উপন্যাস সমগ্র

হুমায়ূন আহমেদ

উপন্যাস সমগ্র ১

হুমায়ূন আহমেদ

প্রথম প্রকাশ · বইমেলা ১৯৪৬

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস বোড সূত্রাপুব, ঢাকা-১১০০'ব পক্ষে
এফ. বহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রাযণ ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস বোড
সূত্রাপুব, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : অষ্টাদশ শতকেব নকশী রুমাল অবলম্বনে

মূল্য ৩০০.০০ টাকা মাত্র।

UPANYASH SAMAGRA (A Collection of Novels) Vol-1 by Humayun Ahmed
Published by PROTIK 46/2 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100

একমাত্র পবিবেশক : অবসব প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রযকেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজাব (দোতলা), ঢাকা-১১০০

উ ৎ স র্গ

বাবা ও মাকে

নিজের কিছু কথা

কুড়ি বছর আগের কথা।

বর্ষার রাত। বাইরে ঘন ঘন বিজলি চমকাচ্ছে। আমি বইপত্র মেলে বসে আছি। থার্মোডিনামিক্সের একটি জটিল অংশ যে করেই হোক পড়ে শেষ করতে হবে।

হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। কেমিস্ট্রিব বইখাতা ঠেলে সরিয়ে দিলাম, লিখতে শুরু করলাম—

"রাবেযা ঘুরে ঘুরে সেই কথা কটিই বার বাব বলছিল।

রুনুর মাথা নিচু হতে হতে থুতনি বুকের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল।

........."

আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস— নন্দিত নরকে। ঐ রাতে কেন হঠাৎ উপন্যাস লেখায় হাত দিলাম, কেনই বা এ রকম গল্প মাথায় এল তা বলতে পাবব না।

লেখকরা যখন লেখেন তখন তাঁরা অনেক কিছুই বলতে চান। সমাজেব কথা বলেন, কালেব কথা বলেন, জীবনের রহস্যমযতার কথা বলেন। লেখার ভেতর আদি প্রশ্নেব উত্তব খোঁজেন— আমবা কোত্থে কে এসেছি? আমবা কারা? আমবা কেনই বা এলাম? আমবা কোথায় যাচ্ছি?

নন্দিত নরকে লেখার সময আমার বযস উনিশ–কুড়ির বেশি নয। এই বযসেব একজন তরুণ কি এত ভেবেচিন্তে কিছু লেখে? আমার জানা নেই—আমি শুধু জানি ঐ বাতে একটি গল্প আমার মাথায ভর কবেছিল, গল্পেব চরিত্রগুলি স্পষ্ট চোখের সামনে দেখছিলাম, ওদেব কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। ভেতরে প্রচণ্ড চাপ অনুভব করছিলাম—যেভাবে ওদেব দেখছি হুবহু সেইভাবে ওদের কথা বলতে হবে এবং আজ রাতেই বলতে হবে। এই মানসিক চাপেব উৎস কী, আমি জানি না।

এক রাতে লেখা ষাট পৃষ্ঠার এই লেখাটির কাছে আমি নানানভাবে ঋণী। এই লেখাই আমাকে ঔপন্যাসিক হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি দিয়েছিল। এই একটি লেখা প্রকাশিত হবার পর অন্য লেখা প্রকাশে আমার কোনো রকম বেগ পেতে হয় নি।

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে নন্দিত নরকে আমার প্রথম উপন্যাস নয়। আমার প্রথম লেখা 'শঙ্খনীল কারাগাব', প্রকাশিত হয় নন্দিত নরকের পরে।

শঙ্খনীল কারাগার উপন্যাসটির সঙ্গে আনন্দ–বেদনার অনেক স্মৃতি জড়িযে আছে। আমাব বাবা আমার কোনো লেখাই পড়ে যেতে পারেন নি—এই পাণ্ডুলিপিটি পড়েছিলেন। বাবা যাতে উপন্যাসটি পড়েন সেই আশায আমি ভয়ে ভয়ে পাণ্ডুলিপিটি তাঁর অফিসে অসংখ্য ফাইলের এক ফাঁকে লুকিযে রেখে এসেছিলাম। উপন্যাস পড়ে তিনি কী বলেছিলেন তা এই রচনায় লিখতে চাচ্ছি না। পৃথিবীর সব বাবারাই তাঁদের পুত্রকন্যাদের প্রতিভায় মুগ্ধ থাকেন। সন্তানের অতি অক্ষম রচনাকেও তাঁরা ভাবেন চিরকালের চিরদিনের লেখা।

'শঙ্খনীল কারাগার' উৎসর্গ করি আহমেদ ছফা এবং আনিস সাবেতকে। আহমেদ ছফা আমার প্রথম উপন্যাস প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অসাধারণ একজন মানুষ। আনিস সাবেত—আরেকজন অদ্ভুত মানুষ! রোগা লম্বা বৈশিষ্ট্যহীন এই মানুষটি হৃদয়ে ভালবাসার সমুদ্র

ধারণ করেছিলেন। মানুষ ফেরেশতা নয়, তার মধ্যে অন্ধকার কিছু দিক থেকেই যায়। আনিস সাবেতের ভেতরে অন্ধকার বলে কিছু ছিল না। সচেতন পাঠক হয়তো লক্ষ্য করেছেন আমার অনেক উপন্যাস ও নাটকে আনিস নামটি ঘুরেফিরে এসেছে। যখনই কোনো অসাধারণ চরিত্র আঁকতে চেয়েছি, আমি নাম দিয়েছি আনিস।

তখন সদ্য দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমি, আহমেদ ছফা এবং আনিস ভাই তিন জন সারাক্ষণ একসঙ্গে থাকি। আমাদের চোখে কত না স্বপ্ন! সাহিত্যের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করব, চিরকুমার থাকব, জীবনকে দেখার ও জানার জন্যে যা করণীয় সবই করব। তাঁরা দুজন তাঁদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন। আমি পরাজিত হলাম জীবনেব মোহেব কাছে।

শঙ্খনীল কারাগাব উপন্যাসটি আরো একটি কারণে আমার বড় প্রিয়। এই লেখা পড়ে অষ্টম শ্রেণীর একটি বালিকা আমাব সঙ্গে দেখা করতে এল। তার নাকি বইটি বড় ভালো লেগেছে। তার ধারণা বইটির লেখকও বইটিব একটি চরিত্রের (খোকা) মতো খুব ভালোমানুষ। সে এই ভালোমানুষটির সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকতে চায়।

অষ্টম শ্রেণীর সেই বালিকা এখনো ভালোমানুষটির (?) সঙ্গেই আছে। তাকে নিয়ে সুখে-দুঃখে জীবনটা পার করেই ফেললাম। যখন পেছনের দিকে তাকাই, বড় অবাক লাগে।

শুধুমাত্র এই বালিকাটিকে অভিভূত করবার জন্যেই আমি একটি উপন্যাস লিখি। নাম— নির্বাসন। সেই উপন্যাসটি তার নামে উৎসর্গ করা হয়। বালিকা আনন্দে অভিভূত হবার বদলে ভয়ে অস্থির হয়ে যায়। তার ধারণা হয় তার বাবা-মা যখনি উৎসর্গপত্রটি দেখবেন তখনি তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। তার আশঙ্কা খুব অমূলক ছিল না।

'তোমাদেব জন্যে ভালোবাসা' এবং 'অচিনপুর' এই দুটি রচনা ময়মনসিংহ শহরে লেখা। তখন ময়মনসিংহেব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি। কাউকেই চিনি না। কথা বলার লোক নেই, গল্প করাব কেউ নেই। কিছু ভালো লাগে না। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ে হাঁটাহাঁটি কবি। একসঙ্গে অনেক গল্প মাথায় আসে। ইচ্ছা করে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে দিনরাত লিখি। শুধুই লিখি। কত কথা আমার বুকে জমা হয়ে আছে। সব কথা সবাইকে জানিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। কাবো সঙ্গে দেখা হলেই মনে হয়—এই মানুষটার জীবনটা কেমন? কী গল্প লুকিয়ে আছে তাঁর ভেতরে? কিন্তু আগ বাড়িয়ে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে না। সব সময় নিজেকে সবিয়ে রাখতে চাই। স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি যখন ঘরের একটি নিরিবিলি কোণ পেয়ে যাই, যেখান থেকে সামান্য একটু আকাশ দেখা যায়। এক চিলতে রোদ পোষা বেড়ালের মতো পায়ের কাছে পড়ে থাকে। আমি বসে যাই কাগজ-কলম নিয়ে—'আমি বলি এই হৃদয়েরে। সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুবে একা কথা কয়।'

লিখে যাচ্ছি ক্রমাগত। কুড়ি বছর হয়ে গেল লেখালেখির বয়স। খুব দীর্ঘ সময় না হলেও খুব কমও তো নয়। অনেক লেখকই ক্রমাগত কুড়ি বছর লিখতে পারেন না। মৃত্যু এসে কলম থামিয়ে দেয়। কেউ কেউ আপনাতেই থেমে যান। তাঁদের লেখার ইচ্ছা ফুরিয়ে যায়। আমার অসীম সৌভাগ্য বয়সেব সঙ্গে সঙ্গে লেখার ইচ্ছা বেড়েই চলছে। আজকাল প্রায়ই বলতে ইচ্ছা কবে— ''জীবন এত ছোট কেন।'

এই যে এত লিখছি, কী বলতে চাচ্ছি এসব লেখায়? 'চারপাশের দুঃসময়, গ্লানিময় এবং রহস্যময় জগৎকে একজন লেখক গভীর মমতায় ভালবাসেন'—এই কি আমার লেখার সারকথা? নাকি এর বাইরেও কিছু আছে? আমি জানি না—আমার জানতে ইচ্ছাও করে না। আমার ইচ্ছা করে—থাক। সব কথা বলে ফেলা ঠিক হবে না। কিছু রহস্য থাকুক।

হুমায়ূন আহমেদ
শহীদুল্লাহ হল।

প্রকাশকের নিবেদন

উপন্যাসসমগ্র প্রথম খণ্ডের তৃতীয় উপন্যাস তোমাদের জন্য ভালোবাসা, যেটি হুমায়ূন আহমেদের প্রথম সায়েন্স ফিকশান, তদুপরি বাংলায় প্রথম সায়েন্স ফিকশান উপন্যাস। এ কারণে এই উপন্যাসটি এই খণ্ডে মুদ্রিত হল। পরবর্তী খণ্ডগুলোতে কোনো সায়েন্স ফিকশান থাকবে না, কেননা হুমায়ূন আহমেদের 'সায়েন্স ফিকশান' শিরোনামে ভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রথম খণ্ডের সূচি

নন্দিত নরকে

ভূমিকা

মাসিক 'মুখপত্রে'র প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় গল্পের নাম 'নন্দিত নরকে' দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কেননা ঐ নামের মধ্যেই যেন একটি নতুন জীবনদৃষ্টি, একটি অভিনব রুচি, চেতনার একটি নতুন আকাশ উঁকি দিচ্ছিল। লেখক তো বটেই, তাঁর নামটিও ছিল আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবু পড়তে শুরু করলাম ঐ নামের মোহেই।

পড়ে আমি অভিভূত হলাম। গল্পে সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছি একজন সূক্ষ্মদর্শী শিল্পীর; একজন কুশলী স্রষ্টার পাকা হাত। বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক সুনিপুণ শিল্পীর, এক দক্ষ রূপকারের, এক প্রজ্ঞাবান দ্রষ্টার জন্মলগ্ন যেন অনুভব করলাম।

জীবনের প্রাত্যহিকতার ও তুচ্ছতার মধ্যেই যে ভিন্নমুখী প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির জটাজটিল জীবনকাব্য তার মাধুর্য, তার ঐশ্বর্য, তার মহিমা, তার গ্লানি, তার দুর্বলতা, তার বঞ্চনা ও বিড়ম্বনা, তার শূন্যতার যন্ত্রণা ও আনন্দিত স্বপ্ন নিয়ে কলেবরে ও বৈচিত্র্যে স্ফীত হতে থাকে, এত অল্প বয়সেও লেখক তাঁর চিন্তা-চেতনায় তা ধারণ করতে পেরেছেন দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত।

বিচিত্র বৈষয়িক ও বহুমুখী মানবিক সম্পর্কের মধ্যেই যে জীবনের সামগ্রিক স্বরূপ নিহিত, সে উপলব্ধিও লেখকের রয়েছে। তাই এ গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে অনেক মানুষের ভিড়, বহুজনের বিদ্যুৎ-দীপ্তি এবং খণ্ড খণ্ড চিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। আপাতনিস্তরঙ্গ ঘরোয়া জীবনের বহুমুখী সম্পর্কের বর্ণালি কিন্তু অসংলগ্ন ও বিচিত্র আলেখ্যর মাধ্যমে লেখক বহুতে ঐক্যের সুষমা দান করেছেন। তাঁর দক্ষতা ঐ নৈপুণ্যেই নিহিত। বিড়ম্বিত জীবনে প্রীতি ও করুণার আশ্বাসই সম্বল।

হুমায়ূন আহমেদ বয়সে তরুণ, মনে প্রাচীন দ্রষ্টা, মেজাজে জীবন-রসিক, স্বভাবে রূপদর্শী, যোগ্যতায় দক্ষ রূপকার। ভবিষ্যতে তিনি বিশিষ্ট জীবনশিল্পী হবেন--এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় *ডঃ আহমদ শরীফ*

রাবেয়া ঘুরে ঘুরে সেই কথা ক'টিই বার বার বলছিল।

রুনুর মাথা নিচু হতে হতে থুতনি বুকের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল। আমি দেখলাম তার ফর্সা কান লাল হয়ে উঠেছে। সে তার জ্যামিতি-খাতায় আঁকিবুকি কাটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে 'দাদা একটু পানি খেয়ে আসি' বলে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল। রুনু বারো পেরিয়ে তেরোতে পড়েছে। রাবেয়ার অশ্লীল কদর্য কথা তার না বোঝার কিছু নেই। লজ্জায় সে লাল হয়ে উঠেছিল। হয়তো সে কেঁদেই ফেলত। রুনু অল্পতেই কাঁদে। আমি রাবেয়াকে বললাম, 'ছিঃ রাবেয়া, এসব বলতে আছে? ছিঃ! এগুলি বড় বাজে কথা। তুই কত বড় হয়েছিস।'

রাবেয়া আমার এক বৎসরের বড়ো। আমি তাকে তুই বলি। পিঠাপিঠি ভাই-বোনেরা এক জন আরেক জনকে তুই বলেই ডাকে। রাবেয়া আমাকে তুই বলে। আমার প্রতি তার ব্যবহার ছোটবোনসুলভ। সে আমার কথা মন দিয়ে শুনল। কিছুক্ষণ ধরেই বালিশের গায়ে চাদর জড়িয়ে সে একটা পুতুল তৈরি করছিল। আমার কথায় তার ভাবান্তর হল না। পুতুল তৈরি বন্ধ রেখে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। পা নাচাতে নাচাতে সে নোংরা কথাগুলি আগের চেয়েও উঁচু গলায় বলল। আমি চুপ করে রইলাম। বাধা পেলেই রাবেয়ার রাগ বাড়বে। গলার স্বর উঁচু পর্দায় উঠতে থাকবে। পাশের বাসার জানালা দিয়ে দু'-একটি কৌতূহলী চোখ কী হচ্ছে দেখতে চেষ্টা করবে।

রাবেয়া বলল, 'আমি আবার বলব।

'বেশ।'

'কী হয় বললে?'

আমি কাতর গলায় বললাম, 'সে ভারি লজ্জা রাবেয়া। এটা খুব একটা লজ্জার কথা।'

'তবে যে ও আমাকে বলল।'

'কে?'

আমি বুঝতে পারছি, রাবেয়া নিশ্চয়ই কথাগুলি বাইরে কোথাও শুনে এসেছে। কিন্তু রাবেয়াকে, যার বয়স গত আগস্ট মাসে বাইশ হয়েছে, তাকে সরাসরি এমন একটি কদর্য কথা কেউ বলতে পারে ভাবি নি।

আমি বললাম, ' কে বলেছে?'

'আজ সকালে বলেছে।'

'কে সে?'

'ঐ যে লম্বা ফর্সা।'

রাবেয়া সেই ছেলেটির আর কোনো পরিচয়ই দিতে পারবে না। আবারও রাবেয়া বেড়াতে বেরুবে, আবার হয়তো কেউ এমনি একটি ইতর অশ্লীল কথা বলে বসবে তাকে।

'খোকা তোর দুধ।'

মা দুধের বাটি টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। কাল রাতে তাঁর জ্বর এসেছিল। বেশ বাড়াবাড়ি রকমের জ্বর। বাবা মাঝরাত্তিরে আমার দরজায় ঘা দিয়েছিলেন। আমার ঘুমের ঘোর না কাটতেই শুনলাম, 'তোর কাছে এ্যাসপিরিন আছে খোকা?'

স্বপ্ন দেখছি এই ভেবে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ার উদ্যোগ করতেই মায়ের কান্না শুনলাম। মা অসুখ-বিসুখ একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। অল্প জ্বর, মাথা ব্যাথা--এতেই কাহিল।

বাবা আবার ডাকলেন, 'খোকা, তোর কাছে এ্যাসপিরিন আছে?'

তোষকের নিচে আমার ডাক্তারখানা। এ্যাসপিরিন, ডেসপ্রোটেব এই জাতীয় ট্যাবলেট জমান আছে। অন্ধকারেই আমি মাঝারি সাইজের ট্যাবলেট খুঁজতে লাগলাম। এ ঘরে আলো নেই। কোথায় যেন তার জ্বলে গেছে। রাতে হ্যারিকেন জ্বালান হয়। ঘুমুবার সময় রুনু হ্যারিকেন নিবিয়ে দেয়। আলোতে রুনুর ঘুম হয় না। বাবা বললেন, 'খোকা, পেয়েছিস ?'

'হুঁ। কী হয়েছে ?'

'তোর মার জ্বর।'

'জ্বরে এ্যাসপিরিন কী হবে?'

'খুব মাথাব্যথাও আছে।'

'অ।'

তিনটি ট্যাবলেট হাতে নিয়ে দরজা খুলতেই বারান্দায় লাগান পঁচিশ পাওয়ারের বাল্বের আলো এসে পড়ল। কী বাজে ব্যাপার! একটিও এ্যাসপিরিন নয়। বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ঘরে দেশলাই রাখতে পারিস না?'

মনে পড়ল ড্রয়ারে একটি নতুন দেশলাই আর তিনটি বৃস্টল সিগারেট রয়েছে। সারা দিনে পাঁচটার বেশি খাব না ভেবেও সাতটা হয়ে গেছে। আর এখন এই মধ্যরাতে একটা তো জ্বালাতেই হবে। কিছুক্ষণের ভেতরই একটা সিগারেট ধরাব, এতেই মনটা ভরে উঠল। বাবা এ্যাসপিরিন নিয়ে চলে গেলেন। দেশলাই জ্বালাতেই চোখে পড়ল, রাবেয়া বিশ্রীভাবে শুয়ে রয়েছে। প্রায় সমস্তটা শাড়ি পাকিয়ে পুঁটলি বানিয়ে বুকের কাছে জড়িয়ে রেখেছে। শীতের সময় মশা থাকে না, মশারির আব্রুও সেই কারণেই অনুপস্থিত। বাবার গলা শোনা গেল, 'নাও শানু, খেয়ে ফেল ট্যাবলেটটা।'

আশ্চর্য! বাবা এমন আদুরে গলায় ডাকতে পারেন! আমার লজ্জা করতে লাগল। বাবা আবার ডাকলেন, 'শানু শানু।'

শাহানা নামটাকে কী সুন্দর করে ভেঙে শানু ডাকছেন বাবা! আমার আর বাবার ঘরের ব্যবধানটা বাঁশের বেড়ার ব্যবধান। উপরের দিকে প্রায় দু' হাত খানিক ফাঁকা। সামান্যতম শব্দের কথাও আমার ঘরে ভেসে আসে। আমি একটা চুমুর শব্দও শুনলাম।

আমার মাঝে মাঝে ইনসমনিয়া হয়। আমার তোষকের নিচে চারটে ভেলিয়াম-টু ট্যাবলেট আছে। কিন্তু আমি কখনো ভেলিয়াম খাই না। ঘুমের ওষুধ হার্ট দুর্বল করে। আমার বন্ধু সলিল ঘুমানর জন্য দু'টি মাত্র বড়ি খেয়ে মারা গিয়েছিল। তার হার্টের অসুখ ছিল। আমারও হয়তো আছে। আমার মাঝে মাঝে বুকের বাম পাশে চিনচিনে ব্যথা হয়।

আমি হাজার ইনসমনিয়াতেও ঘুমের ওষুধ খাই না। মাঝে মাঝে এ জন্যে আমার বেশ অসুবিধা হয়। মাঝরাতে বাব্বা যখন 'শানু শানু, এই শাহানা' বলে ডাকতে থাকেন, তখন আমার কান গরম হয়ে ওঠে। নাক ঘামতে থাকে। হার্টের স্পন্দন দ্রুত ও স্পষ্ট হয়। রাতের নাটকের সব ক'টি কথা আমার জানা। মা বলেন, 'আহা কর কি? ছি!' বাবা ফিসফিস করে কী বলেন। তাঁর গলা খাদে নেমে আসে। মা জড়িত কণ্ঠে হাসেন। আমি দু' হাতে আমার কান বন্ধ করে ফেলি। নিজের বুকের শব্দটা সে সময় বড়ো বেশি স্পষ্ট মনে হয়। কিছুক্ষণের ভিতরই আবার সব নীরব হয়।

রুনু আর রাবেয়া ঘুমের ঘোরে বিজবিজ করে। টেবিল ঘড়ির টক টক টক টক শব্দ আবার ফিরে আসে। আমি টেবিলে রাখা জগে মুখ লাগিয়ে ঢকঢক করে পানি খেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াই।

বারান্দার এক পাশে দু'টি হাসুহেনা গাছ আছে। মা বলেন হাছনাহেনা। দুটোই প্রকাণ্ড। রাতের বেলায় তার পাশে এসে দাঁড়ালে ফুলের গন্ধে নেশার মতো হয়। হাসুহেনার গন্ধে নাকি সাপ আসে। মন্টু এই গাছের নিচেই এক বার একটা মস্ত সাপ মেরেছিল। চন্দ্রবোড়া সাপ। মা দেখে আঁতকে উঠে বলেছিলেন, ' কি করলি রে মন্টু, এর জোড়াটা যে এবার তোকে খুঁজে বেড়াবে।'

আমি যদিও এ-সব বিশ্বাস করতাম না, তবু আমার ভয় লাগছিল। আমি তন্ন তন্ন করে অন্য সাপটাকে খুঁজলাম। বাড়ির চারপাশে কার্বলিক এসিড দেওয়া হল। মাস্টার চাচা বললেন, 'যে সাপটা রয়ে গেছে সেটা পুরুষ সাপ।' সাপ দেখে তিনি স্ত্রী-পুরুষ বলতে পারতেন। ক'দিন সবাই খুব ভয়ে ভয়ে কাটালাম, যদিও সেই পুরুষ সাপটিকে কখনো দেখা যায় নি।

রাবেয়া বলল, 'মা আমি দুধ খাব।'

মার কাল রাতে জ্বর এসেছিল। তাঁর মুখ শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। রাবেয়ার কথা শুনে মার মুখ আরো শুকিয়ে গেল। তাঁকে বাচ্চা খুকির মতো দেখাতে লাগল। আমি জানি আমরা কেউ যখন কোনো একটা জিনিসের জন্যে আব্দার করি এবং মা যখন সেটি দিতে পারেন না তখন তাঁর মুখ এমনি লম্বাটে হয়ে বাচ্চা খুকিদের মতো দেখাতে থাকে। তাঁর নাকের পাতলা চামড়া তিরতির করে কাঁপতে থাকে। ছোট বয়সে মার এই ভঙ্গিটাকে আমার খুব খারাপ লাগত। আমি একটি জিনিস

চেয়েছি, মা সেটি দিতে পারছেন না। তাঁর মুখ বাচ্চা খুকিদের মতো হয়ে গিয়েছে। নাকের ফর্সা পাতলা পাতা তিরতির করে কাঁপছে। মায়ের এই ভঙ্গিটাকে আমার অপরাধীর ভঙ্গি বলে মনে হ'ত। আমি মাকে কী করে কষ্ট দেওয়া যায় তা ভাবতে থাকতাম। মার গায়ে একটি টিকটিকি ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে হ'ত। মা টিকটিকিকে বড়ো ভয় পান। মুখে বলেন ঘৃণা, কিন্তু আমি জানি এ তাঁর ভয়। এক বার মা ভাত খেতে বসেছেন, হঠাৎ ছাদ থেকে একটা টিকটিকির বাচ্চা এসে পড়ল তাঁর মাথায়। তিনি হড়হড় করে বমি করে ফেললেন। মার উপর রাগ হলেই আমি টিকটিকি খুঁজতাম। কিন্তু টিকটিকি খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। পেলেও ধরা যেত না। কাপড়ের বল বানিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতাম দেয়ালে টিকটিকির গায়। টুপ করে তার ল্যাজ খসে পড়ত। সেই ল্যাজও মা ঘেন্না করতেন। মা কখনো আমাদের কিছু বলতেন না। মা বড়ো বেশি ভালোমানুষ। বাবা মারতেন প্রায়ই। ভীষণ মার। মা বলতেন, 'আহা কী কর! আহা ব্যথা পায় না?' বাবা বলতেন, 'যাও, সরে যাও সামনে থেকে। আদর দিয়ে মাথায় তুলেছ তুমি।' মাকে তখন বড়ো বেশি অসহায় মনে হ'ত। আর আমার ইচ্ছে হ'ত কাল ভোরেই বাড়ি থেকে পালাব। আর কখনো আসব না।

'মা আমাকে দুধ দাও।'

রাবেয়া জেদ করতে লাগল। আমি বাটিটি তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। মা মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'আহা, খা না তুই, তোর পরীক্ষা।'

দুধের বিলাসিতাটুকু আমার জন্যেই। সামনেই এম.এস.সি ফাইনাল, রাত জেগে পড়ি। ন'টার দিকে মা দুধ নিয়ে আসেন। আমি দুধে চুমুক দিতেই মা নীরবে রাবেয়ার শাড়ি থেকে একটি একটি করে সেফটিপিন খুলতে থাকেন। রাবেয়ার শাড়িতে গোটা দশেক সেফটিপিন সারা দিন লাগান থাকে। সমস্ত দিন সে ঘুরে বেড়ায়। তার অনাবৃত শরীর ভুলেও যেন কারুর চোখে না পড়ে, এই ভয়েই মা এ করেন। রাবেয়াকে ঘরে আটকে রাখা যাবে না--তাকে সালোয়ার কামিজও পরান যাবে না। তার সে-বয়স নেই। অথচ সবাই রাবেয়ার দিকে অসংকোচে তাকাবে। বয়স হলেই ছেলেরা মেয়েদের দিকে তাকায়। সেই তাকানয় লজ্জা থাকে, দৃষ্টিতে সংকোচ থাকে। কিন্তু রাবেয়ার ব্যাপারে সংকোচ বা লজ্জার কোনো কারণ নেই। রাবেয়াকে যে-কেউ অতি কুৎসিত কথা বললেও সে হাসিমুখে সে-কথা শুনবে। বাড়ি এসে অনায়াসে সবাইকে বলে বেড়াবে।

মা রাবেয়ার পাশে বসে রাবেয়ার মাথায় হাত রাখলেন। আমি একটি ছোট কিন্তু স্পষ্ট দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। রাবেয়া ঢকঢক করে দুধ খাচ্ছে। রাবেয়া হয়তো ঠিক রূপসী নয়। কিংবা কে জানে হয়তো রূপসী। রং হালকা কালো। বড়ো বড়ো চোখ, স্বচ্ছ দৃষ্টি, সুন্দর ঠোঁট। হাসলেই চিবুক আর গালে টোল পড়ে। যে-সমস্ত মেয়ে হাসলে টোল পড়ে, তারা কারণে-অকারণে হাসে। তারা জানে হাসলে

তাদের ভালো দেখায়। রাবেয়া তা জানে না, তবু সে হাসে। কারণে–অকারণে হাসে। রাবেয়ার কপালে, ঠিক মাঝখানে একটা কাটা দাগ আছে। ছোটবেলায় চৌকাঠে পড়ে গিয়েছিল। দুধ শেষ করে রাবেয়া বলল, 'বাজে দুধ। ছিঃ!'

মা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'শুভাপুরের পীর সাহেবের কাছে যাবি এক বার?' শুভাপুরে এক পীর সাহেব থাকেন। পাগল ভালো করতে পারেন বলে খ্যাতি। শুভাপুর এখান থেকে আট মাইল। সাইকেলে ঘন্টাখানেক লাগে, কিন্তু আমি জানি পীর–ফকিরে কিছু হবে না। বড়ো ডাক্তার যদি কিছু করতে পারে। কিন্তু আমাদের পয়সা নেই। আমার ছোট হয়ে যাওয়া শার্ট মন্টু পরে। আমরা কাপড় কিনি বৎসরে এক বার, রোজার ঈদে।

রুনু এল একটু পরেই। আড়চোখে দু'–তিন বার তাকাল রাবেয়ার দিকে। না, রাবেয়া সেই কুৎসিত কথাগুলি আর বলছে না। রুনু হাই তুলল। তার ঘুম পাচ্ছে। চোখ ফুলে উঠেছে। রাবেয়ার নোংরা কথা শুনে রুনুর কেমন লেগেছিল কে জানে। রুনুর বয়স এখন তেরো। আগামী নভেম্বরে চৌদ্দতে পড়বে। রুনুর বৃশ্চিক রাশি। আমার যখন এমন বয়স ছিল, তখন এ ধরনের কথা শুনে বেশ লাগত। সেই বয়সে মেয়েদের কথা ভাবতে আমার ভালো লাগত। টগর ভাইয়ের বাসায় সন্ধ্যাবেলা অঙ্ক বুঝতে যেতাম। নীলু বলে তার একটা ছোট বোন ছিল। বড়ো হয়ে এই মেয়েটিকে বিয়ে করব ভেবে বেশ আনন্দ হ'ত আমার। নীলুর সঙ্গে কথা বলতেও লজ্জা লাগত, কথা বেধে যেত মুখে। নীলু যখন আমার হাত ধরে টেনে বলত, 'আসুন না দাদু ভাই, লুডু খেলি।' তখন অকারণেই আমার কান লাল হয়ে উঠত। গলার কাছটায় ভার–ভার লাগত।

রুনুরও কি কোনো ছেলেকে ভালো লাগে? রুনুও কি কখনো ভাবে, বড়ো হয়ে আমি এই ছেলেটিকে বিয়ে করব? কে জানে। হয়তো ভাবে, হয়তো ভাবে না। রুনু বড় লক্ষ্মী মেয়ে। এত লক্ষ্মী আর এত কোমল যে আমার মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। কেন জানি না আমার মনে হয়, এ ধরনের মেয়েরা সুখ পায় না জীবনে। আমি রুনুকে অনেক বড়ো করব। রুনু ডাক্তার হবে বড়ো হলে। স্টেথোসকোপ গলায়, কালো ব্যাগ হাতে মেয়ে ডাক্তারদের বড়ো সুন্দর দেখায়। রুনু অঙ্ক ভালো পারে না। আমি তাকে নিজের পড়া বন্ধ রেখে এ্যালজেবরা বোঝাই। ডাক্তারী পড়তে অবশ্যি অঙ্ক লাগে না।

সেদিন রুনুর অঙ্কখাতা উল্টে চমকে গিয়েছিলাম। বেশ গোটা গোটা করে লেখা 'আমি ভালোবাসি'। পরের কথাগুলি পড়ে অবশ্যি আমি লজ্জাই পেলাম। সেটি একটি ছেলেমানুষী কবিতা। আমি পৃথিবীর এই সৌন্দর্য ভালোবাসি, গাছপালা–গান ভালোবাসি––এই জাতীয়। আমি বললাম, 'সুন্দর কবিতা হয়েছে রুনু।'

রুনু লজ্জায় গলদা চিংড়ির মতো লাল হয়ে বলল, 'যাও, ভারি তো। এটা মোটেই ভালো হয় নি।'

আমি বললাম, 'তাহলে তো মনে হয় অনেক কবিতা লিখেছিস।'

'উঁহু !' রুনু মাথা নিচু করে হাসতে লাগল।

আমি বললাম, 'দেখা রুনু, লক্ষ্মী মেয়ে তুই।'

রুনু আরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে আমার ট্রাঙ্ক খুলল। তার যাবতীয় গোপন সম্পত্তি আমার ট্রাঙ্কে থাকে। এই বয়সে কত তুচ্ছ জিনিস অন্যের চোখের আড়াল করে রাখতে হয়। কিন্তু রুনুর নিজস্ব কোনো বাক্স নেই। আমার ট্রাঙ্কের এক পাশে তার দু'টি বড়ো বড়ো চারকোণা বিস্কুটের বাক্স থাকে। আর কিছু খাতাপত্রও থাকে দেখছি। রুনু হাতির ছবি আঁকা একটা দু'নম্বরী খাতা নিয়ে এসে লজ্জায় বেগুনি হয়ে গেল।

আমি বললাম, 'তুই পড়ে শোনা আমাকে।'

'না, তুমি পড়।'

'দে তাহলে আমার হাতে।'

রুনু খাতাটা গুঁজে দিয়ে দৌড়ে পালাল। দেখলাম সব মিলিয়ে বারোখানা কবিতা। দু'টি মায়ের ওপর, একটি পলার ওপর। (পলা আমাদের পোষা কুকুর। এক দুপুরে কোথায় যে চলে গেল।) একটি মন্টুর সাপ মারা উপলক্ষে--

'মন্টু ভাই তো মারলেন মস্ত বড়ো সাপ
চার হাত লম্বা সেটি---কী তার প্রতাপ।'

মনে মনে ভাবলাম, রুনুকে একটি ভালো খাতা কিনে দেব। রুনু খাতা ভর্তি করে ফেলবে কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পে বাচ্চা মেয়ের একটি চরিত্র আছে। মেয়েটি লিখতে শিখে অব্দি ঘরের দেয়াল, বইয়ের পাতা, মার হিসেবের খাতায় যা মনে আসত তাই লিখে বেড়াত। মেয়েটির দাদা তাকে একটি চমৎকার খাতা দিয়েছিল, যা তার জীবনে পরম সখের সামগ্রী হয়েছিল। কিন্তু আমার হাতে টাকা ছিল না। তবু আমি মনস্থির করে ফেললাম, রুনুকে একটা খুব ভালো খাতা কিনে দেব। আমার মনে পড়ল হাতি মার্কা যে-খাতাটায় রুনু কবিতা লিখেছে, রুনু সেটি আমার কাছ থেকেই চেয়ে নিয়েছিল। যেখানে আমার নাম ছিল, সেটি কেটে রুনু বড়ো বড়ো করে নিজের নাম লিখেছে। দিনে ক'ঘন্টা পড়ছি তার হিসেব রাখার জন্যে খাতাটি কিনেছিলাম। সপ্তাহ দুয়েক যাবার পরও যখন কিছু লেখা হয় নি, তখন এক দিন রুনু সংকুচিতভাবে আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। সাপের মতো এঁকেবেঁকে বলল, 'দাদা খাতাটা আমাকে দাও না।'

'কোন খাতা?'

'এইটে।'

'যা, নিয়ে যা।'

রুনু খাতা হাতে চলে গেল। তার মুখে সেদিন যে-খুশির আভা দেখেছি, আমি আবার তা দেখব। সাড়ে তিন টাকা দিয়ে প্লাস্টিকের সুদৃশ্য কাভারের চমৎকার

একটি খাতা কিনে দেব তাকে।

আমার হাতে যদিও টাকা ছিল না, তবু আমি রুনুকে খাতা কিনে দিয়েছিলাম। রুনুকে বড়ো ভালোবাসি আমি। বড়ো ভালোবাসি। রুনুকে দেখলেই আমার আদর করতে ইচ্ছে হয়। রুনু বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে। রুনুর ভালো নাম সালেহা। রুনু নামটা আমারই দেওয়া। রুনুর জন্যে রুনু নামটাই মানানসই। রুনু নামে কেমন একটা বাজনার আমেজ আসে। আবার যখন দীর্ঘ স্বরে ডাকা হয় রু ---- নু ---- তখন কেমন একটা আমেজ আসে। রুনু বলল, 'দাদা, আমি ঘুমিয়ে পড়ি।'

মা মশারি খাটিয়ে দিয়ে গেছেন। বেশ মশা এখন। রাতের সঙ্গে সঙ্গে মশাও বাড়তে থাকবে। আমার কানের কাছে গুনগুন করবে তারা। পড়ায় মন দিতে পারছি না, এম. এস. সি-তে খুব ভালো রেজাল্ট করতে হবে আমার। একটা ভদ্র ভালো বেতনের চাকরির আমার বড়ো প্রয়োজন। রুনু গুটিসুটি মেরে রাবেয়ার পাশে শুয়ে পড়েছে। অবশ্যি সে এখন ঘুমুবে না। যতক্ষণ ঘরে আলো জ্বলে ততক্ষণ রুনু ঘুমুতে পারে না।

আমার পাশেই রাবেয়া আর রুনু শুয়ে আছে। এত পাশে যে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। রাবেয়াটা শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ে। এক-এক বার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঁদে। সে কান্না বিলম্বিত দীর্ঘ সুরের কান্না। পলাও মাঝে মাঝে এমন কাঁদত। মা বলতেন, 'দূর দূর'। কুকুরের কান্না নাকি অমঙ্গলের চিহ্ন। গৃহস্থদের বিপদ দেখলেই কুকুর বেড়াল জাতীয় পোষা জীবগুলি কাঁদে। রাবেয়ার কান্নার উৎস আমরা জানি না। হয়তো সারা দিনের অবরুদ্ধ কান্না রাতে অঝোর ধারার মতোই নেমে আসে। রাবেয়ার কান্নায় রুনু ভয় পায়। বলে, 'দাদা, আপা কাঁদছে কেমন দেখ।' আমি বলি, 'ভয় কি রুনু?' উঁচু গলায় ডাকি, 'এই, এই রাবেয়া কাঁদ কেন? কী হয়েছে?'

কোনো কোনো রাতে অপূর্ব জোছনা হয়। জানালা গলে নরম আলো এসে পড়ে আমাদের গায়। জোছনায় নাকি হাসনুহেনা খুব ভালো ফোটে। নেশা-ধরান ফুলের গন্ধে ঘর ভরে যায়। আমি ডাকি, 'রুনু ঘুমিয়েছিস?'

'উঁহু।'

'গল্প শুনবি?'

'বল।'

কী গল্প বলব ভেবে পাই না। গল্পের মাঝখানে থেমে গিয়ে বলি, 'এটা নয়, আরেকটা বলি।' রুনু বলে, 'বল'। সে গল্পও শেষ হয় না। আচমকা মাঝপথে থেমে গিয়ে বলি, 'তুই একটা গল্প বল, রুনু।'

'আমি বুঝি জানি?'

'যা জানিস তা-ই বল। বল না।'

'উঁহু, তুমি বল দাদা।'

রুনুকে আমার টমাস হার্ডির 'এ পেয়ার অব ব্লু আইজ'-এর গল্প বলতে ইচ্ছে

হয়। আমার মনে হয় রুনুই যেন 'এ পেয়ার অব ব্লু আইজে'র নায়িকা। কিন্তু রুনু আমার ছোট বোন। সামনের নভেম্বরে সে চৌদ্দ বৎসরে পড়বে। এমন প্রেমের গল্প তাকে কি করে বলি। রুনু বলে, 'থেমে গেলে কেন দাদা? শেষ কর না।'

আমি গল্প বন্ধ করে জিজ্ঞেস করি, 'রুনু, তোর কাকে সবচে ভাল লাগে?'

'তোমাকে।'

হয়তো আমাকে তার সত্যি ভালো লাগে। বাইরে তীব্র জোছনা, ফুলের অপরূপ সৌরভ, মশারি উড়িয়ে নেবার মতো বাতাস। বুকের কাছটায় গভীর বেদনা অনুভব করি।

'এই আপা, এই!'

'কী হয়েছে রুনু?'

'দাদা, আপা আমার গায়ে ঠ্যাং তুলে দিয়েছে।'

রাবেয়া ঘুমের ঘোরে পা তুলে দিয়েছে রুনুর গায়ে। বেশ স্বাস্থ্য রাবেয়ার। স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের হয়তো ভরা যৌবনের মেয়ে বলে। ভরা যৌবন কথাটায় কেমন একটা অশ্লীলতার ছোঁয়া আছে। আমার কাছে যুবতী কথাটা তরুণীর চেয়ে অনেক অশ্লীল মনে হয়। কে জানে কেন।

পাশের বাসার লোকজনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাত যত বাড়ে আশেপাশের শব্দ ততই স্পষ্ট হয়। দিনে কখনো থানার ঘড়ির ঘন্টা শুনি না। রাত ন'টার পর থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাশের বাসায় কে যেন কাশল। কিছুক্ষণ পর খিলখিল করে হাসির শব্দ শুনলাম। হাসির স্বরগ্রাম বেশ উঁচু। নিশ্চয়ই নাহার ভাবী। নাহার ভাবী উঁচু গলায় কথা বলেন। 'বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে'—নাহার ভাবী রেকর্ড চড়িয়েছেন। প্রায় রাতেই তিনি গান শোনেন। এই গানটি তাঁর ফেবারিট। আমার রবীন্দ্রসংগীতের 'প্রাঙ্গণে মোর শিরিষশাখায়' সব চেয়ে ভালো লাগে। এই রেকর্ডটি তাঁরা খুব কম বাজান। 'বিধি ডাগর আঁখি' বড়ো করুণ। নাহার ভাবী তো খুব হাসি-খুশি। অথচ এমন একটি করুণ গান তাঁর পছন্দ কেন কে জানে। যারা খুব হাসি-খুশি, করুণ সুর তাদের খুব মুগ্ধ করে—কোথায় যেন পড়েছি।

রুনু হঠাৎ ডাকাল, 'দাদা ঘুমিয়েছ?'

'না।'

'নাহার ভাবী গান বাজাচ্ছে।'

'হুঁ।'

'এর পর কোন গানটা বাজবে জান?'

'না, কোনটা?'

'আধুনিক। জোনাকি ঝিকিমিকি জ্বালো আলো।'

সত্যি সত্যিই তাই বাজল। রুনু শব্দ করে হাসল।

আমি বললাম, 'তুই জানলি কী করে?'

'আমিই তো আজ দুপুরে সাজিয়ে রেখেছি। তোমার গান সবার শেষে।'

রাবেয়া ঘুমের ঘোরে বলল, 'না না, বললাম তো যাব না।' হারুন ভাই যদি সত্যি সত্যি রাবেয়াকে বিয়ে করে ফেলত, তবে আর মাঝরাতে গান শোনা হ'ত না। রাবেয়ার গান ভালো লাগে না। কে জানে, কী তার ভালো লাগে। হারুন ভাইদের বাসার সবাই রাজি হলেও এ বিয়ে হ'ত না।

রাবেয়া যদি কোনো দিন ভালো হয়ে ওঠে, তবে তাকে খুব এক জন হৃদয়বান ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব। হারুন ভাইয়ের মতো একটি নিখুঁত ভালো ছেলে। সেও গভীর রাতে রেকর্ড বাজাবে। চাঁদের আলো এসে পড়বে তাদের দু'জনার গায়। ভদ্রলোক রাবেয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলবেন, 'তোমার কপালে কিসের দাগ রাবেয়া?'

'পড়ে গিয়েছিলাম চৌকাঠে।'

তিনি সেই কাটা দাগের উপর অনেকক্ষণ হাত রাখবেন। তারপর চুমু খাবেন সেখানটায়।

রুনু আমায় ডাকল, 'দাদা, তোমার গান হচ্ছে।'

আমি শুনলাম 'প্রাঙ্গণে মোর শিরিষশাখায় ফাগুন মাসে কী উচ্ছ্বাসে'। আবেগে আমার চোখ ভিজে উঠল। গানটি আমার বড়ো ভালো লাগে।

গান শুনতে শুনতে আমি নাহার ভাবীর মুখ মনে আনতে চেষ্টা করলাম। মাঝে মাঝে খুব পরিচিত লোকদের মুখও আমি কিছুতেই মনে আনতে পারি না। নাহার ভাবীর মুখটা ত্রিভুজ আকৃতির। হারুন ভাইদের বাসার সবার মুখ আবার লম্বাটে, ডিমের মতো। তারা সবাই ভারি সুন্দর। কয় পুরুষ ধনী থাকলে চেহারায় একটা আলগা লালিত্য আসে কে জানে। ভাবতে ভালো লাগে, এই পরিবারটিতে কোনো দুঃখ নেই। মাসের পনের তারিখের পর থেকে খরচ বাঁচানর আপ্রাণ চেষ্টা এ পরিবারের মায়ের করতে হয় না। ইচ্ছে হলেই ইংরেজি ছবির মতো মোটরে করে এরা আউটিং-এ চলে যায়। স্বাধীনতা-দিবসে এ পরিবারের মেয়েরা রাইফেল শুটিং-এ ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়।

তারা কবে এসেছিল শান্তি কটেজে আমার মনে নেই, তবে খুব বৃষ্টি সেদিন। আমি, রাবেয়া আর রুনু বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। জীপ থেকে ভিজতে ভিজতে নামল সবাই। প্রথমে রুনুর বয়সী একটি মেয়ে। নাম শীলা। বাবা আদর করে ডাকেন শীলু মা, মা শুধু বলেন শীলু। তারপর বড় ভাই, চোখে বুড়ো মানুষের চশমা হলেও একেবারে ছেলেমানুষী চেহারা। গাড়ি থেকে নেমেই চেঁচিয়ে উঠল, 'কী চমৎকার বাড়ি শীলু।' বাবা নামলেন, মা নামলেন, চাকর-বাকর নামল। আজিজ সাহেবদের চলে যাওয়ার অনেক দিন পর বাড়িটা ভরল। বর্ষা গিয়ে শীত এল। ব্যাডমিন্টন কোর্ট কেটে হৈহৈ করে দুই ভাইবোন লাভ ইলেভেন, লাভ টুয়েলভ করে খেলতে লাগল।

রুনু বড়ো লাজুক, নয়তো সে গিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব করতে পারত। আমার খুব ইচ্ছে হ'ত শীলু মেয়েটির সঙ্গে রুনুর ভাব হোক। আমি দেখতাম, সন্ধ্যা হলেই শীলু তাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কবুতর ওড়াত। তাদের দু'টি লোটন পায়রা ছিল। কারণে-অকারণে যেত রাবেয়া। তাকে আমরা বাধা দিতাম না। বাধা পেলেই রাবেয়ার মেজাজ বিগড়ে যেত। চিটাগাং-এ বড়ো খালার ভাসুর মস্ত ডাক্তার। তিনি বলেছিলেন, 'যা ইচ্ছে হয় তা-ই করতে দেবেন একে। দেখবেন, যা এবনর্মালিটি আছে, তা আপনি সেরে যাবে।' আমাদের চিকিৎসার টাকা ছিল না। নিখরচার চিকিৎসা তাই আমরা প্রাণপণে করতাম। এক দিন মা কাঁদো কাঁদো হয়ে আমার টেবিলে একটি কী যেন নামিয়ে রাখলেন। দেখি চমৎকার একটি কলমদান। ধবধবে সাদা দু'টি পেঙ্গুইন পাখি কলমদানের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পেঙ্গুইন দুটোর মাঝামাঝি একটি বাচ্চা পেঙ্গুইন হাঁ করে শূন্যে তাকিয়ে। সেই হাঁ-করা মুখেই কলম রাখার জায়গা। আমার এ-জাতীয় জিনিসের দাম সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তবু মনে হল এ অনেক দামী। মা কাঁপা গলায় বললেন, 'রাবেয়া এনেছে ও-বাড়ি থেকে।'

আমার প্রথমেই যা মনে হল, তা হল রাবেয়া না-বলেই এনেছে। কিন্তু রাবেয়া পোনি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে বলতে লাগল, 'আমি আনি নি, ওরা আপনি দিয়েছে।'

মিথ্যা রাবেয়া বলে না। কিন্তু ওরাই-বা কেন দেবে? এমন একটা সৌখিন জিনিস হঠাৎ করে দিতে হলে যে দীর্ঘ পরিচয় প্রয়োজন, তা কি আমাদের আছে? খবরের কাগজে কলমদানটি মুড়ে রুনু প্রথম বারের মতো ও-বাড়ি গেল। রাবেয়া নাকী সুরে বলতে লাগল, 'আমার জিনিস রুনু যে বড়ো নিয়ে চলল, ভেঙে ফেললে আমি মজা না-দেখিয়ে ছাড়ব?'

জানা গেল রাবেয়া আনে নি, ওরাই দিয়েছে। না, ঠিক ওরা নয়, হারুন বলে যে-ছেলেটি শিগ্‌গিরই বিদেশে যাবে, শুধু একটি পাসপোর্টের অপেক্ষা--সে দিয়েছে। শীলু আর তার মাও ঠিক জানতেন না ব্যাপারটা। তাঁরাও একটু অবাক হয়েছেন। শীলুর সঙ্গে এই অল্প সময়েই খুব ভাব হয়ে গেল রুনুর। একটি লম্বাটে মিমি চকলেট আর বিভূতিভূষণের 'দৃষ্টিপ্রদীপ' সে নিয়ে এসেছে। আমি বললাম, 'ওরা কেমন লোক রুনু?'

'খুব ভালো।'

'চকলেট পেয়ে গলে গেছিস, না?'

'যাও। শীলু কিন্তু সত্যি ভালো। জান, শীলু মোটর চালাতে পারে!'

'যাহ্! এতটুকু বাচ্চা মেয়ে!'

'সত্যি! ওদের মোটর সারাতে দিয়েছে। যখন আসবে, তখন সে দেখাবে চালিয়ে।'

'আর কি গল্প হল?'

'কত গল্প, ওদের অনেক রেকর্ড আছে।'

'অনেক?'

'হুঁ, হিসেব নেই এত। আমাকে রোজ যেতে বলেছে।'

'শুধু তুই যাবি, ও আসবে না?'

'আসবে না কেন? নিশ্চয়ই আসবে।'

শীলু অবশ্যি এসেছে কালে-ভদ্রে। যখন তার রুনুর সঙ্গে দরকার পড়ত তখনি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকত, 'রুনু রুনু'। রুনু সব কাজ ফেলে ছুটে যেত। আমি মনে মনে চাইতাম, মেয়েটা ঘন ঘন আসুক আমাদের কাছে। তার সাথে গল্প করার ইচ্ছে হ'ত আমার। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম, তার সঙ্গে যদি আলাপ হয় তবে কী বলব। দু' রাতে তাকে স্বপ্নেও দেখেছি।

একটি স্বপ্নে সে শাড়ি পরে এসে খুব পরিচিত ভঙ্গিতে বসেছে আমার টেবিলে। আমি বললাম, 'টেবিলে কেন শীলু, চেয়ারে বস।'

শীলু হাসতে হাসতে বলল, 'টেবিলে বসতেই যে আমার ভালো লাগে।' হাতে একটা চামচ নিয়ে টুং টাং করে চায়ের কাপে জলতরঙ্গের মতো একটা বাজনা বাজাতে লাগল সে।

দ্বিতীয় স্বপ্নটি দেখেছি দিনে-দুপুরে। অনুরোধের আসর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ দেখলাম শীলু এল। আগের মতোই শাড়ি-পরা। আমি বলছি, 'শীলু, এত দেরি কেন, কী চমৎকার গান হচ্ছিল।'

'আমার নাম তো শীলা, আপনি শীলু ডাকেন কেন?'

শীলুর সঙ্গে আমার কথা হ'ত এই ধরনের। হয়তো বিকেলে বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ শীলু ডাকল, 'শুনুন, একটু রুনুকে ডেকে দেবেন?'

বাবা পেঙ্গুইন পাখির কলমদান দেখে খুব রাগ করলেন। বাবার পয়সা ছিল না বলেই হয়তো অহংকার ছিল। শীলুদের পরিবারকে তাঁর একটুও পছন্দ হ'ত না। নিজে আজীবন কষ্ট পেয়েছেন, অন্যের সুখ সে-কারণে সহজভাবে নেওয়ার মানসিকতা তাঁর ছিল না। প্রথম জীবনে ছিলেন স্কুলমাষ্টার। প্রাইভেট স্কুল। মাইনের ঠিক ছিল না। আমরা সব তাঁর মাইনের উপর নির্ভর করে আছি দেখে মাষ্টারি ছেড়ে ঢুকলেন ফার্মে। বারো বছরে ক্যাশিয়ার থেকে একাউন্টেন্ট হলেন। মাইনে সাড়ে তিন শ'। কলমদানটা ফিরিয়ে দেবার জন্য বাবা পীড়াপীড়ি করছিলেন। কিন্তু রুনু বা মা কেউ সে নিয়ে এগলো না। কলমদানের পেঙ্গুইন পাখিটি ধ্যানী মূর্তির মতো বসে রইল আমার টেবিলে। রাবেয়া শুধু মাঝে মাঝে আমায় বলে, 'তোমার টেবিলে বলে এটা তোমার মনে কর না, খোকা। আচ্ছা, ইচ্ছে হলে মাঝে মাঝে কলম রেখ।'

ঘুমের ঘোরে রুনু বলল, 'না, পানি খাব না।' তারপর আরো খানিকক্ষণ 'উঁহু উঁহু' করল। থানার ঘড়িতে ঢং করে শব্দ হল একটা। সাড়ে-বারো, এক, কিংবা

দেড়--যে কোনোটা হতে পারে। আমার আরেকটা সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে হচ্ছে। কে যেন বলেছিল সিগারেটের আনন্দটা আসলে সাইকলজিকেল। তুমি একটা কিছু পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছ, তার আনন্দ। অনেকে আবার বলেন, নিঃসঙ্গের সঙ্গী। এই মধ্যরাতে আমি একলা জেগে আছি, নিঃসঙ্গ তো বটেই। সিগারেটের একটি বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম সিনেমায়। সমস্ত পর্দা অন্ধকার। আবছা আলোয় হলে দেখা গেল বড়ো রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে কে এক জন। চারপাশে কেউ নেই, ভূতুড়ে আবহাওয়া, থমথম করছে অন্ধকার। পর্দায় লেখা হল : 'সে কি নিঃসঙ্গ?' লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। পর্দায় লেখা হল ঃ 'না, নিঃসঙ্গ নয়। এই তো তার সঙ্গী।' চমৎকার বিজ্ঞাপন। আমার মনে হয়, সিগারেটের নেশার মূল্যের চেয়ে বন্ধুত্বের মূল্য অনেক বেশি।

খুট করে দরজা খোলার শব্দ হল। আমি কান পেতে রইলাম। কে হতে পারে? বাবা নিশ্চয়ই নন, তিনি ওঠেন সাড়াশব্দ করে, দরজা খোলেন ধুমধাম শব্দ করে। মন্টু অথবা মাষ্টার কাকা হবেন। টিউবওয়েলে পানি তোলার শব্দ হল অনেকক্ষণ। ছড়ছড় করে পানি পড়ার আওয়াজ। কুলি করে পানি ছিটাতে ছিটাতে এদিকেই যেন আসছে। হ্যাঁ, মাষ্টার কাকাই। তাঁর মাঝে মাঝে অনেক রাতে ফুলগাছের কাছে চেয়ার পেতে গুনগুন করে গান গাওয়ার শখ আছে। পলা বেঁচে থাকলে প্রথমটায় অপরিচিত জন ভেবে ঘেউঘেউ করত। তারপর গরগর করে পরিচিত জনের অভ্যর্থনা। মাষ্টার কাকা বলতেন, 'কিরে পলু, তোরও বুঝি ঘুম নেই?'

আমি বললাম, 'কে?'

মাষ্টার কাকা বললেন, 'আমি, খোকা।'

'কি করেন?'

'এই বসেছি একটু। যা গরম! তুই ঘুমুস নি এখনো?'

'জ্বি না।'

'আসবি নাকি বাইরে?'

দরজা খুলে বেরুতেই চোখে পড়ল কাকা বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। বললাম, 'চেয়ারে বসেন। চেয়ার নিয়ে আসি।'

'না থাক।'

আমি তাঁর পাশে বসলাম। গরম কোথায়? আশ্বিনের শেষাশেষি, একটু শীতই করছে। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে। মাষ্টার কাকারও বোধকরি মাঝে মাঝে ইনসমনিয়া হয়। কাকা বললেন, 'ঘুমুচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভাঙল। তারপর আর হাজার চেষ্টাতেও ঘুম আসছে না।'

আমি বললাম, 'প্রথম রাত্রিতে ঘুম ভাঙলে এ রকম হয়।'

কাকা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটা মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। কাকা খুব নিচু গলায় বললেন, "কী মিষ্টি গন্ধ দেখেছিস? আমি যখন শিউলিতলা

থাকতাম, তখন স্কুলে যাওয়ার পথে একটা কাঁঠালচাঁপার গাছ পড়ত, ভারি গন্ধ।'

'আমার, কাকা, কাঁঠালচাঁপার গন্ধ বাজে লাগে। বড়ো বেশি কড়া।'

কাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তারা দেখে সময় বলতে পারি। এখন প্রায় দুটো।'

আমিও আকাশের দিকে তাকালাম। খুব পরিষ্কার আকাশ। ঝক্‌ঝক্ করছে তারা।

কাকা বললেন, 'দেখেছিস কত তারা? খুব যখন তারা ওঠে, তখন দেশে দুর্ভিক্ষ হয় শুনেছি।'

আমার শীত করছে। তবু বেশ লাগছে বসে থাকতে।

মাষ্টার কাকাকে খুব ভালো লাগে আমার। অদ্ভুত মানুষ। বয়সে বাবার সমান। বিয়েটিয়ে করেন নি। দুই যুগের বেশি আমাদের সঙ্গে আছেন। কোনো পারিবারিক সম্পর্ক নেই। বাইরের কেউ যদিও তা বুঝতে পারে না। বাইরের কেন, আমি নিজেই অনেক দিন পর্যন্ত তাঁকে বাবার আপন ভাই বলেই ভেবেছি। তিনি যে বাবার বন্ধু এবং শুধুমাত্র বন্ধু হয়েও আমাদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গেছেন, তা আঁচ করতে কষ্ট হয় বই কি। বাবার সঙ্গে মাষ্টার কাকার পরিচয় হয় আনন্দমোহন কলেজে। অনেক দিন আগের কথা সে-সব। মার কাছ থেকে শোনা। সারাসরি তো আমরা বাবার কাছ থেকে কিছু জানতে পারতাম না। বাবা মা-কে যা বলতেন, তা-ই শোনাতেন আমাদের। মাষ্টার কাকাকে বাবা অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন বলেই হয়তো খুঁটিনাটি সমস্তই বলেছেন মাকে।

খুব চুপচাপ ধরনের ছেলে ছিলেন মাষ্টার কাকা। ক্লাসে জানালার পাশে একটি জায়গা বেছে নিয়ে সারাক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকতেন। তেমন চোখে পড়ার মতো ছেলে নয়। একটু কুঁজো, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে রয়েছে, শুকনো দড়ি-পাকান চেহারা। ক্লাসের সবাই ডাকত শকুন মামা বলে। তবু বাবা তাঁর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সমস্ত ব্যাপারে তাঁর অদ্ভুত নির্লিপ্ততা আর অঙ্কে অস্বাভাবিক দখল দেখে। তাঁদের ভেতর প্রগাঢ় বন্ধুত্বও হয়েছিল অতি অল্প সময়ে। মাষ্টার কাকা বলতেন, 'দু'টি জিনিস আমি ভালোবাসি, প্রথমটি অঙ্ক, দ্বিতীয়টি এস্ট্রলজি।' সেই অল্প বয়সেই মাষ্টার কাকা নিখুঁত কোষ্টি তৈরি করতে শিখেছিলেন।

পরীক্ষার ঠিক আগে-আগে মাষ্টার কাকাকে কলেজ ছেড়ে দিতে হল। তিনি একটি বিশেষ ধরনের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। যে সময়ের কথা বলছি, সে-সময় খুব কম মেয়েই সায়েন্স পড়তে আসত আনন্দমোহনে। অ্যাডভোকেট রাধিকারঞ্জন চৌধুরীর মেয়ে অনিলা চৌধুরী ছিলেন সব ক'টি মেয়ের মধ্যে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম।

খুব আকর্ষণীয় চেহারা ছিল, খুব ভালো গাইতে পারতেন, ছাত্রী হিসেবেও

অত্যন্ত মেধাবী। কিন্তু তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। কেউ সেধে বলতে এলে ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিতেন। হয়তো কিছুটা অহংকারী ছিলেন। তাঁকে জব্দ করার জন্যই ছেলেরা হঠাৎ করে অনিলা নাম পাল্টে 'শকুনি মামী' বলে ডাকতে শুরু করল। 'শকুন মামা ও শকুনি মামী' এই নামে পদ্য লিখে বিলি করা হল। মাষ্টার কাকা তাঁকে শকুন মামা ডাকায় কিছুই মনে করতেন না। কিন্তু এই ব্যাপারটিতে হকচকিয়ে গেলেন। অসহ্য বোধ হওয়ায় অনিলা চৌধুরী আনন্দমোহন কলেজ ছেড়ে দেন। তার কিছুদিন পরই সপরিবারে তাঁরা কলকাতায় চলে যান স্থায়ীভাবে। অনিলার প্রতি হয়তো মাষ্টার কাকার প্রগাঢ় দুর্বলতা জন্মেছিল। কারণ তিনিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কলেজ ছেড়ে দেন। এরপর আর বহুদিন তাঁর খোঁজ পাওয়া যায় নি।

প্রায় ছ' বছর পর বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা হল কুমিল্লার ঠাকুরপাড়ায়, বাবার নিজের বিয়েতে। বাবা চিনতে পারেন নি। মাষ্টার কাকা বাবার হাত ধরে যখন বললেন, 'আমি শরীফ আকন্দ, চিনতে পারছ না?' তখন চিনলেন। সময়ের আগেই বুড়িয়ে গেছেন। কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, আরো কুঁজো হয়ে পড়েছেন। বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য, আবার দেখা হবে ভাবি নি। এখানে কোথায় থাক তুমি?'

'তুমি যে-বাড়িতে বিয়ে করেছ, আমি সে-বাড়িতেই থাকি। বাচ্চাদের পড়াই

বাবা বললেন, 'আসবে আমার সঙ্গে?'

মাষ্টার কাকা খুব আগ্রহের সঙ্গে রাজি হলেন। সেই থেকেই তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন। বাবা স্কুলের মাষ্টারি যোগাড় করে দিয়েছেন, তাঁর একার বেশ চলে যায় তাতে। তিনি জন্ম থেকেই আমাদের স্মৃতির সঙ্গে গাঁথা। ছোটবেলার কথা যা মনে পড়ে, তা হল মাদুর বিছিয়ে বসে বসে পড়ছি তাঁর ঘরে, রাবেয়াটা হৈচৈ করছে, মাষ্টার কাকা পড়াতে পড়াতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে বলছেন, 'খোকা হাত মেলে ধর আমার সামনে, দু' হাত।'

কিছুক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে হাতের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার অন্যমনস্কতা, বিড়বিড় করে কথা বলা। কান পাতলেই শোনা যায় বলছেন, 'সব ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। বৃত্ত দিয়ে ঘেরা। এর বাইরে কেউ যেতে পারবে না। আমি না, খোকা তুইও না।'

বাবার সঙ্গে বিশেষ কথা হত না তাঁর। বাবা নিজে কম কথার মানুষ, মাষ্টার কাকাও নির্লিপ্ত প্রকৃতির।

মাষ্টার কাকাকে বাইরে থেকে শান্ত প্রকৃতির মনে হলেও তাঁর ভেতরে একটা প্রচণ্ড অস্থিরতা ছিল। যখন স্কুলে পড়তাম, তখন তিনি এস্ট্রলজি নিয়ে খুব মেতেছেন। কাজকর্মেও তাঁর মানসিক অস্থিরতার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। গভীর রাতে খড়ম পায়ে হেঁটে বেড়াতেন। খটখট শব্দ শুনে কত বার ঘুম ভেঙে গেছে, কত বার মাকে আঁকড়ে ধরেছি ভয়ে। মা বলেছেন, 'ভয় কি খোকা, ভয় কি? ও

তোর মাষ্টার কাকা।'

বাবা ভারি গম্ভীর গলায় ডাকতেন, 'ও মাষ্টার, মাষ্টার, শরীফ মিয়া, ও শরীফ মিয়া।'

খড়মের খটখট শব্দটা থেমে যেত। মাষ্টার কাকা বলতেন 'কি হয়েছে?'

'ছেলে ভয় পাচ্ছে, কী কর এত রাত্রে?'

'তারা দেখছিলাম। এত তারা আগে আর ওঠে নি। দেখবে?'

'পাগল! যাও, ঘুমাও গিয়ে।'

'যাই।'

মাষ্টার কাকা খড়ম পায়ে খটখট করে চলে যেতেন।

আমাদের সবার পড়াশোনার হাতেখড়ি হয়েছে তাঁর কাছে। আমি তাঁর প্রথম ছাত্র, তারপর মন্টু। পড়াশোনায় মন নেই বলে রাবেয়ার তো পড়াই হল না। রুনু এখন পড়ে তাঁর কাছে। বাড়িতে তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন নেই তাঁর। থাকলেও যাবার উৎসাহ পান না। অবসর সময় কাটে এস্ট্রলজির বই পড়ে। অঙ্কের মাষ্টার হিসেবে এস্ট্রলজি হয়তো ভালোই বোঝেন। মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকে বই এনে পড়ি আমি। বিশ্বাস হয়তো করি না। কিন্তু পড়তে ভালো লাগে। আমি জেনেছি মীন রাশিতে আমার জন্ম। মীন রাশির লোক দার্শনিক আর ভাগ্যবান হয়। তাদের জীবন চমৎকার অভিজ্ঞতার জীবন। প্রচুর সুখ, সম্পদ, বৈভব। বেশ লাগে ভাবতে। কাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঐ যে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখছ না? ওর ডান দিকের ছোট্ট তারাটি হল কেতু। বড়ো মারাত্মক গ্রহ। আমার জন্মলগ্নে কেতুর দশা চলছিল।'

জানি না, হয়তো জন্মলগ্নে কেতুর দশা থাকলেই আজীবন নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়। গভীর রাতে অনিদ্রাতপ্ত চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহগুলি পরখ করতে হয়। কাকাকে আমার ভালো লাগে। তাঁর ভিতরে প্রচণ্ড জানবার আগ্রহটাকে আমি শ্রদ্ধা করি। সামান্য বেতনের সবটা দিয়ে এস্ট্রলজির বই কিনে আনেন। দেশবিদেশের কথা পড়েন। মাঝে মাঝে বেড়াতে যান অপরিচিত সব জায়গায়। কোথায় কোন জঙ্গলে পড়ে আছে ভাঙা মন্দির একটি, কোথায় বাদশা বাবরের আমলে তৈরী গেটের ধ্বংসাবশেষ। সামান্য স্কুলমাষ্টারের পড়াশোনার গণ্ডি আর উৎসাহ এত বহুমুখী হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। তিনি মানুষ হিসেবে তত মিশুক নন। নিজেকে আড়াল করার চেষ্টাটা বাড়াবাড়ি রকমের। কোনো দিন মায়ের সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলতে দেখি নি। খালি গায়ে ঘরোয়াভাবে ঘরে বসে রয়েছেন, এমনও নজরে আসে নি।

স্কুলে কাকা আমাদের ইতিহাস আর পাটীগণিত পড়াতেন। ইতিহাস আমার একটুও ভালো লাগত না। নিজের নাম হুমায়ূন বলেই বাদশা হুমায়ূনের প্রতি আমার বাড়াবাড়ি রকমের দরদ ছিল। অথচ আমাদের ইতিহাস বইয়ে ফলাও করে

শেরশাহের সঙ্গে তাঁর পরাজয়ের কথা লেখা। শেরশাহ্ আবার এমনি লোক, যে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড করিয়েছে, ঘোড়ার পিঠে ডাক চালু করিয়েছে। কিন্তু এত করেও ক্লাস সেভেনের একটি বাচ্চা ছেলের মন জয় করতে পারে নি। পরীক্ষার খাতায় তাঁর জীবনী লিখতে গিয়ে আমার বড়ো রকমের গ্লানি বোধ হ'ত। সেই থেকেই সমস্ত ইতিহাসের ওপরই আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। কাকা তা জানতেন। এক দিন আমায় বললেন, 'খোকা তোর প্রিয় বাদশা হুমায়ূনের কথা বলব তোকে, বিকেলে ঘরে আসিস।'

সেই দিনটি আমার খুব মনে আছে। কাকা আধশোয়া হয়ে তাঁর বিছানায়, আমি পাশে বসে, রুনু আর মন্টু সেই ঘরে বসে–বসে লুডু খেলছে। কাকা বলে চলেছেন, 'হুমায়ূন সম্পর্কে কে এক জন ছোট্ট একটি বই লিখেছিলেন––'হুমায়ূন নামা'। বইটিতে হুমায়ুনকে তিনি বলেছেন দুর্ভাগ্যের অসহায় বাদশা। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্যবান বাদশা হতে পারলে আমি বিশ্ববিজয়ী সিজার কিংবা মহাযোদ্ধা নেপোলিয়ানও হতে চাই না। যুদ্ধ বন্ধ রেখে চিতোরের রাণীর ডাকে তাঁর চিতোর অভিমুখে যাত্রা, ভিস্তিওয়ালাকে সিংহাসনে বসানর পিছনে কৃতজ্ঞতার অপরূপ প্রকাশ। গান, বই আর ধর্মের প্রতি কি আকর্ষণ!' আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। যেখানে আজান শুনে হুমায়ূন লাইব্রেরি থেকে দ্রুত নেমে আসছেন নামাজে সামিল হতে, নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মারা গেছেন, সে–জায়গায় আমার চোখ ছলছল করে উঠল। কাকা বললেন, 'বড়ো হৃদয়বান বাদশা, সত্যিকার কবিহৃদয় তাঁর।' আমার মনে হল আমিই যেন সেই বাদশা। আর আমাকে বাদশা বানানর কৃতিত্বটা কাকার একার।

আজ এই আশ্বিনের মধ্যরাত্রি, কাকা বসে আছেন ঠাণ্ডা মেঝেতে। অল্প অল্প শীতের বাতাস বইছে। জোছনা ফিকে হয়ে এসেছে। এখনি হয়তো চাঁদ ডুবে চারদিক অন্ধকার হবে। আমার সেই পুরনো কথা মনে পড়ল। আমি ডাকলাম, 'কাকা, কাকা।'

'কি?'

'অনেক রাত হয়েছে, ঘুমুতে যান।'

'যাই।'

কাকা মন্থর পায়ে চলে গেলেন। আমি এসে শুয়ে পড়লাম। রাবেয়া ঘুমের মধ্যেই চেঁচাল, 'আম্মি আম্মি।'

আমার মনে পড়ল রাবেয়া এক দিন হারিয়ে গিয়েছিল। চৈত্র মাস। দারুণ গরম। কলেজ থেকে এসে শুনি রাবেয়া নেই। তার যাবার জায়গা সীমিত। অল্প কয়েকটি ঘরবাড়িতে ঘুরে বেড়ায় সে। দুপুরের খাবারের আগে আসে। খেয়েদেয়ে অল্প কিছুক্ষণের ঘুম। তারপর আবার বেরিয়ে পড়া। সেদিন সন্ধ্যা উৎরেছে, রাবেয়া আসে নি। মার কান্না প্রায় বিলাপে পৌচেছে। মন্টু দুপুর থেকেই খুঁজছে। বাবা হতবুদ্ধি। একটি অপ্রকৃতিস্থ সুন্দরী যুবতী মেয়ের হারিয়ে যাওয়াটা অনেক কারণেই

বেদনাদায়ক। আমি কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাকে কি আবার ফিরে পাওয়া যাবে? রুনু চুপচাপ শুয়ে আছে তার বিছানায়। তার দুঃখপ্রকাশের ভঙ্গিটা বড়ো নীরব। এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা রুনুর ছোট শরীরটা একটা অসহায়তারই প্রতীক। আমায় দেখে রুনু উঠে বসল। বলল, 'কি হবে দাদা?'

তার চোখের কোণে চব্বিশ ঘন্টাতেই কালি পড়েছে। আমি বললাম, 'পাওয়া যাবে রুনু, ভয় কি?'

'কিন্তু ও যে ঠিকানা জানে না। কেউ যদি ওকে খুঁজে পায়, ও কি কিছু বলতে পারবে?'

সে কিছুই বলতে পারবে না। তার বড়ো বড়ো চোখে সে হয়তো অসহায়ের মতো তাকাবে। মেলায় হারিয়ে যাওয়া ছোট খুকির মতো শুধুই বলবে, 'আমি বাড়ি যাব। আমি বাড়ি যাব।' সে বাড়ি যে কোথায়, তা তার জানা নেই।

রুনু আবার বলল, 'দাদা, ও যদি কোনো বাজে লোকের হাতে পড়ে?'

রুনু বুঝতে শিখেছে। মেয়েদের মানসিক প্রস্তুতি শুরু হয় ছেলেদেরও আগে। তারা তাদের কচি চোখেও পৃথিবীর নোংরামি দেখতে পায়। সে নোংরামির বড়ো শিকার তারাই। তাই প্রকৃতি তাদের কাছে অন্ধকারের খবর পাঠায় অনেক আগেই।

রাবেয়া ফিরে এল রাত আটটায়। সঙ্গে মাষ্টার কাকা। বুকের উপর চেপে-বসা দুশ্চিন্তা নিমিষেই দূর হল। মাষ্টার কাকা বললেন, 'ওকে আমি স্কুলের কাছে পাই, হারিয়ে গেছে তা আমি জানতাম না।' এসব শোনার উৎসাহ আমার ছিল না। পাওয়া গেছে এই যথেষ্ট। স্কুলঘরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, মাষ্টার কাকাকে দেখে দৌড়ে রাস্তা পার হল, আরেকটু হলেই গাড়িচাপা পড়ত। এ সবে এখন আর আমাদের উৎসাহ নেই। বাবা পরপর দু' দিন রোজা রাখলেন।

'খোকা, ও খোকা।'

'কি?'

'বাতি জ্বাল।'

'কেন?'

'আমার বাথরুম পেয়েছে।'

বারেয়া মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। আমি বললাম, 'বাতি জ্বালাতে হবে না। আয়, বারান্দায় আলো আছে।'

'না, জ্বাল।'

দেশলাই খুঁজে হ্যারিকেন জ্বালালাম। দরজা খুলতেই ওঘর থেকে মা বললেন, 'কে?' শেষরাতের দিকে মায়ের ঘুম পাতলা হয়ে আসে।

'আমরা মা, রাবেয়া বাথরুমে যাবে।'

বারান্দায় এসে রাবেয়া হাই তুলল। বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'কি

চনমনে গন্ধ ফুলের, না?'

'হুঁ। ফুলের গন্ধ তোর ভালো লাগে, রাবেয়া?'

'না, বাজে।'

বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বলল, 'পলা কবে আসবে, খোকা?'

পলার সঙ্গে তার কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে। মাঝে মাঝেই পলার কথা জানতে চায়। কে জানে কুকুরটা যে কিসের দুঃখে বিবাগী হল।

আজ রাতেও এক ফোঁটা ঘুম হবে না। দু' মাস পরেই পরীক্ষা, এক রাত্রি ঘুম না-হলে পরপর দু' দিন পড়া হয় না। বুঝতে পারছি কোন ফাঁকে মশা ঢুকেছে কয়েকটা। কেবলি গুনগুন করছে কানের কাছে। কান অথবা মুখের নরম মাংস থেকে এক ঢোক করে রক্ত না-খাওয়া পর্যন্ত এ চলতেই থাকবে। পাখা করে মশা তাড়াবার ইচ্ছে হচ্ছে না। বালিশে মাথা গুঁজে ঘুমের জন্যে প্রাণপণে আমার সমস্ত ভাবনা মুছে ফেলতে চাইলাম।

হঠাৎ করেই অনেকটা আলো এসে পড়ল ঘরে। শীলুদের বারান্দার এক শ' ওয়াটের বাল্বটা জ্বালিয়েছে কেউ। কে হতে পারে? শীলুর বাবা না নাহার ভাবী? শীলু কিংবা তার মাও হতে পারে। শীলুর মা চমৎকার মহিলা। এক বার এসেছিলেন আমাদের ঘরে।

শীলুর মা, যিনি সন্ধ্যায় লনে বসে শীলুর বাবার সঙ্গে হেসে হেসে চা খান, বিকেলে প্রায়ই হারুন ভাই-এর পার্টনার হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ব্যাডমিন্টন খেলেন, যাঁর একটি গাঢ় সবুজ শাড়ি আছে, যেটি পরলে তাঁর বয়স দশ বৎসর কম মনে হয়, তিনি এক দিন এসেছিলেন আমাদের বাসায়। সেদিন ছিল শুক্রবার। রুনুর স্কুল বন্ধ ছিল, বাবা ছিলেন অফিসে। শীলুর মা লাল বুটি দেওয়া হালকা নীল শাড়ি পরেছিলেন। সোনালি ফ্রেমের চশমায় তাঁকে কলেজের মেয়ে-প্রফেসরের মতো দেখাচ্ছিল। আমার মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কী করে যত্ন করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। আর শীলুর মা? তিনি মূর্তির মতো অনেকক্ষণ বসে থেকে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম তাঁর দিকে। তিনি থেমে থেমে প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'হারুনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনার মেয়ে রাবেয়াকে বিয়ে করতে চায়।'

আমরা সবাই চুপ করে রইলাম। তিনি বলে চললেন, 'আপনার মেয়েকে পাঠাবেন না ওখানে। কি করে সে ছেলের মন ভুলিয়েছে! মাথার ঠিক নেই একটা মেয়ে। ছি!' মা লজ্জায় কুঁকড়ে গেলেন।

রাবেয়া অকারণে মার খেল সেদিন। সব শুনে বাবার মেজাজ চড়ে গিয়েছিল। কেন সে যাবে হ্যাংলার মতো? রাগলে বাবার মাথার ঠিক থাকে না। বয়স্কা আধপাগলা একটা মেয়েকে তিনি উন্মাদের মতোই মারলেন। রাবেয়া শুধু বলছিল, 'আমি আর করব না। মারছ কেন? বললাম তো আর করব না।'

কী জন্যে মরা খাচ্ছিল তা সে নিশ্চয়ই বুঝছিল না। বারবার তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে। মা নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। আর আশ্চর্য, কান্না শুনে প্রথম বারের মতো হারুন ভাই এলেন আমাদের বাসায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি অল্প অল্প কাঁপছিলেন। তাঁর চোখ লাল। তিনি থেমে থেমে বললেন, 'ওকে মারছেন কেন?'

বাবা তাকালেন হারুন ভাই-এর দিকে। আমিও ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলাম। হঠাৎ তাঁর আমাদের এখানে আসা আমাদের ঠাট্টা করার মতোই মনে হল। রাবেয়া বলল, 'দেখুন না, আমাকে মারছে শুধু শুধু।'

হারুন ভাই-এর ফ্যাকাশে মুখে আমি স্পষ্ট গভীর বেদনার ছায়া দেখেছিলাম। তবু কঠিন গলায় বললাম, 'আপনি বাসায় যান। আপনি এসছেন কেন?'

শীলুদের বাসার জানালায় শীলু আর তার মা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

রাবেয়াকে ক'দিন চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখা হল। তার দরকার ছিল না, হারুন ভাই-এর বিয়ে হল নাহার ভাবীর সঙ্গে। তাঁর খালাতো বোন, হোম ইকনমিক্সে বি. এ. পড়তেন। হারুন ভাই জার্মানী চলে গেলেন কেমিকেল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিগ্রী নিতে। আগেই সব ঠিক হয়ে ছিল।

নাহার ভাবী সমস্তই জেনেছিলেন। বিয়ের সাত দিন না পেরুতেই তিনি আমাদের বাসায় এসে সবার সঙ্গে গল্প করলেন। রাবেয়াকে নিয়ে গেলেন তাঁদের বাসায়। রাবেয়া হাতে হলুদ রঙের একটা প্যাকেট নিয়ে হাসতে হাসতে বাসায় ফিরল।

'মা দ্যাখো, ঐ মেয়েটি আমায় কী সুন্দর একটা শাড়ি দিয়েছে। আমি চাই নি, ও আপনি দিলে।'

রাবেয়া নীল রঙের একটা শাড়ি আমাদের সামনে মেলে ধরল। চমৎকার রং। অদ্ভুত সুন্দর।

কাক ডাকল। ভোর হচ্ছে বুঝি। কোমল একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আযান হল। মাঠের ওপারে ঝাঁকড়া কাঁঠালগাছের জমাট-বাঁধা অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। বাঁশের বেড়ার উপর হাত রেখে নাহার ভাবী খালি পায়ে ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। খুব সকালে ঘুম ভাঙে তাঁর। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন অল্প, বললেন, 'আজ দেখি খুব ভোরে উঠেছেন।'

আমি চুপ করে রইলাম, হাঁ--বাচক মাথা নড়লাম একটু।

নাহার ভাবী বললেন, 'রাতে আপনার গান বাজিয়েছিলাম, শুনেছেন?'

'জ্বি, শুনেছি।'

'রুনুর পছন্দ-করা গান। সেই সাজিয়ে দিয়েছিল। রুনু ঘুমুচ্ছে এখনো?'

'জ্বি।'

'ডেকে দিন একটু, খালি পায়ে বেড়াবে শিশিরের ওপর। চোখ ভালো থাকে।'

রুনু রাবেয়ার গলা জড়িয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আমি ডাকলাম 'রুনু রুনু।'

ক'দিন ধরেই দেখছি মা কেমন যেন বিমর্ষ। বড়ো ধরনের কোনো রোগ সারবার পর যেমন সমস্ত শরীরে ক্লান্তির ছায়া পড়ে, তেমনি। বয়স হয়েছে, ভাঙা চাকার সংসার টেনে নিতে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, দেহ মন শ্রান্ত তো হবেই। তবু তাঁর এমন অসহায় ভাবটা আমার ভালো লাগে না। খুব শিগ্‌গিরই হয়তো আমি একটি ভালো চাকরি পাব। আমি সবাইকে পরিপূর্ণ সুখী করতে চাই। মাকে নিয়ে একবার সীতাকুণ্ড বেড়াতে যাব। কলেজে যখন পড়ি, তখন ক'বন্ধুকে নিয়ে এক বার গিয়েছিলাম। এত সুন্দর, এত আশ্চর্য! চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে দূরে সমুদ্র দেখা যায়। মা নিশ্চয়ই চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠতে পারবেন না। মা আর বাবাকে নিচে রেখে আমরা সবাই উপরে উঠব। বাবাও হয়তো উঠতে চাইবেন। ঠিক সন্ধ্যার আগে-আগে উঠতে পারলে সূর্যাস্ত দেখা যাবে! রেকর্ডপ্লেয়ার নেব, অনেক রেকর্ডও নিয়ে যাব।

'খোকা, ও খোকা।'

'কি মা?'

'কিছু না, গল্প করি তোর সাথে, আয়!'

'বসেন, সারা দিন তো কাজ নিয়েই থাকেন।'

'কই আর কাজ?'

'আপনার স্বাস্থ্য খুব ভেঙে গেছে, মা।'

'আর স্বাস্থ্য!'

মা বসলেন আমার সামনে। তাঁর চোখের কোণে গাঢ় কালি পড়েছে। তিনি থেমে থেমে বললেন, 'কাল রাতেও আমার ঘুম হয় নি, খোকা।'

'আমায় ডাকলেন না কেন, ওষুধ ছিল তো আমার কাছে।'

'দু' বার ডেকেছি, তুই ঘুমুচ্ছিলি।'

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন' আমার খুব ঘুম বেড়েছে দেখছি। রাত ন'টা বাজতেই ঘুমিয়ে পড়ি, উঠি পরদিন আটটায়। মা বললেন, 'রাবেয়াকে নিয়ে তোর বড়ো খালার কাছে একবার যাব।'

'হঠাৎ কী ব্যাপার?'

'এমনি--ঘুরে আসি একটু।'

'কোনো পীরের খোঁজ পেয়েছেন বুঝি?'

মা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। আমি দেখলাম, মার নাকের পাতলা চামড়া তিরতির করে কাঁপছে। মাকে আমার হঠাৎ খুব ছেলেমানুষ মনে হল। বললাম, 'রাত-দিন কী এত ভাবেন?'

'কই, কিছু ভাবি না তো। চা খাবি এক কাপ?'

'এই দুপুরে!'

'খা না। আগে তো খুব চা চাইতি।'

মা উঠে চলে গেলেন। মার ভিতর একটা স্পষ্ট পরিবর্তন এসেছে। শরীর সুস্থ নয় নিশ্চয়ই। মাকে এক জন বড়ো ডাক্তার দেখালে হ'ত। রুনুর স্কুল ছুটি হয় সাড়ে চারটায়। আজ সে দুপুরেই হাজির। হাসতে হাসতে বলল, 'স্কুল ছুটি হয়ে গেল দাদা।'

'সকাল সকাল যে! কি ব্যাপার?'

মর্নিং স্কুল আজ থেকে। সকাল সাতটায় স্কুলে গেলাম। তুমি তো তখন ঘুমে। বাব্বাহ্, এত ঘুমুতেও পার!

মা চা নিয়ে ঢুকলেন। রুনু বলল, 'আমায় এক কাপ দাও না মা।'

'আরেকটা কাপ এনে ভাগ করে নে।'

'না, তা হলে থাক। দাদা খাক।'

'আহা, নে না।'

রুনু চা নিয়ে বসল একপাশে। চুমুক দিতে কী ভেবে হাসল খনিকক্ষণ। বলল, 'মা খিদে পেয়েছে, কি রান্না মা আজকে?'

''মাছ। খিদে নিয়ে চা খেতে আছে?'

'ওতে কিছ হবে না, মা। আচ্ছা, আপাকে দেখলাম বাবার সঙ্গে রিকসা করে যাচ্ছে। কোথায়?'

'কি জানি কোথায়। তোর আম–কাঁঠালের বন্ধ কবে রুনু।'

'দেরি আছে, সামনের মাসের পনের তারিখ থেকে।'

'আমি তোর খালার বাসায় যাব বেড়াতে। তুই তাহলে থাকবি?'

'সে কি, তোমার সঙ্গে কে কে যাবে মা?'

'আমি, রাবেয়া আর তোর আব্বা।'

'বেশ তো! আমি বুঝি বাতিল?'

রুনুর কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেললাম সবাই। রুনু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাদা, তোমার চাকরি হলে আমায় নিয়ে বেড়াতে যাবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি কিন্তু কক্সবাজার যাব। শীলুরা গিয়েছিল গত বার।'

'বেশ তো।'

'আর যেদিন প্রথম বেতন পাবে সেদিন----'

'সেদিন কি রুনু?'

'সেদিন আমাকে দশ টাকা দিতে হবে। দেবে তো?'

'হ্যাঁ, কী করবি?'

'এখন বলব না।'

রুনু লম্বা হয়েছে একটু, চোখের তারাও যেন মনে হয় আরো গভীর কালো। চাঞ্চল্যও এসেছে একটু। সেদিন দেখলাম অনেকক্ষণ ধরেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াল। সে কি বুঝতে পারছে তার চোখের পাতায়, তার হলুদ গালে, বরফি-কাটা মসৃণ চিবুকে রূপের বন্যা নামছে। যৌবনের সেই লুকান চাবি দিয়ে প্রকৃতি একটি একটি করে অজানা ঘর খুলে দিচ্ছে তার সামনে। সে দেখছি প্রায় রাতেই শুয়ে শুয়ে উপন্যাস পড়ে। পড়তে পড়তে এক এক বার চোখে রুমাল দিয়ে কেঁদে ওঠে। আমি বলি, 'কী হয়েছে রুনু?'

'কই, কিছুই তো হয় নি।'

'কাঁদছিস কেন?'

'কাঁদছি না তো।'

'কি বই পড়ছিলি দেখি।'

রুনু উঁচু করে বই দেখায়। কেঁদে ভাসাবার মতো কিছু নয়। জীবনে একটি সময় আসে যখন তীব্র অনুভূতিতে সমস্ত আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। প্রথম বেতন পেলে রুনুকে একটা চমৎকার শাড়ি কিনে দেব আমি। সবুজ জমিনের উপর সাদা ফুলের নকশা। রোল নাম্বার থার্টিন পরত দেখতাম।

অনেক দিন পর শীলুকে দেখলাম। সবাই মিলে চাটগাঁয় গিয়েছিল বেড়াতে। বেশ কিছু দিন পর ফিরল। এত দিন শান্তি কটেজকে কি বিষণ্ণই না লাগছিল। দেখতাম সন্ধ্যা হতেই শান্তি কটেজের বুড়ো দারোয়ান বারান্দায় বাতি জ্বালিয়ে একা একা বসে চুপচাপ। খালি বাড়ি পেয়ে পাড়ার ছেলেমেয়েরা লুকোচুরি খেলতে হাজির হচ্ছে সকাল-বিকাল।

'ফুলগাছ নষ্ট করো না গো, ও লক্ষ্মী ছেলেমেয়েরা।'

প্রতিবাদের সুরও যেন খালি বাড়ির মতোই বিষণ্ণ। মাঝে মাঝেই ঝড়ের মতো হাজির হ'ত রাবেয়া। গেটের বাইরে থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাত--'এই দারোয়ান এই, এই বুড়ো।'

'কি খুকি আপা?'

'এরা কোথায় গেছে?'

'বেড়াতে।'

'কেন বেড়াতে গেল?'

দারোয়ান হাসত কথা শুনে। আশ্বাসের ভঙ্গিতে বলত, 'আবার আসবে আপামণি।'

'কবে আসবে? কাল?'

'ষোল তারিখে আসবে।'

'না, কালকেই আসতে হবে। তুমি ওদের আনতে যাবে ইস্টিশনে?'

'জ্বি, আপামণি।'

'আমিও সঙ্গে যাব।'

'আচ্ছা।'

'তুমি নিয়ে যাবে তো আমাকে?'

'জ্বি, আপনাকে নিয়ে যাব, ঠিক যাব আপামণি।'

'পেয়ারা পেড়ে দাও আমাকে।'

লম্বা আঁকশি নিয়ে খুশি মনে পেয়ারা খোঁজে বুড়ো। গ্যারেজের উপর ঝুঁকে-পড়া গাছে ঝেঁপে পেয়ারা হয়েছে।

খালি বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আমিও রাবেয়ার মতো আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। কবে আসবে শীলু, যাকে আমি করুণা বলে নিজের মনেই ডাকি। করুণা ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে বাগানে, নিজের খেয়ালে গান গেয়ে উঠবে আচমকা। আমাদের বাসার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় ডাকবে, 'রুনু, রুনু, বাসায় আছ?'

এর জন্যে আমি অপেক্ষা করে ছিলাম। ভালোবাসা সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু আমি বুকের ভেতর গোপন ভালোবাসা পুষেছি।

কত দিন পর দেখলাম শীলুকে।

গাড়ি থেকে নামতেই আমার সঙ্গে দেখা। খুব কোমল কণ্ঠে বলল, 'আপনারা সব ভালো ছিলেন তো? রুনু ভালো?'

তেমনি লম্বাটে মুখ, কপালের দিকে টানা ভুরু, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কথা বলতে-বলতে হঠাৎ থমকে অন্য দিকে তাকাল। আমার হৃৎপিণ্ড দুলে উঠল, শীলুর চোখের দিকে সরাসরি তাকাতে গিয়ে অদ্ভুত কষ্ট হল। আমি বললাম, 'তোমরা ভালো তো শীলু?'

'জ্বি।'

শীলুর মা মালপত্র নামাতে নামাতে আড়চোখে তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে। বুড়ো বয়সেও ঠোঁটে আর মুখে রং মেখেছেন। বয়স অগ্রাহ্য করে পরা চকচকে শাড়িতে তাঁকে হাস্যকর লাগছিল, কিন্তু তবু তিনি শীলুর মা, আমি বিনীত ভঙ্গিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

সবার শেষে নামলেন নাহার ভাবী। ভারি সুন্দর হয়েছেন তিনি। গায়ের মসৃণ চামড়া ঝক্‌ঝক্ করছে। নাকের উপর জমে থাকা বিন্দু বিন্দু ঘাম চিকচিক্ করছে রোদ লেগে। নাহার ভাবী আমাকে দেখে ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনাদের কথা যা ভেবেছি!'

'আমিও ভেবেছি---আপনারা কবে যে আসবেন!'

'রুনু আর রাবেয়া কোথায়?'

'রুনু স্কুলে। রাবেয়া বেড়াতে বের হয়েছে।'

'রুনুর জন্যে আমি অনেক গল্পের বই এনেছি। অনেক নতুন রেকর্ড কিনেছি।'

শীলুর মা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'রোদে তোমাদের মাথা ধরবে, ভেতরে গিয়ে বস, মেয়েরা।'

শীলু, তোমাকে আমি গোপনে করুণা বলে ডাকি। তোমার জন্যে আমার অনেক কিছু করতে ইচ্ছে হয়। প্রতি রাতে তোমাকে নিয়ে কত কি ভাবি। যেন তোমার কঠিন অসুখ করেছে। শুয়ে শুয়ে দিন গুনছ মৃত্যুর। হঠাৎ এক দিন আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তোমার বিছানার পাশে। তুমি ছেলেমানুষের মতো বললে, 'এত দিন পরে এলেন?'

আমি বললাম, 'তুমি তো আমায় কখনো ডাক নি শীলু। ডাকলেই আসতাম।' তুমি বিবর্ণ ঠোঁটে হাসলে। আমি বসলাম তোমার পাশে। জানালা দিয়ে হুহু করে হাওয়া আসছে। হাওয়ায় কাঁপছে তোমার লালচে চুল। আমি তোমার মাথায় হাত রাখলাম। তুমি বললে 'জানেন আমার যে একটি ময়না ছিল। সেটি ঠিক মানুষের মতো শিস দিত, খাঁচা ভেঙে পালিয়েছে।'

কী হাস্যকর ছেলেমানুষী ভাবনা! কত দিন ভাবতে-ভাবতে রাত হয়ে যেত। রাস্তায় নিশি-পাওয়া কুকুর চেঁচাত। ঘুম ভেঙে মাষ্টার কাকা উঠে আপন মনে কথা বলতেন।

আমার বন্ধু রমিজ এক বিবাহিতা ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেছিল। মেয়েটি তার স্বামী ও দু'টি বাচ্চা ছেলে-মেয়ে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল রমিজের সঙ্গে। ভদ্রমহিলার স্বামী দুঃখে লজ্জায় এন্ড্রিন খেয়ে মরেছিল। ঘটনাটি শুনে রমিজের প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা হয়েছিল। তার অনেক দিন পর যখন শীলুরা ঘর অন্ধকার করে বাইরে বেড়াতে গেল, তখন কেন যেন মনে হল রমিজ কোনো দোষ করে নি।

ভালোবাসার উৎস কী আমি জানি না। আশফাক বলত, 'ভালোবাসা হচ্ছে নিছক কামনা, যৌন আকর্ষণের পরিভাষা।' কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমার গলা জড়িয়ে শীলু কখনো ঘুমিয়ে থাকবে--এ ধরনের কল্পনা তো কখনো মনে আসে না।

একদিন শীলুর বয়স হবে। পাক ধরবে তার চুলে, পোকায় কাটা অশক্ত দাঁতে কালো ছোপ পড়বে, ছানি-পড়া চোখের ঝাপসা দৃষ্টিতে তখন কি সে দেখতে পারবে বছর ত্রিশেক আগে একটি অনুভূতিপ্রবণ তরুণ ছেলে কান পেতে আছে কখন সেই কোমল কণ্ঠ শোনা যাবে, 'দাদু ভাই, রুনু বাসায় আছে?'

আমি ইদানীং কেমন আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছি। মা আমাকে মাঝে মাঝে বুঝতে চেষ্ট করেন। রুনু প্রায়ই অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়তো আমার বোঝার ভুল। তবু তার হাবভাব যেন কেমন। যেন কিছু জানতে চেষ্ট করছে। সেদিন অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলে বসল, 'শীলুকে কি তোমার খুব বুদ্ধিমান মনে হয়, দাদা

ভাই?'

আমি নিজেকে যথেষ্ট স্বাভাবিক রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তোমার কাছে ওকে ভালো লাগে?'

'তা লাগে।'

'কিন্তু, ও কী বলে জান?'

'কী বলে?'

'বলে তোমার দাদাভাইকে দেখলেই মনে হয় বোকা, তাই না?'

বলা বাহুল্য আমি সেদিন দুঃখিত হয়েছিলাম। আমাকে কেউ বোকা বলছে, সেই জন্যে নয়। আমার গভীর আবেগের কথা সে জানছে না, এই জন্যে। আমার ধারণা, শীলু যখন সমস্ত কিছু জানবে, তখন নিশ্চয়ই আমাকে অন্য চোখে দেখবে। আমি বললাম, 'শুনে তোর খারাপ লেগেছে, রুনু?'

'হ্যাঁ।'

'শীলু কি তোর খুব ভালো বন্ধু?'

'হ্যাঁ, ভালো বন্ধু।'

আমাদের সংসারে কী—একটা পরিবর্তন এসেছে। সুর কেটে গেছে কোথাও। শীলু আমার সমস্ত চেতনা এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, আমি ঠিক কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। মা ভীষণরকম নীরব হয়ে পড়েছেন। শঙ্কিতভাবে চলাফেরা করছেন। তাঁর হতাশ ভাবভঙ্গি, নিচু সুরে টেনে—টেনে কথা বলা সমস্তই বলে দেয় কিছু একটা হয়েছে। বাবা এসে প্রায়ই আমার ঘরে বসেন। নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় দু'—একটি কথাবার্তা বলেন ঃ কেমন পড়াশোনা চলছে? বাজারের জিনিসপত্রের যা দাম!

আমি তাঁর ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারি, তিনি কিছু একটা বলতে চান। এলোমেলো কথা বলতে—বলতে এটি সেটি নাড়তে থাকেন, তারপর হঠাৎ করে উঠে চলে যান। কী বলতে চান তা বুঝে উঠতে পারি না। বাবাকে আমরা বড়ো ভয় পাই, নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাই না। মাকে যখন জিজ্ঞেস করি, 'কি হয়েছে মা?' মা অবাক হবার ভান করে বলেন, 'হবে আবার কি রে খোকা?'

মা মিথ্যা বলতে পারেন না, কিছু লুকোতে পারেন না। আমি জোর দিয়ে বলি, 'বল, কী হয়েছে?'

মা মেঝের দিকে তাকিয়ে টানা সুরে কাঁপা গলায় বললেন, 'কোথায় কি হয়েছে?'

অথচ প্রায়ই দেখছি বাবা আর মা ফিস্‌ফিস্‌ করে আলাপ করছেন। বিরক্তিতে বাবার ভ্রূ কুঁচকে উঠছে ঘন ঘন। অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে বসে থাকছেন। পরশু রাতে মা গুনগুন করে কাঁদছিলেন। আমার কাছে মনে হচ্ছিল, কে যেন

ইনিয়েবিনিয়ে গান গাইছে। রাবেয়া বলল, 'ও খোকা, ও ঘরে মা কাঁদছে রে।'

রুনু বলল, 'সত্যি দাদা, মা কাঁদছে। আমি ভেবেছি--বুঝি বেড়াল।'

রাবেয়া গলা উঁচু করে ডাকল, 'মা, ও মা, কাঁদছ কেন?'

মা চুপ করে গেলেন। রাবেয়া আবার ডাকল, 'মা, ও মা!'

মা ধরা-গলায় বললেন, 'কি?'

'তুমি কাঁদছিলে কেন?'

আমি সমস্ত কিছু বুঝতে চাই। আমি সবাইকে ভালোবাসি। যে-সংসার বাবা গড়ে তুলেছেন, সেখানে আমার যা ভূমিকা, আমি তার চেয়ে অনেক বেশি করতে চাই। যদি কোনো জটিলতা এসেই থাকে, তবে সে-জটিলতা থেকে আমি দূরে থাকতে চাই না। আমি চাই সবাই সুখী হোক। রুনু শীলুর মতো একটি ময়না এনে পুষুক, যেটি সময়ে-অসময়ে মানুষের মতো সুখের শিস দিয়ে উঠবে।

দুপুরবেলা ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ রাবেয়া আমায় ডেকে তুলল। উত্তেজনায় তার চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপছে।

'ও খোকা, শুনছ, আমার বিয়ে।'

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম? রাবেয়া খিলখিল করে হেসে বলল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না? আল্লার কসম, সত্যি বিয়ে, আম্মাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।'

'কখন বিয়ে?'

'আজ বিকেলে। এখন আমি গোসল করে সাজব। তুমি আবার সবাইকে বলে বেড়িও না খোকা, আমার বুঝি লজ্জা নেই?'

মাকে জিজ্ঞেস করতেই মা বললেন, 'বরপক্ষের ওরা বিকেলে দেখতে আসবে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'পাগল মেয়েকে বিয়ে করবে কে?'

মা বললেন, 'পাগল কোথায় রে, ঐ একটু যা আছে তা সেরে যাবে।'

'বরপক্ষের লোকজন জানে?'

মা ভীত কণ্ঠে বললেন, 'আমি ঠিক বলতে পারি না তোর আব্বা বলেছে কি না। তুই আপত্তি করিস না খোকা।'

'কিন্তু হঠাৎ বিয়ের কী হল?'

'আমি জানি না। তোর আব্বা সব ঠিক করেছেন। তোর আব্বাকে জিজ্ঞেস কর।'

দেখতে আসবে পাঁচটায়, চারটার ভিতরেই সব তৈরি হয়ে গেল। মা ঘামতে ঘামতে খাবার তৈরি করলেন। বসবার ঘরে নতুন পর্দা লাগান হল; ট্রাঙ্কে তোলা টেবিল-ক্লথ বিছিয়ে দেয়া হল টেবিলে। মন্টু সাইকেলে করে দূর কোথাও থেকে ফুল এনে ফুলদানি সাজাল। রুনু রাবেয়ার একটি শাপলা রঙের শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাবেয়া ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল, 'মা, রুনু যে বড়ো আমার শাড়ি

পরেছে, ময়লা করে ফেলবে তো।'

'ময়লা হলে ইস্ত্রি করিয়ে দেব।'

'যদি ছিঁড়ে ফেলে?'

'কি ভ্যাজর ভ্যাজর করছিস!'

'হুঁ, আমি তো ভ্যাজর ভ্যাজর করছি। আমার যদি আজ বিয়ে না হ'ত, দেখতে রুনুর চুল ছিঁড়ে ফেলতাম না!'

রাবেয়া পরেছে বেশ দামী আসমানী রঙের শাড়ি। সাধারণ সাজগোজের বেশি কিছু করে নি। এতে তাকে যে এত সুন্দরী লাগবে, কে ভেবেছে! বড়ো বড়ো ভাসা চোখ, বরফি–কাটা চিবুক, শিশুর মতো চাউনি। সব মিলিয়ে রূপকথার বইয়ে আঁকা বন্দী রাজকন্যার ছবি যেন।

মাষ্টার কাকা একটা ফর্সা পাঞ্জাবি পরে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন, বরপক্ষীয়দের অভ্যর্থনার জন্য। পাঁচটায় তাদের আসার কথা, ছ'টা পর্যন্ত কেউ এল না। ঠিকানা নিয়ে মাষ্টার কাকা খুঁজতে গেলেন। জানা গেল কেউ আসবে না। একটি পাগল মেয়ে গছিয়ে দেবার ষড়্যন্ত্র তারা কী করে যেন জেনেছে।

লজ্জায় আমার চোখে পানি এসে পড়ল। কী দরকার ছিল এ সবের? না–ই হ'ত বিয়ে। মা কাঁদো–কাঁদো গলায় বললেন, 'দরকার ছিল রে।'

'কী জন্যে?'

'আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় খোকা!'

'কী সন্দেহ?'

'কাল তোর বাবা রাবেয়াকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে, তখন জানবি।'

বাবা নামলেন রিকসা থেকে। রাবেয়া ধীরে–সুস্থে নামল। মুখ কালো করে বলল, 'মা, ডাক্তার আমাকে বেশি পরিশ্রম করতে নিষেধ করেছেন। এখন শুধু বিশ্রাম। তাই না বাবা?'

বাবা মার দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বললেন, 'এখন কী করবে?'

ব্যাপারটা আমি জানলাম। রুনু জানল। মন্টু ফুটবল খেলতে বাইরে গেছে, শুধু সে–ই জানল না। রাবেয়ার নির্বিকার ঘুরে বেড়ানর ফল ফলেছে। ডাক্তার তাকে পরিশ্রম করতে নিষেধ করেছেন। এখন রাবেয়ার প্রয়োজন শুধু বিশ্রাম।

রাবেয়ার মাথার ঠিক নেই। ছোটবেলা থেকেই সে ঘুরে বেড়াত চারদিকে। সব বাড়িঘরই তার চেনা। চাচা খালু দাদা বলে ডাকে আশেপাশের মানুষদের। তাদের ভিতর থেকেই কেউ তাকে ডেকে নিয়েছে। এমন একটি মেয়েকে প্রলুব্ধ করতে কী লাগে? মার রাত্রে ঘুম হয় না। তাঁর চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। রুনু আর শীলুদের বাসায় গান শুনতে যায় না। নাহার ভাবী বেড়াতে এসে বললেন, 'কি

ব্যাপার, তোমরা কেউ দেখি আমাদের ওখানে যাও না, রাবেয়া পর্যন্ত না।'

রুনু কথা বলে না। মা নিচু গলায় বলেন, 'রাবেয়ার অসুখ করেছে মা।'

'কি অসুখ, কই জানি না তো?'

'এমনি শরীর খারাপ।'

বলতে গিয়ে মায়ের কথা বেধে যায়। অসহায়ের মতো তাকান।

ব্যাপারটার উৎস রাবেয়ার কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করলাম আমি। সন্ধ্যায় যখন রুনু মাষ্টার কাকার কাছে পড়তে যায়, ঘরে থাকি আমি আর রাবেয়া। তখনই আমি কথা শুরু করি :

'রাবেয়া।'

'কি?'

'কোথায় কোথায় বেড়াতে যাস তুই?'

'কত জায়গায়। চেনা বাড়িতে।'

'খুব ভালো লাগে?'

'হুঁ।'

'কাকে কাকে ভালো লাগে?'

'সবাইকে।'

'ছেলেদের ভালো লাগে?'

'হুঁ।'

'নাম বল তাদের।'

একটানা নাম বলে চলে সে। তাদের কাউকেই সন্দেহভাজন মনে হয় না আমার। সবাই বাচ্চা বাচ্চা ছেলে। রাবেয়াকে বড়ো আপা ডাকে।

'তারা তোকে আদর করে, রাবেয়া?'

'হুঁ।'

'কী করে আদর করে?'

'আমার সঙ্গে খেলে, আর--"

'আর কি?'

'গল্প করে।'

'কিসের গল্প?'

'ভূতের।'

ইতস্তত করে বলি, 'তোকে কেউ চুমু খেয়েছে রাবেয়া?'

'যাহ্! তাই বুঝি খায়?'

মার কথাগুলি হয় আরো স্পষ্ট, আরো খোলামেলা। আমার লজ্জা করে। মা আদুরে গলায় বলেন, 'রাবেয়া, কে তোর শাড়ি খুলেছিল? বল তো নাম।'

'যাও মা, তুমি তো ভারি……'

মা রেগে যান। হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, 'তাহলে এমন হল কেন? বল তুই হারামজাদী?'

রাবেয়া বলে না কিছু, মা ফুঁপিয়ে–ফুঁপিয়ে কাঁদেন। রাবেয়া বড়ো বড়ো চোখে তাকায়। বলে, 'কাঁদ কেন, মা?'

'বল, কার সঙ্গে তুই শুয়েছিলি?'

রাবেয়া চুপ করে থাকে। কথাই হয়তো বুঝতে পারে না। বাবা পাগলের মতো হয়ে উঠেছেন। মেজাজ হয়েছে খিটখিটে, অল্পতেই রেগে বাড়ি মাথায় তোলেন। রুনু স্কুল থেকে ফিরতে দেরি করেছে বলে মার খেল সেদিন। এক দিন দেখি বাবা গণক নিয়ে এসেছেন, পাড়ার সব যুবকদের নাম লিখে কী–সব মন্ত্র পড়ছে সে।

রাবেয়ার অসুখের প্রত্যক্ষ চিহ্ন ধরা পড়ল এক দিন ভোরে। চা খেয়েই ওয়াক ওয়াক করে বমি করল সে। যদিও তার শারীরিক অস্বাভাবিকতা নজরে আসার সময় এখনো হয় নি, তবু তার শরীরে আলগা শ্রী আসছিল। একটু চাপা গাল ভরাট হয়ে উঠছে, ভুরু মনে হচ্ছে আরো কালো, চোখ হয়েছে উজ্জ্বল, চলাফেরায় এসেছে এক স্বাভাবিক মন্থরতা। স্কুলের হেড–মাষ্টারের বউ এক দিন বেড়াতে এসে বললেন, 'দেখ ও বউ, তোমার মেয়ে কেমন হাঁটছে––ঠিক যেন পোয়াতি।'

কথাগুলি আমার বুকে ধক্ করে বিঁধেছে। কিছু একটা করতে হবে এবং খুব শিগ্গিরই। সবার জানবার ও বুঝবার আগে। একটি করে দিন যাচ্ছে, অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সবাই। কিন্তু কী করা যায়? বাবা নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবেছেন। এক বার ইচ্ছে হয় তাঁকে জিজ্ঞেস করি, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। বাবাকে বড়ো ভয় করি আমরা।

সেদিন রাতে শুনলাম বাবা চাপা কণ্ঠে বলছেন, 'বিষ খাইয়ে মেরে ফেল মেয়েকে।' মা বললেন, 'ছি ছি, বাপ হয়ে এই বললে?' বাবা বিড়বিড় করে বললেন, 'আমার মাথার ঠিক নেই শানু, তুমি কিছু মনে করো না। পাগল মেয়ে আমার!' বাবার দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনলাম। অনেক রাত অবধি ঘুম হল না আমার। একসময় রাবেয়া ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। কাতর গলায় বলল, 'খোকা।'

'কি? বাথরুমে যাবি?'

'উঁহু।'

'কী হয়েছে? খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'বমি করবি?'

'না।'

'স্বপ্ন দেখেছিস?'

'হুঁ।'

'কী স্বপ্ন?'

'মনে নেই।'

'ঘুমিয়ে পড়, ভালো লাগবে।'

'আচ্ছা।'

রাবেয়া শুয়ে পড়ল আবার। মুহূর্তেই উঠে বসে বলল, 'খোকা।'

'কি?'

'পলা এসেছে।'

'কে এসেছে?'

'পলা। দোর খুলে দেখ, বারান্দায় বসে আছে। আমি ডাক শুনলাম।'

দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম দু' জনেই। কোথায় কি? খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। রাবেয়া ডাকল, 'পলা, পলা।'

মা বললেন, 'কে কথা বলে?'

'আমি রাবেয়া, মা।'

বাবা ধমকে উঠলেন, 'যাও যাও, ঘুমুতে যাও। কী কর এত রাত্রে?'

শব্দ শুনে মাষ্টার কাকা বাইরে আসেন।

'কী হয়েছে খোকা?'

রাবেয়া বলে, 'পলাকে ডাকছিলাম কাকা।'

'যাও শুয়ে পড়, পলা কোত্থেকে আসবে এত রাত্তিরে?'

শুতে শুতে রাবেয়া বলল, 'খোকা, পলাকে একটা চামড়ার বেল্ট কিনে দেবে? গলায় বেঁধে দেব।'

'আচ্ছা।'

'আর একটা লম্বা শিকল কিনে দেবে?'

'দেব।'

'আচ্ছা, আর একটা জিনিস দেবে?'

'কি জিনিস?'

'নাম মনে নেই আমার। দেবে তো?'

'আচ্ছা দেব।'

'কবে? কাল?'

'না, চাকরি হোক আগে।'

বাবা বলে উঠলেন, 'কি ভ্যাজর ভ্যাজর করছিস তোরা? ঘুমো। সারা দিন খেটে এসে শুই, তাও যদি শান্তি পাওয়া যায়!'

বহু আকাঙ্ক্ষিত চিঠিটি এল। সরকারী সীল থাকা সত্ত্বেও কিছুই বুঝতে পারি নি। আর দশটা খাম যেমন খুলি, তেমনি আড়াআড়ি খুলে ফেললাম। আমাকে তাঁরা

ডাকছেন। রসায়নশাস্ত্রের লেকচারারশিপ পেয়েছি একটি কলেজে। প্রাথমিক বেতন সাড়ে চার শ' টাকা, ইয়ারলি পঁচিশ টাকা ইনক্রিমেন্ট। লেখাগুলি কেমন অপরিচিত মনে হচ্ছিল। খুব খুশি হয়েছি এমন একটা অনুভূতি আসছিল না। অথচ আমি সত্যি খুশি হয়েছি এবং আমি সবাইকে সুখী করতে চাই। সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যেতে চাই, রুনুকে গাঢ় সবুজ একটি শাড়ি দিতে চাই, রোল নাম্বার থার্টিন–এর গায়ে যেমন দেখেছি। এখন হয়তো সমস্তই আমার মুঠোয়, তবু সেই অগাধ সুখ, সমস্ত শরীর জুড়ে উন্মাদ আনন্দ কই? আমরা বহু কষ্ট পেয়ে মানুষ হয়েছি। আমাদের ছেলেমানুষি কোনো সাধ, কোনো বাসনা আমার বাবা–মা মেটাতে পারেন নি। আমাদের বাসনা তাঁদের দুঃখই দিয়েছে। আজ আমি সমস্ত বেদনায় সমস্ত দুঃখে শান্তির প্রলেপ জুড়াব। আলাদীনের প্রদীপ হাতে পেয়েছি, শক্তিমান দৈত্যটা হাতের মুঠোয়।

'মা আমার চাকরি হয়েছে।'

মা দৌড়ে এলেন। বহুদিন পর তাঁর চোখ আনন্দে ছলছল করে উঠল। বললেন, 'দেখি।' আমি চিঠিটা তাঁর হাতে দিলাম। মা পড়তে জানেন না, তবু উল্টেপাল্টে দেখলেন সেটি। এমনভাবে নাড়াচাড়া করছিলেন, যেন খুব একটা দামী জিনিস হাতে। মা বললেন, 'বেতন কত রে?'

'সাড়ে চার শ'।'

'বলিস কি? এত!'

আমি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললাম, 'বেশি আর কোথায়?' বলেই আমি লজ্জা পেলাম। ভালো করেই জানি, টাকাটা আমার কাছে অনেক বেশি। মা বললেন, 'এবার বিয়ে করাব তোকে।'

'কী যে বলেন!'

'বেশ একটি লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে আনতে হবে। রূপবতী কিন্তু সাধাসিধা, নাহার মেয়েটির মতো।'

মা কল্পনায় সুখের সাগরে ডুব দিলেন।

'শহরে তুই বাসা করবি?'

'তা তো করতেই হবে।'

'বেশ হবে, মাঝে মাঝে তোর কাছে গিয়ে থাকব।

'মাঝে মাঝে কেন, সব সময়ে থাকবেন।'

'না রে বাপু, সংসার ফেলে যাব না।'

মা ছেলেমানুষের মতো হাসলেন। আমি বললাম, 'প্রথম বেতনের টাকায় আপনাকে কী দেব মা?'

'তোর বাবাকে একটা কোট কিনে দিস, আগেরটা পোকায় নষ্ট করেছে।'

'বাবারটা তো বাবাকেই দেব, আপনাকে কী?'

মা রহস্য করে বললেন, 'আমায় একটা টুকটুকে বউ এনে দে।'

মাষ্টার কাকাও খবর শুনে খুশি হলেন। তাঁর খুশি সব সময়ই মৌন। এবার একটু বাড়াবাড়ি ধরনের আনন্দ করলেন। নিজের টাকায় প্রচুর মিষ্টি কিনে আনলেন। অনেক মিষ্টি। যার যত ইচ্ছে খাও। কাকা বললেন, 'সুখ আসতে শুরু করলে সুখের বান ডেকে যায়, দেখো খোকা, কত সুখ হবে তোমার।'

রুনু স্কুল থেকে এসে বলল, 'দাদা, তোমার নাকি বিয়ে?'

'কে বলেছে রে?'

'মা, হি হি।'

'খুব হি হি, না? তোকে বিয়ে দি যদি?'

'যাও, খালি ঠাট্টা। কাকে তুমি বিয়ে করবে দাদা?'

'দেখি ভেবে।'

'আমি জানি কার কথা ভাবছ।'

'কার কথা?'

'শীলার কথা নয়?'

'পাগল তুই।'

অবহেলায় উড়িয়ে দিলেও বুঝতে পারছি, আমার কান লাল হয়ে উঠছে। অস্বস্তি বোধ করছি। শীলুকে কেন যে হঠাৎ ভালো লাগল। যত বার তাকে দেখি, তত বার বুক ধ্বক করে ওঠে। একটা আশ্চর্য সুখের মতো ব্যথা অনুভব করি। সমস্ত শরীর জুড়ে শীলু শীলু করে কারা বুঝি চেঁচায়। আমি একটু হেসে বলি, 'কে ভাবে তোর শীলুর কথা?'

'না, এমনি বলছি ম। বড়ো ভালো মেয়ে শীলু।'

'হুঁ। তুই কাকে বিয়ে করবি রুনু?'

'যাও দাদা, ভালো হবে না বলছি।'

'আমার এক জন বন্ধু আছে, খুব ভালো ছেলে—'

'দাদা, আমি কিন্তু কেঁদে ফেলব এবার।'

আনন্দ-অনুষ্ঠান থেকে মন্টু বাদ পড়ল। বড়ো নানার বাড়িতে গিয়েছে সে, আগামী কাল আসবে। বাবা এলেন রাত ন'টার দিকে। মা খবরটা না দিয়ে মিষ্টি খেতে দিলেন বাবাকে।

'মিষ্টি কিসের?'

'আছে একটা ব্যাপার।'

বাবা আধখানা মিষ্টি খেলেন, ব্যাপার জানার জন্যে উৎসাহ দেখালেন না। মা নিজের থেকেই বললেন, 'খোকার চাকরি হয়েছে। সাড়ে চার শ' টাকা মাইনে।'

বাবা খুশি হলেন। থেমে থেমে বললেন, 'ভালো হয়েছে। আমি চাকরি ছেড়ে দেব এবার। বয়স হয়েছে, আর পারি না। রাবেয়া, রাবেয়া কোথায়?'

'ঘুমিয়েছে, শরীর খারাপ।'

'ভাত খায় নি তো?'

'না, একটা মিষ্টি খেয়েছে শুধু।'

'আহ্! বললাম খালিপেটে রাখতে, মিষ্টিই–বা দিলে কেন?'

সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লাম সেদিন। রাত একটার দিকে মা পাগলের মতো ডাকলেন, 'খোকা, ও খোকা--শিগ্‌গির ওঠ। ও খোকা, খোকা।'

খুব ছোটবেলায় গভীর রাতে একবার মা এমন ব্যাকুল হয়ে ডেকেছিলেন। ভূমিকম্প হচ্ছিল তখন। আমাদের বাসা থেকে চল্লিশ গজের ভিতর নন্দী সাহেবদের ছেড়ে–যাওয়া পুরানো বাড়ি ধ্বসে পড়ে গিয়েছিল। আজকের এই গভীর রাতে মায়ের আতঙ্কিত ডাক আমাকে ভূমিকম্পের কথা মনে করিয়ে দিল। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই মা বললেন, 'আয় আমার ঘরে, আয় তাড়াতাড়ি।'

'কী হয়েছে?'

মা অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন। দরজা খোলা, চোখে পড়ল মায়ের বিছানায় রাবেয়া শুয়ে আছে। তার মাথার কাছে বাবা গরুর মতো চোখে তাকিয়ে আছেন। রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। এ্যাবোরশান নাকি? কাকে দিয়ে কি করালেন? নাকি নিজে নিজেই কিছু খাইয়ে দিয়েছেন? বাবা ধরা–গলায় বললেন, 'খোকা, তুই মাথায় একটু হাওয়া কর, আমি এক জন বড়ো ডাক্তার নিয়ে আসি। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।'

ডাক্তার এলেন এক জন। গম্ভীর হয়ে ইনজেকশন করলেন।

'আপনার মেয়েকে আমি চিনি।'

বাবা ডাক্তারের হাত চেপে ধরলেন, 'বড়ো দুঃখী মেয়ে, মেয়েটাকে আপনি বাঁচান ডাক্তার।'

ডাক্তার সেন্টিমেন্টের ধার দিয়েও গেলেন না। এক গাদা ঔষধ দিয়ে গেলেন। সকালে আরো দুটো ইনজেকশন করতে বললেন। দশটার দিকে তিনি আসবেন।

বাবা হাঁপাতে–হাঁপাতে বললেন, 'কেউ জানবে না তো ডাক্তার?'

ডাক্তার বললেন, 'মান ইজ্জত পরের ব্যাপার, আগে মেয়ে বাঁচুক।'

রাবেয়া চিঁ চিঁ করে বলল, 'মা, আমার কী হয়েছে?'

'কিছু হয় নি, সেরে যাবে, চুপ করে শুয়ে থাক।'

'বুকটা খালিখালি লাগছে কেন?

'সেরে যাবে মা, দুধ খাবে একটু?'

'না।'

আমি আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঘরে লম্বালম্বি একটা ছায়া পড়ল। তাকিয়ে দেখি মাষ্টার কাকা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। একটু কাশলেন তিনি। বাবা হাউমাউ করে কেঁদে বললেন, 'শরীফ মিয়া, আমার মেয়েটাকে বাঁচাও।'

মাষ্টার কাকা মৃদু গলায় বললেন, 'শহর থেকে খুব বড়ো ডাক্তার আনব আমি। খোকা, তোর সাইকেলটা বের করে দে।'

আমি বললাম, 'আমি যাই কাকা?'

'না, তুমি গুছিয়ে বলতে পারবে না। তুমি থাক।'

বাবা ধমকে উঠলেন, 'ওর কথা শুন না। ও একটা পাগল–ছাগল। তুমি যাও। নিজেই যাও।'

রুনু কখন–বা এসেছে। আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে সে। ঘরময় নষ্ট রক্তের একটা দম আটকান অস্বস্তিকর গন্ধ। রাবেয়া চোখ বুঁজে শুয়ে। তার মুখটা কী ফর্সাই না দেখাচ্ছে। বাবা বললেন, 'মা রাবু, একটু দুধ খাও।'

'না।'

'মাথায় পানি দেব মা?'

'না বাবা।'

রাবেয়া চোখ মেলে বাবার দিকে তাকাল। বলল, 'বাবা।'

'কি মা?'

'আমার বুকটা খালিখালি লাগছে কেন?'

'সেরে যাবে মা।'

'তুমি আমার বুকে হাত রাখবে একটু? এইখানে?'

এমনি করেই ভোর হল। মন্টু এল ছ'টায়।

সে হতভম্ব হয়ে গেল। বাবা গিয়েছেন ইনজেকশন দেবার লোক আনতে। রাবেয়া মন্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মন্টু আমার অসুখ করেছে।'

মন্টু বিস্মিত হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিল। রাবেয়া আবার বলল, 'মন্টু, আমার বুকটা খালিখালি লাগছে।'

মন্টু রাবেয়ার মাথায় হাত রাখল। মা নিঃশব্দে কাঁদছেন। রুনু আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। সকালের রোদ এসে পড়েছে জমাট–বাঁধা কালো রক্তে। রাবেয়া আমাকে ডাকল, 'খোকা, ও খোকা।'

আমি তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছি। নীল রঙের চাদরে ঢাকা রাবেয়ার শরীর নিস্পন্দ পড়ে আছে। একটা মাছি রাবেয়ার নাকের কাছে ভনভন করছে। রাবেয়া হঠাৎ করেই বলে উঠল, 'পলাকে তো দেখছি না। ও খোকা, পলা কোথায় রে?' আমাদের চারদিকে উদ্বিগ্ন হয়ে পলাকে খুঁজল সে। আর কী আশ্চর্য, বেলা ন'টায় চুপচাপ মরে গেল রাবেয়া। তখন চারদিকে শীতের ভোরের কী ঝক্‌ঝকে আলো।

গত বৎসর আমরা বড়ো খালার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। বড়ো খালার মেয়ে নিনাও এসেছিল মায়ের কাছে। প্রথম পোয়াতি মেয়ে। মা নিয়ে এসেছেন নিজের কাছে। নিনা আপা কি প্রসন্ন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন চারদিকে। প্রথম সন্তান জন্মাবে,

তার কী প্রগাঢ় আনন্দ চোখে–মুখে। 'যদি ছেলে হয়, তবে তার নাম দেব কিংশুক, মেয়ে হলে রাখী।' হেসে–হেসে বলে উঠেছিলেন নিনা আপা। আর তাতেই উৎসাহিত হয়ে রাবেয়া বলেছিল; 'আমিও আমার ছেলের নাম কিংশুক রাখব।' আমরা সবাই হেসে উঠেছিলাম। রাবেয়া, নীল রঙের চাদর গায়ে জড়িয়ে তুই শুয়ে আছিস। হলুদ রোদ এসে পড়ছে তোর মুখে। কিংশুক নামের সেই ছেলেটি তোর বুকের সঙ্গে মিছে গেছে। যে–বুক একটু আগেই খালিখালি লাগছিল।

বারোটার দিকে ফিরে এলেন মাষ্টার কাকা। সঙ্গে শহর থেকে আনা বড়ো ডাক্তার। আর মন্টু, দিনে–দুপুরে অনেক লোকজনের মধ্যে ফালা–ফালা করে ফেলল মাষ্টার কাকাকে একটা মাছ–কাটা বঁটি দিয়ে। পানের দোকান থেকে দৌড়ে এল দু'–তিন জন। এক জন রিকশাওয়ালা রিকশা ফেলে ছুটে এল। ওভারশীয়ার কাকুর বড়ো ছেলে জসীম দৌড়ে এল। ডাক্তার সাহেব চেঁচাতে লাগলেন, 'হেল্প! হেল্প!' চিৎকার শুনে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আমি দেখলাম, বঁটি হাতে মন্টু দাঁড়িয়ে আছে। পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরে আছে ক'জন মিলে। রক্তের একটা মোটা ধারা গড়িয়ে চলেছে নালায়। মন্টু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাদা, ওকে আমি মেরে ফেলেছি।'

আমার মনে পড়ল, হাস্নুহেনা গাছের নিচে মন্টু এক দিন পিটিয়ে একটা মস্ত সাপ মেরেছিল।

রাবেয়াকে ঘিরে সবাই বসে ছিল। আমি ঢুকতেই নাহার ভাবী বললেন, বাইরে এত গোলমাল কিসের?'

আমি মায়ের দিকে তাকালাম, 'মা, এইমাত্র মন্টু মাষ্টার কাকাকে খুন করেছে। আপনি বাইরে আসেন। মন্টুকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে সবাই।'

হাস্নুহেনা গাছের নিচে মন্টু একটা মস্ত চন্দ্রবোড়া সাপ মেরেছিল। সাপের মাথায় গোল বেগুনি রঙের চক্র। চার হাতের উপর লম্বা। মন্টু মরা সাপটাকে কাঠির আগায় নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াতেই ছোট বাচ্চারা উল্লাসে লাফাতে লাগল। রাবেয়া খুশিতে হেসে ফেলে বলল, 'মন্টু, কাঠিটা আমার হাতে দে।'

পলা আনন্দে ঘেউঘেউ করছিল। মাঝে মাঝে লাফিয়ে সাপটাকে কামড়াতে গিয়ে ফিরে আসছিল। রাবেয়া পলার দিকে তাকিয়ে শাসাল, 'এই পলা এই, মারব থাপ্পড়।'

সাপটাকে সবাই মিলে পুকুরপাড়ে কবর দিতে নিয়ে গেল। মিছিলের পুরোভাগে রাবেয়া। তার হাতের কাঠিতে সাপটা আড়াআড়ি ঝুলছে। মন্টু পলাকে নিয়ে দলের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল। সাপের জন্য লম্বা করে কবর খোঁড়া হল। মন্টু পুকুরপাড়ে বিষণ্নভাবে বসেছিল।

কাকাকে মেরে ফেলবার পর মন্টুকে সবাই জাপটে ধরে রেখেছিল। জসীম

মন্টুর হাত শক্ত করে ধরে চেঁচাচ্ছিল, 'পুলিশে খবর দিন। পুলিশে খবর দিন।' মাছকাটার বঁটিটা কাৎ হয়ে ঘাসের উপর পড়ে আছে। সেখানে একটুও রক্তের দাগ নেই। কাকা যেখানে পড়ে ছিলেন, সেখান থেকে একটা মোটা রক্তের ধারা ধীরে ধীরে নালার দিকে নেমে যাচ্ছিল। মন্টু আমায় দেখে বলল, 'দাদা, ওকে আমি মেরে ফেলেছি।'

মন্টু চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। আশেপাশে প্রচুর লোক জমা হয়ে গিজগিজ করছিল। মোটা ডাক্তার ভাঙা গলায় প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিলেন, 'হেল্প! হেল্প!' একটা পাংশুটে রঙের কুকুর মরা লাশটার কাছে ভিড়বার চেষ্টা করছিল।

মন্টুর কুকুরের রং ছিল সাদা। গলার কাছে কালো একটা ফুটকি। মন্টু কাঞ্চনপুর থেকে এনেছিল কুকুরটাকে। অল্প দিনেই ভীষণ পোষ মেনেছিল। মন্টু তাকে টুলকাঠ দিয়ে একটি চমৎকার ঘর বানিয়ে দিয়েছিল। আমি কুকুরটার নাম দিয়েছিলাম পলা। রাবেয়া মন্টুর কাছ থেকে আট আনা দিয়ে কিনে নিয়েছিল। মন্টুর বিক্রির ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু রাবেয়া পীড়াপীড়ি করছিল, 'মন্টু পলাকে আমি কিনব।'

'না আপা, আমি পলাকে বেচব না।'

'আহা, দে না মন্টু। আট আনা পয়সা দেব আমি। দে না।'

'বললাম তো আমি বেচব না।'

'মন্টু দিয়ে দে, এমন করছিস কেন?'

রাবেয়া সব সময় পলাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুত। পরিচিত ঘরবাড়িতে গিয়ে বলত, 'খালাম্মা আমার পলাকে একটু দুধ দিন। আহা, চিনি দিয়ে দিন। শুধু শুধু দুধ বুঝি কেউ খায়?'

মন্টু এক দিন একটা টিয়া পাখির বাচ্চা আনল কোথা থেকে। সেটি বাচ্চা হলেও খুব চমৎকার ছিল দেখতে। বারান্দায় খাঁচা ঝুলিয়ে পাখিটিকে রাখা হ'ত। ঠাণ্ডা লেগে এক দিন সেটি মারা গেল। মন্টু পাখির শোকে এক বেলা ভাত খেল না।

মন্টু আর মাষ্টার কাকা সবচেয়ে ছোট ঘরটায় থাকতেন। ঘরটায় আলো আসত না ভালো। গরমের সময় গুমোট গরম। বাতাস আসার পথ নেই। মন্টুর হাজতবাসের দিনগুলি এখন কেমন কাটছে? মন্টুর বয়স এখন উনিশ, সাত বাদ দিলে হয় বারো। বারো বৎসর সে আর মাষ্টার কাকা একসঙ্গে একটি ঘরে কাটিয়েছে। মাষ্টার কাকার অভাব সে অনুভব করছে কি? খুনের পর শুনেছি অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যায়। দিন-রাত্তির খুন করা লোকের চেহারা, খুনের দৃশ্য চোখের সামনে ভাসতে থাকে। মন্টুর সে-রকম হবে না। তার বড়ো শক্ত নার্ভ। মন্টুর মা, আমাদের বড়োমা যেদিন মারা গেলেন, মন্টু সেদিন নিতান্ত সহজভাবেই কাটাল। পরদিন শিমুলতলা গাঁয়ে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গেল বাসায় কাউকে না বলে। বয়স অল্প ছিল। শোক বোঝবার বুদ্ধিই হয়তো হয় নি। কিন্তু আমার মনে হয় কম বয়সের জন্যে নয়। বড়োমার মতো তারও ইস্পাতের মতো শক্ত নার্ভ ছিল। মন্টু দেখতে অনেকটা বড়োমার মতো।

তার চাইবার ভঙ্গি, কথা বলার ভঙ্গি, সমস্তই বড়োমায়ের মতো। বাবার শোবার ঘরে বড়োমা আর বাবার একটা যৌথ ছবি আছে। বিয়ের ছবি। সেই ছবির দিকে তাকালেই মন্টুকে চেনা যায়। ছবির কাঁচে ময়লা জমে ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবু বড়োমার বালিকা বয়সের ছবি আমাদের আকর্ষণ করে। চৌঠা আগস্ট আমাদের বাসায় একটা উৎসব হয়। ভুল বললাম, শোকের আসর হয়। বাদ–মাগরেব মিলাদ পড়ান হয়। বাবা বড়োমায়ের কবর জিয়ারত করেন। দু'–একটি ফকির–মিসকিনকে খাওয়ান হয়। হাউমাউ করে বাবা বড়োমায়ের মৃত্যুদিন স্মরণ করে কিছুক্ষণ কাঁদেন। তাঁর শোকটা নিশ্চয়ই আন্তরিক, তবু সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন হাস্যকর লাগে। বিশেষ করে এই দিনটিতে মা মুখ কালো করে ভয়ে–ভয়ে ঘুরে বেড়ান। তাঁর ভাব দেখে মনে হয় চৌঠা আগস্টের এই শোকের দিনটির জন্যে মা নিজেই দায়ী। বাবা সেদিন অতি সামান্যতম অতি তুচ্ছতম ব্যাপারেও মায়ের উপর ক্ষেপে যান। আমার কষ্ট হয়। বড়োমা আমাদের সবারই অতি শ্রদ্ধার মানুষ। রাবেয়া আর আমি অনেক দিন পর্যন্ত তাঁকে জড়িয়ে না ধরে ঘুমুতে পারি নি। যখন বয়স হয়েছে, তাঁর কোলে এসেছে মন্টু। আমি আর রাবেয়া দক্ষিণের ঘরে নির্বাসিত হয়েছি, তখনো তিনি মাঝে মাঝে এসে বলতেন, 'খোকা আজ তুই শুবি আমার সাথে। আগে আমার সঙ্গে ঘুমাবার জন্যে এত হৈচৈ করতিস, এখন যে বড়ো চুপচাপ?'

'বড়ো হয়েছি যে।'

'ওহ্, কী মস্ত বড়ো ছেলে।'

বড়োমার গলা জড়িয়ে তার বরফি–কাটা ছাপের ব্লাউজে নাক ডুবিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় আবদার, 'গল্প বলেন বড়োমা। ভূতের গল্প।'

বড়োমা কোমল কণ্ঠে ধীরে ধীরে গল্প বলতেন, "আমরা তখন ছোট। বারো–তের বৎসরের বেশি বড়ো নয়। নানার বাড়ি যাচ্ছি সবাই। ভাদ্র মাস, নদী কানায় কানায় ভরা। সারা দিন নৌকা চলল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাঝিরা পুরান এক তালগাছের সঙ্গে নৌকা বেঁধে রান্না বসিয়েছে। এমন সময় রুস্তম বলে যে–বুড়ো মাঝিটা ছিল, তার সে কি বিকট চিৎকার, 'কর্তা তালগাছে এটা কী?' আমি শুনেই বাবাকে জাপ্টে ধরেছি। তালগাছের দিকে চাইবার সাহস নেই।" বলতে বলতে বড়োমা থামতেন, আমরা ফুঁসে উঠতাম, 'থামলে কেন, বল শিগ্‌গির।'

গল্প শুনে আতঙ্কে জমে যেতাম। কী অদ্ভুত তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি! বড়োমার মৃত্যুর দিনটিতে বাবার হৈচৈ আমার তাই ভালো লাগত না। আমার মনে হ'ত আড়ম্বরের চেয়ে মৌন দুঃখানুভূতিই হয়তো ভালো হ'ত। আমি মনে মনে বললাম, 'বড়োমা তোমার ছেলের আজ বড়ো বিপদ।'

হ্যাঁ, আজ মন্টুর বড়ো বিপদ। বড়ো ভয়ঙ্কর বিপদ। মন্টু কি বড়ো মাকে ডাকছে?

ফুটবলের খুব নেশা ছিল মন্টুর। খেলতে গিয়ে পা ভেঙে ছেলেদের কাঁধে চড়ে বাসায় এল। হাঁটুর নিচে আধ–হাতখানেক জায়গা কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। হৈচৈ শুনে বড়োমা বেরিয়ে আসতেই মন্টু বলল, 'মা, আমি পা ভেঙে ফেলেছি।'

বড়োমা বললেন, 'সেরে যাবে।'

মন্টুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। এক্সরে করে দেখা গেল ভেতরে হাড়ের একটা ছোট ছুঁচাল কণা ভেঙে রয়ে গেছে, কেটে বের করতে হবে।

মন্টুকে সাদা বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। এনেসথেসিয়া করার বড়ো চৌকো ধরনের যন্ত্রটা ডাক্তার মন্টুর মুখের কাছে নামিয়ে আনলেন। ছোট্ট মন্টু আতঙ্কে নীল হয়ে গেল। ডাক্তার বললেন, 'বল খোকা বল, এক দুই তিন চার।' মন্টু বলল, 'মা, মা, মা, মা।'

আজ মন্টুর বড়ো বিপদ। দুর্গন্ধ কম্বলে মাথা চাপা দিয়ে আজো কি সে মা মা জপছে? না, মন্টু বড়ো শক্ত ছেলে। ইস্পাতের মতো তার নার্ভ। দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আকন্দকে খুন করেছ?'

'জ্বি।'

'কী দিয়ে?'

'বঁটি দিয়ে, মাছকাটা বঁটি।'

'ক'টা কোপ দিয়েছিলে?

'মনে নেই।'

'মরবার সময়ে তিনি কিছু বলেছিলেন?'

'জ্বি।'

'কী বলেছিলেন?'

'বাবা মন্টু।'

'আর কিছু বলেন নি?'

'না।'

'তিনি কি তোমাদের খুব শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন?'

'জ্বি, ছিলেন।'

'তুমি কী কর?'

'বি এ. পড়ছিলাম।'

দারোগা সাহেব কিছুক্ষণের জন্য থামলেন। এবার শুরু করলেন আপনি করে।

'কী জন্যে খুন করেছেন তাঁকে?'

মন্টু চুপ করে রইল। দারোগা সাহেব বললেন, 'আমাকে বলতে কোনো অসুবিধা নেই। কোর্টে অন্য কথা বললেই হল। বাঁচার অধিকার তো সবারই আছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক কোনো স্ক্যাণ্ডাল—'

'ছিঃ।'

'আমার মনে হয় আপনি মিথ্যা বলছেন।'

'আমি মিথ্যা বলি না।'

মন্টু খুব স্পর্ধার সঙ্গে বলল, 'আমি মিথ্যা বলি না'। বলতে গিয়ে বুক টান করে দাঁড়াল।

দারোগা সাহেবের মাথা উপর একটা ফ্যান ঘুরছিল। ফ্যানের বাতাসে মন্টুর চুল কাঁপছিল। আমি কাঁচুমাচু হয়ে ভদ্রলোকের সামনে একটা চেয়ারে বসেছিলাম। মন্টু কি কখনো মিথ্যা বলে না? মন্টুর সঙ্গে কথাবার্তা তেমন হয় না। সে জন্ম থেকেই নীরব। তাকে বোঝা হয়ে ওঠে নি আমার। রুনু সম্বন্ধে আমি যেমন বলতে পারি, রুনুর একটু মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে। যখন সে মিথ্যা বলে, তখন সে মাথা নিচু করে অল্প অল্প হাসে। মন্টু সম্বন্ধে এমন কিছু বলতে পারছি না আমি।

'আপনি কি খুব ভেবেচিন্তে খুন করেছেন?'

'না, খুব ভাবি নি।'

'আমার মনে হয়, আপনি খুব অনুতপ্ত?'

'না।'

'তাঁকে খুন করার ইচ্ছে কি হঠাৎ আপনার মনে জেগেছে, না আগে থেকেই ছিল?'

'হঠাৎ জেগেছে।'

'তিনি কোন ধরনের লোক ছিলেন?'

'ভালো লোক। বিদ্বান, অনেক জানতেন।'

'আপনাদের সঙ্গে তাঁর কী ধরনের সম্পর্ক ছিল?'

'ভালো। আমাদের খুব স্নেহ করতেন।'

'তাঁকে খুন করা কি খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল?'

'জানি না। আমার রাগ খুব বেশি।'

হ্যাঁ, মন্টুর রাগ বেশি। ভয়ঙ্কর উন্মাদ রাগ। আমি জানি, এ সম্বন্ধে ভালো করেই জানি। দু' বৎসর হয় নি এখনো। অনার্স পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসেছি, সময়ও মনে আছে, পৌষ মাস। দারুণ শীত। আমাদের সামনের বাসায় থাকতেন এক ওভারশীয়ার সাহেব। তাঁর মেয়ে এবং ছেলে সব মিলিয়েই এক জন, মীনা। বয়স আমার সমান কিংবা আমার চেয়ে দু'-এক বৎসরের বড়ো। ওভারশীয়ার ভদ্রলোকের ভারি আদরের মেয়ে, সব সময় চোখে-চোখে রাখতেন। মেয়েটি বেশির ভাগ সময়ই কাটাত বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে। ওভারশীয়ার ভদ্রলোক এক দিন হাতে একটি চিঠি নিয়ে চড়াও হলেন আমাদের বাসায়। আমি বাইরেই বসে ছিলাম, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই চিঠি তুমি লিখেছ?'

নামহীন একটি চিঠি তিনি আমার সামনে ফেলে দিলেন।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম, 'কি বলছেন আপনি!'

'নিশ্চয়ই তুমি, এত বড়ো সাহস তোমার, এমন নোংরা কথা আমার মেয়েকে লিখেছ!'

ভদ্রলোক গর্জাতে লাগলেন। আমি হতভম্ব এবং লজ্জিত। এমনিতেই আমি একটু লাজুক ধরনের ছেলে। এ ধরনের অভিযোগে একেবারে বোকা বনে গেলাম।

'তুমি কি মনে করেছ, আমি ছেড়ে দেব? এ্যাঁ? ভদ্রলোকের মেয়েছেলের মান-ইজ্জত!'

কথা শেষ হবার আগেই মন্টু ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শান্ত গলায় বলল, 'যান।, আপনি বাড়ি যান।'

'বললেই হল, যা ইচ্ছে তা লিখে বেড়াবে, আর আমি বসে বসে কলা চুষব?'

মন্টু নিমিষের মধ্যে, আমার কিছু বোঝবার আগেই, ভদ্রলোকের কলার চেপে ধরল। হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'চোপরাও ছোটলোক।' মা বেরিয়ে এলেন। আশেপাশে লোক জমে গেল। আমি তটস্থ। মন্টু চেঁচাতে লাগল, 'দুনিয়াসুদ্ধ লোক জানে তোমার মেয়ের কারবার, আর তুমি এসেছ দাদার কাছে?'

ওভারশীয়ার ভদ্রলোক বদলি হয়ে গেছেন রাজশাহী। মেয়েকে নিশ্চয়ই কোথাও বিয়ে দিয়েছেন। তিনি এখানে থাকলে মন্টুর উন্মাদ রাগের পরিণতি দেখে খুশি হতেন হয়তো।

মাষ্টার কাকার বাড়ি থেকে লোক এল এক জন। দড়ি-পাকান চেহারা। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, ছুঁচাল দাড়ি। চোখে নিকেলের চশমা।

'শরীফ আকন্দের ভাই আমি। বড়ো ভাই। তার জিনিসপত্র, টাকা-পয়সা যা আছে নিতে এসেছি।'

আমি বললাম, 'জিনিসপত্র বিশেষ নেই, তবে অনেক বই আছে।'

'টাকা পয়সা কী আন্দাজ আছে?'

'দু' শ' পনের টাকা ছিল।'

'মাত্র! তবে যে শুনলাম বহু টাকা। টাকার জন্যেই খুন করা হয়েছে!'

লোকটি কুঁৎকুঁতে চোখে তাকাচ্ছিল। পান-চিবান ঠোঁট বেয়ে গড়িয়ে-পড়া লালা টেনে নিচ্ছিল মাঝে মাঝে। গলা খাঁকারি দিয়ে সে বলল, 'আপনারা যা বলবেন এখন তো তাই সত্যি। তা সে টাকা ক'টাই দিন। আসতেই আমার পঁচিশ টাকা খরচ।'

'তাঁর সব কিছুই থানায়। আপনি সেখানেই যান।'

'কই?'

'থানায়।'

'অ।'

ভদ্রলোক বিমর্ষ হয়ে চলে গেলেন। রুনু বলল, 'দাদা, ও কি সত্যি মাষ্টার কাকার ভাই?'

'হুঁ।'

'কী করে বুলে?'

'এক রকম চেহারা।'

মাষ্টার কাকার চেহারা আমার মনে আছে। গত পরশু শেষ রাতে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি। বড়োমাকেও দেখেছি। বড়োমা অবাক হয়ে বলছেন, 'তুই এই হলুদ রঙের শাড়ি আনলি আমার জন্যে, খোকা? এই শাড়ি পরার বয়স কি আছে রে বোকা?'

'বেতন পেয়ে সবার জন্যেই কিছু-না-কিছু কিনেছি। আপনি নেন এটা।'

'সবার জন্যেই কিনেছিস?'

'জ্বি।'

'কী কী কিনলি?'

আমি নাম বলে চললাম। বড়োমা আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'সবার জন্যে কিনলি, মাষ্টারের জন্য কিনলি না? সে বাদ পড়ল বুঝি?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'জানেন না, মাস্টার কাকা তো মারা গেছেন?'

'আহা, কী করে মারা গেল? বড়ো ভালো লোক ছিল।'

বড়োমা মাষ্টার কাকাকে খুব স্নেহের চোখে দেখতেন। প্রায়ই আলাপ করতেন তাঁর সাথে। মাষ্টার কাকা বড়োমাকে বড়োবোনের মতো দেখতেন। আমার মাকে ভাবী বলে ডাকলেও বড়োমাকে ডাকতেন বড়োবুবু বলে। বড়োমা প্রায়ই বলতেন, 'ও মাষ্টার, আমার ভাগ্যটা গুণে দিলে না?'

'বড়ো বুবু, আপনাদের সবার ভাগ্যই আমি গুণে রেখেছি।'

'ছাই গুণেছ। বল আমার ভাগ্য।'

'আপনার জন্মলগ্নে আছে মঙ্গল আর রবির প্রভাব। সৌভাগ্যবতী আপনি। ভাগ্যবান ছেলে হবে আপনার।'

বড়োমা হো হো করে হেসে উঠতেন।

'মাথার ঠিক নাই তোমার। এই তোমার ভাগ্য গণনা? এই সব বুঝি লেখা বই-এ? পুড়িয়ে ফেল তোমার বই। না হয় আমাকে দিও, আমি আগুন করে তোমাকে চা বানিয়ে দেব।'

কাকা বিমর্ষ হয়ে বই-এর পাতা ওল্টাতেন। এইখানেই তাঁর গণনা মিলত না। বাবা বড়োমার ছেলে হওয়ার কোনো আশা না দেখেই দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছিলেন।

আশ্চর্যভাবে কাকার গণনা মিলে গেল এক সময়। রুনুর জন্মের পাঁচ বৎসর আগেই বড়োমার কোলে এল মন্টু। বড় মা ভীষণ অবাক হয়েছিলেন কাকার নির্ভুল গণনা দেখে। কাকাকে ডেকে বললেন, 'আমার ছেলের ভাগ্যটা একটু দেখ মাষ্টার। আশ্চর্য, এসব শিখলে কী করে? আমার শিখতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

মাষ্টার কাকা হেসে বলেছিলেন, 'এও এক ধরনের বিজ্ঞান বুবু। অন্ধকার বিজ্ঞান। আপনি যদি শিখতে চান……'

বড়োমা অসহিষ্ণু হয়ে বলেছিলেন, 'আগে আমার ছেলের ভাগ্য বল। তারপর তোমার অন্ধকার বিজ্ঞান।'

কাকা বললেন, 'জন্ম হয়েছে মঘা নক্ষত্রযুক্ত সিংহ রাশিতে চন্দ্রের অবস্থানকালে। জন্মসময় আকাশে কুন্তলীন। জাতক শনির ক্ষেত্রে রবির হোরায় বুধের দ্রেক্কাণে শুক্রের সপ্তমাংশে……'

'আহা, কি আবোলতাবোল শুরু করলে, ফলাফলটা বল।'

'ছেলে বুদ্ধিমান, সাহসী, শক্তিমান আর প্রেমিক। সৌভাগ্যবান ছেলে আপনার। তাকে একটা গোমেদ পাথর দেবেন বুবু, খুব কাজে লাগবে।'

বড়োমা মন্টুকে এগারো বৎসরের রেখে মারা গেলেন। মন্টুর জন্যে গোমেদ পাথর আর নেওয়া হল না। সেই পাথর যদি থাকত, তবে কি এই বিপদ এড়াতে পারত মন্টু?

আদালতে কৌতূহলী মানুষের ভিড়। জজসাহেব মনে হল বিশেষ কিছু শুনছেন না। সিগারেটের ধোঁয়া, ঘামের গন্ধ, লোকজনের মৃদু কথাবার্তা—সব মিলিয়ে অন্যরকম পরিবেশ। গুমোট গরম, যদিও মাথার উপর দু'টি নড়বড়ে রং-ওঠা ফ্যান ক্যাঁ–ক্যাঁ শব্দ করে ঘুরছে। কালো গাউন পরা উকিলরা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন। মন্টু সরাসরি তাকিয়ে আছে সামনে। বাবা, আমি আর রুনু বসে আছি জড়সড় হয়ে। মন্টুকে দেখলাম মুখে হাত চাপা দিয়ে কয়েক বার কাশল।

'আপনি বলছেন খুন করার ইচ্ছে হঠাৎ হয় নি, কিছুদিন থেকেই মনে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কত দিন থেকে?'

'কত দিন থেকে আমার মনে নেই।'

'কিন্তু কী কারণে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার ইচ্ছে হল?'

'কারণ আমার মনে নেই।'

'আপনি অসুস্থ?'

'না, আমি সুস্থ।'

ক্রস–একজামিনেশনের শুরুতেই বাবা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ তিনি শব্দ করে কেঁদে ফেললেন। সবাই তাকাল তাঁর দিকে। আদালতে মৃদু গুঞ্জন সরব হয়ে উঠল। জজ সাহেব বললেন, 'অর্ডার অর্ডার।' তার কিছুক্ষণ পরই আদালত সেদিনের মতো মুলতবি হয়ে গেল। মা কাঁপা গলায় বললেন, 'বিচার শেষ হবে কবে খোকা?'

চারদিকে বড়ো বেশি নির্জনতা। বড়ো বেশি নীরবতা। মন্টুর ঘরে বাবা একটা তালা লাগিয়েছেন। রুনুর বিছানায় রুনু একা–একা অনেক রাত অবধি জেগে থাকে।

বাতি জ্বালান থাকলে আগে ঘুমুতে পারত না সে। এখন সারা রাত বাতি জ্বলে। হ্যারিকেনের আবছা আলোয় সমস্তই কেমন ভূতুড়ে দেখায়। ঘরের দেয়ালে আমার মাথার একটা প্রকাণ্ড কালো ছায়া পড়ে। মাঝে মাঝে বাবা গোঙানির মতো শব্দ করে কাঁদেন। রুনু আঁৎকে উঠে বলে, 'কী হয়েছে দাদা?' আমি চুপ করে থাকি।

রুনু আবার বলে, 'দাদা, কী হয়েছে?'

'বাবা কাঁদছেন।'

বাবা গোঙানির মতো শব্দ করে কাঁদেন। বারান্দায় কী অপরূপ জ্যোৎস্না হয়! হাস্নুহেনার সুবাস ভেসে আসে। রুনু বলে, 'মরার পর কী হয় দাদা?'

আমি উত্তর দিই না। মনে মনে বলি, 'কিছুই হয় না। সব শেষ। যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের--মানুষের হয়না কো দেখা...।' অসংলগ্ন কত কথাই মনে আসে।

'দাদা, মন্টু ভাইয়ের কী হবে?'

'জানি না।'

ঘরের দেয়ালের লম্বা ছায়াগুলির দিকে তাকিয়ে আমার বুক হুহু করে। নাহার ভাবী মৃদু ভল্যুমে গান শোনেন, 'বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল, সে কি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না'। কান পেতে শুনি।

মাঝে মাঝে নাহার ভাবী আসেন আমার ঘরে। বিষণ্ন হয়ে বসে থাকেন। সেদিনও এসেছিলেন। আমি জানালা বন্ধ করে বসেছিলাম। বাইরে কী তুমুল বৃষ্টি! বিকেলের আলো নিভে গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে আগেভাগে। নাহার ভাবী রুনুর বিছানায় এসে বসলেন।

'আমি পরশু চলে যাচ্ছি।'

আমি চমকে বললাম, 'কোথায়?'

'প্রথমে বাবার কাছে যাব। সেখান থেকে বাইরেও যেতে পারি দাদার সঙ্গে, ও চিঠি লিখেছে যেতে।'

আমি চুপ করে রইলাম। নাহার ভাবী বললেন, 'আপনাদের কথা খুব মনে থাকবে আমার। আপনাদের সবাইকে আমার বড়ো ভালো লেগেছে। রাবেয়ার কথা খুব মনে হয় আমার।'

নাহার ভাবী চোখ মুছলেন। রুনু চা নিয়ে এল দু' কাপ। নাহার ভাবী চায়ে চুমুক দিয়ে ধরা–গলায় হঠাৎ করেই বললেন, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে, মন্টু এমন কাজ কেন করল বলবেন? অনেকে অনেক কথা বলে। আমার খারাপ লাগে শুনে। আপনাদের আমি বড্ড ভালোবাসি।'

আমি বললাম, 'রাবেয়ার মৃত্যুর কারণটা তো আপনি জানেন ভাবী।'

'জানি।'

'কাকাই হয়তো দায়ী ছিলেন, মন্টু জেনেছিল। অবশ্যি মন্টু বলে নি কিছুই।'

'মন্টুর সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, আমি সব সময় তার জন্যে দোওয়া করব। তাকে আমি ভালো করে দেখিও নি কোনো দিন।'

'ভাবী, মন্টু বড়ো চুপচাপ ছেলে।'

'আমার দোওয়ায় কিছু হবে না। তবু আমি তার জন্যে দোওয়া করব।'

নাহার ভাবী মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। আমার মনে হল, নাহার ভাবী আমাদের বড়ো আপন। বড়ো পরিচিত।

'রাবেয়ার একটা ছবি দেবেন আমাকে?'

'ছবি?'

'জ্বি। আমি সঙ্গে নিয়ে যেতাম। ও খুশি হ'ত দেখলে। রাবেয়াকে তার খুব ভালো লেগেছিল।'

'ওর তো কোনো ছবি নেই। আমাদের সবার শুধু একটা গ্রুপ ছবি আছে, মন্টুর জন্মের পর তোলা।'

'অ।'

নাহার ভাবী চলে গেলেন। ট্রাঙ্ক খুলে ছবি বের করলাম আমি। পুরনো ছবি। হলুদ হয়ে গেছে। তবু কী জীবন্তই না মনে হচ্ছে! রাবেয়া হাসিমুখে বসে আছে মেঝেতে। রুনু বাবার কোলে। মন্টু চোখ বুজে বড়োমার কোলে শুয়ে। বুকে গভীর বেদনা অনুভব করছি। স্মৃতি---সে সুখেরই হোক, বেদনারই হোক--সব সময়ই করুণ।

সারা রাত ধরে বৃষ্টি হল। আষাঢ়ের আগমনী বৃষ্টি। বৃষ্টিতে সব যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। রুনু বলল, 'মনে আছে দাদা, এক রাতে এমনি বৃষ্টি হয়েছিল, তুমি একটা ভূতের গল্প বলেছিলে।'

আমি কথা বললাম না। গলা পর্যন্ত চাদর টেনে হ্যারিকেনের শিখার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাবা হঠাৎ করে বিকৃত গলায় ডাকলেন 'খোকা, ও খোকা।'

'কী বাবা?'

'আয়, তুই আমার কাছে আয়। মন্টুর জন্যে বুকটা বড়ো কাঁদে রে।'

তিমিরময়ী দুঃখ। প্রগাঢ় বেদনার অন্ধকার আমাদের গ্রাস করছে। বাইরে গাছের পাতায় বাতাস লেগে হা হা হা হা শব্দ উঠল।

সতেরই আগস্ট মন্টুর ফাঁসির হুকুম হল। মন্টু, যার জন্ম হয়েছিল মঘা নক্ষত্রযুক্ত সিংহ রাশিতে, রবির হোরায় বুধের দ্রেক্কাণে। কাকা বলেছিলেন, এ ছেলে হবে সাহসী, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও প্রেমিক।

মন্টুর জীবন ভিক্ষা চেয়ে আমরা মার্সি-পিটিশন করলাম। আমার মনে পড়ল ফাঁসির হুকুম হওয়ার আগের দিনটিতে রোগা, শ্যামলা একটি মেয়ে আমাদের বাসায় এসেছিল। তার মুখটা নিতান্তই সাদাসিধে, ছেলেমানুষী চাহনি। মেয়েটি রিক্সা থেকে নেমেই থতমত খেয়ে বাসার সামনে দাঁড়িয়েছিল। আমায় দেখে ঢোক গিলল।

বললাম, 'কার খোঁজ করছেন?'

মেয়েটি মাথা নিচু করে কী ভাবছিল। হঠাৎ সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'আমার নাম ইয়াসমিন। আমি আপনার ভাইয়ের সাথে পড়ি।'

'মন্টুর সঙ্গে?'

'জ্বি।'

'আস, ভেতরে আস। তুমি করে বললাম, কিছু মনে করো না।'

মেয়েটি হেসে বলল, 'আমি কত ছোট আপনার, তুমি করেই তো বলবেন।'

বাবা, মা আর রুনু মন্টুকে দেখতে গিয়েছেন। আমি মেয়েটিকে আমার ঘরে এনে বসালাম।

'বস।'

'এখানে কে শোয়?'

'আমি আর রুনু।'

'রুনু কোথায়?'

'মন্টুকে দেখতে গিয়েছে। বাবা আর মা-ও গিয়েছেন।'

'আরও আগে আসলে আমিও রুনুর সঙ্গে যেতে পারতাম, না?'

'তুমি যেতে চাও?'

'জ্বি না। ওর খারাপ লাগবে।'

মেয়েটি চুপ করে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ঘর দেখতে লাগল।

আমি বললাম, 'চা খাবে?'

'জ্বি না।'

'কোথায় থাক তুমি?'

'উইখানে।'

মেয়েটি হয়তো বলতে চায় না সে কোথায় থাকে। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলাম। সে বলল, 'আমি সব জানতাম, অনেক ভেবেছি আসি। কিন্তু সাহস হয় নি।'

'এসে কী করতে?'

'না, কী আর করতাম। তবু হঠাৎ ইচ্ছে হ'ত। আমি আপনাদের সবাইকে চিনি। ও আমাকে বলেছে।'

'কী বলেছে?'

মেয়েটি মুখ নিচু করে হাসল। বলল, 'আপনাদের একটা কুকুর ছিল, পলা।'

'হ্যাঁ, শুধু পলাতক হ'ত,তাই তার নাম পলা।'

'আচ্ছা, ওর কী সাজা হবে?'

'বারো-তেরো বৎসরের সাজা হবে হয়তো।'

'ফাঁসি হবে না তো?'

'না। উকিল বলছেন কম বয়স, আর রাগের মাথায় খুন।'

'ওর বুঝি খুব রাগ?'

'তোমার কী মনে হয়?'

মেয়েটি হাসল কথা শুনে। বলল, 'জানি না। আমি যাই।'

'আবার এস।'

'আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল আমার।'

'কেন?'

'ও আপনাকে খুব ভালোবাসত। আমার কাছে সব সময় বলত আপনার কথা।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, ও তো মিথ্যা বলে না।'

মেয়েটি চলে গেল। মন্টু হয়তো আমাকে খুব শ্রদ্ধা করত। বড়ো চাপা ছেলে, বোঝবার উপায় নেই। তবে শ্রদ্ধা করত ঠিকই। না, শ্রদ্ধা নয়, ভালোবাসা বলা যেতে পারে।

মনে পড়ল এক দিন সন্ধ্যায় রুনু এসে আমায় বলল, 'দাদা, মন্টু আজ বাসায় আসবে না, আমায় বলে দিয়েছে। সে কাঁঠালগাছে বসে আছে।'

'কেন রে?'

'ও শার্ট ছিঁড়ে ফেলেছে মারামারি করে। তাই আমায় বলেছে, তুমি যদি ওকে আনতে যাও, তবেই আসবে।'

প্রবল ভালোবাসা না থাকলে সন্ধ্যাবেলা বসে কেউ প্রতীক্ষা করে না—কখন বড়ো ভাই এসে গাছ থেকে নামিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবে।

মন্টুর চলে যাবার পরপরই বাবা মন্টুর ঘরে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন। কত দিন আর হল মন্টু গিয়েছে, তবু মনে হয় অনেক দিন ধরেই এই ঘরে একটি মাস্টার-লক ঝুলে আছে। একটু আগে যে-মেয়েটি এসেছিল, সে মন্টুর ঘর দেখতে চায় নি। কে জানে সে-ঘরের কোথাও হয়তো এই মেয়েটির লেখা দু'-একটা চিঠি মলিন হয়ে পড়ে আছে। আমি মন্টুর ঘরের তালা খুলে ফেললাম। পশ্চিম দিকের জানালা খুলতেই এক চিলতে হলুদ রোদ এসে পড়ল ঘরে। পাশাপাশি দু'টি চৌকি। কাকার জিনিসপত্র কিছু নেই। সমস্তই পুলিশ সিজ করে নিয়েছে। মন্টুর বিছানা, কভার-ছাড়া বালিশ, দড়িতে ঝোলান শার্ট-প্যান্ট সব তেমনি আছে। বাঁশের তৈরী ছাপড়ায় সুন্দর করে খবরের কাগজ সাঁটা। ঝুঁকে পড়ে তাকাতেই নজরে পড়ল টিপকলম দিয়ে লিখে রেখেছে 'দিন যায় দিন যায়।' কী মনে করে লিখেছিল কে জানে!

সতের তারিখ মন্টুর ফাঁসির হুকুম হল। ঠাণ্ডা মাথায় খুন, অনেক আই উইটনেস। কলেজে পড়া বিবেক-বুদ্ধির ছেলে। জজ সাহেব অবলীলায় হুকুম করলেন।

সেপ্টেম্বরের নয় তারিখ মার্সি-পিটিশন অগ্রাহ্য হল। আমি জানলাম আঠার

তারিখ ভোর–রাতে তার ফাঁসি হবে। তার লাশ নিতে হলে সেই সময় জেলগেটের সামনে জেলারের চিঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

বাবা, মা আর রুনুকে নিয়ে মন্টুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

রোগা হয়ে গিয়েছে মন্টু। আমাদের দেখে অপ্রকৃতস্থের মতো হাসল। বলল, 'দাদা, মার্সি–পিটিশনটার কোনো জবাব এসেছে?'

ওকে বুঝি সে–কথা জানান হয় নি? ভালোই হয়েছে। আমি বললাম, 'না রে, এখনো আসে নি।'

মা, রুনু আর বাবা কাঁদছিলেন। মন্টু বলল, 'কাঁদেন কেন আপনারা? আমি জানি আমার ফাঁসি হবে না। কাল রাতে মাকে স্বপ্নে দেখেছি। মা বলছেন, খোকা ভয় পাস কেন? তোর ফাঁসি হবে না।'

আমি বললাম, 'মন্টু, তোর কাছে একটি মেয়ে এসেছিল রোগা লম্বা মতো।'

মন্টু বলল, 'ও ইয়াসমিন, আমার সঙ্গে পড়ে।'

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। মন্টু নীরবতা ভঙ্গ করে রুনুর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'রুনু মিয়া মরতে ইচ্ছে হয় না।'

বাবা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'তোকে কী খেতে দেয় রে?'

'ভালোই দেয় বাবা। আগে আজেবাজে দিত। ক'দিন ধরে রোজ জানতে চায়––আজ কী দিয়ে খেতে চান? এ জেলের জেলার খুব ভালো মানুষ বাবা, আমাকে শিবরামের একটা বই পাঠিয়েছেন, যা হাসির!'

মা বললেন, 'মন্টু, বাসার কোনো জিনিস খেতে ইচ্ছে হয় তোর?'

'না মা, এখানে এরা বেশ রাঁধে।'

সেপাই এসে বলল, 'অনেকক্ষণ হয়েছে তো, আরো কথা বলবেন?'

বাবা বললেন, 'না।' বাবা মন্টুর হাতে চুমু খেলেন কয়েক বার। মন্টু কাশল বার কয়। সে মনে হল একটু লজ্জা পাচ্ছে। বের হয়ে আসছি, হঠাৎ মন্টু ডাকল, 'দাদা, তুমি একটু থাক।'

আমি ফিরে এসে মন্টুর হাত ধরলাম। মন্টু কিছু বলল না। আমি বললাম, 'কিছু বলবি?'

'না।'

'ইয়াসমিনের কথা কিছু বলবি?'

'না–না।'

'তবে?'

মন্টু অল্প হাসল। বলল, 'তোমাদের আমি বড়ো ভালোবাসি দাদা।'

গাছের নিচে ঘন অন্ধকার। কী গাছ এটা? বেশ ঝাঁকড়া। অসংখ্য পাখি বাসা বেঁধেছে। তাদের সাড়াশব্দ পাচ্ছি। পেছনের বিস্তীর্ণ মাঠে ম্লান জ্যোৎস্নার আলো।

কিছুক্ষণের ভিতরই চাঁদ ডুবে যাবে। জেলখানার সেন্ট্রি দু' জন সিগারেট খাচ্ছে। দু'টি আগুনের ফুলকি ওঠানামা করছে দেখতে পাচ্ছি। তাদের ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। দূর থেকে ছায়া–ছায়া মূর্তি মনে হয়। জেলখানার মাথার গেটের ঠিক উপরে এক শ' পাওয়ারের বাতি জ্বলছে একটা। বাতির চারপাশে অনেক পোকা ভিড় করেছে। বাবা বললেন, 'খোকা, ক'টা বাজে?' বলতে বলতে বাবা বুকে হাত রাখলেন। তাঁর বুক–পকেটে জেলারের চিঠি রয়েছে। সেটি দেখালেই তারা মন্টুকে আমাদের হাতে তুলে দেবেন। মন্টুকে আমরা ঘরে ফিরিয়ে নেব। ঘরে, যেখানে মা আজ সারারাত ধরে কোরান শরীফ পড়ছেন।

বাইরে ম্লান জ্যোৎস্না হয়েছে। কিছুক্ষণের ভিতরে চাঁদ ডুবে যাবে। আমি আর বাবা ঘেঁষাঘেষি করে বসে আছি সিমেন্টের ঠাণ্ডা বেঞ্চিতে। মাথার উপর ঝাঁকড়া অন্ধকার গাছ। বাবা নড়েচড়ে বসলেন। তাঁর দ্রুত শ্বাস নেওয়ার শব্দ পাচ্ছি। তিনি একটু আগেই জানতে চাচ্ছিলেন ক'টা বাজে।

আমরা সবাই মাঝে মাঝে এমনি ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে বাইরের জ্যোৎস্না দেখতাম। হাস্নুহেনা গাছে কী ফুলই না ফুটত! আমাদের বাসার সামনে মাঠে একটা কাঁঠালগাছ আছে। সেখানে অসংখ্য জোনাকি জ্বলত আর নিভত। 'জোনাকি ঝিকিমিকি জ্বালো আলো' গান বাজিয়েছিলেন নাহার ভাবী।

আমাদের পলার নাকটা ছিল সিমেন্টের মেঝের মতোই ঠাণ্ডা। মন্টু বলেছিল, 'দাদা, কুকুরের নাক এত ঠাণ্ডা কেন?'

মাষ্টার কাকা বাইরে বসে বসে আকাশের তারা দেখতেন। বলতেন, 'খোকা, আমি তারা দেখে সময় বলতে পারি।'

রাবেয়া এক দিন রাগ হয়ে বলেছিল 'মা আমি সবার বড়ো, কিন্তু কেউ ঈদের দিন আমাকে সালাম করে না।'

আমি আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে আছি। আমার শীত করছে। বাবা ভারি গলায় ডাকলেন, 'খোকা, খোকা।'

'কি বাবা?'

'ক'টা বাজে রে?'

আমি বাবার হাত ধরলাম। কী শীতল হাত! বাবা থরথর করে কাঁপছেন। আমাদের মাথার উপরের ঝাঁকড়া গাছ থেকে আচমকা অসংখ্য কাক কা–কা ডেকে জেলখানার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

ভোর হয়ে আসছে। দেখলাম চাঁদ ডুবে গেছে। বিস্তীর্ণ মাঠের উপরে চাদরের মতো পড়ে থাকা ম্লান জ্যোৎস্নাটা আর নেই।

শঙ্খনীল কারাগার

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

সোমেন চন্দের লেখা অসাধারণ ছোট গল্প 'ইঁদুর' পড়ার পরই নিম্ন মধ্যবিত্তদের নিয়ে গল্প লেখার একটা সুতীব্র ইচ্ছা হয়। 'নন্দিত নরকে', 'শঙ্খনীল কারাগার' ও 'মনসুবিজন' নামে তিনটি আলাদা গল্প প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিখে ফেলি। নিজের উপর বিশ্বাসের অভাবের জন্যেই লেখাগুলি দীর্ঘদিন আড়ালে পড়ে থাকে। যাই হোক, জনাব আহমদ ছফা ও বন্ধু রফিক কায়সারের আগ্রহে 'নন্দিত নরকে' প্রকাশিত হয় মাস ছয়েক আগে। এবারে প্রকাশিত হল 'শঙ্খনীল কারাগার।'

'নন্দিত নরকে'র সঙ্গে এই গল্পের কোনো মিল নেই। দু'টি গল্পই উত্তম পুরুষে বলা এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের গল্প এই মিলটুকু ছাড়া। নাম ধাম দু'টি বইতেই প্রায় একই রেখেছি। প্রথমত নতুন নাম খুঁজে পাই নি বলে, দ্বিতীয়ত এই নামগুলির প্রতি আমি ভয়ানক দুর্বল বলে। কার্যকারণ ছাড়াই যেমন কারো কারো কিছু কিছু দুর্বলতা থাকে, এও সেরকম।

আন্তরিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু ছাপার ভুল রয়ে গেছে। ভুলগুলি অন্যমনস্ক পাঠকের চোখ এড়িয়ে যাবে এইটুকুই যা ক্ষীণ আশা।

হুমায়ূন আহমেদ

১

বাস থেকে নেমে হকচকিয়ে গেলাম। বৃষ্টিতে ভেসে গেছে সব। রাস্তায় পানির ধারাস্রোত। লোকজন চলাচল করছে না, লাইটপোস্টের বাতি নিভে আছে। অথচ দশ মিনিট আগেও যেখানে ছিলাম, সেখানে বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। শুকনো খটখট করছে চারদিক। কেমন অবাক লাগে ভাবতে, বৃষ্টি এসেছে, ঝুপ ঝুপ করে একটা ছোট্ট জায়গা ভিজিয়ে চলে গেছে। আর এতেই আশৈশব পরিচিত এ অঞ্চল কেমন ভৌতিক লাগছে। হাঁটতে গা ছমছম্ করে।

রাত ন'টাও হয় নি, এর মধ্যেই রশীদের চায়ের ষ্টল বন্ধ হয়ে গেছে। মডার্ণ লন্ড্রিও ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। এক বার মনে হল হয়তো আমার নিজের ঘড়িই বন্ধ হয়ে আছে। রাত বাড়ছে ঠিকই, টের পাচ্ছি না । কানের কাছে ঘড়ি ধরতেই ঘড়ির আওয়াজ ছাপিয়ে মন্টুর গলা শোনা গেল।

রাস্তার পাশে নাপিতের যে–সমস্ত ছোট ছোট টুলকাঠের বাক্স থাকে, তারই একটায় জড়সড় হয়ে বসে আছে। আলো ছিল না বলেই এতক্ষণ নজরে পড়ে নি। চমকে বললাম, 'মন্টু কী হয়েছে রে?'

'কিছু হয় নি।

স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল হাতে নিয়ে মন্টু টুলবাক্স থেকে উঠে এল। কাদায় পানিতে মাখামাখি। ধরা গলায় বলল, 'পা পিছলে পড়েছিলাম, স্যাণ্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে গেছে।'

'এত রাতে বাইরে কী করছিলি?'

'তোমার জন্যে বসে ছিলাম, এত দেরি করেছ কেন?'

'বাসায় কিছু হয়েছে মন্টু?'

'না, কিছু হয় নি। মা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, বলেছে ভিক্ষে করে খেতে।'

মন্টু শার্টের লম্বা হাতায় চোখ মুছতে লাগল।

'টুনুদের বাসায় ছিলাম, টুনুর মাষ্টার এসেছে। সে জন্যে এখানে বসে আছি।'

'কেউ নিতে আসে নি?'

'রাবেয়া আপা এসে চার আনা পয়সা দিয়ে গিয়েছে, বলেছে তুমি আসলে তোমাকে নিয়ে বাসায় যেতে।'

মন্টু আমার হাত ধরল। দশ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে সন্ধ্যা থেকে বসে আছে বাইরে, এর ভেতর ঝড়–বৃষ্টি হয়েছে, বাতিটাতি নিভিয়ে লোকজন ঘুমিয়েও পড়েছে। সমস্ত ব্যাপারটার ভেতরই বেশ খানিকটা নির্মমতা আছে। অথচ মাকে এ নিয়ে কিছুই বলা যাবে না। বাবা রাত দশটার দিকে ঘরে ফিরে যখন সব শুনবেন, তখন তিনি আরো চুপ হয়ে যাবেন' মুখ কালো করে ঘুরে বেড়াবেন এবং একদিন ক্ষতিপূরণ হিসেবে চুপি চুপি হয়তো একটি সিনেমাও দেখিয়ে আনবেন।

'দাদা, রুনুকেও মা তালা বন্ধ করে রেখেছে। ট্রাঙ্ক আছে যে ঘরটায়, সেখানে।'

'রুনু কী করেছে?'

'আয়না ভেঙেছে।'

'আর তুই কী করেছিলি?'

'আমি কিছু করি নি।'

ঝুনু বারান্দায় মোড়া পেতে চুপচাপ বসেছিল। আমাদের দেখে ধড়মড় করে উঠে

দাঁড়াল।

'দাদা, এত দেরি করলে কেন? যা খারাপ লাগছে।'

'কী হয়েছে, ঝুনু?'

'কত কি হয়েছে, তুমি রাবেয়া আপাকে জিজ্ঞেস কর।'

গলার শব্দ শুনে রাবেয়া বেরিয়ে এল। চোখে ভয়ের ভাবভঙ্গি প্রকট হয়ে উঠেছে। চাপা গলায় বলল, 'মার ব্যথা শুরু হয়েছে রে খোকা, বাবা তো এখনো আসল না, কী করি বল তো?'

'কখন থেকে?'

'আধ ঘন্টাও হয় নি। মার কাছ থেকে চাবি এনে দরজা খুলে দেব রুনুর, সেই জন্যে গিয়েছি--দেখি এই অবস্থা।'

ভেতরের ঘরে পা দিতেই রুনু ডাকল, 'ও দাদা, শুনে যাও। মার কী হয়েছে দাদা?'

'কিছু হয় নি।'

'কাঁদছে কেন?'

'মার ছেলে হবে।'

'অ। দাদা তালাটা খুলে দাও, আমার ভয় লাগছে।'

'একটু দাঁড়া, রাবেয়া চাবি নিয়ে আসছে।'

এখান থেকে মায়ের অস্পষ্ট কান্না শোনা যাচ্ছে। কিছু কিছু কান্না আছে, যা শুনলেই কষ্টটা সম্বন্ধে শুধু যে একটা ধারণাই হয় তাই নয়, ঠিক সেই পরিমাণ কষ্ট নিজেরও হতে থাকে। আমার সেই ধরনের কষ্ট হতে থাকল।

রাবেয়া এসে রুনুর ঘরের তালা খুলে দিল। রাবেয়া বেচারি ভীষণ ভয় পেয়েছে।

'তুই এত দেরি করলি খোকা, এখন কী করি বল? ওভারশীয়ার কাকুর বউকে খবর দিয়েছি, তিনি ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে আসছেন। তুই সবাইকে নিয়ে খেতে আয়, শুধু ডালভাত। যা কাণ্ড সারা দিন ধরে, রাঁধব কখন? মার মেজাজ এত খারাপ আগে হয় নি।'

হড়বড় করে কথা শেষ করেই রাবেয়া রান্নাঘরে চলে গেল। কলঘরে যেতে হয় মার ঘরের সামনের বারান্দা দিয়ে। চুপি চুপি পা ফেলে যাচ্ছি, মা তীক্ষ্ণ গলায় ডাকলেন, 'খোকা।'

'কি মা?'

'তোর বাবা এসেছে?'

'না।'

'আয় ভেতরে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

ব্যথাটা বোধহয় কমেছে। সহজভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। মার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম আর ফ্যাকাশে ঠোঁট ছাড়া অসুস্থতার আর কোনো লক্ষণ নেই।

'খোকা, মন্টু এসেছে?'

'এসেছে।'

'আর রুনুর ঘর খুলে দিয়েছে রাবেয়া?'

'দিয়েছে।'

'যা, ওদের নিয়ে আয়।'

রুনু ঝুনু আর মন্টু জড়সড় হয়ে দাঁড়াল সামনে। কিছুক্ষণ চুপ থেকেই মা বললেন, 'কাঁদছ কেন রুনু?'

'কাঁদছি না তো।'

'বেশ, চোখ মুছে ফেল। ভাত খেয়েছ?'

'না।'

'যাও, ভাত খেয়ে ঘুমাও গিয়ে।'

মন্টু বলল, 'মা, আমি বাবার জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকব?'

'না-না। ঘুমাও গিয়ে। ঝুনু মা, কাঁদছ কেন তুমি?'

'কাঁদছি না তো।'

'আমার কিছু হয় নি, সবাই যাও, ঘুমিয়ে পড়। যাও, যাও।'

ঘর থেকে বেরিয়েই কেমন যেন খারাপ লাগতে লাগল আমার। আমাদের এই গরিব ঘর, বাবার অল্প মাইনের চাকরি। এর ভেতর মা যেন সম্পূর্ণ বেমানান।

বাবার সঙ্গে তাঁর যখন বিয়ে হয় তিনি তখন ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষা দেবেন। আর বাবা তাঁদের বাড়িরই আশ্রিত। গ্রামের কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে চাকরি খুঁজতে এসেছেন শহরে। তাঁদের কী-যেন আত্মীয় হন।

বিয়ের পর এই বাড়িতে এসে ওঠেন দু' জন। মার পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। কিছু দিন কোনো এক স্কুলে মাষ্টারি করেছেন। সেটি ছেড়ে দিয়ে ব্যাঙ্কে কী-একটা চাকরিও নেন। সে চাকরি ছেড়ে দেন আমার জন্মের পরপর। তারপর একে একে রুনু হল, ঝুনু হল, মন্টু হল--মা গুটিয়ে গেলেন নিজের মধ্যে।

সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে মা আমাদের গরিব ঘরে এসেছেন বলেই তাঁর সামান্য রূপের কিছু কিছু আমরা পেয়েছি। তাঁর আশৈশব লালিত রুচির কিছুটা (ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ হলেও) সঞ্চারিত হয়েছে আমাদের মধ্যে। শুধু যার জন্যে তৃষিত হয়ে আছি, সেই ভালোবাসা পাই নি কেউ। রাবেয়ার প্রতি একটি গাঢ় মমতা ছাড়া আমাদের কারো প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই। মার অনাদর খুব অল্প বয়সে টের পাওয়া যায়, যেমন আমি পেয়েছিলাম। রুনু ঝুনুও নিশ্চয়ই পেয়েছে। অথচ আমরা সবাই মিলে মাকে কী ভালোই না বাসি।

উকিল সাহেবের বাসায় টেলিফোন আছে। সেখান থেকে ছোট খালার বাসায় টেলিফোন করলাম। ছোট খালা বাসায় ছিলেন না, ফোন ধরল কিটকি।

'কী হয়েছে বললেন খোকা ভাই?'

'মার শরীর ভালো নেই।'

'কী হয়েছে খালার?'

কী হয়েছে বলতে গিয়ে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল, এদিকে উকিল সাহেব আবার কান খাড়া করে শুনছেন কী বলছি। কোনো রকমে বললাম, 'মার ছেলে হবে কিটকি।'

'আপনাদের তো ভারি মজা, কতগুলি ভাই-বোন। আমি একদম একা।'

'কিটকি, খালাকে সকাল হলেই বাসায় এক বার আসতে বলবে।'

'হ্যাঁ বলব। আমিও আসব—।'

মার বাড়ির লোকজনের ভেতর এই একটিমাত্র পরিবারের সঙ্গে আমাদের কিছুটা যোগাযোগ আছে। ছোট খালা আসেন মাঝে মাঝে। কিটকির জন্মদিন, পুতুলের বিয়ে—এই জাতীয় উৎসবগুলিতে দাওয়াত হয় রুনু-ঝুনুর।

বাসায় ফিরে দেখি বাবা এসে গেছেন। ওভারশীয়ার কাকুর বউ এসেছেন, ধাই সুহাসিনীও এসেছে। রান্নাঘরে বাতি জ্বলছে। রাবেয়া ব্যস্ত হয়ে এঘর-ওঘর করছে। বাবা ভেতরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছেন। আমাকে দেখে যেন একটু জোর পেলেন। 'তোর ছোটখালাকে খবর দিয়েছিস খোকা?'

'জ্বি দিয়েছি। আপনি কখন এসেছেন?'

'আমার একটু দেরি হয়ে গেল। তোর আজিজ খাঁকে মনে আছে? ঘড়ির দোকান ছিল যে, আমার খুব বন্ধুমানুষ। সে হঠাৎ মারা গেছে। গিয়েছিলাম তার বাসায়।'

বাবা যেন আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন, এমন ভাব-ভঙ্গি করতে লাগলেন, 'আজিজ খাঁর বউ ঘন ঘন ফিট হচ্ছে। এক বার মনে করলাম থেকেই যাই। ভাগ্য ভালো থাকি নি, নিজের ঘরে এত বড়ো বিপদ।'

'বিপদ কিসের বাবা?'

'না। বিপদ অবশ্যি নয়। কিন্তু রাতে এমন একটা বাজে স্বপ্ন দেখেছি। যত বারই মনে হয়, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। কিছুক্ষণ আগে রাবেয়াকে বলেছি সে-কথা।'

'কী স্বপ্ন?'

'না-না, রাতের বেলা কেউ স্বপ্ন বলে নাকি রে? যা তুই, রাবেয়ার কাছে গিয়ে বস একটু।'

ঘরে যদিও অনেকগুলি প্রাণী জেগে আছি তবু চারদিক খুব বেশিরকম নীরব। রান্নাঘরে দু'-একটি বাসনকোশন নাড়ার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। বাবা অবশ্যি মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। তাঁর একা একা কথা বলার অভ্যাস আছে। মাঝে মাঝে যখন মেজাজ খুব ভালো থাকে, তখন গুনগুন

করে গানও গান। কথা বোঝা যায় না, 'ও মন মন রে' এই লাইনটি অস্পষ্ট শোনা যায়। রাবেয়া বলে, 'বাবার নৈশ সংগীত।' রাবেয়াটা এমন ফাজিল।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখি একটা মস্ত এলুমোনিয়ামের সসপ্যানে পানি ফুটছে। রাবেয়ার ঘুম ঘুম ফোলা মুখে আগুনের লাল আঁচ এসে পড়েছে। সে আমার দিকে তাকিয়ে কি ভেবে অল্প হাসল। আমি বললাম, 'হাসছিস যে?'

'এমনি। সুহাসিনী মাসির আমি কী নাম দিয়েছি জানিস?'

'কী নাম?'

'কুহাসিনী মাসি। ওর হাসি শুনলেই আমার গা জ্বলে। একটু আগে কী বলেছে জানিস?'

'কী বলেছে?

'থাক, শুনে কাজ নেই।'

'বল না?'

'বলে, আজ তোমার মার জন্যে এসেছি, এক দিন তোমাব জন্যেও আসব খুকি।' বলতে বলতে রাবেয়া মুখ নিচু করে হাসল। সে মনে হল কথাটা বলে ফেলে বেশ লজ্জা পেয়েছে। হঠাৎ করে ব্যস্ত হয়ে কী খুঁজতে লাগল মিটসেফে। আমি বললাম, 'তোর ভাবভঙ্গি দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ খুশিই হয়েছিস শুনে।'

'তুই একটা গাধা।'

লজ্জায় রাবেয়া লাল হয়ে উঠল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'লজ্জা পাওয়ার কী হয়েছে?'

'যা! লজ্জা পেলাম কোথায়, তোর যে কথা! যাই, দেখে আসি রুনু-ঝুনুরা মশারি ফেলে ঘুমিয়েছে কি না, যা মশা!'

রাবেয়া আমার পাঁচ বৎসরের বড়ো। এই বয়সে মেয়েরা খুব বিয়ের কথা ভাবে। তাদের অন্তরঙ্গ সখীদের সাথে বিয়ে নিয়ে হাসাহাসি করে। রাবেয়ার একটি বন্ধুও নেই। আমিই তার একমাত্র বন্ধু। সুহাসিনী মাসির সেই কথাটি হয়তো এই জন্যেই বলেছিল আমাকে। আর আমি এমন গাধা, তাকে উল্টো লজ্জা দিয়ে ফেললাম। মেয়েরা লজ্জা পেলে এত বেশি অপ্রস্তুত হয় যে, যে লজ্জা দিয়েছে তার অস্বস্তির সীমা থাকে না।

ঘরে খুব হৈহৈ করে বেড়ালেও রাবেয়া ভীষণরকম লাজুক। কলেজে যাওয়া বন্ধ করার ব্যাপারটিই ধরা যাক। তিন বছর আগে হঠাৎ এক দিন এসে বলল, 'বাবা, আমি আর কলেজ করব না।'

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'কেন মা?'

'এমনি।'

মা বললেন, 'রাবেয়া, তোমাকে কি কেউ কিছু বলেছে?'

'না মা, কেউ কিছু বলে নি।'

'কোনো চিঠিফিটি দিয়েছে নাকি কোনো ছেলে?'

'না মা। আমাকে চিঠি দেবে কেন?'

'তবে কলেজে যাবে না কেন?'

'এমনি।'

'না, এমনি না। বল তোমার কী হয়েছে?'

রাবেয়া হঠাৎ ফুপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, 'মা, ছেলেরা আমাকে মা কালী বলে ডাকে।'

আমাদের ভেতর রাবেয়াই শুধু মার রং পায় নি। যতটুকু কালো হলে মায়েরা মেয়েদের শ্যামলা বলেন, রাবেয়া তার চেয়েও কালো। কিন্তু ছেলেরা শুধু গায়ের রংটাই দেখল?

'ও ছেলে।'

তাকিয়ে দেখি সুহাসিনী মাসি। ধবধব করছে গায়ের রং, ফোলা ফোলা চোখে এক বেমানান চশমা। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'খামাখা তোমার বাবা আমার ঘুম ভাঙিয়ে এনেছে, এখনো অনেক দেরি। ন'টার আগে নয়।'

আমি চুপ করে রইলাম। সুহাসিনী মাসি বললেন, 'মেয়েটি কই? লম্বামতো মেয়েটি?'

'আসবে এক্ষণি, কেন?

'এক কাপ চা করে দিতে বলতাম।--এই যে, ও খুকি, মাসিকে চা করে দাও না এক কাপ।'

রাবেয়া হাসিমুখে বলল, 'দিই, আপনি বসবেন এখানে?'

'না, আমি একটু শোব ভেতরের ইজিচেয়ারে।'

রাবেয়া তাকাল আমার চোখে চোখে, 'তোর লাগবে নাকি এক কাপ?'

'দে।'

'তাহলে পাঁচ কাপ দি। বাবাকে এক কাপ, আমার নিজের দু' কাপ।'

রাবেয়া চায়ের সরঞ্জাম সাজাতে লাগল। অভ্যস্ত নিপুণ হাত, দেখতে ভালো লাগে। আমি বললাম, 'মাসির বয়স কত রে?'

'অনেক। আমি ছাড়া সবাই তো তাঁর হাতে। দেখলে মনে হয় না, তাই না?'

'হুঁ। মার ব্যথাটা একটু কম মনে হয়।'

'ছ' বার মা এমন কষ্ট পেলেন। তোরা তো সুখে আছিস, কষ্ট যা তা তো মেয়েদেরই। পেটে ছেলে-মেয়ে আসা মানেই এক পা কবরে রাখা।'

আমি বললাম, 'কষ্টটা যদি পুরুষরাও পেত, তাহলে তুই খুশি হতি?'

'জানি না।'

বলেই রাবেয়া হঠাৎ কী মনে করে হাসতে লাগল। হাসির উচ্ছ্বাসে পেয়ালার দুধ গেল উল্টে, আঁচল খসে পড়ল মেঝেয়।

অবাক হয়ে বললাম, 'হাসির কী হয়েছে? এত হাসছিস কেন?'

'একটা গল্প মনে পড়ছে, তাই হাসছি।'

'কী গল্প?'

'বাজে গল্প, তবে খুব মজার। শুনলে তুই নিজেও হাসবি। শুনবি?'

'বল।'

'একদল মেয়ে আল্লাহ্‌র কাছে নালিশ করল। তাদের বক্তব্য ছেলেমেয়ে হওয়ার ব্যথাটা শুধু মেয়েদেরই হবে কেন? এবার থেকে ছেলেদেরও হতে হবে, ব্যথার ভাগও সমান সমান। আল্লাহ্ বললেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে।' তারপর হল কি শোন। মেয়েদের এই দলটির যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাঁর ব্যথা শুরু হল। কিন্তু কি আশ্চর্য স্বামী বেচারা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কোনো ব্যথা–ফ্যাতা নেই। এদিকে তাদের গাড়ির ড্রাইভার ছুটির দরখাস্ত করেছে, তার নাকি হঠাৎ ভীষণ ব্যথা শুরু হয়েছে পেটে।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি? মেয়েরা বলল, আল্লাহ্ তোমার পায়ে পড়ি। ব্যথার ভাগাভাগি আর চাই না। আমাদের কষ্ট আমাদেরই থাক। তুই হাসলি না একটুও, আগে শুনেছিস নাকি?'

'না।'

'তবে?'

'নোংরা গল্প, তাই হাসলাম না।'

'ওঃ।'

রাবেয়া চায়ের পেয়ালা হাতে বেরিয়ে গেল। সে খুব অপ্রস্তুত হয়েছে। চোখ লজ্জায় ভিজে উঠেছে। আমার খারাপ লাগতে লাগল। অন্য সময় হলে ঐ গল্পেই প্রচুর হাসতাম। আজ পারি নি। হয়তো মায়ের কথা ভাবছিলাম বলে। চায়ের পেয়ালা হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখি মন্টু গুটিগুটি পায়ে বেরিয়ে এসেছে।

'কিরে মন্টু?'

'ঘুম আসছে না দাদা।'

'কেন?'

'রুনু ঝুনু ঘুমিয়ে পড়েছে, আমার একা একা ভয় লাগছে।'

'কিসের ভয়?'

'ভূতের।'

রাবেয়া রান্নাঘরে ফিরে যাচ্ছিল, মন্টু ডাকল, 'আপা, আমি চা খাব।'

'এক ফোঁটা ছেলের রাত তিনটের সময় চা চাই। সিগারেটও লাগবে নাকি বাবুর? দিই বাবার কাছ থেকে এনে?'

'আপা, ভালো হবে না বলছি।'

'ও ঘর থেকে কাপ নিয়ে আয় একটা। দেখিস, ফেলে দিয়ে একাকার করিস না।'

ভোর হয়ে আসছে, কাক ডাকছে। মুরগির ঘরে মুরগিগুলি সাড়াশব্দ দিচ্ছে, চাঁদের আলোও ফিকে হয়ে এসেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভোর হওয়া দেখছি। ভেতরের ঘর থেকে বাবা বেরিয়ে এলেন, ভীত গলায় ডাকলেন, 'খোকা।'

'জ্বি।'

'তোর মাকে মনে হয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই ভালো।'

'কেন? হঠাৎ করে?'

'না, মানে সুহাসিনী বলল। এখন বয়স হয়েছে কিনা। তা ছাড়া---

'তা ছাড়া কী?'

'না, মানে কিছু নয়। আমার কেন যেন খারাপ লাগছে স্বপ্নটা দেখার পর দেখলাম যেন আমি একটা ঘরে.......।'

'একটা ঘরে কী?'

'না না, রাতের বেলায় স্বপ্ন বলে নাকি কেউ।'

বাবা থতমত খেয়ে চুপ করলেন। মায়ের সেই ভয়-ধরান চিৎকার আর শোনা যাচ্ছে না। কোথা থেকে দু'টি বেড়াল এসে ঝগড়া করছে। অবিকল শিশুদের কান্নার আওয়াজ। বাবা বললেন, 'খোকা আমি হাসপাতালে গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সকে খবর দিই।'

'আপনার যেতে হবে না, আমি যাই। বরঞ্চ পাশের বাড়ি থেকে ফোন করে দিই।'

'না-না, ফোন করলে কাজ হবে না। আসতে দেরি করবে, বাসা চিনবে না--অনেক ঝামেলা। তুই থাক।'

বাবা চাদর গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এত রাতে রিক্সাটিক্সা কিছু পাওয়া যাবে না, হেঁটে হেঁটে যেতে হবে। আমি ইজিচেয়ারে চুপচাপ বসে রইলাম। 'যে শিশুটি জন্মাবে, সে এত আয়োজন, এত প্রতীক্ষা ও যন্ত্রণার কিছুই জানছে না', এই জাতীয় চিন্তা হতে লাগল। অন্ধকার মাতৃগর্ভের কোনো স্মৃতি কারোর মনে থাকে না। যদি থাকত, তবে কেমন হ'ত সে-স্মৃতি কে জানে! জন্মের সমস্ত ব্যাপারটাই বড়ো নোংরা।

রাবেয়া এসে দাঁড়াল আমার কাছে। নিচু গলায় বলল, 'খোকা, বাবা কি হাসপাতালে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা খুব ভয় পেয়েছেন, নারে?'

'হুঁ, পেয়েছেন।'

'আমারো ভয় লাগছে খোকা।'

'ভয় কিসের?'

'আমি কিছুতেই বিয়ে করব না, দেখিস তুই। মাগো কী কষ্ট!'

'মায়ের কাছে গিয়েছিলি রাবেয়া?'

'হ্যাঁ।'

'মা কী করছে?'

'চিৎকার করছেন না। চিৎকার করার শক্তি নেই। খুব কষ্ট পাচ্ছেন।'

'কী বাজে ব্যাপার!'

'হুঁ।'

'মাসি কী করছে?'

'ঘুমাচ্ছে। বাজনার মতো নাক ডাকছে। মেয়েমানুষের নাক ডাকা কী বিশ্রী। বাঁশির সরু আওয়াজের মতো তালে তালে বাজছে। ঘেন্না লাগে।'

মসজিদ থেকে ফজরের আজান হল, ভোর হয়ে আসছে। অ্যাম্বুলেন্স এল ছ'টার দিকে। ড্রাইভারটা মুশকো জোয়ান। সঙ্গের হেল্পার দু'টিরও গুণ্ডার মতো চেহারা। হৈচৈ করে স্ট্রেচার বের করল তারা। সাত-সকালেই অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেল। পাড়ার মেয়েদের প্রায় সবাই এসেছে। উকিল সাহেবের বউ আমাকে ইশারায় ডাকলেন, 'খোকা, তোর মার অবস্থা নাকি খুব খারাপ? হেড ক্লার্কের বউ বললেন।'

'না, তেমন কিছু নয়। দেখে আসুন না গিয়ে।'

'এই যাচ্ছি' বলে তিনি অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করতে লাগলেন। হেড ক্লার্কের বউও এসেছেন, তাঁর সঙ্গে একটি সুন্দর মতো মেয়ে। কমবয়সী কয়েক জন ছেলেমেয়ে দেখি হৃষ্টচিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মন্টু ভীষণ ভয় পেয়েছে, আমার একটা হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। মাঝে মাঝে সে যে কাঁপছে, তা বুঝতে পারছি। রুনু আর ঝুনুকে দেখছি না। রাবেয়া উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একা একা।

মন্টু বলল, 'দাদা, তোমাকে ডাকছে।'

'কে?'

'ওভারশীয়ার কাকু।'

মন্টুর হাত ধরে ওপাশে গেলাম। হয়তো হাজারো কথা জিজ্ঞেস করবেন। পুরুষ মানুষের মেয়েলি কৌতূহলে বড়ো খারাপ লাগে। ওভারশীয়ার কাকু খালি পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমাকে দেখে বললেন, 'খোকা, তোমাকে একটু ডাকছিলাম।'

'কী জন্যে চাচা?'

'না, মানে তেমন কিছু নয়, ঘুম থেকে উঠেই অ্যাম্বুলেন্স দেখে...... মানে। ইয়ে...... ধর তো খোকা। মাসের শেষ, কতরকম দরকার হয়, লজ্জা করো না সোনা, রাখ।'

কথা বলবার অবসর না দিয়ে চাচা সরে গেলেন। ঐদিকটায় হৈচৈ হচ্ছে। স্ট্রেচারে করে মাকে তুলছে গাড়িতে, ছুটে গেলাম।

'বাবা, সঙ্গে কে যাচ্ছে?'

'আমি আর তোর সুহাসিনী মাসি।'

'রাবেয়াকে নিয়ে যান।'

'না না, ও ছেলেমানুষ। খোকা, তোর ছোটখালাকে খবর দিস।'

গাড়ি স্টার্ট নিতেই বাবা আবার ডাকলেন, 'খোকা, ও খোকা, তোর মা ডাকছে, আয় একটু।'

গাড়ির ভেতর আবছা অন্ধকার। গলা পর্যন্ত চাদর জড়িয়ে মা পড়ে আছেন। সারা শরীর কেঁপে উঠছে এক-এক বার। মা নরম স্বরে বললেন, 'খোকা, আয় এদিকে।'

অস্পষ্ট আলোয় চোখে পড়ল যন্ত্রণায় তাঁর ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে। অদ্ভুত ফর্সা মুখের অদৃশ্য নীল শিরা কালো হয়ে ফুলে উঠছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে সারা মুখে।

'মা, কী জন্যে ডেকেছেন? কী?'

মা কোনো কথা বললেন না। বাবা বললেন, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে, খোকা তুই নেমে যা।'

'আমিও সঙ্গে যাই বাবা?'

'না-না, তুই থাক। বাসায় ওরা একা। নেমে যা, নেমে যা।'

মাসি গলা বাড়িয়ে বললেন, 'পানের কৌটা ফেলে এসেছি, কেউ আসে তো সঙ্গে দিয়ে দিও।'

গাড়ি ছেড়ে দিল। মন্টু গাড়ির পেছনে পেছনে বড়ো রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ফিরে এল। রুনু-ঝুনুকে নিয়ে আমি বসে রইলাম বারান্দায়। জন্ম বড়ো বাজে ব্যাপার। মৃত্যুর চেয়েও করুণ।

বুকের উপর চেপে থাকা বিষণ্নতা দেখতে দেখতে কেটে গেল। আবহাওয়া তরল হয়ে এল ঘন্টাখানেকের মধ্যে। ছোট খালা এলেন নয়টায় তাঁর মস্ত কালো রঙের গাড়িতে করে, সঙ্গে মেয়ে কিটকি। রাবেয়া ঢাউস এক কেটলি চায়ের পানি চড়িয়ে দিল। রুনু ঝুনু স্কুলে যেতে হবে না শুনে আনন্দে লাফাতে লাগল।

সারা রাত নির্ঘুম থাকায় মাথা ব্যথা করছিল। চুপচাপ শুয়ে রইলাম। ইউনিভার্সিটিতে এক দফা যেতে হবে। স্যার কাল খোঁজ করেছিলেন, পান নি। আতিক কি জন্যে যেন তার বাসায় যেতে বলেছে। খুব নাকি জরুরী। চার্লি চ্যাপলিনের 'দি কিড' ছবিটি চলছে গুলিস্তানে। আজ দেখব কাল দেখব করে দেখা

য় নি। দু' দিনের ভেতর দেখতে হবে। সামনের হপ্তায় কী একটা বাজে ছবি যেন।

'কিরে খোকা, শুয়ে?'

মৃদু সেন্টের গন্ধ ছড়িয়ে খালা ঢুকলেন। খালার সঙ্গে মায়ের চেহারার খুব মিল। তবে খালা মোটাসোটা, মা ভীষণ রোগা। খালা পাশের চেয়ারে বসলেন, 'জ্বর নাকি রে?'

'জ্বি না, এই শুয়েছি একটু।'

'দেখি?'

খালা মাথায় হাত রাখলেন।

'না, মোটেও জ্বর নেই। ডাক্তারের বউ হাফ-ডাক্তার হয় জান তো?'

'জানি। জ্বরটর নয়, এমনি শুয়ে আছি।'

'খারাপ লাগছে? তা তো লাগবেই, বুড়ো বয়সে মায়েদের যদি মেটারনিটিতে যেতে হয়।'

আমি চুপ করে রইলাম। দরজার আড়াল থেকে কিটকি উঁকি দিল। খালা ডাকলেন, 'আয় ভেতরে।'

কিটকি লজ্জিতভাবে ঢুকল। যখন অন্য কেউ থাকে না তখন আমার সঙ্গে কিটকির ব্যবহার খুব সহজ ও আন্তরিক। বাইরের কেউ থাকলেই কিটকি সংকোচ ও লজ্জায় চোখ তুলে তাকায় না। শৈশবের একটি ছোট্ট ঘটনা থেকেই কিটকির এমন হয়েছে।

সে তখন খুব ছোট, ছ'-সাত বৎসর বয়স হবে। মায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছে বাসায়। রুনু-ঝুনুর সঙ্গে সারা দুপুর হৈচৈ করে খেলল। মা যখন সবাইকে খেতে ডাকলেন, তখন তার হঠাৎ কী খেয়াল হল কি জানি, মাকে গিয়ে বলল, 'খালা, আমি আপনাকে একটা কথা বলব, কাউকে বলবেন না তো?'

'না মা, বলব না।'

'আল্লার কসম বলুন।'

'আল্লার কসম।'

'তা হলে মাথা নিচু করুন, আমি কানে কানে বলি।'

মা মাথা নিচু করলেন এবং কিটকি ফিসফিস্ করে বলল, 'বড়ো হয়ে আমি খোকা ভাইকে বিয়ে করব। আপনি কাউকে বলবেন না তো?'

মা কিটকির কথা রাখেন নি। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে বলে দিয়েছেন। যদিও সুদূর শৈশবের ঘটনা, তবু স্থানে-অস্থানে এই প্রসঙ্গ তুলে বেচারিকে প্রচুর লজ্জা দেওয়া হয়। মা তো কিটকির সঙ্গে দেখা হলে এক বার হলেও বলবেন, 'আমার বউমেয়েকে কেউ দেখি যত্ন করছে না?'

কিটকি তার মায়ের পাশে বসল। সে আজ হলুদ রঙের কামিজ পরেছে, লম্বা বেণীতে মস্ত বড়ো বড়ো দু'টি হলুদ ফিতের ফুল। অল্প হাসল কিটকি। আমি

বললাম, 'কি কিটকি, আজ কলেজ নেই?'

'আছে, যাব না।'

'কেন?'

'এমনি। কলেজ ভীষণ ব্যোরিং। তা ছাড়া খালার অসুখ।'

'থাকবি আজ সারা দিন?'

'হ্যাঁ। আজ রাতে আপনাকে ভূতের গল্প বলতে হবে।'

'ভূতের গল্প শুনে কাঁদবি না তো আবার?'

'ইস্, কাঁদব? ছোটবেলায় কবে কেঁদেছিলাম, এখনো সেই কথা।'

'ছোটবেলা তো তুই আরো কত কি করেছিস।'

'ভালো হবে না কিন্তু।'

বলতে বলতে কিটকি লজ্জায় মাথা নিচু করল। খালা বললেন, 'আমি হাসপাতালে যাই খোকা। কিটকি, তুই যাবি আমার সঙ্গে?'

'না মা, আমি থাকি এখানে।'

খালা চলে যেতেই রাবেয়া চায়ের ট্রে হাতে ঢুকল। বেশ মেয়ে রাবেয়া। এর ভেতর সে গোসল সেরে নিয়ে চুল বেঁধেছে। রান্না শেষ করেছে, এক দফা চা খাইয়ে আবার চা এনেছে। রাবেয়া হাসতে হাসতে বলল, 'কি কিটকি? না—না ভিটকি বেগম, এই ঘরে কী করছ? পূর্বরাগ নাকি? সিনেমার মতো শুরু করলে যে?'

'যান আপা, আপনি তো ভারি ইয়ে......মা ডাকলেন তাই।'

'বেশ বেশ, তা এমন গলদা চিংড়ির মতো লাল হয়ে গেছ যে! গরমে না হৃদয়ের উত্তাপে?'

'যান আপা, ভাল্লাগে না।'

'নিন, নিন, ভিটকি বেগম--চা নিন।'

'কি সব সময় ভিটকি ডাকেন, জঘন্য লাগে।'

'কিটকির কি কোনো মানে আছে? তাই ভিটকি ডাকি।'

'যেন ভিটকির কত মানে আছে।'

'আছেই তো। ভিটকি হচ্ছে ভেটকি মাছের স্ত্রীলিঙ্গ। অর্থাৎ তুই একটি গভীর জলের ভেটকি ফিশ, বুঝলি?'

'বেশ, আমি গভীর জলের মাছ। না, চা খাব না।'

কাঁদো কাঁদো মুখে উঠে দাঁড়াল কিটকি। কাউকে কিছু বলার অবসর না দিয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। রাবেয়া হেসে উঠল হো হো করে। বলল, 'বড়ো ভালো মেয়ে।'

'হুঁ।'

'একটু অহংকার আছে, তবে মনটা ভালো।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, আমার ভীষণ ভালো লাগে। আর আমার মনে হয় কি জানিস?'

'কী মনে হয়?'

'মনে হয় মেয়েটির শৈশবে তোর দিকে যে টান ছিল, তা যে এখনো আছে তাই নয়--চাঁদের কলার মতো বাড়ছে।'

'তোর যত বাজে কথা।'

রাবেয়া বলল, 'মেয়েটির কথা ছেড়ে দিই, তোর যে ষোল আনার উপর দু' আনা, আঠারো আনা টান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কান-টান লাল করে একেবারে টমেটো হয়ে গেছিস, আচ্ছা গাধা তো তুই!'

রাবেয়া হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল। রুনু এসে ঢুকল খুব ব্যস্তভাবে, হাতে একটা লুডুবোর্ড।

'কিরে রুনু?'

'কিটকি আপার কী হয়েছে?'

'কেন?'

'চুপচাপ বসে আছে। আগে বলেছিল লুডু খেলবে, এখন বলছে খেলবে না।'

রাবেয়া উঁচু গলায় হাসল আবার। রুনুকে বললাম, 'রুনু, মন্টু কোথায়? মন্টুকে দেখছি না তো।'

'মন্টু হাসপাতালে গেছে।'

'হাসপাতালে কার সঙ্গে গেল, খালার সঙ্গে?'

'না, একাই গেছে। তার নাকি খুব খারাপ লাগছিল। তাই একা একাই গেছে।'

'কোন হাসপাতালে, চিনবে কী করে?'

'চিনবে। তার স্কুলের কাছেই।'

'চা-টা খেয়ে গিয়েছে?'

'না, খায় নি।'

রাবেয়া শুয়ে শুয়ে পা দোলাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে করে উঠে বসল, 'খোকা তুই বাজি রাখতে চাস আমার সঙ্গে?'

'কী নিয়ে বাজি?'

'মায়ের ছেলে হবে কি মেয়ে হবে, এই নিয়ে।'

'রাবিশ।'

'আহ্, রাখ না একটা বাজি। তোর কি মনে হয় ছেলে হবে?'

'আমার কিছু মনে হয় না।'

'আহ্, বল না একটা কিছু।'

'ছেলে।'

'আমার মনে হয় মেয়ে। যদি ছেলে হয়, তবে আমি তোকে একটা সিনেমা দেখার পয়সা দেব। আর মেয়ে হলে তুই কী দিবি আমাকে?'

'কি বাজে বকিস। ভাল্লাগে না।'
'আহা, বল না কী দিবি? প্লীজ বল।'

ক্লাস শেষ হল দেড়টায়।

আতিক ছাড়ল না, টেনে নিয়ে গেল তার বাসায়। একটি মেয়ে নাকি প্রেমপত্র লিখেছে তার কাছে। সত্যি মেয়েটিই লিখেছে, না কোনো ছেলে ফাজলামি করেছে, তাই ভেবে পাচ্ছে না। তার আসল সন্দেহটা আমাকে নিয়ে, আমিই কাউকে দিয়ে লেখাই নি তো। যত বার বলছি, 'আজ ছেড়ে দাও, আরেক দিন কথা হবে। আমার একটু কাজ আছে।' ততই সে চেপে ধরে। উঠতে গেলেই বলে, 'কী এমন কাজ বল?' কী যে কাজ, তা আর বলতে পারি না লজ্জায়। অস্বস্তিতে ছটফট করি। বাসায় ফিরতে ফিরতে বিকেল। আমাকে দেখেই ওভারশীয়ার কাকু দৌড়ে এলেন, 'খোকা, তোমার মার অবস্থা বেশি ভালো নয়। সবাই হাসপাতালে গেছে। তুমি কোথায় ছিলে? যাও, তাড়াতাড়ি চলে যাও। রিক্সাভাড়া আছে?'

আমার পা কাঁপতে লাগল। আচ্ছন্নের মতো রিক্সায় উঠলাম। সমস্ত শরীর টলমল করছে।

কালোমতো একটি মেয়ে কাঁদছে। কী হয়েছে তার কে জানে। রাবেয়া বাবার হাত ধরে রেখেছে। রুনু-ঝুনুকে দেখছি না। বাচ্চা বোনটা কাঁদছে ট্যাঁট্যা করে। খালা কোলে করে আছেন তাকে। খালা বললেন, 'দেখ খোকা, কি সুন্দর ফুলের মতো বোন হয়েছে।'

হ্যাঁ, খুব সুন্দর ফুলের মতো বোন হয়েছে একটি। আর আমাদের আশ্চর্য ফর্সা, ভীষণ রোগা মা হাইফোরসেপ ডেলিভারিতে অপারেশন টেবিলে চুপচাপ মারা গেছেন।

২

তেইশ বছর আগে মা এসেছিলেন আমাদের ঘরে। তেইশ বছরে একটি বারের জন্যও নিজের বাবার প্রকাণ্ড বাড়িতে যান নি। কতই-বা দূর, বাসে চার আনার বেশি লাগে না। এত কাছাকাছি থেকেও যেন তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরের গৃহে তেইশ বছর কাটিয়ে দিলেন।

হাসপাতালে মার চারপাশে তাঁর পরিচিত আত্মীয়স্বজনেরা ভিড় করলেন। নানাজানকে প্রথম দেখলাম আমরা। সোনালি ফ্রেমের হাল্‌কা চশমা, ধবধবে গায়ের রং। শাজাহান নাটকে বাদশা শাজাহানের চেহারা যেমন থাকে, ঠিক সে-রকম

চেহারা। নানাজান বাবাকে বললেন, 'মেয়েকে আমি আমার বাড়ি নিয়ে যাই, তোমার আপত্তি আছে?'

বাবা চুপ করে রইলেন। নানাজান কথা বলছিলেন এমন সুরে যেন তাঁর বাড়ির কোনো কর্মচারীর সঙ্গে বৈষয়িক কথা বলছেন। তিনি আবার বললেন, 'সেখানে মেয়ের মার কবর আছে, তার পাশেই সেও থাকবে।'

তেইশ বছর পর মা আবার তাঁর নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। একদিন যেমন সব ছেড়েছুড়ে এসেছিলেন, কোনো পিছুটান ছিল না, ফিরেও গেলেন তেমনি।

সুর কাটল না কোথাও। ঘর সংসার চলতে লাগল আগের মতোই। বয়স বাড়তে লাগল আমাদের। রুনু ঝুনু আর মন্টু ব্যস্ত থাকতে লাগল তাদের পুতুলের মতো ছোট্ট বোনটিকে নিয়ে, যার একটিমাত্র দাঁত উঠেছে। মুখের নাগালের কাছে যা-ই পাচ্ছে তা-ই কামড়ে বেড়াচ্ছে সেই দাঁতে। সে সময়ে-অসময়ে থ থ থ থ বলে আপন মনে গান গায়। আর রাবেয়া? অপূর্ব মমতা আর ভালোবাসায় ডুবিয়ে রেখেছে আমাদের। সমুদ্রের মতো এত স্নেহ কী করে সে ধারণ করেছে কে জানে?

বাবা রিটায়ার করেছেন কিছুদিন হল। দশটা-পাঁচটা অফিসের বাঁধা জীবন শেষ হয়েছে। ফেয়ারওয়েলের দিন রুনু-ঝুনু বাবার সঙ্গে গিয়েছিল। অফিসের কর্মচারীরা বাবাকে একটি কোরাণ শরীফ, একটি ছাতা আর এক জোড়া ফুলদানি উপহার দিয়েছে। এতেই বাবা মহা খুশি।

মার অবর্তমানে যতটা শূন্যতা আসবে মনে করেছিলাম, তা আসে নি--সমস্তই আগের মতো চলছে। সব মৃত্যু সম্বন্ধেই এ কথা হয়তো খাটে। 'অতি প্রিয়জন যদি পাশে না থাকে, তবে কি করে বেঁচে থাকা যাবে' ভাবনাটা অর্থহীন মনে হয়। মৃত্যুর জন্যে মানুষ শোক করে ঠিকই, কিন্তু সে-শোক স্মৃতির শোক, এর বেশি কিছু নয়।

কোনো কোনো রাতে ঘুম ভেঙে গেলে মার কথা মনে পড়ে। তখন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। কিটকির কথা প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করি তখন। যেন সে এসে বসেছে আমার পাশে। আমি বলছি, 'কি কিটকি, এত রাতে আমার ঘরে ভয় করে না?'

'কিসের ভয়, ভূতের? আমি বুঝি আগের মতো ছেলেমানুষ আছি?'

'না, তুই কত বড়ো হয়েছিস, সবাই বড়ো হচ্ছি আমরা।'

'হ্যাঁ, দেখেছেন আমার চুল কত লম্বা হয়েছে?'

'তোকে বব চুলে এর চেয়ে ভালো দেখাত।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'কাঁচি আছে আপনার কাছে?'

'কী করবি?'

'বধ করে ফেলি আবার।'

রাতে এ জাতীয় অসংলগ্ন ভাবনা ভাবি বলেই হয়তো কিটকিকে দিনের বেলায় দেখলে লজ্জা ও সংকোচ বোধ করি। যেন একটা অপরাধ করে ধরা পড়েছি। কিটকি অবশ্যি আগের মতোই আছে। হৈচৈ করার নেশাটা একটু বেড়েছে মনে হয়। রুনু-ঝুনুর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে। প্রায়ই এদের দু' জনকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়।

আমার নিজের স্বভাব-চরিত্রে বেশ পরিবর্তন এসেছে। যখন ছাত্র ছিলাম, রাত জেগে পড়তে হ'ত, আর দু' চোখে ভিড় করত রাজ্যের ঘুম। কষ্ট করে রাত জাগা। এখন ঘুমুবার অবসর আছে, কিন্তু চেপে ধরেছে ইন্‌সমনিয়ায়। থানার ঘড়িতে বড়ো বড়ো ঘন্টা বেজে ছোটগুলিও বাজতে শুরু করে, ঘুম আসে না এক ফোঁটা। বিছানায় গড়াগড়ি করি। ভোর হয়। সকালের আলো দু' চোখে পড়তেই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। আটটা বাজার আগেই রুনু ঝাঁকায়, 'দাদা ওঠ, চা জুড়িয়ে পানি হয়ে গেল।'

'হোক, তোরা খা। শরীর খারাপ, আমি আরেকটু ঘুমুই।'

রুনু চলে যেতেই রাবেয়া আসে। প্রবল ঝাঁকুনিতে চমকে উঠে শুনি, 'তিন মিনিটের মধ্যে না উঠলে দিচ্ছি মাথায় পানি ঢেলে। এক-দুই-তিন-চার-এই দিলাম, এই দিলাম--।'

রাবেয়াকে বিশ্বাস নেই, উঠে পড়তে হয়। বারান্দায় মুখ ধুতে ধুতেই বাবা সকালের দীর্ঘ ভ্রমণ সেরে ফিরে আসেন। খুশি খুশি গলায় বলেন, 'তুই বড়ো লেটরাইজার। স্বাস্থ্য খারাপ হয় এতে। দেখ না আমার স্বাস্থ্য আর তোর স্বাস্থ্য মিলিয়ে।'

সত্যি চমৎকার স্বাস্থ্য বাবার। রিটায়ার করার পর আরো ওজন বেড়েছে। আমি সপ্রশংস চোখে তাকাই বাবার দিকে। বাবা হেসে হেসে বলেন, 'এত রোগা তুই! কলেজের ছেলেরা তোর কথা শোনে?'

'তা শোনে।'

রাবেয়া রান্নাঘর থেকে চ্যাঁচায়, 'না বাবা, মোটেই শোনে না।'

বাবা খুব খুশি হন। অনেকক্ষণ ধরে আপন মনে হাসেন। বেশ বদলে গেছেন তিনি। বাবা ছিলেন নিরীহ, নির্লিপ্ত মানুষ। সকালে অফিসে যাওয়া, বিকেলে ফেরা। সন্ধ্যায় একটু তাস খেলতে যাওয়া, দশটা বাজতে-না-বাজতে ঘুমিয়ে পড়া। খুবই চুপচাপ স্বভাব। আমাদের কাউকে কোনো কারণে সামান্য ধমক দিয়েছেন, এও পর্যন্ত মনে পড়ে না। সংসারে বাবার যেন কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের নিয়ে আর মাকে নিয়েই আমাদের সংসার। বাবার ভূমিকা নেপথ্য কোলাহলের।

কেউ আমাদের দাওয়াত করতে এলে মাকেই বলত। বাড়িওয়ালা ভাড়া নিতে এসে বলত, 'খোকা তোমার মাকে একটু ডাক তো।' অথচ বাবা হয়তো বাইরে

মোড়ায় বসে মন্টুকে অঙ্ক দেখিয়ে দিচ্ছেন।

এখন বাবা ভীষণ বদলেছেন। সবার সঙ্গে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে আলাপ চালান। সেদিন ওভারশীয়ার কাকুর সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়ে সারা দিন কাটিয়ে এসেছেন। খবরের কাগজ রাখেন দু'টি। প্রতিটি খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। রাজনীতি নিয়েও আলোচনা চলে।

'খোকা, তোর কী ধারণা? আওয়ামী লীগ পপুলারিটি হারাবে?'

'আমার? না, আমার কোনো ধারণা নেই।'

'ভালো করে পেপার পড়া চাই, না পড়লে কি কিছু বোঝা যায়? রাজনীতি বুঝতে হলে চোখ-কান খোলা রাখা চাই, বুঝলি? কি, বিশ্বাস হল না, না?'

'হবে না কেন?'

'বিশ্বাস যদি না হয়, কাগজ-কলম নিয়ে আয়, তিন বৎসর পর পার্টির কি অবস্থা হবে লিখে দিই। সীল করে রেখে দে। তিন বৎসর পর অক্ষরের সাথে অক্ষর মিলিয়ে দেখবি।'

বাবার রূপান্তর খুব আকস্মিক। আর আকস্মিক বলেই বড়ো চোখে পড়ে। প্রচুর মিথ্যে কথাও বলেন বানিয়ে বানিয়ে। সেদিন যেমন শুনলাম। ওভারশীয়ার কাকুর ছেলের বউয়ের সঙ্গে গল্প করছেন পাশের ঘরে। এ ঘর থেকে সমস্ত শোনা যাচ্ছে, 'কাউকে যেন বলো না মা, গতকাল রাতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে।'

'কী ব্যাপার চাচাজান?'

'অনেক রাত তখন। আমি বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে আছি। হঠাৎ ফুলের গন্ধ পেলাম। বকুল ফুলের গন্ধ। অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। দেখি কি, খোকার মা হাল্কা হলুদ রঙের একটা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে আমগাছটার নিচে।'

'বলেন কি চাচা!'

'হ্যাঁরে মা, মিনিট তিনেক দেখলাম।'

'রাত কত তখন?'

'বারোটার মতো হবে।'

গল্পটি যে সম্পূর্ণই মিথ্যা, এতে কোনো সন্দেহ নেই। গতরাতে আমার এক ফোঁটা ঘুম হয় নি। সারা রাতই আমি বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে কাটিয়েছি।

অথচ যে-বাবা কোনোদিন অপ্রয়োজনে সত্য কথাটিও বলেন নি, তিনি কেন এমন অনর্গল মিথ্যা বলে চলেন, ভেবে পাই না।

রাবেয়া এক দিন বলছিল, 'মা মারা যাবার পর বাবা খুব ফ্রী হয়েছেন।'

'তার মানে?'

'মানে আর কি, মনে হয় বাবা মার সঙ্গে ঠিক মানিয়ে নিতে পারেন নি।'

'তুই কী সব সময় বাজে বকিস?'

'আহা এমনি বললাম। কে বলেছে বিশ্বাস করতে?'

বিশ্বাস না করলে অবশ্যি চলে, কিন্তু বিশ্বাস না করাই–বা যায় কী করে? কিন্তু মার মতো মেয়ে তেইশ বছর কী করে মুখ বুজে এইখানে কাটিয়ে দিয়েছেন ভেবে পাই না। বাবা মার সঙ্গে হাস্যকর আচরণ করতেন। যেন মনিবের মেয়ের সঙ্গে দিয়ে দেয়া প্রিয় খানসামা এক জন। ভালোবাসার বিয়ে হলে এ রকম হয় না। সেখানে অসামঞ্জস্য হয়, অশান্তি আসে, কিন্তু মূল সুরটি কখনো কেটে যায় না। অথচ যতদূর জানি ভালোবেসেই বিয়ে হয়েছিল তাঁদের। কিছুটা খালা বলেছেন, কিছু বলেছেন বাবা, রাবেয়াও বলেছে কিছু কিছু (স হয়তো শুনেছে মার কাছ থেকেই)। সব মিলিয়ে এ ধরনের চিত্র কল্পনা করা যায়।

শিরিন সুলতানা নামের উনিশ বছরের একটি মেয়ে সূর্য ওঠার আগে ছাদে বসে হারমোনিয়ামে গলা সাধত ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মে। সাতটার দিকে গানের মাষ্টার শৈলেন পোদ্দার আসতেন গান শেখাতে। তিনি আধঘন্টা থাকতেন। এই সমস্ত সময়টা আজহার হোসেন নামের একটা গরিব আশ্রিত ছেলে কান পেতে অপেক্ষা করত। ছাদের চিলেকোঠার ঘরটায়, সেখানেই সে থাকত। এক দিন মেয়েটি কী–একটি গান গাইল যেন, খুব ভালো লাগল ছেলেটির। বেরিয়ে এসে কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'আরেক বার গান না। মাত্র এক বার।'

শিরিন সুলতানা গান তো গানই নি, ছাদের গান বন্ধ করে দিয়েছেন তার পর থেকে। লজ্জিত ছেলেটি অপরাধী মুখে আরো দু' বছর কাটিয়ে দিল চিলেকোঠার ঘরটায়। এই দু' বছরে শিরিন সুলতানার সঙ্গে তার একটি কথাও হয় নি। শুধু দেখা গেল, দু' জনে বিয়ে করে দেড় শ' টাকা ভাড়ার একটা ঘুপচি ঘরে এসে উঠেছেন।

কী করে এটা সম্ভব হল, তা আমার কাছে একটি রহস্য। রাবেয়ার কাছে জানতে চাইলে সে বলত, 'আমি জানি, কিন্তু বলব না।'

'কেন?'

'এমনি। কী করবি শুনে?'

'জানতে ইচ্ছে হয় না?'

'বলব তোকে একদিন। সময় হোক।'

সেই সময়ও হয় নি। জানাও যায় নি কিছু। অথচ খুব জানতে ইচ্ছে করে।

ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের সঙ্গে দুপুর বারোটায় একটা ক্লাস ছিল। একটার দিকে শেষ হল। দুপুরে রিকশা পাওয়ার আশা কম। সব রিকশাওয়ালা একসঙ্গে খেতে যায় কি না কে জানে? অল্প হাঁটতেই ঘামে শার্ট ভিজে ওঠার যোগাড়। ভীষণ রোদ। রাস্তার পিচ গলে স্যাণ্ডেলের সঙ্গে আঠার মতো এঁটে যাচ্ছিল। ছায়ায় দাঁড়িয়ে রিকশার জন্যে অপেক্ষা করব কি না যখন ভাবছি, তখনি মেয়েলি গলা শোনা গেল, 'খোকা ভাই, ও খোকা ভাই।'

তাকিয়ে দেখি কিটকি। সিনেমা হলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবাইকে সচকিত করে বেশ জোরেসোরেই ডাকছে। কানে পায়রার ডিমের মতো দুটো লাল পাথর। চুলগুলো লম্বা বেণী হয়ে পিঠে ঝুলছে। কামিজ সালোয়ার সবই কড়া হলদে-লাল নকশাকাটা। সুন্দর দেখাচ্ছিল, মুখটা লম্বাটে, পাতলা বিস্তৃত ঠোঁট। আমি বললাম, 'কিরে, তুই সিনেমা দেখবি নাকি?'

'হুঁ, ইয়েলো স্কাই।'

'একা এসেছিস?'

'না, আমার এক বন্ধু আসবে বলেছিল, এখনো আসল না। দেড়টা বেজে গেছে, এখুনি শো শুরু হবে।'

'টিকিট কেটে ফেলেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'দে আমার কাছে, বিক্রি করে দি একটা। তুই দেখ একা-একা।'

'আপনি দেখেন না আমার সঙ্গে, আপনার তো কোনো কাজ নেই! আসেন না।'

'আরে, পাগল নাকি? বাসায় গিয়ে গোসল করব, ভাত খাব।'

'আহা, এক দিন একটু দেরি হলে মরে যাবেন না। একা একা ছবি দেখতে আমার খুব খারাপ লাগে। আসেন না, দেখি। খুব ভালো ছবি। প্লীজ বলুন, 'হ্যাঁ।'

কিটকির কাণ্ড দেখে হেসে ফেলতে হল। বললাম, 'চল দেখি, ছবি ভালো না হলে কিন্তু মাথা ভেঙে ফেলব।'

দু' জন সিঁড়ি দিয়ে উঠছি দোতলায়, কিটকি হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখুন তো, কী মুশকিল হল।'

'আবার কি?'

'আমার বন্ধুটা এসে পড়েছে। ঐ যে নামছে রিকসা থেকে।'

'খাটো করে ঐ মেয়েটি নাকি; লাল ওড়না?'

'হুঁ।'

'ভালোই হয়েছে। দেখ তোরা দু' জনে, আমায় ছেড়ে দে।'

'না-না, আসেন এই পোস্টার বোর্ডটার আড়ালে চলে যাই। না দেখলেই চলে যাবে।'

'তুই যা আড়ালে, আমাকে তো আর চেনে না।'

'আহা, আসেন না। কোন দিকে গেছে?'

'দোতলায় খুঁজতে গেছে হয়তো।'

'কেমন গাধা মেয়ে দেখেছেন? সাড়ে বারোটায় আসতে বলেছি, এসেছে দেড়টায়।'

ছবিটা সত্যি ভালো। কিছুক্ষণের মধ্যেই জমে গেলাম। তবে ইটালিয়ান ছবি

যেমন হয়--করুণ রসের ছড়াছড়ি। ছবির সুপুরুষ ছেলেটি বিয়ে করেছে তার প্রেমিকার বড় বোনকে। খবর পেয়ে প্রেমিকা বিছানায় শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। সেটাই দেখাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখি কিটকি নিজেই মুখে আধখানা রুমাল গুঁজে কান্নার দুরন্ত বেগ সামলাচ্ছে। চোখের পানিতে চিক্‌চিক্ করছে গাল। পাশে বসা এক গোবেচারা তরুণ পর্দা ছেড়ে কিটকিকেই দেখছে অবাক হয়ে। আমি বললাম, 'কি রে কিটকি, কী ব্যাপার?'

'কিছু না।'

'আয় আয়, ছবি দেখতে হবে না। কী মুশকিল। কান্নার কী হল! তোর তো কিছু হয় নি।'

কিটকির হাত ধরে হল থেকে বেরিয়ে এলাম। আলোয় এসেই লজ্জা পেয়ে গেল সে।

'তুই একটা পাগল।'

'বলেছে আপনাকে!'

'আর একটা বাচ্চা খুকি।'

'আর আপনি একটা বুড়ো।'

'তুই ভারি ভালো মেয়ে কিটকি। তোর কান্না দেখে আমার এত ভালো লেগেছে।'

'ভালো হবে না বলছি।'

'আইসক্রীম খাবি কিটকি?'

'ন্-না।'

'না-না, খেতেই হবে। আয়, তুই সিনেমা দেখালি--আমি আইসক্রীম খাওয়াই।'

'দেখলেন তো কুল্লে সিকিখানা সিনেমা।'

'আচ্ছা, তুই সিকিখানাই খাস।'

কিটকি সুন্দর করে হাসল। সবুজ রুমালে নাক ঘষতে ঘষতে বলল, 'ছবিটা বড় ভালো, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ইস্, সবটা যদি দেখতাম!'

গরমে মন্দ লাগল না আইসক্রীম। বড়ো কথা, পরিবেশটি ভালো। সুন্দর করে সাজান টেবিলে সাদা টেবিল-ক্লথ। বয়গুলি কেতাদুরস্ত। অসময় বলেই ভিড় নেই। কিটকি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল, 'চলুন উঠি।'

'বস আরেকটু, আইসক্রীম আরো একটা নে।'

'ছেলেমানুষ পেয়েছেন আমাকে, না?'

সবুজ রুমাল বের করে নাক ঘষল কিটকি।

'আমার ভীষণ নাক ঘামে, খুব বাজে।'

'না, খুব ভালো, যাদের নাক ঘামে তারা--'

'জানি জানি, বলতে হবে না। যত সব মিথ্যে কথা। আপনি বিশ্বেস করেন?'

'না।'

'আমিও না। আচ্ছা, যে-সব মেয়েদের গালে টোল পড়ে, তাদের হ্যাসব্যাণ্ড নাকি খুব কম বয়সে মারা যায়?'

'কই, তোর তো টোল পড়ে না? নাকি পড়ে? হাসি দে একটা।'

'আহা, আমার জন্যে বলছি না। আপনি ভারি বাজে।'

'বাসায় যাবি কিটকি? চল যাই।'

'না, আজ থাক। আরেক দিন যাব।'

'শুক্রবারে আয়।'

'শুক্রবারে কলেজ খোলা যে, আচ্ছা, সন্ধ্যাবেলা আসব।'

'রাতে থাকবি তো?'

'উঁহু।'

কিটকি রিকশায় উঠে হাত নাড়ল।

রোদের তেজ কমে আসছে। চারটে বেজে গেছে প্রায়। প্রচুর ঘেমেছি। বাসায় গিয়েই একটা দীর্ঘ গোসল সারব। অবেলায় ভাত আর খাব না। চা-টা খেয়ে দীর্ঘ ঘুম দেব। রুনু ক'দিন ধরেই সিনেমা দেখার জন্যে ঘ্যানর ঘ্যানর করছে। তাকে নিয়ে এক দিন দেখলে হয় 'ইয়েলো স্কাই'।

বাসায় এসে দেখি, গেটে তালা ঝুলছে। তালার সঙ্গে আটকান ছোট্ট চিরকুট, 'খোকা, সবাই মিলে ছোটখালার বাসায় বেড়াতে গিয়েছি। সন্ধ্যার আগে ফিরব না। তুইও এসে পড়।--রাবেয়া।'

ক্লান্তি লাগছিল খুব, কোথাও গিয়ে চা-টা খেলে হ'ত।

'এই চিঠিটি সম্ভবত তোমাকেই লেখা?'

তাকিয়ে দেখি, বেশ লম্বা নিখুঁত সাহেবি পোশাকে এক ভদ্রলোক আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কপালের দু' পাশের চুলে পাক ধরলেও এখনো বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা।

'তুমি বলেছি বলে কিছু মনে কর নি তো, ছেলের বয়সী তুমি।'

'না-না, কিছু মনে করি নি আমি। আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।'

'চিনবে কী করে, আমি তো পরিচিত কেউ নই। রাবেয়া বলে এই বাড়িতে একটি মেয়ে আছে না?'

'জ্বি, আমার বোন।'

'ছোটবেলায়, সে যখন স্কুলে পড়ত, তখন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

তাকে দেখলেই আমি গাড়িতে করে লিফ্‌ট্‌ দিতাম।'
'তাই নাকি?'
'হ্যাঁ, বড়ো ভালো মেয়ে। অনেক দিন দেশের বাইরে ছিলাম। কিছুদিন হল এসেছি, ভাবলাম মেয়েটিকে দেখে যাই। এসে দেখি তালাবন্ধ। তালার সঙ্গের চিঠিখানা পড়ে দেয়াশলাই কিনতে গিয়েছি, আর তুমি এসেছ।'
'আপনাকে বসাই কোথায়--আসেন, চা খান এক কাপ।'
'না। আমার ডায়াবেটিস, চা থাক। তুমি এই মেয়েটিকে এই চকোলেটগুলি দিয়ে দিও, আচ্ছা?'
ভদ্রলোক কালো ব্যাগ খুলে চকোলেট বের করতে লাগলেন।
'বিদেশে থাকাকালীন প্রায়ই মনে হ'ত, মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায় নি তো? হলে কোথায় হল?'
'না, বিয়ে হয় নি এখনো।'
'আচ্ছা তাহলে যাই, কেমন?'
রাবেয়া বেশ মেয়ে তো! পথের লোকজনদের সঙ্গে ছোট বয়সেই কেমন খাতির জমিয়েছে। এমন খাতির যে একেবারে বিদেশ থেকে চকোলেট এনেছেন তিনি। চকোলেট-খাওয়া মেয়েটি এত বড়ো হয়েছে জানলে আর চকোলেট আনতেন না নিশ্চয়ই। রাবেয়ার এমন আরো কয়েক জন বন্ধু আছে। এক জন ছিল আবুর মা। কী যে ভালোবাসত রাবেয়াকে! রোজ এক বার খোঁজ নেওয়া চাই। রাবেয়ার যে-বার অসুখ হল, টাইফয়েড, আবুর মা তার ঘরসংসার নিয়ে আমাদের বারান্দায় উঠে এল। পনের দিনের মতো ছিল অসুখ, সেই ক'দিন বুড়ি এখানেই ছিল। মা ভারি বিরক্ত হয়েছিলেন। মেয়ের অমঙ্গল হবে ভেবে তাড়িয়েও দিতে পারেন নি। হঠাৎ একদিন আবুর মা আসা বন্ধ করে দিল। হয়তো চলে গিয়েছিল অন্য কোথাও, কিংবা মারা-টারা গিয়েছে গাড়িচাপা পড়ে। রাবেয়াকে ঠাট্টা করে সবাই 'আবুর মার সখী' ডাকত। বাবা ডাকতেন 'আবুর নানী'। রাবেয়া রাগত না মোটেই। আবুর মার সঙ্গে রাবেয়া হেসে হেসে কথা কইছে, ছবির মতো ভাসে চোখে।
'ও বুড়ি, আজ কত পেয়েছ?'
'দুই সের চাইল, আর চাইর আনা পয়সা। এই কাপড়টা দিছে পুরানা পল্টনের এক বেগম সায়েব।'
'দেখি কী কাপড়।'
রাবেয়া গম্ভীর হয়ে কাপড় দেখত, 'ভালো কাপড়।'
'ছাপটা বালা?'
'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো ছাপ।'
রাবেয়াটা বেশ পাগলাটে। ছোট বয়স থেকেই।

৩

'ও! ইনি আবিদ হোসেন।'

রাবেয়া হাসিমুখে বলল। চকোলেটের প্যাকেট পেয়ে সে খুব খুশি হয়েছে।

'কোথায় দেখা হয়েছে তাঁর সাথে?'

'বাসায় এসেছিলেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ হল। ছোটবেলা তোকে নাকি লিফ্‌ট্ দিতেন গাড়িতে?'

'হ্যাঁ। স্কুলটা অনেক দূরে পড়ে গিয়েছিল। যাওয়ার সময় বাবা সঙ্গে যেতেন, আসবার সময় প্রায়ই এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ত। আমাদের দু' জনের মধ্যে খুব খাতির হয়েছিল। দাঁড়া, সবটা বলি। চা বানিয়ে আনি আগে।'

ঘরে আলো জ্বলছিল না। বাইরে ভীষণ দুর্যোগ। অল্প একটু ঝড়-বাদলা হলেই এখানকার কারেন্ট চলে যায়। ঘরে যে একটিমাত্র হ্যারিকেন ছিল, সেটি জ্বালিয়ে লুডু খেলা হচ্ছে। বাবাও খেলছেন বেশ সাড়াশব্দ করেই। রুনুর গলা সবচেয়ে উঁচুতে।

'সে কি বাবা, তোমার চার হয়েছে, পাঁচ চাললে যে?'

'পাঁচই তো উঠল।'

'হুঁ, আমার বুঝি চোখ নাই। এবার থেকে তোমার দান আমি মেরে দেব।'

অন্ধকার ঘরে বসে বৃষ্টি পড়া দেখছি। দেখতে দেখতে বর্ষা এসে গেল। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামছে। টিনের চালে বাজনার মতো বৃষ্টি, অপূর্ব লাগে। রাবেয়া চা নিয়ে খাটে উঠে এল। দু' জনে চাদর গায়ে মুখোমুখি বসলাম। রাবেয়া বলল 'গোড়া থেকে বলি?'

'বল।'

'থ্রিতে পড়ি তখন। মর্নিং স্কুল। এগারোটায় ছুটি হয়ে গেছে। আমি আর উকিল সাহেবের মেয়ে রাহেলা বাসায় ফিরছি, এমন সময় ঐ ভদ্রলোক কী মনে করে লম্বা পা ফেলে আমাদের কাছে এলেন। আমাকে বললেন, তোমরা কোথায় যাবে? চল তোমাদের পৌছে দিই। গাড়ি আছে আমার। ঐ দেখ, দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

রাহেলা বলল, 'আমরা হেঁটে যেতে পারব।'

'না-না, হেঁটে যাবে কেন? এস এস. গাড়িতে এস। মিষ্টি খাবে তোমরা? নিশ্চয়ই খাবে। কি বল?'

ভদ্রলোক আমাদের দিকে না তাকিয়ে ড্রাইভারকে বললেন, 'তুমি নেমে যাও, একটা রিকশা করে জিনিসগুলি নিয়ে যাও, আমি বাচ্চাদের নিয়ে একটু ঘুরে আসি।'

আমরা কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। গাড়িতে চড়ার লোভ ষোল-আনা আছে। আবার ভয়-ভয়ও করছে। রাহেলা ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল, 'ও কে রে ভাই?'

আমি মিথ্যা করে বললাম, 'আমাদের এক জন চেনা লোক, চল বেড়িয়ে আসি।'

রাহেলা বলল, 'ছেলেধরা না তো?'

তখন চারদিকে খুব ছেলেধরার কথা শোনা যেত। ছেলেধরারা নাকি ছেলেমেয়ে ধরে নিয়ে হোটেলে বিক্রি করে দেয়। সেখানে মানুষের মাংস রান্না হয়। কে আবার মাংস খেতে গিয়ে একটি বাচ্চা মেয়ের কড়ে আঙুল পেয়েছে। এই জাতীয় গল্প। রাহেলার কথা শুনে ভয় পেলেও হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছি, 'ছেলেধরা এমন হয় বুঝি?' ভদ্রলোক গাড়ির দরজা খুলে আমাদের ডাকলেন। উঠে বসলাম দু' জনেই।

মিষ্টির দোকান দেখে তো আমি হতভম্ব। মেঝেতে কার্পেট, দেয়ালে দেয়ালে ছোট ছোট লম্বা মাদুরে অদ্ভুত সব ছবি, টেবিলগুলির চারপাশে ধবধবে প্লাস্টিকের চেয়ার, প্রতিটি টেবিলে সবুজ কাঁচের ফুলদানিতে টাটকা ফুল। ঘরের মাঝখানটায় কাঁচের জারে রং-বেরংয়ের মাছ। রাহেলা পাংশু মুখে বলল, 'আমার বড় ভয় করছে ভাই।'

'বল খুকিরা, কী খাবে? কোনো লজ্জা নেই, যত ইচ্ছে, আর যা খুশি। আমি নিজে মিষ্টি খাই না। তোমরা খাও।'

ভদ্রলোক হড়বড়িয়ে কথা বলতে বলতে সিগারেট ধরালেন। রাহেলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কী নাম খুকি?'

'রাহেলা।' পাংশু মুখে বলল রাহেলা।

'খাও খাও, লজ্জা করো না।'

রাহেলা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, 'আমার ভয় করছে, আমি বাসায় যাব।'

অল্প দিনেই ভয় ভেঙে গেল আমাদের। ভদ্রলোকের সঙ্গে রোজ দেখা হতে লাগল। তিনি যেন গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন আমাদের জন্যেই। দেখা হলেই বলতেন, 'গাড়িতে করে বেড়াতে ইচ্ছে হয় খুকি? ড্রাইভার, মেয়ে দু'টিকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আস।'

শুধু রাহেলাই নয়, মাঝে মাঝে অন্য মেয়েরাও থাকত। তারা বলত, 'রাবেয়া, কেউ যদি দেখে ফেলে, তবে?'

এর মধ্যে আমি অসুখে পড়লাম। এক মাসের মতো স্কুল কামাই। হাড় জিরজিরে রোগা হয়ে গেছি। পায়ের উপর দাঁড়াতে পারি না এমন অবস্থা, মাথার সব চুল পড়ে গেছে, আঙুল ফুলে গেছে। অফিস থেকে ফিরেই বাবা আমাকে কোলে নিয়ে বেড়াতেন। এক দিন এমন বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ দেখি ঐ লোকটি গট্‌গট্‌ করে এসে ঢুকছে গেট দিয়ে, মুখে সিগারেট, ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়ছে। বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'কী চান আপনি?'

'মেয়েটির অসুখ করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী অসুখ?'

'লিভার ট্রাবল।'

'আপনি যদি বলেন তবে আমি এক জন বড়ো ডাক্তার পাঠাতে পারি, আমার এক জন বন্ধু আছেন।'

বাবা একটু রেগে বললেন, 'মেয়েকে বড়ো ডাক্তার দেখাব না টাকার অভাবে, এই ভেবেছেন আপনি?'

ভদ্রলোক বললেন, 'কাকে দেখিয়েছেন, আপনি যদি দয়া করে--'

'শরাফত আলিকে।'

ভদ্রলোক খুশি হয়ে গেলেন। 'আমি শরাফতের কথাই বলছিলাম।'

বাবা বললেন, 'আপনি চলে যান। কেন এসেছেন এখানে?'

'না, মানে--'

'আর আসবেন না।'

ভদ্রলোক খুব দ্রুত চলে গেলেন। কথাবার্তা শুনে মা বেরিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে? কার সঙ্গে কথা বলছিলে?'

'আবিদ হোসেন এসেছিল।'

যদিও আমি তখন খুব ছোট, তবু বাবা-মা দু' জনের ভাবভঙ্গি দেখেই আঁচ করেছিলাম এই লোকটি তাঁদের চেনা এবং দু' জনের কেউই চান না সে আসুক।

তারপর আর দেখি নি তাঁকে। এই এত দিন পরে আবার এসেছেন চকোলেট নিয়ে।'

'লোকটি কে রে রাবেয়া?'

রাবেয়া জবাব দেবার আগেই বাবা ঢুকলেন, 'ভাত দিয়ে যাও মা। সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ি।'

'আগে চকোলেট খাও বাবা। এই নাও।'

'কে এনেছে চকোলেট, খোকা তুই নাকি?'

'না বাবা, আবিদ হোসেন এনেছেন।'

বাবা একটু অবাক হয়ে বললেন, 'দেশে ফিরেছে জানি না তো। এক জার্মান মেয়েকে বিয়ে করেছিল শুনেছিলাম। সেখানেই নাকি থাকবে!'

আমি বললাম, 'আবিদ হোসেন কে বাবা?'

'আমার এক জন বন্ধুমানুষ। রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার, খুব ভালো সেতার বাজাতে জানে।'

সকাল সকাল খাওয়া সারা হল। একটিমাত্র হ্যারিকেনে চারদিক ভৌতিক লাগছে। আমাদের বড়ো বড়ো ছায়া পড়েছে দেয়ালে। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। ঝড় উঠেছে হয়তো, শোঁ শোঁ আওয়াজ দিচ্ছে। মন্টু বলল, 'বাবা, গল্প বলেন।'

'কিসের গল্প, ভূতের?'

নিনু বলল, 'না, আমি ভয় পাচ্ছি, হাসির গল্প বলেন।'

বাবা বললেন, 'রাবেয়া, তুই একটা হাসির গল্প বল।'

রাবেয়ার হাসির গল্পটা তেমন জমল না। বাবা অবশ্যি অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন।

রুনু বলল, 'মনে পড়ে আপা, মা এক দিন এক কানা সাহেবের গল্প বলেছিল? সেদিনও এমন ঝড়-বৃষ্টি।'

'কোন গল্পটার কথা বলছিস?'

'ঐ যে, সাহেব বাজারে গেছে গুড় কিনতে।'

'মনে নেই তো গল্পটা, বল তো!'

রুনু চোখ বড়ো বড়ো করে গল্প বলে চলল। রুনুটা অবিকল মায়ের চেহারা পেয়েছে। এই বয়সে হয়তো মা দেখতে এমনিই ছিলেন। কেমন অবাক লাগে--একদিন মা যে-গল্প করে গেছেন, সেই গল্পই তাঁর এক মেয়ে করছে। পরিবেশ বদল হয় নি একটুও, সেদিন ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল, আজও হচ্ছে।

গল্প শেষ হতেই বাবা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। টানা গলায় বললেন, 'শুয়ে পড় সবাই।'

শুয়ে শুয়ে আমার কেবলই মায়ের কথা মনে পড়তে লাগল, বেশ কিছুদিন আগেও এক দিন এরকম মনে পড়েছিল। সেকেণ্ড ইয়ারের ক্লাস নিচ্ছি, হঠাৎ দেখি বারান্দায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন গল্প করছে। দেখামাত্র ধক্ করে উঠল বুকের ভেতর। অবিকল মায়ের মতো চেহারা। তেমনি দাঁড়াবার ভঙ্গি, বিরক্তিতে কুঁচকে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরা। আমি এত বেশি বিচলিত হলাম যে, ক্লাসে কী বলছি নিজেই বুঝতে পারছিলাম না। ক্লাস শেষ হলেই মেয়েটি সঙ্গে আলাপ করব, এই ভেবে প্রাণপণে ক্লাসে মন দিতে চেষ্টা করলাম। ক্লাস একসময় শেষ হল, মেয়েটিকে খুঁজে পেলাম না। সেদিনও সমস্তক্ষণ মায়ের কথা ভেবেছিলাম। সে-রাতে অনেক দিন পর স্বপ্ন দেখলাম মাকে। মা ছোট্ট খুকি হয়ে গেছেন। ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঘরময়। আমি বলছি, 'মা আপনি এত হৈচৈ করবেন না, আমি ঘুমুচ্ছি।'

মা বললেন, 'বা রে, আমি বুঝি এক্কা-দোক্কাও খেলব না?'

'খেলুন, তবে শব্দ করে নয়।'

'তুই খেলবি আমার সঙ্গে খোকা?'

'না, আমি কত বড়ো হয়েছি দেখছেন না? আমার বুঝি এসব খেলতে আছে?'

খুব অবাক হয়েছিলাম স্বপ্নটা দেখে। এমন অবাস্তব স্বপ্নও দেখে মানুষ!

মায়ের চারদিকের রহস্যের মতো স্বপ্নটাও ছিল রহস্যময়। চারদিকে রহস্যের আবরণ তুলে তিনি আজীবন আমাদের চেয়ে আলাদা হয়ে ছিলেন। শুধু কি তিনিই?

তাঁর পরিবারের অন্য মানুষগুলিও ছিল ভিন্ন জগতের মানুষ, অন্তত আমাদের কাছে।

মাঝে–মাঝে বড়ো মামা আসতেন বাসায়। বাবা তটস্থ হয়ে থাকতেন সারাক্ষণ। দৌড়ে মিষ্টি আনতে যেতেন। রাবেয়া গলদঘর্ম হয়ে চা করত, নিমকি ভাজত। বড় মামা সিকি কাপ চা আর আধখানা নিমকি খেতেন। যতক্ষণ থাকতেন, অনবরত পা নাচাতেন আর সিগারেট ফুঁকতেন। আমাদের দিকে কখনো মুখ তুলে তাকিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। বাবা অবশ্যি এক এক করে আমাদের নিয়ে যেতেন তাঁর সামনে। আমরা নিজেদের নাম বলে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। মামা ভীষণ অবাক হয়ে বলতেন, 'এরা সবাই শিরিনের ছেলেমেয়ে? কী আশ্চর্য!' আশ্চর্যটা যে কী কারণে, তা বুঝতে না পেরে আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতাম। মামা রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে বলতেন, 'বুঝলেন আজহার সাহেব, শিরিন ছোটবেলায় মোটেই ছেলেমেয়ে দেখতে পারত না। আর তারই কিনা এতগুলি ছেলেমেয়ে!'

'এই যে, এইটিই কি বড়ো ছেলে?'

মামা আঙুল ধরে রাখতেন আমার দিকে। আমি ঘাড় নাড়তাম।

মামা বলতেন, 'কী পড়া হয়?'

'নাইনে পড়ি।'

বাবা অতিরিক্ত রকমের খুশি হয়ে বলতেন, 'খোকা এইটের বৃত্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। জ্বর নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল। স্কুল থেকে একটা মেডেল দিয়েছে। গোল্ড মেডেল। রাবেয়া, যাও তো মা, মেডেলটা তোমার মামাকে দেখাও। ছোট ট্রাঙ্কে আছে।'

ব্লেডের মতো পাতলা মেডেলটা মামা ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখতেন। আবেগশূন্য গলায় বলতেন, 'শিরিনের মতো মেধাবী হয়েছে ছেলে। শিরিন মেট্রিকুলেশনে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছিল।'

বলতে বলতে মামা গম্ভীর হয়ে যান। অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলেন, 'আমাদের পরিবারটাই ছিল অন্য ধরনের। হাসিখুশি পরিবার। বাড়ির নাম ছিল 'কারা কানন'। দেয়ালের আড়ালে ফুলের বাগান। শিরিন নিজেই দিয়েছিল নাম।'

মা আসতেন আরো কিছু পরে। খুব কম সময় থাকতেন। আমরা বেরিয়ে আসতাম সবাই। একসময় দেখতাম মুখ কালো করে মামা উঠে যেতেন। মা শুয়ে শুয়ে কাঁদতেন সারা দুপুর। আমরা মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াতাম। কিছুই ভালো লাগত না। সেই অল্পবয়সেই মাকে কি গভীর ভালোই না বেসেছিলাম! অথচ তিনি ছিলেন খুবই নিরাসক্ত ধরনের। কথাবার্তা বলতেন কম। নিঃশব্দে হাঁটতেন। নিচু গলায় কথা বলতেন। মাঝে মাঝে মনে হ'ত, বড়ো রকমের হতাশায় ডুবে গেছেন। তখন সময় কাটাতেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে। প্রয়োজনের কথাটিও বলতেন না। ঘরের কাজ রাবেয়া আর একটা ঠিকে ঝি মিলে করত। বিষণ্নতায় ডুবে যেত সারা বাড়ি।

বাবা অফিস থেকে এসে চুপচাপ বসে থাকতেন বারান্দায়। রাবেয়া চা এনে দিত। বাবা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলতেন, 'তোর মাকে দিয়েছিস?'

'না, মা খাবে না।'

'আহা, দিয়েই দেখ না।'

'ভাতই খায় নি দুপুরে।'

'অ।'

রুনু–ঝুনু সকাল সকাল বই নিয়ে বসত। গলার সমস্ত জোর দিয়ে পড়ত দু' জনে। বাবা কিছুক্ষণ বসতেন তাদের কাছে, আবার যেতেন রান্নাঘরে রাবেয়ার কাছে। কিছুক্ষণ পরই আবার উঠে আসতেন আমার কাছে। ইতস্তত করে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার উত্থাপন করতেন, 'খোকা, তোদের কলেজে মেয়ে–প্রফেসর আছে?'

'আছে।'

'বিয়ে হয়েছে নাকি?'

'হয়েছে কারো কারো।'

'সবগুলির নিশ্চয়ই হয় নি। কলেজের মেয়ে–প্রফেসরদের বিয়ে হয় না।'

কিংবা হয়তো জিজ্ঞেস করেন, 'তোর কোনো দিন রাতের বেলা পানির পিপাসা পায়?'

'পায় মাঝে মাঝে।

'কী করিস তখন?'

'পানি খাই। আর কী করব?'

'খালি পেটে পানি খেতে নেই, এর পর থেকে বিস্কুট এনে রাখবি। আধখান খেয়ে এক ঢোক পানি খাবি, বুঝলি তো?'

'বুঝেছি।'

কথা বলবার জন্যেই কথা বলা। মাঝে মাঝে মার উপর বিরক্ত লাগত। 'কেন, আমরা কী দোষ করেছি? এমন করবেন কেন আমাদের সাথে?'

অবশ্যি বিপরীত ব্যাপারও হয়! অদ্ভুত প্রসন্নতায় মা ভরে ওঠেন। বেছে বেছে শাড়ি পরেন। লম্বা বেণী করে চুল বাঁধেন। মন্টু অবাক হয়ে বলে, 'মা, তোমাকে অন্য বাড়ির মেয়ের মতো লাগছে।'

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেব, 'কী বললি মন্টু?'

'বললাম, তোমাকে অন্যরকম লাগছে। তুমি যেন বেড়াতে এসেছ আমাদের বাড়ি।'

রুনু বলে ওঠে, 'মন্টুটা বড়ো বোকা, তাই না মা?'

মা হেসে হেসে রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করেন, 'ও রাবেয়া, তোর গান ভালো লাগে?'

'হ্যাঁ মা, খুউব।'

'আমার বড়দাও ভারি গানপাগল ছিলেন। রোজ রাতে আমরা ছাদে বসে রেকর্ড বাজাতাম। চিন্ময়ের রবীন্দ্রসংগীত যা ভালোবাসত বড়দা!'

'মা, তুমিও তো গান জান। তোমার নাকি রেকর্ড আছে গানের?'

মা রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসেন, খুশি খুশি গলায় বলেন, 'স্কুলে যখন পড়ি, তখন রেকর্ড হয়েছিল। মেসবাহ্‌উদ্দিন ছিলেন তখন রেডিওর রিজিওনাল ডাইরেক্টর। তিনিই সব করিয়েছিলেন। এক পিঠে আমার, এক পিঠে পিনু হকের। পিনু হককে চিনিস না? এখন তো সিনেমায় খুব প্লেব্যাক গায়। খুব নাকি নামডাক। তখন এতটুকু মেয়ে, আমার চেয়েও ছোট।'

যদিও আমরা সবাই জানতাম, গানের একটা রেকর্ড আছে, তবু গানটি শুনি নি কেউ। পুরনো রেকর্ড বাজারে পাওয়া যেত না। নানার বাড়িতে যে-কপিটি আছে, সেটি আনার কথা কখনো মনে পড়ে নি। মা কিন্তু কোনো দিন গান গেয়ে শোনান নি, এমন কি ভুল করেও নয়।

মার প্রসন্ন দিনগুলির জন্যে আমরা আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। কি ভালোই না লাগত। বাবা নিজে তো মহাখুশি, কি যে করবেন ভেবেই যেন পাচ্ছেন না। অফিসের কোন কলিগ কি করেছে, তাই কমিক করে হাসাতেন আমাদের। বাবা খুব ভালো [illegible] করতে পারতেন। অফিসের ছোটবাবু কেমন করে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বড়ো বাবুর চেম্বারে হাজিরা দিতেন--তা এত সুন্দর দেখাতেন! হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তাম আমরা। মা বলতেন, 'আর নয়, পেট ব্যথা করছে আমার। ঝুনু চোখ বড়ো বড়ো করে বলত, 'রাবেয়া আপা, বাবা খুব ভালো জোকার, তাই না?'

রাবেয়া রেগে গিয়ে বলত, 'মারব থাপ্পড়। বাবাকে জোকার বলছে! দেখছ বাবা--মেয়ের কেমন ফিচলে বুদ্ধি হয়েছে?'

বাবা বলতেন, 'ঝুনুর আমার এই এতটা বুদ্ধি। যাও তো রুনু-ঝুনু, একটু নাচ দেখাও।'

কিটকির কাছে শেখা আনাড়ি নাচ নাচত দু' জনে। মা মুখে মুখে তবলার বোল দিতেন। বাবা বলতেন, 'বাহা রে বেটি, বাহা। কী সুন্দর শিখেছে, বাহ্‌ বাহ্‌! এবার মন্টু সোনা, একটি গান গাও।'

বলবার অপেক্ষামাত্র--মন্টু যেন তৈরি হয়েই ছিল, সঙ্গে সঙ্গে শুরু--

'কাবেরী নদীজলে...।' শুধু এই গানটির সে ছয় লাইন জানে।

ছয় লাইন শেষ হওয়ামাত্র বাবা বলতেন, 'ঘুরেফিরে ঘুরেফিরে।'

মন্টু ঘুরেফিরে একই কলি বার বার গাইত। ভালো গানের গলা ছিল। ছেলেমানুষ হিসেবে গলা অবশ্যি মোটা, চড়ায় উঠতে পারত না, তবে চমৎকার সুরজ্ঞান ছিল।

মাঝামাঝি সময়ে দেখা যেত রাবেয়া এক ফাঁকে চা বানিয়ে এনেছে। বিশেষ উপলক্ষ বলেই রুনু-ঝুনু-মন্টু আধ কাপ করে চা পেত সেদিন। সুখের সময়গুলি

খুব ছোট বলেই অসম্ভব আকর্ষণীয় ছিল। ফুরিয়ে যেত সহজেই, কিন্তু সৌরভ থাকত অনেক অ–নে–ক দিন।

ভাবতে ভাবতে রাত বেড়ে গেল। মানুষের চিন্তা যতই অসংলগ্ন মনে হোক, কিন্তু তলিয়ে দেখলে সমস্ত কিছুতেই বেশ একটা ভালো মিল দেখা যায়। বৃষ্টির রাতে গল্প বলা থেকে ভাবতে ভাবতে কোথায় চলে এসেছি। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। চারদিকে ভিজে আবহাওয়া, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বিদ্যুৎ–চমকানিতে ক্ষণিকের জন্য নীলাভ আলো ছড়িয়ে পড়ছে। গলা পর্যন্ত চাদর টেনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

'মা গো, এত ঘুমুতেও পারেন?'

কিটকি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

'কাল সারা রাত ঘুমান নি, না?'

'দেরিতে ঘুমিয়েছি। তুই যে এত সকালে? শাড়ি পরেছিস, চিনতে পারছি না মোটেই। রীতিমতো ভদ্রমহিলা।'

'আগে কী ছিলাম? ভদ্রলোক?'

'না, ছিলি ভদ্রবালিকা। বেশ লম্বা দেখাচ্ছে শাড়িতে, কত লম্বা তুই?'

'পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি।'

'বস, মুখ ধুয়ে আসি।'

কলঘরে যাওয়ার পথে রাবেয়ার সঙ্গে দেখা, চায়ের ট্রে নিয়ে যাচ্ছে ভেতরে।

'ও খোকা, কিটকি বেচারি কখন থেকে বসে আছে, ঘুম ভাঙে না তোর। রাতে কি চুরি করতে গিয়েছিলি?'

হাত–মুখ ধুয়ে এসে বসলাম কিটকির সামনে। সবুজ রঙের শাড়ি পরেছে। ঠোঁটে হালকা করে লিপিষ্টিক, কপালে জ্বলজ্বল করছে নীল রঙের টিপ। কিটকি বলল, 'বলুন তো, কী জন্যে এই সাত–সকালে এসেছি?'

'কোনো খবর আছে বোধ হয়?

'বলুন না, কী খবর?'

'দল বেঁধে পিকনিকে যাবি, তাই না?'

'কিছুটা ঠিক। আমরা ম্যানিলা যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'ম্যানিলা। পাঁচ বৎসরের চুক্তিতে আব্বা যাচ্ছেন এই ডিসেম্বরে। কী যে ভালো লাগছে আমার!'

খুশিতে ঝলমল করে উঠল কিটকি। বুকে ধক করে একটা ধাক্কা লাগল আমার।

'খুব খুশি লাগছে তোর?'

'হ্যাঁ, খুব।'

'আমাদের জন্যে খারাপ লাগবে না?'

'লাগবে না কেন, খুব লাগবে। আমি চিঠি লিখব সবাইকে।'

'কিটকি, দেখি তোর হাত।'

'হাত কি দেখবেন?'

ইতস্তত করে হাত বাড়িয়ে দেয় কিটকি। লাল টুকটুকে এতটুকু ছোট্ট হাত।

'হাত দেখতে জানেন আপনি? এত দিন বলেন নি তো? ভালো করে দেখবেন কিন্তু। সব বলতে হবে।'

কিটকির নরম কোমল হাতে হাত রেখে আমি আশ্চর্য যাতনায় ছটফট করতে থাকি।

'কী দেখলেন বলুন? বলুন না।'

'ও এমনি, আমি হাত দেখতে জানি না।'

'তবে যে দেখলেন?'

'কি জন্যে দেখলাম, বুঝতে পারিস নি? তুই তো ভারি বোকা।'

কিটকি হাসিমুখে বলল, 'বুঝতে পারছি।'

'কী বুঝতে পারলি?'

'বুঝতে পারছি যে, আপনিও বেশ বোকা।'

কিটকিরা ডিসেম্বরের ন' তারিখে চলে গেল। এ্যারোড্রামে অনেক লোক হয়েছিল। রাবেয়াকে নিয়ে আমিও গিয়েছিলাম সেখানে। কিটকির যে এত বন্ধু আছে, তা জানতাম না। হেসে হেসে সবার সঙ্গেই সে কথা বলল। কিটকিকে মনে হচ্ছিল একটি সবুজ পরী। সবুজ শাড়ি, সবুজ জুতো, সবুজ ফিতে—এমন কি কাঁধের মস্ত ব্যাগটাও সবুজ।

রাবেয়াকে বললাম, 'কিটকিকে কী সুন্দর মানিয়েছে, দেখেছিস? তুই এমন মিল করে সাজ করিস না কেন?'

'সাজ দেখে যদি তোর মতো কোনো পুরুষ—হৃদয় ভেঙে যায়, সেই ভয়ে।'

খালা লাউঞ্জের এক কোণায় বসে ছিলেন। ইশারায় কাছে ডাকলেন।

'চললাম রে তোদের ছেড়ে।'

'ফিরবেন কবে?'

'কে জানে কবে! কর্তার মর্জি হলেই ফিরব। পাঁচ বছরের মেয়াদ। কিরে রাবেয়া, হাসছিস কী দেখে?'

রাবেয়া হাত তুলে দেখাল, এক মেমসাহেব তার বাচ্চা ছেলেটিকে নিয়ে বিষম বিব্রত হয়ে পড়েছেন। বাচ্চাটা দমাদম ঘুষি মারছে মাকে। কিছুতেই শান্ত করান যাচ্ছে না।

সবাই হাসিমুখে দেখছে ব্যাপারটা। খালা বললেন, 'তুই তো বড়ো ছেলেমানুষ রাবেয়া। বয়স কত হল তোর? আমি যখন সেভেনে পড়ি, তখন তোর জন্ম হল। তার মানে--সে কি! তোর যে ত্রিশ পেরিয়েছে! কী ব্যাপার? বুড়ি হয়ে গেলি যে, বিয়ে এখনো হল না? কি মুশকিল!'

রাবেয়া স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি চোখ তুলে রাবেয়ার দিকে তাকাতে পারছিলাম না। এমন অবিবেচকের মতো কথা বুঝি শুধু মেয়েদের পক্ষেই বলা সম্ভব। রাবেয়ার চোখ চক্‌চক্‌ করছে, কে জানে কেঁদে ফেলবে কিনা। আমি হাত ধরলাম রাবেয়ার।

'আমরা যাই খালা, খালুজান কোথায়?'

'বুকিং-এ কী যেন আলাপ করছেন।'

'তাঁকে সালাম দিয়ে দেবেন। খোদা হাফেজ।'

কিটকির সঙ্গে গেটে দেখা, তার এক বান্ধবীর সঙ্গে হো হো করে হাসছিল, 'যাই কিটকি।'

'সে কি? প্লেন ছাড়তে এখনো চল্লিশ মিনিট।'

'না রে--একটু সকাল সকাল যেতে হবে, কাজ আছে।'

'রাবেয়া আপা এমন মুখ কালো করে রেখেছেন কেন?'

রাবেয়া থতমত খেয়ে বলল, 'তুই চলে যাচ্ছিস, তাই। চিঠি দিবি তো?'

রাবেয়া আমার ছ' বছরের বড়ো। এ বছর একত্রিশে পড়েছে। অথচ কি বাচ্চা মেয়ের মতো হাত ধরে আসছে আমার পিছে পিছে। মাথায় আবার মস্ত ঘোমটাও দিয়েছে। রিক্সায় উঠে জড়সড় হয়ে বসে রইল সে।

'রাবেয়া, চুপ করে আছিস যে?'

'তুই নিজেও তো চুপ করে আছিস।'

'তুই মুখ কালো করে রাখলে বড়ো খারাপ লাগে। তুই কি মনে কষ্ট পেয়েছিস?'

রাবেয়া ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'আমি কখনো কারো কথায় কষ্ট পাই না। আজ খালার কথা শুনে বড়ো খারাপ লাগছে।'

নির্জন রাস্তায় রিক্সা দ্রুত চলছে। রিক্সার দুলুনিতে রাবেয়াটা কাঁপছে অল্প অল্প। মাথায় গন্ধ তেল দিয়েছে বুঝি, তার মৃদু সুবাস পাচ্ছি। রাস্তায় কী ধুলো! রাবেয়ার বাঁ হাত অবসন্নভাবে পড়ে আছে আমার কোলে।

'খালার কথা এখনো মনে গেঁথে রেখেছিস, খালার কি মাথার ঠিক আছে?'

'না, তা নয়। যাই হোক--বাদ দে, অন্য কথা বল।'

'কী কথা?'

'কিটকির জন্য তোর খারাপ লাগছে?'

'তা লাগছে। যতটা ভাবছিস ততটা নয়।'

রাবেয়া অল্প হেসে চুপ করল। তার যে এতটা বয়স হয়েছে, মনেই হয় না। ঐ তো সেদিন যেন কারা দেখতে এল। বুড়ো ভদ্রলোক মাথা দুলিয়ে বললেন, 'মেয়ে আপনার ভালো, লক্ষ্মী মেয়ে, দেখেই বুঝেছি। বয়সও বেশি নয়, তবে কিনা আজকালকার আধুনিক ছেলে, তাদের কাছে রূপ মানেই হলো ধবধবে ফর্সা।' বলেই ভদ্রলোক হায়নার মতো হে হে করে হাসতে লাগলেন।

'গান জান মা?' কোনো বাজনা? এই ধর গিটার-ফিটার? আজকাল আবার এসবের খুব কদর।'

'জ্বি না, জানি না।'

এবার বরের এক বন্ধু এগিয়ে এলেন।

'আপনি কি মডার্ণ লিটারেচার কিছু পড়েছেন?'

'না, পড়ি নি।'

'ইবসেনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন?'

'জ্বি না, শুনি নি।'

বিয়ে ভেঙে গেল। আরো একবার সব কিছু ঠিকঠাক। ছেলেটিও ভালো, অথচ রাবেয়াই বেঁকে বসল।

'ও ছেলে বিয়ে করব না।'

'কেন বল তো? ছেলে দেখে পছন্দ হচ্ছে না?'

'না-না, পছন্দ হবে না কেন, বেশ ভালো ছেলে।'

'তবে! বেতন কম পাচ্ছে বলে?'

'ছিঃ, সে-জন্যে কেন হবে? আর বেতন কমই-বা কি?'

'ঠিক করে বল তো, অন্য কোনো ছেলেকে ভালো লাগে?'

'গাধা! সিনেমা দেখে দেখে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'কী জন্যে বিয়ে করবি না, বল।

'ছেলেটা বড় বাচ্চা। বয়সে ওর দেড় গুণ বড়ো আমি। আমার ভীষণ লজ্জা করছে। তাছাড়া একটা কথা তোকে বলি খোকা--'

'বল।'

'বিয়ে-টিয়ে করতে আমার একটুও ইচ্ছে হয় না। ওটা একটা বাজে ব্যাপার। অজানা-অচেনা একটা ছেলের সঙ্গে শুয়ে থাকা, ছিঃ।'

রিক্সা দ্রুত চলছে। রাবেয়া চুপ করে বসে। রোদের লালচে আঁচে রাবেয়ার মুখটাও লালচে হয়ে উঠেছে। কী ভাবছে সে কে বলবে।

৪

রুনু টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে কী যেন একটা লিখছিল। আমাকে দেখেই হকচকিয়ে উঠে দাঁড়াল। *লেখা কাগজটা সন্তর্পণে আড়াল করে বলল, 'কি দাদা?'*

'কোথায় কি? কী করছিলি?'

রুনু টেনে টেনে বলল, 'অঙ্ক করছিলাম।' বলতে গিয়ে যেন কথা বেধে গেল মুখে। একটু বিস্মিত হয়েই বেরিয়ে এলাম। রুনু কি কাউকে ভালোবাসার কথা লিখছে? বিচিত্র কিছু নয়। ওর যা স্বভাব, অকারণেই একে-ওকে চিঠি লিখে ফেলতে বাধবে না। রুনু-ঝুনু দু' জনেই মস্ত বড়ো হয়েছে। আগের চেহারার কিছুই অবশিষ্ট নেই। স্বভাবও বদলেছে কিছুটা। দু' জনেই অকাতরে হাসে। সারা দিন ধরেই হাসির শব্দ শুনি। কিছু-না-কিছু নিয়ে খিলখিল লেগেই আছে।

'ও মাগো, ঝুনুকে এই শাড়িতে কাজের বেটির মতো লাগছে! হি হি হি!'

'ও রুনু, দেখ দেখ, রাবেয়া আপা কী করছে, হি হি হি।'

'আপা শোন, আজ সকালে কি হয়েছে, আমি--হি হি হি, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি--হি হি হি---'

আবার অতি সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া। মুখ দেখাদেখি বন্ধ। কিছুক্ষণের ভেতর আবার মিটমাট। লুকিয়ে লুকিয়ে ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখা। সাজগোজের দিকে প্রচণ্ড নজর। সব মিলিয়ে বেশ একটা দ্রুত পরিবর্তন। আগের যে রুনু-ঝুনুকে চিনতাম, এরা যেন সেই রুনু-ঝুনু নয়। বিশেষ করে সেই গোপন চিঠিলেখার ভঙ্গিটা খট করে চোখে লাগে।

রাবেয়া মোড়ায় বসে সোয়েটার সেলাই করছিল। তাকে বললাম, 'আচ্ছা, কোনো ছেলের সঙ্গে কি রুনুর চেনাজানা হয়েছে নাকি?'

রাবেয়া কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'কিটকির কথা রাত-দিন ভেবে ভেবে তোর এমন হয়েছে। কিটকির চিঠি পাস নি নাকি?'

'না, আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। শরীফ সাহেবের ছেলেটা দেখি প্রায়ই আসে, মনসুর বোধ হয় নাম।'

'আসে আসুক না। যখন ন্যাংটা থাকত, তখন থেকে এ বাড়িতে এসে খেলেছে রুনু-ঝুনুর সঙ্গে।'

'যখন খেলেছে তখন খেলেছে। এখন রুনু-ঝুনুও বড়ো হয়েছে, ও নিজেও বড়ো হয়েছে।'

'কি বাজে ব্যাপার নিয়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করছিস! বেশ তো, যদি ভালোবাসাবাসি হয়, বিয়ে হবে। মনসুর চমৎকার ছেলে। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে কোথায় যেন চাকরিও পেয়েছে।'

এক কথায় সমস্যার সমাধান করে রাবেয়া সেলাই-এ মন দিল।

মন্টুটারও ভীষণ পরিবর্তন হয়েছে। মস্ত জোয়ান। পড়াশোনায় তেমন মন নেই। প্রায়ই অনেক রাতে বাড়ি ফেরে। কি এক কায়দা বের করেছে, বাইরে থেকেই টুকুস করে বন্ধ দরজা খুলে ফেলে।

পত্রিকায় নাকি মাঝে মাঝে তার কবিতা ছাপা হয়। যেদিন ছাপা হয়, সেদিন লজ্জায় মুখ তুলে তাকায় না। যেন মস্ত অপরাধ করে ফেলেছে এমন হাব-ভাব। চমৎকার গানের গলা হয়েছে। গানের মাষ্টার রেখে শেখালে হয়তো ভালো গাইয়ে হ'ত। মাঝে মাঝে আপন মনে গায়। কোনো কোনো দিন নিজেই অনুরোধ করি, 'মন্টু একটা গান কর তো।'

'কোনটা?'

'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে।'

'রবীন্দ্রসংগীত না, একটা আধুনিক গাই, শোন।'

'বাতি নিবিয়ে দে, অন্ধকারে গান জমবে।'

বাতি নিবিয়ে গান গাওয়া হয়। এবং গানের গলা শুনলেই বাবা টুকটুক করে হাজির। বাবার শরীর ভীষণ দুর্বল হয়েছে। হাঁপানি, বাত--সব একসঙ্গে চেপে ধরেছে। বিকেলবেলায় একটু হাঁটেন, বাকি সময় বসে বসে কাটে। রাবেয়া রাত আটটা বাজতেই গরম তেল এনে বুকে মালিশ করে দেয়। তখন বাবা বিড়বিড় করে আপন মনে কথা বলেন। রাবেয়া বলে, 'একা একা কী বলছেন বাবা?'

'না মা, কিছু বলছি না, কী আর বলব।'

'একটু আরাম হয়েছে?'

'হবে না কেন মা? তোর মতো মেয়ে যার আছে, তার হাজার দুঃখ-কষ্ট থাকলেও কিছু হয় না। লক্ষ্মী মা আমার। আমার সোনার মা।'

'আহ্ বাবা, কি বলেন, লজ্জা লাগে।

'তাহলে থাক। মনে মনে তোর গুণ গাই।'

'বাবা চুপ করেন।'

সবচেয়ে ছোট যে নিনু সেও দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে গেল। মার চেয়েও রূপসী হয়েছে সে। পাতলা ঠোঁট, একটু থ্যাবড়া নাক, বড়ো বড়ো ভাসা চোখ সব সময় ছল্‌ছল্‌ করছে। ঐ তো সেদিন হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াত। থ থ থ বলে আপন মনে গান করত, আর আজ একা একা স্কুলে যায়। সাবলীল গর্বিত হাঁটার ভঙ্গি। একটু পাগলাটে হয়েছে সে। স্কুল থেকে ফিরে এসেই বই-খাতা ছুঁড়ে ফেলে মেঝেতে, তারপর জাপটে ধরে রাবেয়াকে।

'ছাড় ছাড়, কি করিস? ছাড়।'

'না, ছাড়ব না।'

'কী বাজে অভ্যেস হয়েছে তোর!'

'হোক।'

'হাত–মুখ ধুয়ে চা খা।'
'পরে খাব, এখন তোমাকে ধরে রাখব।'
'বেশ থাক ধরে।'
'রাবেয়া আপা।'
'কি?'
'কোলে নাও।'
'এত বড়ো মেয়ে, কোলে নেব কি রে বোকা!'
'না–না, নিতেই হবে।'
তারপর দেখি নিনু রাবেয়ার কোলে উঠে লাজুক হাসি হাসছে। আমার সঙ্গেও বেশ ভাব হয়েছে তার। রাতের খাওয়া–দাওয়া হয়ে গেলে আমার বিছানায় উঠে এসে বালিশ নিয়ে কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে।
'কি হচ্ছে রে নিনু?'
'যুদ্ধ–যুদ্ধ খেলছি। দাদা।'
'কি?'
'গল্প বলবে কখন?'
'আরো পরে, এখন পড়াশোনা কর।'
'না, আমি পড়ব না, যুদ্ধ–যুদ্ধ খেলব।'
'বেশ খেল।'
'তুমি খেলবে, দাদা?'
'না।'
'আস না? এই বালিশটা তুমি নাও। হ্যাঁ, এবার মার তো দেখি আমাকে?'

রাবেয়ার আগের হাসিখুশি ভাব আর নেই। সারাক্ষণ দেখি একা একা থাকে। অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘরে বাতি জ্বলে। রাত জেগে সে কী করে কে জানে? রাবেয়াটার জন্যে ভারি কষ্ট হয়। বিয়ে করল না শেষ পর্যন্ত। মেঘে মেঘে বেলা তো আর কম হয় নি। আমি মনে–প্রাণে চাই তাকে হাসিখুশি রাখতে। মাঝে মাঝে বলি, 'রাবেয়া সিনেমা দেখবি?'
'না।'
'চল না, যাই সবাই মিলে। কত দিন ছবি দেখি না।'
'তুই যা রুনু–ঝুনুদের নিয়ে––কত কাজ ঘরের।'
'যা কাজ, রুনু–ঝুনুই করতে পারবে। আয়, তুই আর আমি দু' জনে যাই।'
'না রে, ইচ্ছে করছে না।'
'তাহলে চল, একটু বেড়িয়ে আসি।'
'কোথায়?'

'তুই যেখানে বলিস।'

'আজ থাক।'

আমি অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্ করি। রাবেয়ার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও লজ্জা হয়। যেন তার মানসিক দুঃখ–কষ্টের অনেকটা দায়ভাগ আমার।

এক দিন রাবেয়া নিজেই বলল, 'চল খোকা, বেড়িয়ে আসি।'

আমি খুশি হয়ে বললাম, 'চল, সারা দিন আজ ঘুরব। বল কোথায় কোথায় যাবি?'

'প্রথম যাব আমার এক বন্ধুর বাসায়। একটা রিক্সা নে।'

রিক্সা যে–বাড়ির সামনে থামল, তা দেখে চমকালাম। রাজপ্রাসাদ নাকি? বাড়ির সামনে কি প্রকাণ্ড ফুলের বাগান। আমি বললাম, 'রাবেয়া, তুই ঠিক জায়গায় এসেছিস তো? কার বাড়ি এটা?'

'আবিদ হোসেনের, ঐ যে ছোটবেলায় আমাকে গাড়িতে করে স্কুলে পৌঁছে দিত।'

'বাসা কী করে চিনলি?'

'এসেছিলাম তো তাঁর সঙ্গে বাসায়।'

আবিদ হোসেন বাসায় ছিলেন না। এক জন বিদেশিনী মহিলা খুব আন্তরিকভাবে আমাদের বসতে বললেন। কী দরকার, বারবার জিজ্ঞেস করলেন। চমৎকার বাংলা বলেন তিনি।

রাবেয়া বলল, 'কোনো প্রয়োজন নেই। এমনি বেড়াতে এসেছি। ছোটবেলায় তিনি আমার খুব বন্ধু ছিলেন।'

ভদ্রমহিলা কফি করে খাওয়ালেন। বেরিয়ে আসবার সময় মস্ত বড়ো বড়ো ক'টি গোলাপ তুলে তোড়া করে দিলেন রাবেয়ার হাতে। এক জন অপরিচিত বিদেশিনীর এমন ব্যবহার সত্যিই আশা করা যায় না।

রাবেয়া বেরিয়ে এসে বলল, 'চল খোকা, এই ফুলগুলি মার কবরে দিয়ে আসি। এই তিনটা দিবি তুই, বাকি তিনটা দেব আমি। আয় যাই।'

বেশ কেটে যাচ্ছে দিন। কিটকির চিঠি হঠাৎ মাঝে মাঝে এসে পড়ে। কেমন আছেন ভালো আছি গোছের। একঘেয়ে জীবনের মধ্যে এইটুকুই যেন ব্যতিক্রম। হঠাৎ করে এক দিন সবার একঘেয়েমী কেটে গেল। মনসুরের বাবা এক সন্ধ্যায় বেড়াতে এসে অনেক ভণিতার পর বাবাকে বললেন, 'আপনার মেয়ে রুনুকে যদি দেন আমাদের কাছে, বড়ো খুশি হই। মনসুরের নিজের খুব ইচ্ছা। মনসুরকে আপনি ছোটবেলা থেকেই দেখেছেন। চাকরিও পেয়েছে চিটাগাং স্টীল মিলে, নয় শ' টাকার মতো বেতন, কোয়ার্টার আছে। তা ছাড়া আপনার মেয়েরও মনে হয় কোনো অমত নেই।'

বাবা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। বারোই আশ্বিন বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। এক মিনিটে বদলে গেল সারাটা বাড়ি। বাবার সমস্ত অসুস্থতা কোথায় যে পালাল! বিয়ে নিয়ে এর সঙ্গে আলাপ করা, ওর কাছে যাওয়া, বাজারের হাল অবস্থা দেখা, মেয়েকে কী দিয়ে সাজিয়ে দেবেন সে সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া--এক মুহূর্ত বিশ্রাম রইল না তাঁর।

মন্টু তার বন্ধুদের নিয়ে এসে সারাক্ষণই হৈচৈ করছে। গেট কোথায় হবে, ইলেকট্রিকের বাল্বে সাজান হবে কি না, কার্ড কয়টি ছাপাতে হবে, নিমন্ত্রণের ভাষাটা কী রকম হবে, এ নিয়ে তার ব্যস্ততা প্রায় সীমাহীন। রাবেয়াকে নিয়ে আমি কেনাকাটা করতে প্রায় প্রতিদিনই বেরিয়ে যাই। ঝুনুটা সারাক্ষণ আহ্লাদী করে বেড়ায়। শীতের শুরুতে ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে এমনিতেই একটু উৎসবের ছোঁয়াচ থাকে, বিয়ের উৎসবটা যুক্ত হয়েছে তার সাথে।

রুনুর চাঞ্চল্য কমে গেছে। হৈচৈ করার স্বভাব মুছে গেছে একেবারে। সারা দিন শুয়ে শুয়ে গান শোনে। একটু যে কোথাও যাবে, আমাদের সঙ্গে কিংবা বাইরের বারান্দায় এসে বসবে--তাও নয়। দুপুরটা কাটায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে--বড় ভালো লাগে দেখে। যদি বলি, 'কিরে রুনু, বিয়ের আগেই বদলে গেছিস দেখি।'

'যাও দাদা, ভালো লাগে না।'

'তোর চিটাগাং-এর বাড়িতে বেড়াতে গেলে খাতির-যত্ন করবি তো?'

'না, করব না। তোমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখব।'

রুনুর চোখ জ্বলজ্বল করে। সারা শরীরে আসন্ন উৎসবের কী গভীর ছায়া। মনসুর দেখি প্রায়ই আসে। এক দিন সিনেমার টিকেট নিয়ে এল রুনু-ঝুনুর জন্যে। রুনু কিছুতে যাবে না। রুনু বলে, 'নিনুকে নিয়ে যাক।' নিনুও যাবে না, 'আমার জন্যে তো আনে নি। আমি কেন যাব?'

'এই বয়সেই পাকা পাকা কথা।'

এক দিন সে মনসুরের সঙ্গে হেসে হেসে সারা দুপুর গল্প করেছে, আজকে তার সাড়া পেলেই রুনু বন্দী হয়ে যায় নিজের ঘরে। রাবেয়া হেসে হেসে বলে, 'বেচারা বসে থাকতে থাকতে পায়ে ঝিঁঝি ধরিয়ে ফেলেছে, রুনু যা, বেচারাকে দর্শন দিয়ে আয়।'

'থাকুক বসে, আমি যাচ্ছি না।'

'কেন যাবি না?'

'রোজ রোজ বেহায়ার মতো আসবে, লজ্জা লাগে না বুঝি?'

ঝুনু আর নিনুকে নিয়ে গল্প করে বেচারা সময় কাটায়।

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন এসে পড়ল। বাবার দু' জন ফুফু এলেন, তাঁর চাচাত ভাইও ছেলে-মেয়ে নিয়ে এলেন। বাড়ি লোকজনে গমগম করতে লাগল। মন্টু

কোত্থেকে একটি রেকর্ড-প্লেয়ার এনেছে। সেখানে তারস্বরে রাত-দিন আধুনিক গান হচ্ছে। ফুফুর ছেলেমেয়ে ক'টির হল্লায় কান পাত যাচ্ছে না, আশেপাশের বাড়ির ছেলেমেয়েরাও যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। পাড়ার ছেলেরা নিজেরাই বাঁশ কেটে ম্যারাপ বাঁধার যোগাড় করছে। বেশ লাগছে। উৎসবের নেশা-ধরান আমেজ। কলেজ থেকে সাত দিনের ছুটি নিয়ে নিলাম।

তিন দিন পর বিয়ে। দম ফেলার ফুরসৎ নেই। দুপুরের ঘুম বিসর্জন দিয়ে কিসের যেন হিসেব কষছি। রাবেয়া পাশেই বসে। রুনু, ঝুনু আর ফুফুর দু' মেয়ে লুডু খেলছে বসে বসে। বাবা গেছেন নানার বাড়ি। নিনুটা এল এমন সময়। হাসিমুখে বলল, 'দাদা, তোমাকে ডাকে।'

'কে?'

'নতুন দুলাভাই ইঞ্জিনীয়ার সাহেব।'

রুনু লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। রাবেয়া বলে বসে, 'আহা, বেচারার আর তর সইছে না।' আমি স্যাণ্ডেল পায়ে নিচে নামি। বসার ঘরে মনসুর মুখ নিচু করে বসে। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

'কী ব্যাপার ভাই? কিছু বলবে?'

ঝুনু দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতে লাগল। মনসুর বলল, 'আপনি যদি একটু বাইরে আসেন, খুব জরুরী।'

আমি চমকে উঠলাম। কিছু কি হয়েছে এর মধ্যে?

'ঘরে না, আসেন ঐ চায়ের দোকানটায় বসি।'

মনুসুরের মুখ শুকনো। চোখের নিচে কালি পড়েছে। অপ্রকৃতস্থের মতো চাউনি। চায়ের দোকানে বসে সে কাশতে লাগল। আমি বললাম, 'কী ব্যাপার, খুলে বল।'

'এই চিঠিটা পড়েন একটু।'

গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। আধপাতার একটা চিঠি। সবুজ নামে একটি ছেলেকে লেখা। সবুজের সঙ্গে সে সিনেমায় যেতে পারবে না' বাসার সবাই সন্দেহ করবে। রুনুই লিখেছে মাস তিনেক আগে। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

'কই পেয়েছ এই চিঠি?'

'সবুজ কাল রাতে আমাকে দিয়ে গিয়েছে।'

'ও।'

কথা বলতে আমার সময় লাগল। আর বলবই-বা কী?

শুকনো গলায় বললাম, 'আমাকে কী করতে বল? বিয়ে ভেঙে দিতে চাও?'

'না--মানে এত আয়োজন, এত কিছু, মানে--'

'তুমি কি রুনুর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে চাও?'

'না-না, কী বলব আমি?'

'তবে?'

'আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে ঝুনুকে আমি বিয়ে করতে পারি।'

'সে কী করে হয়! সব করা হয়েছে রুনুর নামে। আজ হঠাৎ করে......'

'আপনি ভালো করে ভেবে দেখুন, তা হলে সব রক্ষা হয়।'

'সব দিক রক্ষার তেমন দরকার নেই। একটা মেয়ে একটা চিঠি লিখে ফেলেছে। এই বয়সে খুব অস্বাভাবিক নয় সেটা।'

'সবুজ আমাকে আরো বলেছে.......'

'কী বলেছে?'

'না, সে আমি আপনাকে বলতে পারব না।'

'সে তো মিথ্যা কথাও বলতে পারে।'

'আপনি বরঞ্চ ঝুনুর সঙ্গে......'

'না।'

'আমি তাহলে রুনুর সঙ্গে একটা কথা বলি।'

'না। রুনুকে আর কী বলবে? যা বলবার আমিই বলব।'

আমি রুনুর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। আসন্ন উৎসবের আনন্দ [illegible] চোখে–মুখে। সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে রুনুকেই দায়ী করা উচিত। কিন্তু কিছু[illegible] পারছি না। রুনুকে আমি বড়ো ভালোবাসি। এ ঘটনাটা তাকে এক্ষুণি জানান উচিত। কিন্তু কী করে বলব, ভেবে বুক ভেঙে গেল। রাবেয়াকেই জানালাম প্রথম। রাবেয়া প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল। শেষটায় কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে। রাবেয়া বড়ো শক্ত ধাঁচের মেয়ে, চোখে পানি দেখেছি খুব কম।

রাবেয়া বলল, 'তুই রুনুকে সমস্ত বল। ওকে নিয়ে বাইরে কোথাও বেড়াতে যা। বাবাকে আমি বলব।'

রুনুকে এক চাইনীজ রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলাম। ফ্যামিলি কেবিনে তার মুখোমুখি বসে আমার গভীর বেদনা বোধ হচ্ছিল। রুনুই প্রথম কথা বলল, 'দাদা, তুমি কি কিছু বলবে? না শেষ বারের মতো ভালো খাওয়াবে?'

'না রে, কিছু কথা আছে।'

'বুঝতে পারছি, তুমি কী বলবে।'

'বল ত?'

'তুমি কিটকির কথা কিছু বলবে, তাই না?'

'না। কিটকির কথা নয়। আচ্ছা রুনু ধর--তোর বিয়েটা যদি ভেঙে যায় কোনো কারণে? মনে কর বিয়েটা হল না।'

'এসব বলছ কেন দাদা, কী হয়েছে?'

'তুই সবুজ নামে কোনো ছেলেকে চিঠি লিখেছিলি?

রুনু বড়ো বড়ো চোখে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ধীরে ধীরে

বলল, 'হ্যাঁ, লিখেছিলাম। তার জন্য কিছু হয়েছে?'

'হ্যাঁ, মনসুর তোকে বিয়ে করতে চাইছে না।'

'কী বলে সে?'

'সে ঝুনুকে বিয়ে করতে রাজি।'

রুনু চেষ্টা করল খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে। কিন্তু মানুষের মন ভেঙে গেলে সে আর যাই পারুক, স্বাভাবিক হতে পারে না। খাবার নাড়াচাড়া করতে করতে রুনু সিনেমার কথা তুলল, কোন বন্ধু এক কবিকে বিয়ে করে রোজ রাতে এক গাদা আধুনিক কবিতা শুনছে, সেকথা খুব হেসে হেসে বলতে চেষ্ট করল, ঝুনু কেন যে এত মোটা হয়ে যাচ্ছে, এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল। এবং এক সময় 'খাবারটা এত ঝাল' বলে রুমাল বের করে চোখ মুছতে লাগল। আমি চুপ করে বসে রইলাম। রুনু ধরা গলায় বলল, 'দাদা, তুমি মন খারাপ করো না। তোমার মন খারাপ দেখলে আমি সত্যি কেঁদে ফেলব।'

আমি বললাম, 'কোথাও বেড়াতে যাবি রুনু?'

'কোথায়?'

'সীতাকুন্ড যাবি? চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে দূরের সমুদ্র খুব সুন্দর দেখা যায়।'

রুনু কাতর গলায় বলল, 'যাব দাদা, কবে নিয়ে যাবে?'

'চল, কালই যাই।'

'না, ঝুনুর বিয়ের পর চল।'

'ঝুনুর সঙ্গে এই ছেলের বিয়ে আমি হতে দেব না।'

'তুমি বুঝতে পারছ না দাদা--'

'খুব বুঝছি।'

'বিয়ে হলে ঝুনু খুশি হবে।'

'হোক খুশি, এই নিয়ে আমি আর কোনো কিছু বলতে চাই না রুনু।'

রুনুকে নিয়ে বের হয়ে এলাম। তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। রাতের নিয়ন আলো জ্বলে গেছে দোকানপাটে। ঝকঝক করছে আলো। রুনু খুব ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে লাগল। আমি তাকে কী আর বলি!

বারোই আশ্বিন ঝুনুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল মনসুরের।

বাবা আর রাবেয়ার প্রবল মতের সামনে টিকতে পারলাম না। ঝুনু বেশ অবাক হয়েছিল। তাকে কিছু বলা হয় নি, তবে সে যে আঁচ করতে পেরেছে--তা বোঝা যাচ্ছিল। ঝুনু যতটা আপত্তি করবে মনে করেছিলাম, ততটা করে নি দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়েছি। আত্মীয়স্বজনরা কী বুঝল কে জানে, বিশেষ উচ্চবাচ্য করল না। শুধু মন্টু বিয়ের আগের দিন বাসা ছেড়ে চলে গেল। তার নাকি কোথায় যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, বিয়ের পর ফিরবে। বাবা স্থবির আলস্যে ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে সিগারেট

টানতে লাগলেন।

বিয়েতে রুনুটা আহ্লাদ করল সবচেয়ে বেশি। গান গেয়ে গল্প বলে আসর জমিয়ে রাখল। তার জন্যে ফুফুর ফাজিল মেয়েটা পর্যন্ত ঢং করার সুযোগ পেল না। আসর ভাঙল অনেক রাতে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। মেয়েরা আড়ি পেতেছে বাসরঘরে। বরযাত্রীরা হৈচৈ করে করে তাস খেলছে। সারা দিনের পরিশ্রমে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সব ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে রুনুর ঘরে এসে দাঁড়ালাম। টেবিল ল্যাম্পে শেড দিয়ে রেখেছে। ঘরে আড়াআড়িভাবে একটা লম্বা ছায়া পড়েছে আমার। রুনুর মুখ দেখা যাচ্ছে না। এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা তার অবসন্ন শরীর চুপচাপ পড়ে আছে। আমি নিঃশব্দে বসলাম রুনুর পাশে। রুনু চমকে উঠে বলল, 'কে? ও, দাদা। কখন এসেছ? কী হয়েছে?'

'না, কিছু হয় নি। ভাবলাম তোর সঙ্গে একটু গল্প করি।'

রুনু অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে। হঠাৎ করেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, 'তোমার গা ছুঁয়ে বলছি দাদা, আমার একটুও খারাপ লাগছে না। আমি বেশ আছি।'

'সবুজকে বিয়ে করবি রুনু?'

'ন্-না। ছিঃ!'

'না কেন?'

'না-কক্ষনো না, ওটা একটা বদমাশ।'

'তবে যে চিঠি লিখেছিলি?'

'এমনি, তামাসা করতে, ও যে লিখত খালি খালি।'

'আয় রুনু, বাইরে হাঁটি একটু, দেখ কি জোছনা।'

রুনু জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সত্যি অপরূপ জোছনায় সব যেন ভেসে যাচ্ছে। চারদিক চিকচিক করছে নরম আলোয়। আপনাতেই মনের ভেতর একটা বিষণ্ণতা জমা হয়। আমি বললাম, 'এটা কী মাস বল তো রুনু।'

'অক্টোবর মাস।'

'বাংলা বল।'

'বাংলাটা জানি না। ফাল্গুন?'

'না, আশ্বিন। আশ্বিন মাসে সবচেয়ে সুন্দর জোছনা হয়। আয়, বাইরে গিয়ে দেখি।'

ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই মন জুড়িয়ে গেল। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে। ফুটফুটে জোছনা চারদিকে। সব কেমন যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়। বড়ো ভালো লাগে।

'ওটা কে দাদা? ঐ যে চেয়ারে বসে?'

তাকিয়ে দেখি কে যেন ইজিচেয়ারে মূর্তির মতো বসে আছে। একটা হাত অবসন্নভাবে ঝুলছে। অন্য হাতটি বুকের উপর রাখা। বসে থাকার সমস্ত ভঙ্গিটাই কেমন দীন–হীন, কেমন দুঃখী। আমি বললাম, 'ও হচ্ছে রাবেয়া। চিনতে পারছিস না?'

'না তো। চল, আপার কাছে যাই।'

'না, ও থাকুক একা একা। আয়, এদিকে আয়।'

রুনু হাঁটতে হাঁটতে আমার একটা হাত ধরল। ছোটবেলায় যেমন করত, তেমনিভাবে হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতে হাল্‌কা গলায় বলল, 'দাদা, তোমরা কি আমার ওপর বিরক্ত হয়েছ?'

'কেন?'

'চিঠি লিখেছি বলে?'

'তোর কী মনে হয়?'

রুনু কথা বলল না। চুপচাপ হাঁটতে থাকল। আমি বললাম, 'রুনু, ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে?'

'কোন কথা?'

'তুই যে এক দিন পালিয়েছিলি?'

'ও মনে আছে। ঝুনু একটা কাপ ভেঙে ফেলেছে। ভেঙেই দৌড়ে পালাল, আর আম্মা এসে আমার গালে ঠাস করে এক চড়।'

রুনু বলতে বলতে হাসতে লাগল। আমি বললাম, 'তারপর কি ঝামেলায় পড়লাম সবাই। তোর কোনো খোঁজ নেই। সকাল গেল, দুপুর গেল, সন্ধ্যা গিয়ে রাত, তবু তোর খবর নেই। বাসায় খাওয়াদাওয়া বন্ধ। বাবা সারা দিন খুঁজেছেন এখানে ওখানে। আড়ালে আড়ালে চোখের পানি ফেলেছেন। আমি থানায় খবর দিতে গেছি। মা কিন্তু বেশ স্বাভাবিক, যেন কিছুই হয় নি। আর ঝুনুটা করল কি, সন্ধ্যাবেলায় রাবেয়াকে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে সে কী কান্না। কোনোমতে বলল, 'আপা আমিই ভেঙেছি কাপটা, রুনু ভাঙে নি।'

'তোর সব মনে আছে রুনু?'

'খুব মনে আছে। আমি চুপচাপ বসে আছি ছাদে। তোমরা তো কেউ ছাদে খুঁজতে আস নি। সারা দিন একা একা বসেছিলাম। রাত হতেই ভূতের ভয়ে নেমে এসেছি।'

'তারপর কী হল বল তো রুনু?'

'আরেকটা চড় খেলাম।'

'চড়টা কে দিয়েছিল মনে আছে?'

'হ্যাঁ, তুমি।'

সশব্দে দু' জনে হেসে উঠলাম।

'কে? কে হাসছে?'

তাকিয়ে দেখি রাবেয়া টলতে টলতে আসছে।

'ও তোরা! বেশ ভয় পেয়েছি। হঠাৎ করে হাসলি। ধক করে উঠছে বুকটা।'

'বস রাবেয়া, গল্প করি।'

'না, ভোর হয়ে আসছে দেখছিস না। সবাই চা-টা খাবে। এত মানুষের ব্যাপার, আমি রান্নাঘরে যাই।'

'চল আপা, আমিও যাই।'

আমি একা একা বসে রইলাম।

ভোরের কাকের কা-কা শোনা যাচ্ছে। আকাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে।

বুঝতে পারছি মনের ভেতর জমে থাকা অবসাদ কেটে যাচ্ছে। ঠিক ভোর হবার মুহূর্তে মনের গ্লানি কেটে যায়। সুন্দর সুখের স্মৃতিগুলি ফিরে আসে। কিটকি লিখেছে, 'গতকাল নৌকায় করে ৬ মাইল উত্তরের 'ক্যানসি' সিটিতে গিয়েছিলাম বেড়াতে। ও মা! আমাদের দেশের ময়লা ঘিঞ্জি চাঁদপুরের মতো দেখতে। এটিকে আবার বাহার করে বলা হচ্ছে সিটি। শহরটা বাজে, বমি আসে। কিন্তু শহর থেকে বেরুলেই চোখ ভরে ওঠে। নীল সমুদ্র, নীল নীল পাহাড়, ঘন নীল আকাশ। উহ্ কী অদ্ভুত! আপনি যদি আসতেন, তাহলে খুব ভালো লাগত আপনার। সত্যি বলছি।'

আই. এ পরীক্ষায় রুনু ফেল করল।

বেশ অবাক হলাম আমরা। পড়াশোনায় আমার সব ভাইবোনই ভালো। রুনু নিজে সাত শ'র উপর নম্বর পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। অঙ্কে আর ভূগোলে লেটার মার্ক ছিল। পরীক্ষায় একেবারে ফেল করে বসবে, এটা কখনো ভাবা যায় না। কাগজে তার রোল নাম্বার যখন কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না এবং রোল নম্বরটি পাওয়া যাবে না এটিও ধারণা করতে পারছি না, তখন রুনু বলল, 'খুঁজে লাভ হবে না দাদা, আমি ফেল করেছি।'

'ফেল করবি কেন?'

'খাতায় যে কিছুই লিখি নি। ইতিহাসের খাতায় সম্রাট বাবরের ছবি এঁকে দিয়ে এসেছি।'

'কার ছবি?'

'সম্রাট বাবরের।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। রুনু অবশ্যি বদলে যাচ্ছিল। কিন্তু পরিবর্তনটা এত ধীর গতিতে হচ্ছিল যে আমি ঠিক ধরতে পারি নি। হয়তো বই নিয়ে পড়তে বসেছে, আমি যাচ্ছি পাশ দিয়ে--হঠাৎ ডাকল, 'দাদা, শোন একটু।'

'কি?'

'মানুষের গোস্ত যদি বাজারে বিক্রি হ'ত তাহলে তোমার গোস্ত হ'ত সবচে

সস্তা, তুমি যা রোগা।'

এই জাতীয় কথাবার্তা রুনু আগে বলত না। কিংবা আরেকটি উদাহরণ ধরা যাক।

এক দিন রাবেয়াকে গিয়ে সে বলছে, 'আপা, একটা কথা শুনবে?'

'বল।'

'তোমার মাথাটা কামিয়ে ফেলবে?'

রাবেয়া বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন রে?'

'এমনি বলছি। ঠাট্টা করছি।'

রুনুর এ জাতীয় কথাবার্তা কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। রুনু বদলে যাচ্ছিল। কথাবার্তা কমিয়ে দিচ্ছিল। অথচ তার মতো হৈচৈ করা মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি। বাসায় যতক্ষণ আছে, গুনগুন করে গান গাইছে। রেডিও কানের কাছে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। সিনেমার তো কথাই নেই, প্রতি সপ্তায় দেখা চাই। তার হাতে টাকা পড়তে না পড়তে ধোঁয়ার মতো উড়ে যাচ্ছে। যখনই দেখতাম রাতের খাওয়ার পর রুনু আমার ঘরে ঘুরঘুর করছে কিংবা আমার পরিষ্কার করে সাজান বিছানা আবার নতুন করে ঝাড়ছে, তখনি বুঝতাম তার কিছু টাকার প্রয়োজন।

'কি রে রুনু, টাকা দরকার?'

'ন্–না।'

'সেদিন যে দশ টাকা দিলাম, খরচ করে ফেলেছিস?'

'হুঁ।'

'আরো চাই?'

'ন্–না।'

'আচ্ছা আচ্ছা, প্যান্টের পকেটে হাত দে. মানি ব্যাগ পেয়েছিস? খোল। নে একটা নোট, নিয়ে যা। আরে আরে, দশ টাকারটাই নিলি? ডাকাত একেবারে!' রুনু খিলখিল হেসে পালিয়ে যায় দ্রুত।

সেই রুনু এমন বদলে গেল। আমরা কেউ বুঝতেই পরলাম না। পরীক্ষার রেজাল্ট শুনে তার কোনোই ভাবান্তর নেই। সেদিন শুনি জানালা দিয়ে মুখ বের করে ওভারশীয়ার চাচাকে বলছে, 'ও চাচাজি, শুনছেন?'

'কি মা?'

'আমার পরীক্ষার রেজাল্ট হয়েছে।'

'কি রেজাল্ট?'

'আমি ফেল করেছি চাচাজি।'

একমাত্র বাবাই রুনুকে ধরতে পেরেছিলেন। প্রায়ই বলতেন, 'রুনুটার কি কোনো অসুখ করেছে? এমন দেখায় কেন?' এক দিন রুনুকে আসমানী রঙের

একটি চমৎকার শাড়ি এনে দিলেন। সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত মন ভালো থাকবে বলে পাঠালেন ঝুনুর কাছে।

ঝুনুর বাসা থেকে ফিরে এসেই রুনু অসুখে পড়ল। প্রথমে একটু জ্বর-জ্বর ভাব, সর্দি, গা ম্যাজম্যাজ। শেষটায় একেবারে শয্যাশায়ী।

এক দিন দু' দিন করে দিন পনের হয়ে গেল, অসুখ আর সারে না। ডাক্তার কখনো বলে দুর্বলতা, কখনো বলে রক্তহীনতা, কখনো-বা লিভার ট্রাবল। সঠিক রোগটা আর ধরা পড়ে না।

রাতে সে বড়ো ঝামেলা করে। নিজে একটুও ঘুমোয় না, কাউকে ঘুমুতেও দেয় না। রাবেয়া প্রায় সারা রাত জেগে থাকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, গল্প পড়ে শোনায়, পিঠ চুলকে দেয়। অনেক রাতে যখন রাবেয়া বলে, 'আমি একটু শুই, রুনু?'

'না-না, শুলেই তুমি ঘুমিয়ে পড়বে।'

'তোর বালিশে একটু মাথাটা রাখি, ভীষণ মাথা ধরেছে।'

'উঁহু, তুমি বরং এক কাপ চা খেয়ে আস। ঘুমুতে পারবে না।'

'খোকাকে ডাকি, ও বসবে তোর পাশে।'

'না, তুমি বসে থাকবে।'

কলেজ থেকে ফিরে আমি এসে বসি রুনুর পাশে।

'কি রে, জ্বর কমেছে।'

'হ্যাঁ, কমেছে?'

কপালে হাত দিয়েই প্রবল জ্বরের আঁচ পাই। রুনু ঘোলাটে চোখে তাকায়। আমি বলি, 'বেশ জ্বর তো। কি রে, খারাপ লাগে?'

'না, লাগে না।'

'মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?'

'দাও।'

'চিটাগাং ভালো লেগেছিল রুনু?'

'হুঁ।'

'সমুদ্র দেখতে গিয়েছিলি?'

'না।'

'আচ্ছা, এক বার তোদের সবাইকে নিয়ে সমুদ্র দেখতে যাব। কক্সবাজারে হোটেল ভাড়া করে থাকব। খুব ফুর্তি করব, কি বলিস?'

'হুঁ করব।'

জ্বরের ঘোরে রুনু ছটফট করতে লাগল। হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলে উঠল, 'দাদা, ঝুনু এখন আর আমাকে একটুও দেখতে পারে না।'

'কেন দেখতে পারে না?'

'কী জানি কেন। আমার সঙ্গে কথা বলে নি। কিন্তু আমার কী দোষ?'

রুনুর জ্বর বাড়তেই থাকে। মন্টু চলে যায় ডাক্তার আনতে। রুনু আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে। ভাত খেতে খেতে রাবেয়া বলে, 'খোকা শোন, তোকে একটা কথা বলি।'

'কী কথা?'

'রুনুটা বাঁচবে না রে।'

'কী বলছিস আবোল-তাবোল!'

'আমার কেন জানি শুধু মনে হচ্ছে। কাল রাতে রুনুর জন্যে গরম পানি করে নিয়ে গেছি, দেখি ওর মাথার পাশে কে এক জন মেয়ে বসে আছে।'

'কী বলছিস এ সব!'

'হ্যাঁ সত্যি। কে যে বসে ছিল, ঠিক বলতে পারব না। তবে আমার মনে হয়, তিনি মা। অল্প কিছুক্ষণের জন্যে দেখেছি।'

'যত সব রাবিশ।'

'না রে, ঠিকই। আমি ভয় পেয়ে বাবাকে ডেকে আনি।'

'বাবাকে বলেছিস কিছু?'

'না, বলি নি।'

দেখতে দেখতে রুনুর জ্বর খুব বাড়ল। ছটফট করতে লাগল সে। ডাক্তার এসে দু'টি ইনজেকশন করলেন। মাথায় পানি ঢালতে বললেন। জ্বরের ঘোরে রুনু ভুল বকতে লাগল, 'বেশ করেছেন আপনি! হ্যাঁ, বেশ তো। ঠিক আছে ঠিক আছে!'

'কী বলছিস রুনু?'

রুনু স্বাভাবিক মানুষের মতো বলল, 'কই দাদা, কিছু বলছি না তো।' রাবেয়াকে বলল, 'আপা এক গ্লাস পানি আন। কানায় কানায় ভরা থাকে যেন। আমি সবটা চুমুক দিয়ে খাব।'

রুনু এক চুমুক পানি খেল। খুব স্বাভাবিক গলায় ডাকল, 'বাবা।'

'এই তো আমি। কী মা?'

'একটু কোলে নেন না।'

বাবা রুনুকে কোলে নিলেন। বাবার পা কাঁপছিল। আমি বাবার একটা হাত ধরলাম। রুনুটা এই ক'দিনে ভীষণ রোগা হয়েছে। বাবার পিঠের ওপর তার দু'টি শীর্ণ হাত আড়াআড়ি ঝুলছে। রুনু বলল, 'বাবা বাইরে চলেন। বাইরে যাব।'

সবাই বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সে রাতে-খুব জোছনা হয়েছিল। জামগাছের পাতা চিকচিক করছিল জোছনায়। উঠোনে চমৎকার সব নকশা হয়েছিল গাছের পাতার ছায়ায়। রুনু ফিসফিস করে বলল, 'বাবা, কাল রাতে আমি মাকে দেখেছি। মা আমার মাথার পাশে এসে বসেছিলেন। আমি কি মারা যাচ্ছি বাবা?'

'না মা, ছিঃ! মারা যাবে কেন?'

'তোমরা কি রাগ করেছ আমার ওপর?'

'রাগ করব কেন? মিষ্টি মা আমার।'

বাবা চুমু খেলেন রুনুর পিঠে। রুনু বলল, 'আমি যে আরেকটি ছেলেকে চিঠি লিখেছিলাম।'

রাবেয়া রুনুকে কোলে নিয়ে বসে আছে। বাবা আর মন্টু গেছে ডাক্তার ডেকে আনতে। রুনু চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। তার ফর্সা সরু আঙুল থরথর করে কাঁপছে। সবাই বুঝতে পারছি, রুনু মারা যাচ্ছে......।

৫

রুনু মারা যাবার পর আমার মনে হল মায়ের মৃত্যু আমি ঠিক অনুভব করতে পারি নি। মা যখন মারা যান তখন অনেক রকম দুশ্চিন্তা ছিল, নিনুকে কে মানুষ করবে, ঘর–সংসার কী করে চলবে। কিন্তু এখন কোনো দুশ্চিন্তা নেই। রুনুর জন্যে কোনো কিছু আটকে থাকার কথা ওঠে না, কিন্তু সমস্তই যেন আটকে গেল। রুনুর কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারি না। মনে হয় গভীর শূন্যতায় ক্রমাগত তলিয়ে যাচ্ছি। অসহ্য বোধ হওয়ায় লম্বা ছুটি নিয়েছি। দীর্ঘ অবসর সময়ও কাটে না কিছুতেই। একবার ভাবলাম বাইরে কোথাও যাই। কত দিন রুনুকে নিয়ে বাইরে যেতে চেয়েছি, সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়, কক্সবাজার, দিনাজপুরের পঞ্চগড়--কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে নি। আজ একা একা কি করে যাব?

কিছুই ভালো লাগে না। শুয়ে শুয়ে দীর্ঘ সময় কাটে। বাবা তাঁর ছোট ঘর থেকে কখনই বের হন না। তাঁর হাঁপানি বড্ড বেড়েছে। মন্টু যে কখন আসে কখন যায়, বুঝতে পারি না। শুধু নিনুর দাপাদাপি শোনা যায়। সে খেলে আপন মনে। পাগলের মতো কথা বলে একা একা।

এক দিন রুনুর ছোট ট্রাঙ্কটা খুলে ফেললাম। কত কি সাজিয়ে রেখেছে সেখানে। প্রথম বেতন পেয়ে তাকে দশ টাকার নোট দিয়েছিলাম একটা। নোটের উপর লিখে দিয়েছিলাম, 'প্রিয় রুনুকে ইচ্ছে মতো খরচ করতে।' রুনু সেটি খরচ করে নি। যত্ন করে রেখে দিয়েছে। একটি অতি চমৎকার মোমের পুতুল। আগে কখনো দেখি নি। কোত্থেকে এনেছিল কে জানে! তার নিজের ফটো কয়েকটি, কিটকির ক্যামেরায় তোলা। স্কুলের ক্রীড়া–প্রতিযোগিতায় পাওয়া দু'টি ছোট কাপ। একটি কবিতার বই, তাতে লেখা 'রাবেয়া আপাকে--রুনু।' পাঁচ–ছ'টি সাদা রুমাল। প্রতিটির কোণায় ইংরেজি লেখা--তার নিজের নামের আদ্যক্ষর! পুরানো ডায়রি পেলাম একটা, পড়তে পড়তে চোখ ভিজে ওঠে।

১৭–১–৭১

আজ রাবেয়া আপা আমাকে বকেছে। মিটসেফ খোলা রেখেছিলাম, আর বিড়ালে দুধ খেয়ে গেছে। প্রথম খুব খারাপ লাগছিল। আপা সেটি বুঝতে পারল। বিকেলে আমাকে ডেকে এমন সব গল্প বলতে লাগল যে হেসে বাঁচি না। একটি গল্প এই রকম--এক মাতাল রাতের বেলা মদ খেয়ে উল্টে পড়েছে নর্দমায়। বিরক্ত হয়ে বলছে– 'ওরে ব্যাটা নর্দমা, তুই দিনের বেলা থাকিস রাস্তার পাশে আর রাত হলেই এসে যাস রাস্তার মাঝখানে?' আপাটা কি হাসাতেই না পারে!

১৪–২–৭১

কিটকি আপা আমাকে এমন একটি কথা বলেছেন যে আমি অবাক। সবাইকে সে–কথাটি বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু বলা যাবে না। আপা আল্লার কসম দিয়ে দিয়েছেন।

৩০–৩–৭১

আজ একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। দুপুরে আমি শুয়ে আছি, বাবা চুপি চুপি এসে ঘরে ঢুকে বলতে লাগলেন--রাবেয়া, রুনুটার কি হয়েছে? ও এমন মন–মরা থাকে কেন? আমি উঠে বললাম, 'আপা তো এখানে নেই বাবা। আর কই, আমার তো কিছুই হয় নি।' বাবার মুখের অবস্থা যা হয়েছিল না!

২২–৫–৭১

আজ দুপুরে লুকিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। ও আল্লা, গিয়ে দেখি সিনেমা হলের লবিতে দাদা ঘুরছে। আমাকে দেখে বলল, 'কি রুনু মিয়া, সিনেমা দেখবে নাকি?' তারপর নিজেই টিকেট কাটল। ছবিটা বড় ভালো।

৫–৬–৭১

মন্টুটা তলে তলে এত! আমাকে বলছে, তিন তিনটা ডি. সি–তে সিনেমা দেখাবে। যদি না দেখায় তাহলে সব ফাঁস করে দেব। তখন বুঝবে। মন্টুর একটি কবিতা ছাপা হয়েছে। কবিতাটি সে শুধু আমাকেই দেখিয়েছে। খুব অশ্লীল কিনা, তাই কাউকে দেখাতে সাহস হয় নি।

৯–৬–৭১

আজ সন্ধ্যাবেলা দেখি রাবেয়া আপা শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। খুব চাপা মেয়ে। কাউকে বলবে না তার কী হয়েছে। আমার যা খারাপ লাগছে। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে।

৯–৭–৭১

নিনুটার কাণ্ড দেখেশুনে অবাক হয়েছি। সেদিন স্কুল থেকে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরেছে। আমি বললাম, 'কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন?'

সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, 'জান না তুমি, আজ ছেলেরা এক প্রফেসরকে মেরে ফেলেছে। আপামনি বলেছে ক্লাসে।'

'তাতে তোর কী হয়েছে?'

'দাদাকে যদি মেরে ফেলে, সেও তো প্রফেসর।'
শুনে আমি হেসে বাঁচি না। ওর যত টান দাদার জন্যে।

হতাশা আর বিষণ্ণতায় যখন সম্পূর্ণ ডুবেছি, তখনি কিটকির চিঠি পেলাম। 'দেশে ফিরছি কবে বলতে পারছি না। প্লেনের টিকিট পেলেই।'

'বদলে গেছিস কিটকি।'
'লম্বা হয়েছি, না?
'হুঁ, আর রোগাও হয়েছিস।'
'আপনিও বদলেছেন, কি বিশ্রী গোঁফ রেখেছেন।'
'বিশ্রী ?'
'হ্যাঁ, বিশ্রী আর জঘন্য, দেখলেই সুড়সুড়ি লাগে।'
'ম্যানিলার কথা বল।'
'সে তো চিঠিতেই বলেছি।'
'মুখে শুনি।'
রাবেয়া ট্রেতে চা সাজিয়ে আনল। কিটকি হাসতে হাসতে বলল, 'রাবেয়া আপা আগের মতোই আছেন।
'না রে, স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে, এই দেখ হাতে কত জোর।'
'উঁহু, উঁহু, আমার ঘাড় ভেঙে ফেলেছেন। বোন ফ্রাকচার হয়েছে নির্ঘাৎ।'
'বোন ফ্রাকচার হয় নি, হার্ট জখম হয়েছে কিনা বল।'
রাবেয়া হাসতে হাসতে চলে গেল। কিটকি বলল, 'রুনুর কথা বলেন।'
'না, রুনুর কথা থাক।'
'মন্টুর নাকি একটা কবিতার বই বেরিয়েছে?'
'হ্যাঁ, 'কিছু কিংশুক' নাম। তোমাকে নিশ্চয়ই দেবে এক কপি।'
'কেমন হয়েছে?'
'আমি কবিতার কী বুঝি, তবে সবাই ভালো বলেছে।'
'আপনার প্রফেসরির কী খবর?'
'খবর নেই কোনো। বেতন বেড়েছে। ব্যাঙ্কে কিছু জমেছে। খরচ–পত্তর তো বিশেষ তেমন কিছু নেই।'
'রাবেয়া আপা শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলেন না?'
'না।'
'কেন?'
'রাবেয়া করতে চাইল না, বাবা খুব চেষ্টা করেছিলেন।'
কিটকি অনেকক্ষণ থাকল বাসায়। দুপুরে আমাদের সঙ্গে ভাত খেল। বিকেলে

চা খেয়ে চলে গেল। কিটকিকে অন্যরকম লাগছিল। ছেলেমানুষী যা ছিল ধুয়ে মুছে গেছে। ভারি সুন্দর হয়েছে দেখতে। চোখ ফেরান যায় না, এমন।

সারা সন্ধ্যা কিটকির কথা ভাবলাম। ছোটবেলা কিটকি আমার জন্যে এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করত। এখনো করে কিনা কে জানে! তাকে সরাসরি কিছু বলার মতো সাহস আমার নেই, কিন্তু বড়ো জানতে ইচ্ছে করে। রাত দশটার দিকে রাবেয়া আমার ঘরে এল।

'কি রে, জেগে আছিস?'

রাবেয়া চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে খাটে বসল। চিরুনি কামড়ে ধরে বেণী পাকাতে লাগল।

'খুব লম্বা চুল তো তোর!'

'হুঁ একটা বেণী কেটে নিয়ে যে কেউ ফাঁস নিতে পারবে।'

'প্রেমের ফাঁস, বল।'

'কিটকিকে দেখে খুব রস হয়েছে, না? মন পেয়েছিস কিটকির?'

'রমণীর মন সহস্র বৎসরেরও সখা সাধনার ধন।'

'তোর সাধনাই–বা কম কি? পাঁচ বছর অনেক লম্বা সময়।'

রাবেয়া চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ। তার পর বলল, 'খোকা তোর কাছে একটা কাজে এসেছি।'

'কি কাজ?'

'আমাকে কলেজে ভর্তি করিয়ে দে, কিছু পড়াশোনা করি।'

'এত দিন পর হঠাৎ?'

'এমনি ইচ্ছে হল। আর একটা মাষ্টার রেখে দিস, কিছু তো ছাই মনেও নেই।'

'আচ্ছা দেব। আবার ছেড়ে দিবি না তো?'

'না, ছাড়ব না।'

৬

ঝুনুর ছেলে হবে। যাতে কেউ গিয়ে ওকে নিয়ে আসে, সে–জন্যে সে সবার কাছে চিঠি লিখেছে। তারা আসতে দেবে কিনা কে জানে! মোটেই ভালো ব্যবহার করছে না তারা। রুনু মারা যাবার পরও আসতে দেয় নি। তবু বাবা যাচ্ছেন আনতে। সঙ্গে রাবেয়াও যাবে। যদি ঝুনু আসে, তবে বেশ হয়। অনেক দিন দেখি না ওকে। খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

রাবেয়া কলেজে ভর্তি হয়েছে। উৎসাহ নিয়ে রাত জেগে পড়ে। ছুটির দিনগুলি ছাড়া তাকে পাওয়াই যায় না। রোববারে ফূর্তি হয় এই কারণেই। সবাই রোববারের

জন্যে মনে মনে অপেক্ষা করি।

মন্টু এক দৈনিক পত্রিকা- অফিসের সহ-সম্পাদক হয়েছে। বেশ ভালো বেতন। বি. এ. টাও পাশ করে নি, কিন্তু বেশ গুছিয়ে ফেলেছে। অবাক হওয়ারই কথা। তার দ্বিতীয় বই 'শুধু ভালোবাসা' সাহিত্যপুরস্কার পেয়েছে। মন্টু এখন নামী ব্যক্তি। অনেকেই তার কাছে আসে। মন্টু তো বাসাতে থাকে কমই, বাবা গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করেন। এ ব্যাপারে বাবার উৎসাহ প্রায় সীমাহীন। কোন পত্রিকায় কী লিখল, তা তিনি অসীম ধৈর্য নিয়ে খোঁজ রাখেন। সযত্নে পেপার-কাটিং জমিয়ে রাখেন। মন্টুর কাছেই শুনেছি, এক দিন বাবা নাকি কোন বই-এর দোকানে ঢুকে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, 'আপনার এখানে "কিছু কিংশুক" কবিতার বইটি আছে?'

দোকানী জবাব দিয়েছে, 'না নেই।'

'তাহলে "শুধু ভালোবাসা" বইটি আছে?'

'না, সেটাও নেই।'

বাবা রেগে গিয়ে বলেছেন, 'ভালো ভালো বই-ই নেই, আপনারা কেমন দোকানদার?'

মন্টুর সঙ্গে কবিতা নিয়ে আলাপ করতেও তাঁর খুব উৎসাহ। মন্টু এ ব্যাপারে অত্যন্ত লাজুক বলেই তিনি সুযোগ পান না।

সত্য-মিথ্যা জানি না, শুনেছি বাবা ওভারশীয়ার কাকুর বড়ো ছেলের বউকে প্রায়ই মন্টুর কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। এই মেয়েটিকে বাবা খুব পছন্দ করেন। মেয়েটির চেহারা অনেকটা রুনুর মতো। পেছন থেকে দেখলে রুনু বলে ভ্রম হয়।

নিনুও অনেক বড়ো হয়েছে। সেদিন তাকে নিয়ে রাস্তায় বেরোতেই দু'টি ছেলে শিস দিল। নিনুকে বললাম, 'নিনু কোনো বদ ছেলে তোমাকে চিঠি-ফিঠি লিখলে না পড়ে আমাকে দিয়ে দেবে, আচ্ছা?' নিনু লজ্জায় লাল হয়ে ঘাড় নেড়েছে।

সেদিন রবিবার। সবার বাসায় থাকার কথা, কিন্তু বাসায় নেই কেউ। বাবা আর রাবেয়া গেছে ঝুনুকে আনতে, মন্টু তার পত্রিকা-অফিসে। পত্রিকা-অফিসের কাজ নাকি পুলিশের কাজের মতো। ছুটির কোনো হাঙ্গামাই নেই। বাসায় আমি আর নিনু। আমি ভেতরে বসে কাগজ পড়ছি, নিনু বলল, 'দাদা, এক জন ভদ্রলোক এসেছেন।'

'কী রকম ভদ্রলোক?'

'বুড়ো। চোখে চশমা।'

বেরিয়ে এসে দেখি বড়মামা। অনেক দিন পর দেখা, কিন্তু চিনতে অসুবিধা হল না। বড়মামা বললেন, 'আমাকে চিনতে পারছ?'

'জ্বি, আপনি তো বড়মামা।'

'অনেক দিন পর দেখা, চেনার কথা নয়। তুমিও বড়ো হয়েছ, আমিও বুড়ো। কী কর এখন?'

'এখানকার এক কলেজে প্রফেসরি করি।'

'বেশ, বেশ। বাসায় আর কেউ নেই? খালি খালি লাগছে।'

'জ্বি না। বাবা এবং রাবেয়া গেছেন চিটাগাং। আমার এক বোনের সেখানে বিয়ে হয়েছে।'

মামা চুপ করে শুনলেন। তাঁকে দেখে আমি বেশ অবাকই হয়েছি। হঠাৎ করে কেনই-বা এলেন। মা বেঁচে নেই যে আসবার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। তা ছাড়া মামাকে কেমন যেন লজ্জিত এবং অপ্রস্তুত মনে হচ্ছিল। মামা বললেন, 'আমার আব্বা--মানে তোমাদের নানা মারা গিয়েছেন দিন সাতেক হল।'

'কী হয়েছিল?'

'তেমন কিছু নয়। বয়স তো কম হয় নি তাঁর, নব্বইয়ের কাছাকাছি। আজকালকার দিনে এত বাঁচে না কেউ।'

মামা বলতে বলতে অল্প হাসলেন কি ভেবে। বললেন, 'আমাকে আসতে দেখে অবাক হয়েছ, না?'

'না-না, অবাক হব কেন? আপনি চা খাবেন?'

'চা ছেড়ে দিয়েছি, ডায়াবেটিসে ভুগছি। আচ্ছা, দাও এক কাপ চিনি ছাড়া।'

নিনুকে চায়ের কথা বলে এসে বসতেই মামা বললেন, 'বাবা শেষের দিকে তোমাদের কথা কেন জানি খুব বলতেন। তিনি সিলেটে আমার ছোটভাইয়ের কাছে ছিলেন। অসুখের খবর শুনে আমি গিয়েছিলাম। বাবা প্রায়ই বলতেন, ঢাকা গিয়েই তোমাদের এখানে আসবেন। আগে কখনো এমন বলেন নি।'

মামা চশমার কাঁচ ঘষতে ঘষতে বললেন, 'বয়স হলে অনেক values বদলে যায়, তাই না?'

'জ্বি।'

'শিরিন খুব আদরের ছিল সবার। তবে বড়ো গোঁয়ার ছিল। জান তো মেয়েদেব দু'টি জিনিস খুব খারাপ, একটি হচ্ছে সাহস, অন্যটি গোঁয়ার্তুমি।'

আমি কোনো কথা বললাম না। মামা বললেন, 'শিরিনের অনেক গুণ ছিল। সাধারণত মেয়েদের থাকে না। যখন সে এখানে চলে আসল, তখন সবাই দুঃখিত হয়েছিলাম। গুণ বিকাশে পরিবেশের প্রয়োজন হয় তো।'

নিনু চা নিয়ে ঢুকল। মামা চায়ে চুমুক দিয়ে চমকালেন, 'একি খুকি, চিনি দিয়ে এনেছ যে!'

নিনু আধহাত জিভ বের করে ফেলল। মামা বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এক দিন একটু অনিয়ম হোক না হয়। তোমার এক ভাই শুনেছি খুব নাম করেছে। আমি ঠিক চিনতাম না। কিটকি আমাকে বলল। কিটকি আমার ভাগ্নী, চিনেছ?'

'জ্বি।'

'তোমার বাবা আসলে সবাইকে নিয়ে যাবে আমাদের বাসায়। আমিই নিয়ে যাব। তোমার মার অনেক গয়না ছিল। সব ফেলে এসেছিল, সেগুলিও নিয়ে আসবে।'

মামা নিনুকে কাছে ডেকে আদর করতে লাগলেন, 'ফুলের মতো মেয়ে। তুমি যাবে মা আমার বাসায়? তোমাকে একটা জিনিস দেব।'

'কী জিনিস?'

'একটা ময়ূর। হিলট্রাক্টে থাকে—এক বন্ধু—আমাকে দিয়েছিল।'

'পেখম হয়?'

'হয় বোধকরি। আমি অবশ্যি পেখম হতে দেখি নি।'

আমি বললাম, 'মামা, মার একটা পুরনো রেকর্ড ছিল নাকি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে এখনো। তুমি চাও সেটি?'

'শুনতে ইচ্ছে হয় খুব।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। মার গান শুনতে ইচ্ছে তো হবেই। পাঠিয়ে দেব আমি, আমার মনে থাকবে।'

ঝুনুকে শেষ পর্যন্ত আসতে দিল তারা।

তিন বৎসর পর দেখছি। মা হতে যাবার আগের শারীরিক অস্বাভাবিকতায় একটু যেন লজ্জিত। ছেলেবেলার উচ্ছৃংখলতা ঢাকা পড়েছে অপরূপ কমনীয়তায়। মোটা হওয়াতে একটু যেন ফর্সা দেখাচ্ছে।

দুপুরবেলা সে যখন এসেছে, তখন আমি কলেজে। মন্টু পাশের বাড়ি থেকে ফোন করল আসতে। পরীক্ষা-সংক্রান্ত জরুরী মীটিং ছিল, আসতে পারলাম না। সারাক্ষণই ভাবছিলাম, কেমন না জানি হয়েছে ঝুনুটা। সেদিনও একটা চিঠি পেয়েছি, 'তুমি তো মনে কর বিয়ে করে ঝুনু বদলে গেছে। বাসার কারো সঙ্গে কোনো যোগ নেই। তাই বাসার কোনো খবরই আমাকে দাও না। রাবেয়া আপার যে জ্বর হয়েছিল, সে তো তুমি কিছু লেখ নি। বাবার চিঠিতে জানলাম। আর আমি এত কেঁদেছি, তোমরা সবাই আমাকে পর মনে করছ, এই জন্যে। মন্টুর কবিতার বই বেরিয়েছে, মন্টু আমায় পাঠায় নি। আমি নিজে যখন একটা কিনেছি, তার দশ দিন পর সে বই পাঠিয়েছে। কেন, আগে পাঠালে কী এমন ক্ষতি হ'ত? মন্টু তার বইয়ে পেন্সিল দিয়ে লিখেছে, 'সুক্রন্দসী বন্ধু ঝুনুকে।' আমি বুঝি সুক্রন্দসী? মন্টুকে হাতের কাছে পেলে কাঁদিয়ে ছাড়ব...।'

সন্ধ্যাবেলা বাসায় এসে শুনি ঝুনু পাশের বাড়ি বেড়াতে গেছে। চায়ের পেয়ালা হাতে বারান্দায় একা একা বসে পেপার দেখছি, এমন সময় সে এল। কি একটা ব্যাপারে ভীষণ খুশি হয়ে হাসতে হাসতে আসছে। আমায় লক্ষ করে নি দেখে নিজেই

ডাকলাম, 'ঝুনু, আয় এদিকে'।

ঝুনু প্রথমে থতমত খেল। তারপর কিছু বোঝবার আগেই তার হাতের ধাক্কায় আমার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা ছিটকে পড়ল। এবং প্রথমেই যা বুঝতে পারলাম, তা হচ্ছে ঝুনুটা আমায় জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। প্রথম উচ্ছ্বাসটা কাটল অল্পক্ষণেই, কান্না থামল না। অনেক দিন পর প্রিয় জায়গায় ফিরে আসা, রুনুর মৃত্যু, নিজের জীবনের অশান্তি--সব মিলিয়ে যে কান্না, তা একটু দীর্ঘস্থায়ী তো হবেই। আমি বললাম, 'ঝুনু, চা খা, তারপর আবার কান্না শুরু কর। মন্টু তোকে সুক্রন্দসী কি আর শুধু শুধু লিখেছে?'

কাঁদুক, ঝুনু কাঁদুক। অনেক দিন এ বাড়িতে কেউ কাঁদে না। সেই কবে রুনু মারা গেল। খুব কাঁদল সবাই। বাবা গলা ছেড়ে কাঁদলেন, মন্টু আর রাবেয়া ছেলেমানুষের মতো কাঁদল। নিনু চুপি চুপি আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর আর এ বাড়িতে কান্না কই? নিনু পর্যন্ত ভুলেও কাঁদে না। রাবেয়া হয়তো কাঁদে, আমার তো কখনো চোখে পড়ে না। কাঁদুক ঝুনু। আমি দেখি তাকিয়ে তাকিয়ে সুক্রন্দসী ঝুনুকে।

ঝুনুর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল পুরনো দিনগুলি যেন ফিরে এসেছে। আগের মতো হৈ-হল্লা হতে লাগল। নিনুর চুল ঘন হয়ে উঠবে বলে এক দিন ঝুনু মহা-উৎসাহে নিনুর মাথা মুড়িয়ে দিল। নিনু তার কাটা চুল লুকিয়ে রাখল তার পুতুলের বাক্সে। এই নিয়ে ফূর্তি হল খুব। মন্টু ছড়া লিখল একটা--'নিনুর চুল'। নিজের পত্রিকায় ছবি দিয়ে ছাপিয়ে ফেলল সেটি। নিনুও মন্টুর খাতায় গোপনে লিখে রাখল 'মন্টু ভাই একটা বোকা রোজ খায় তেলাপোকা'। ঝুনু সবাইকে এক দিন সিনেমা দেখাল। রোববারে পিকনিক হল আমগাছের তলায়। সময় কাটতে লাগল বড় সুখে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে শুয়ে আছি। ঝুনু এসে বলল, 'মাথায় হাত বুলিয়ে দেব দাদা?'

'না, এমনি সারবে।'

'আহা, দিই না একটু।'

ঝুনু বসল মাথার কাছে। মনে হল কিছু বলবে। চুপ করে অপেক্ষা করছি। ঝুনু ইতস্তত করে বলল, 'আচ্ছা দাদা, হাসপাতালে নাকি ছেলে বদল হয়ে যায়?'

'ছেলে বদল! কী রকম?'

অবাক হয়ে তাকাই আমি।

'ওভারশীয়ার চাচার ছেলের বউ বলছিল, হাসপাতালে নাকি ছেলেমেয়েদের নম্বর দিয়ে সব এক জায়গায় রাখে। নম্বরের গণ্ডগোল হলেই এক জনের ছেলে আরেক জনের কাছে যায়।'

হেসে ফেললাম আমি। বললাম, 'এই দুশ্চিন্তাতেই মরছিস? পাগল আর কি!'

'না দাদা, সত্যি। ওর এক বন্ধুর নাকি টুকটুকে ফর্সা এক ছেলে হয়েছিল।

রিলিজের সময় যে–ছেলে এনে দিল, সেটি নিগ্রোর চেয়েও কালো।'

'হাসপাতালে যেতে না চাস, বাসায় ব্যবস্থা করা যাবে। তবে এগুলো খুব বাজে কথা ঝুনু।'

দু' জনেই চুপচাপ থাকি। বুঝতে পারছি, ঝুনুর ছেলের কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। নিজেই জিজ্ঞেস করি, 'ছেলে হলে কী নাম রাখবি, ঝুনু?'

'যাও।'

'বল শুনি, একটা তো ভেবেছিস মনে মনে।'

'আমি যেটা ভেবেছি, সেটা খুব বাজে--পুরনো।'

'কী সেটি?'

'উঁহু।'

'বল না, শুনি কেমন নাম।'

'কিংশুক।'

'এই বুঝি তোর পুরনো নাম?'

'যাও দাদা, শুধু ঠাট্টা।'

'মেয়ে হলে কী রাখবি?'

'মেয়ে হলে রাখব রাখী।'

'চমৎকার!'

'রাখী নামে আমার এক বন্ধু ছিল। এত ভালো মেয়ে! এখন ডাক্তার। আমিও আমার মেয়েকে ডাক্তারি পড়াব দাদা।'

'আমার অসুখবিসুখ হলে আর চিন্তাই নেই। ভাগ্নীকে খবর দিলেই হল।'

'আচ্ছা দাদা, ইরিত্রা নামটা তোমার কেমন লাগে?'

'নতুন ধরনের নাম। আধুনিক।'

'মন্টু বলছে ইরিত্রা রাখতে, দু'টি নামই আমার ভালো লাগে। কী করব বল তো দাদা।'

'দু' নম্বর মেয়ের নাম ইরিত্রা রাখ।'

'না, দু' নম্বর মেয়ের নাম রাখব রুনু।'

'রুনু?'

'হ্যাঁ। তাহলে রুনুর মতো লক্ষ্মী মেয়ে হবে।' একটুক্ষণ থেমে ঝুনু কাতর গলায় বলল, 'রুনুর কথা বড়ো মনে হয় দাদা। ওকে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে।'

রুনুকে আমারো বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে রুনুর ফটোর দিকে তাকিয়ে থাকি। পাতলা ঠোঁট চেপে হাসির ভঙ্গিমায় তোলা ছবি। বড়ো বড়ো চোখ। বাচ্চা ছেলেদের চোখের মতো দৃষ্টি। সব মিলিয়ে কেন যেন ভারি করুণ মনে হয়। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বুকের ভিতর ব্যথা বোধ হয়।

৭

মায়ের গানের রেকর্ডটা একটা লোক এসে দিয়ে গেল। খুব যত্ন করে কাগজে মোড়া। রেকর্ডের লেবেলে মায়ের নাম 'মিস শিরিন সুলতানা' খুব অস্পষ্টভাবে পড়া যায়। হিজ মাস্টার্স ভয়েসের কুকুরের ছবিটার উপর আবার লাল কালিতে কাঁচা হাতে ইংরেজিতে মায়ের নাম লেখা। হয়তো তিনিই লিখেছিলেন।

বাসায় একটা সাড়া পড়ে গেল। ঝুনু তার ছেলে কোলে নিয়ে পুরনো দিনের মতোই লাফাতে লাগল। বাজিয়ে শোনার মতো গ্রামোফোন নেই দেখে শুধু কাঁদতে বাকি রাখল।

মন্টু রেকর্ড–প্লেয়ার আনতে বেরিয়ে গেল তখনি। রাবেয়া কলেজে। সেখানে কী একটা ফাংশন নাকি। মন্টু তাকেও খবর দিয়ে যাবে। বাবাকে দেখে মনে হল, তিনি আমাদের এই হৈচৈ দেখে একটু লজ্জা পাচ্ছেন। নিনুও এতটা উৎসাহের কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। বাবাকে বললাম, 'আজ একটা উৎসবের মতো করা যাক বাবা। খুব ঘরোয়াভাবে সন্ধ্যার পর মায়ের কথা আলোচনা হবে। তারপর ঘুমুতে যাবার আগে রেকর্ড বাজান হবে।' বাবা সংকুচিত ভাবে বললেন, 'এ–সবের চেয়ে তো মিলাদটিলাদ...।' ঝুনু সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে বলল, 'সে পরে হবে, আজ দাদা যা বলছে তাই হোক।'

বাবা জুতো পরে ফুল আনতে চলে গেলেন। ফুলের মালায় মায়ের ছবি সাজান হবে। ঝুনু বলল, 'বাবা, একটু ধূপ এনো। না পেলে আগরবাতি।'

আমি রেকর্ডটা লুকিয়ে ফেললাম, যাতে আগেভাগে কেউ শুনে ফেলতে না পারে। কিটকিকে টেলিফোন করলাম পাশের বাসা থেকে।

'হ্যালো কিটকি। আমি––'

'বুঝতে পারছি আপনি কে। কি ব্যাপার?'

'খালাকে নিয়ে আয় না বাসায় এক বার।'

'কী ব্যাপার?'

'এসেই শুনবি।'

'আহা বলেন না?'

'একটা ছোটখাট ঘরোয়া উৎসব।'

'কিসের উৎসব?'

'আসলেই দেখবি।'

'বলেন না ছাই!'

'মায়ের গাওয়া রেকর্ডটা বাজান হবে। তাছাড়া তাঁর স্মৃতিতে একটা ঘরোয়া আলোচনা। এই আর কি!'

'বাহ্, সুন্দর আইডিয়া তো। আমি আসছি।'

'আচ্ছা কিটকি, মায়ের সঙ্গে তোলা খালার কোনো ছবি আছে?'

'দেখতে হবে।'

'যদি পাস তো--'

'হ্যাঁ নিয়ে আসব। কখন আসতে বলছেন?'

'রাত আটটায়।'

সন্ধ্যাবেলা রাবেয়া রিক্সা থেকে পাংশু মুখে নামল। ভীত গলায় বলল, 'বাসায় কিছু হয়েছে?'

'না, কী হবে?'

'আরে মন্টুটা এমন গাধা, কলেজে আমার কাছে স্লিপ পাঠিয়েছে, 'বাসায় এসো, খুব জরুরী।' আমি তো ভয়ে মরি। না জানি কার কি হল!'

'না, কী আর হবে। মায়ের রেকর্ডটা দিয়ে গেছে।'

'তাই নাকি, বলবি তো।'

বাবা দামী দু'টি জরির মালা নিয়ে এলেন। 'ফুলের মালা পেলাম না রে, অনেক খুঁজেছি।' মালা দু'টি অনেক বড়ো হল। ফটোতে দিতেই ফটো ছাড়িয়ে নিচে অব্দি ঝুলতে লাগল।

বসার ঘরটা সুন্দর করে সাজান হল। চেয়ার-টেবিল সরিয়ে মেঝেতে বিছানা করা হল। ধূপ পোড়ান হল। স্মৃতি হিসেবে মায়ের পার্কার কলমটা রাখা হল। এটি ছাড়া তাঁর স্মৃতি-বিজড়িত আর কিছুই ছিল না বাসায়।

ঠিক আটটায় কিটকি এল। সঙ্গে খালাও এসেছেন। বেশ কতগুলি ছবিও এনেছে কিটকি।

উৎসবটা কিন্তু যেমন হবে ভেবেছিলাম, তার কিছুই হল না। খালার সঙ্গে তোলা মায়ের ছোটবেলাকার ছবিগুলি দেখলাম সবাই।

মার কথা কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করতেই খালা তাঁর নিজের কথাই বলতে লাগলেন। ছোটবেলায় কেমন নাচতে পারতেন, কেমন অভিনয় করতে পারতেন। তাঁর করা 'ইন্দ্রাণী'র পার্ট দেখে কোন ডাইরেক্টর তাঁকে ছবিতে নামার জন্যে ঝোলাঝুলি করেছিল--এই জাতীয় গল্প। খারাপ লাগছিল খুব। খালার থামার নাম নেই। শেষটায় কিটকি বলল, 'আপনি একটু রেস্ট নিন মা, আমরা খালুজানের কথা শুনি।'

বাবা থতমত খেয়ে বললেন, 'না-না, আমি কী বলব? আমি কী বলব? তোমরা বল মা, আমি শুনি।'

'না খালুজান, আপনাকে বলতেই হবে। আমরা ছাড়ব না।'

বাবা বিব্রত হয়ে বললেন, 'তোমাদের মা খুব বড়ঘরের মেয়ে ছিল। আমাকে সে নিজে ইচ্ছে করেই বিয়ে করেছিল। তখন তার খুব দুর্দিন। আমি খুব সাহস করে তাকে বললাম আমাকে বিয়ে করতে। হ্যাঁ, আমি তাকে খুব পছন্দ করতাম। সে খুব

অবাক হয়েছিল আমার কথা শুনে। কিন্তু রাজি হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। না, আমি তার কোনো অযত্ন করি নি। হ্যাঁ, আমার মনে হয় সে শেষ পর্যন্ত খুশিই হয়েছিল। যাক, কী আর জানি আমি। তোমরা বরং গানটা শোন। চোখে আবার কি পড়ল। কি মুশকিল!'

বাবা চোখের সেই অদৃশ্য জিনিসটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মন্টু রেকর্ড চালিয়ে দিল। পুরনো রেকর্ড, তবু খুব সুন্দর বাজছিল। আমরা উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। অল্পবয়সী কিশোরীর মিষ্টি সুরেলা গলা। 'এই তো এত পথ এত যে আলো.....'। অদ্ভুত লাগছিল। ভাবতেই পারছিলাম না, আমাদের মা গান গাইছেন। ফ্রক-পরা পরীর মতো একটি মেয়ে হারমোনিয়ামের সামনে বসে দুলে দুলে গান গাইছে, এমন একটি চিত্র চোখে ভাসতে লাগল।

বাবার দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর চোখের সেই অদৃশ্য বস্তুটি ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুকণা হয়ে ঝরে পড়ছে মেঝেতে।

৮

বাবার হঠাৎ কেন জানি শখ হয়েছে, রান্নার বই লিখবেন একটি। রকমারি রান্নার কায়দা-কানুন নোট বইয়ে লিখে রাখছেন। বাজার থেকে অনেক বইপত্রও কিনে এনেছেন। পুরানো 'বেগম' থেকে ঘেঁটে ঘেঁটে নারকেল-ইলিশ বা ছানার ডালনার রন্ধনপ্রণালী অসীম আগ্রহে খাতায় তুলে ফেলেছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করছে নিনু আর ওভারশীয়ার কাকুর ছেলের বউ। মাঝে মাঝে দু'-একটি রান্না বাসায়ও রাঁধা হয়। সেদিন যেমন 'নোয়াপতি মিষ্টি' বলে একটা মিষ্টি তৈরি হল। খেতে ভালো হয়েছে বলায়, সে কী ছেলেমানুষি খুশি।

ভালোই হয়েছে, কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকছেন। রাবেয়াও তার পড়াশোনা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। তার দেখা পাওয়াই মুশকিল। যদি বলি 'আয় রাবেয়া একটু গল্প করি', রাবেয়া আঁৎকে ওঠে, 'দু দিন পরেই আমার পরীক্ষা--এখন তোর সাথে আড্ডা দিই! পাগল আর কাকে বলে!'

মন্টু রাতে বাসায় ফেরাই বন্ধ করে দিয়েছে। কয়েক জন বন্ধু মিলে নাকি এক ঘর ভাড়া করেছে। সেখানে গল্পগুজব হয়। কাজেই বাসায় তার বড়ো একটা আসা হয় না, হঠাৎ এক-আধ দিন আসে। মেহমানের মতো ঘুরে বেড়ায়, বাবাকে গিয়ে বলে, 'মোট ক'রকম রান্নার যোগাড় হল বাবা?'

'এক শ' বারো।'

'ও বাবা, এত! একটা রান্না কর না আজ, খাই। কী-কী লাগবে বল, আমি বাজার থেকে নিয়ে আসি।'

বাবা মন্টুকে নিয়ে মহা উৎসাহে রান্না শুরু করেন।

ঝুনু চলে যাবার পরপরই আমি একলা পড়ে গেছি।

সবাই সবার কাজ নিয়ে আছে। বাসায় আমার তেমন কোনো কাজ নেই। শুয়ে–বসে সময় কাটাতে হয়। কাজেই আমি দেরি করে বাসায় ফিরি। সেদিন রাত এগারটার দিকে ফিরেছি, দেখি রাবেয়া মুখ কালো করে বসে আছে আমার ঘরে।

'কী হয়েছে রাবেয়া?'

'কিছু হয় নি। তুই হাত–মুখ ধুয়ে আয়, বলছি।'

'বল শুনি কী ব্যাপার।'

'তুই কলেজে যাবার পরপরই খালা এসেছিলেন।'

'কী জন্যে?'

'তুই জানিস না কিছু?'

'না তো!'

'কিটকির বিয়ে। আগামী কাল রাতেই সব সেটেল হবে। খালা সবাইকে যেতে বলেছেন। গাড়ি পাঠাবেন।'

'অ।'

'এক রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট জজের ছেলে। ফরেন সার্ভিসে আছে। ফ্রান্সে পোস্টেড। ছুটিতে এসেছে, বিয়ে করে ফিরবে। ম্যানিলাতেই নাকি কিটকির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ছেলে গিয়েছিল সেখানে কী কারণে যেন। কিটকির সঙ্গে জানাজানি হয়। কিটকিরও ছেলে খুব পছন্দ।'

'এসব আমাকে শুনিয়ে কী লাভ রাবেয়া?'

'কোনো লাভ নেই?'

'না।'

'এ রকম হল কেন? চুপ করে আছিস যে?'

আমি চুপ করেই রইলাম। আমার কী করার আছে? আমি কী করতে পারতাম? রাবেয়া একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কেঁদে ফেলবে কিনা কে জানে। রাবেয়া ফিসফিস করে বলল, 'আমার আর এখানে থাকতে ভালো লাগছে না। আমি পাশ করলেই বাইরে কোথাও চলে যাব। থাকব একা একা। আর খোকা, শোন।'

'বল।'

'তুই একটা গাধা, ইডিয়েট। আমি তোর মুখে থুথু দিই।'

আমি গায়ের শার্ট খুলে কলঘরের দিকে যাই। রাবেয়া আসে আমার পিছনে পিছনে। এক সময় ধরা গলায় বলে, 'খোকা, তুই রাগ করলি? ছিঃ, রাগ করবি না। আমার কথায় রাগ করতে আছে বোকা?'

খোকা,

গত পরশু সন্ধ্যাবেলা পৌঁছেছি এখানে। স্টেশনে স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট এসেছিলেন নিজেই। ভারি ভালোমানুষ। সারাক্ষণই মা মা বলে ডাকছেন। তাঁর নিজের টাকায় স্কুল, নিজের জমির উপর দোতলা স্কুলঘর। নিজের সমস্ত সঞ্চয় ঢেলে দিয়েছেন বলেই প্রতিটি জিনিসের ওপর অসাধারণ মমতা। আর যেহেতু আমি স্কুলের এক জন, কাজেই তাঁর ভালোবাসার পাত্রী।

ট্রেন থেকে খুব ভয়ে ভয়ে নেমেছিলাম। নতুন জায়গা--কাউকে চিনি না, জানি না। কিন্তু তাঁকে দেখে সব ভয় কেটে গেল। কাউকে কাউকে দেখলে মনে হয় যেন অনেক দিন আগে তার সঙ্গে গাঢ় পরিচয় ছিল, ঠিক সে-রকম। তিনি প্রথমে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। বাসায় তিনি আর সুরমা--এই দু'টিমাত্র প্রাণী। সুরমা তাঁর মেয়ে। রাতের খাওয়া সেরে তিনি আমাকে হোস্টেলে পৌঁছে দিলেন। সতের জন ছাত্রী থাকে সেখানে। আমি হয়েছি তাদের হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট। ছোট্ট একটা লাল ইঁটের দালান। সামনে গাঁদা ফুলের এক টুকরো বাগান। পেছনেই পুকুর। সমস্ত মন জুড়িয়ে গেছে আমার।

খোকা, তোদের সঙ্গে যখন থাকতাম তখন এক ধরনের শান্তি পেয়েছি, এ অন্য ধরনের। এখানে মনে হচ্ছে জীবনের সমস্ত বাসনা কামনা কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। আর বেশি কিছু চাইবার নেই। কাল রাতে ছাদে বসে ছিলাম একা একা। কেন যেন মনে হল, একটু কাঁদি নির্জনে। মার কথা ভেবে, রুনুর কথা ভেবে দু'-এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলি। কিন্তু একটুও কান্না আসল না! কেন কাঁদব, বল? প্রচুর দুঃখ আছে আমার। অত প্রচুর যে কোনো দিন কেউ জানতেও পারবে না। কিন্তু তবুও আমি খোকার মতো ভাই পেয়েছি, কিটকির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে শুনে যে-ভাই আমাকেই সান্ত্বনা দিতে আসে। রুনু, ঝুনু, মন্টু, নিনু--এরা আমার পারুল বোন, চম্পা ভাই। চারদিকে এমন চাঁদের হাটে কি কোনো দুঃখ থাকে? মন্টু একটি কবিতার বই উৎসর্গ করেছে আমাকে। সবগুলি কবিতা হতাশা আর বেদনা নিয়ে লেখা। আমার ভেতরের সবটুকু সে কী করে দেখে নিল ভেবে অবাক আমি। সেই যে দু'টি লাইন ঃ

'দিতে পারো একশো ফানুস এনে?
আজন্ম সলজ্জ সাধ-এক দিন আকাশে কিছু ফানুস ওড়াই।'

যেন আমার বুকের ভেতরের সুপ্ত কথাটিই সে বলে গেছে। দোওয়া করি, মস্ত বড়ো হোক সে।

এমন কেন হল খোকা? সব এমন উল্টেপাল্টে গেল কেন? রুনুটার স্মৃতি কাঁটার মতো বিঁধে আছে। আমার হোস্টেলের একটি মেয়ে সুশীলা পুরকায়স্থ,

অবিকল ঝুনুর মতো দেখতে। তাকে কাল ডেকে অনেকক্ষণ আদর করেছি, মন্টুর কবিতার বই পড়তে দিয়েছি। সে বেচারি ভারি অবাক হয়েছে, সে তো জানে না--তাকে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে সারা রাত কাঁদবার কি প্রচন্ড ইচ্ছাই না হচ্ছে!

নিনুটার কথাও মনে হয়। এত অল্প বয়সে কী ভারিক্কি হয়েছে দেখেছিস? আমি যেদিন চলে আসব, সেদিন দুপুরে সে গম্ভীর হয়ে একটা সুটকেস আমার বিছানায় রাখল। আমি বললাম, 'কি রে নিনু, সুটকেসে কী?'

'কিছু নয়। আমার কাপড়চোপড় আর বই। এটিও তুমি সঙ্গে নেবে।'

'সে কি! এটা নিয়ে কী করব?'

'বাহ্, আমিও তো থাকব তোমার সঙ্গে।'

কাণ্ড দেখলি মেয়ের? কাউকে কিচ্ছু বলে নি। নিজে নিজে সমস্ত গুছিয়ে তৈরি হয়ে রয়েছে। আমার সঙ্গে যাবে। এ সমস্ত দেখলেই মন জুড়িয়ে যায়। মনে হয় কিসের দুঃখ কিসের কি? মমতার এমন গভীর সমুদ্রে দুঃখ তো টুপ করে ডুবে যাবে। হাসছিস মনে মনে, না? আমিও কবি হয়ে গেলাম কিনা ভেবে। সব মানুষই তো কবি রে বোকা। বাবার কথাই মনে কর না কেন। রাতের বেলা একা একা কলতলায় বসে গান গাইতেন 'ও মন মন রে--।' আমি ঠাট্টা করে বলতাম 'নৈশ সঙ্গীত।'

কাজেই আমি বলি--সব মানুষই কবি। কেউ কেউ লিখতে পারে, কেউ পারে না।

তোর খুব বড়লোক হবার শখ ছিল, তাই না খোকা? ঠিক ধরেছি তো? আমি তোকে বড়লোক করে দি, কেমন? রেজিস্ট্রি করে একটা চেক পাঠাচ্ছি। দু'-এক দিনের ভেতরে পেয়ে যাবি। কত টাকা আন্দাজ কর তো? তুই যত ভাবছিস তারচে অনেক বেশি। চেক পেয়েই জানাবি। না রে, ঠাট্টা করছি না। আগের মতো কি আর আছি? ঠাট্টা তামাশা একটুও পারি না এখন। টাকাটা আমি তোকে দিলাম খোকা। আমার আর দেবার মতো কী আছে বল? তোর খুব ধনী হওয়ার শখ ছিল। সেই শখ মেটাতে পারছি বলে ভারি আনন্দ হচ্ছে। খুব যখন ছোট ছিলি, তখন এক বার ফুটবল কেনার শখ হল তোর। মার কাছে সাহস করে তো কিছু চাইতি না। আমাকে এসে বললি কানে কানে। আমি টাকা পাব কোথায়? যা কষ্ট লাগল। এখন পর্যন্ত বাচ্চা ছেলেদের ফুটবল খেলতে দেখলে বুক ব্যথায় টনটন করে। তোর নিশ্চয়ই মনে নেই সে-সব। সোনা ভাই আমার, এ টাকাটা সমস্তই তোর, যে ভাবে ইচ্ছে খরচ করিস। নিনু, ঝুনু, মন্টু আর বাবাকে ভাগ করে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু তাদেরকে দেওয়া আর তোকে দেওয়া একই--ভেবে দিই নি। কোত্থেকে পেয়েছি? তুই কি ভাবছিস আগে বল।

না রে, চুরি করি নি। আমাকে কেউ ভিক্ষেও দেয় নি। এ আমার নিজের টাকা। মার কথা সময় হলে তোকে বলব বলেছিলাম না? এখন বলছি, তাহলেই বুঝবি কী

করে কী হয়েছে। বাবার সঙ্গে বিয়ের আগে তাঁর আবিদ হোসেনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের একটি মেয়েও হয়েছিল। ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কী জন্যে, তা তোর জানার দরকার নেই। বাবা মাকে বিয়ে করে নিয়ে আসেন পরপরই। বুঝতেই পারছিস আমি হচ্ছি সেই মেয়ে। খুব অবাক, না? আমার সেই বাবা ভদ্রলোক এত দিন ঢাকাতেই ছিলেন। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কিছুদিন হল বাইরে চলে গেছেন। যাবার আগে এই টাকাটা দিয়ে গেছেন আমাকে। সেই লোকটিও ভালো ছিল রে। আসত প্রায়ই আমাদের বাসায়। দেখিস নি কোনো দিন? নীল রঙের কোট পরত, গলায় টকটকে লালরঙা টাই। আমাকে ডাকত 'ইমা' বলে। গল্পের মতো লাগে, না?

এগার বছর বয়স থেকেই আমি জানি সব। কেমন লাগে তখন বল তো? তোদের যিনি বাবা, আমি নিজে তাঁকে বাবা বলেই ভেবেছি, আর তিনি একটুও বুঝতে দেন নি কিছু। সেই যে একবার কলেজে আমাকে মা কালী ডাকল। তোরা সবাই দুঃখিত হলি। বাবা কী করলেন বল তো? তিনি রাতের বেলা আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন বারান্দায়। ইতস্তত করে বললেন, 'ইয়ে মা, রাখ তো এটা।'

'কি বাবা?'

'না ইয়ে, একটা ক্রীম, খুব ভালো, বিশ টাকা দাম।'

তাকিয়ে দেখি চ্যাপ্টা মুখের বোতল একটা। মুখের উপর লেখা Sevenday beauty programme. চোখে পানি এসে গেল আমার। সেই কৌটাটা এখনো আছে আমার কাছে, ভারি মূল্যবান সেটি। যেন বাবা বিশ টাকায় এক কৌটা ভালোবাসা কিনে এনেছেন। জন্মে জন্মে এমন লোককেই বাবা হিসেবে পেতে চাই আমি। মানুষ তো কখনো খুব বেশি কিছু চায় না, আমি নিজেও চাই নি। মাঝে মাঝে মনে হয়, না চাইতেই তো অনেক পেয়েছি।

কিটকি ভুল করল। কী করবি বল? ভুলে যেতে বলি না। ভুলবি কেন? রুনুকে কি আমরা ভুলতে পারি, না ভোলা উচিত? কিটকি ভারি ভালোমানুষ। মেয়েটি যেন সুখী হয়। এখনো তো তার বয়স হয় নি, বুঝতেও শেখে নি কিছু। কষ্ট লাগে ভেবে।

মার কথা তোর মনে পড়ে খোকা? চেহারা মনে করতে পারিস? আমি কিন্তু পারি না। স্বপ্নেও দেখি না বহু দিন। খুব দেখতে ইচ্ছে হয়। জানি, মার প্রতি তোদের সবার একটা অভিমান আছে। তোদের ধারণা, মা কাউকে ভালোবাসতে পারে নি। হয়তো সত্যি, হয়তো সত্যি নয়। ছোটখালা এক দিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'শিরিন, তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের একটুও দেখতে পার না!'

মা জবাবে হেসে বলেছেন, 'এদের এমন করে তৈরি করে দিচ্ছি, যাতে ভালোবাসার অভাবে কখনো কষ্ট না পায়।'

মা বড় দুঃখী ছিল রে খোকা। মেয়েমানুষের দুঃখ তো বলে বেড়াবার নয়, ঢেকে রাখবার, চিরদিন তিনি তাই রেখে গেছেন। তোরা জানতেও পারিস নি। এত

গানপাগল মা তেইশ বছরে একটি গানও গাইল না। প্রথম স্বামীকে ভুলতে পারে নি। যদি পারত, তবে জানত সুখের স্বাদ কত তীব্র। যাই হোক, যা চলে গেছে তা গেছে। যারা বেঁচে আছে তাদের কথাই ভাবি।

কিছুক্ষণ আগে নিচে ঘন্টা দিয়েছে, খেতে যাবার সংকেত। আমার খাবার ঘরেই দিয়ে যায়। তবু নিচে গিয়ে এক বার দেখে আসি। আজ আর খাব না। শরীরটা ভালো নেই। একটু যেন জ্বরজ্বর লাগছে। মাঝে মাঝে অসুখ হলে মন্দ লাগে না। অসুখ হলেই অনেক ধরনের চিন্তা আসে, যেগুলি অন্য সময় আসে না।

হোস্টেলের খুব কাছ দিয়ে নদী বয়ে গিয়েছে। সুন্দর নাম। এই মুহূর্তে মনে আসছে না। রাতের বেলা সার্চলাইট ফেলে ফেলে লঞ্চ যায়, বেশ লাগে দেখতে। দেখতে পাচ্ছি লঞ্চ যাচ্ছে আলো ফেলে। তোরা ঢাকায় থেকে তো এ-সব দেখবি না।

আজ এই পর্যন্ত থাক। শরীরের দিকে লক্ষ রাখিস। বাজে সিগারেট টানবি না। কম খাবি, কিন্তু দামী হতে হবে। টাকার ভাবনা তো নেই। ছোটবেলা চুমু খেতাম তোর কপালে, এখন তো বড়ো হয়ে গেছিস। তবু দূর থেকে চুমু খাচ্ছি।

তোর, রাবেয়া আপা।

ঠিকানাঃ
সুপারিনটেনডেন্ট, গার্লস হোস্টেল
আদর্শ হাইস্কুল
পোঃ অঃ কলসহাটি
জেলা-ময়মনসিংহ।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায় প্রায়ই। ছাড়া ছাড়া অর্থহীন স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ জেগে উঠি। পরিচিত বিছানায় শুয়ে আছি, এই ধারণা মনে আসতেও সময় লাগে। মাথার কাছের জানালা মনে হয় সরে গিয়েছে পায়ের কাছে। তৃষ্ণা বোধ হয়। টেবিলে ঢাকা-দেওয়া পানির গ্লাস। হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেই হয়, অথচ ইচ্ছে হয় না।

কোনো কোনো রাতে অপূর্ব জোছনা হয়। সারা ঘর নরম আলোয় ভাসতে থাকে। ভাবি, একা একা বেড়ালে বেশ হ'ত। আবার চাদর মুড়ি দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে ফেলি। যেন বাইরের উথালপাথাল চাঁদের আলোর সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই।

মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামে। একঘেয়ে কান্নার সুরের মতো সে-শব্দ। আমি কান পেতে শুনি। বাতাসে জামগাছের পাতায় সরসর শব্দ হয়। সব মিলিয়ে হৃদয় হা-হা করে ওঠে। আদিগন্ত বিস্তৃত শূন্যতায় কী বিপুল বিষণ্ণতাই না অনুভব করি! জানালার

ওপাশের অন্ধকার থেকে আমার সঙ্গীরা আমায় ডাকে। একদিন যাদের সঙ্গ পেয়ে আজ নিঃসঙ্গতায় ডুবছি।*

* 'শঙ্খনীল কারাগার" রফিক কায়সারের একটি কবিতার নাম। কবির অনুমতিক্রমে নামটি পুনর্ব্যবহৃত হল।

তোমাদের জন্যে ভালোবাসা

সবাই এসে গেছেন।

কালো টেবিলের চারপাশে সাজান নিচু চেয়ারগুলিতে চুপচাপ বসে আছেন তাঁরা। এত চুপচাপ যে তাঁদের নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও কানে আসছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসবে। কাল রাতের বেলা 'ভয়ানক জরুরী' ছাপমারা লাল রঙের চিঠি গিয়েছে সবার কাছে। সেখানে লেখা, 'আসন্ন মহাসংকট নিয়ে আলোচনা, আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন।' মহাকাশ প্রযুক্তি-বিদ্যা গবেষণাগার-প্রধান এস. মাথুরের সই করা চিঠি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ বলে পরিচিত মহামান্য ফিহাও হয়তো হাজির থাকবেন এই জরুরী বৈঠকে। চিঠিতে অবশ্য এই কথা উল্লেখ নেই। কখনো থাকে না। অতীতে অনেকবার বিজ্ঞানী সম্মেলনের মহাপরিচালক হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হয়েছে, কিন্তু তিনি আসেন নি। বলে পাঠিয়েছেন, 'ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আসতে পারছি না, দুঃখিত।' কিন্তু আজ তাঁকে আসতেই হবে। আজ যে সংকট দেখা দিয়েছে, তা তো আর রোজ রোজ দেখা দেয় না। লক্ষ লক্ষ বৎসরেও এক-আধ বার হয় কিনা কে জানে! এ সময়ে ফিহার মত বিজ্ঞানী তাঁর অভ্যাসমতো শুয়ে শুয়ে গান শুনে সময় কাটাবেন, তাও কি হয়!

'আমার মনে হয় মাথুর এসে পড়তে আর দেরি নেই।'

যিনি কথা বললেন, সবাই ঘুরে তাকালেন তাঁর দিকে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, নীরবতা ভাঙার জন্যই নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় এ কথাগুলি বলা হয়েছে। বক্তার দিকে তাকিয়ে দু'একজন ভ্রূ কোঁচকালেন। বক্তা একটু কেশে বললেন,

'কাল কেমন ঝড় হয়েছিল দেখেছেন? জানালার একটা কাঁচ ভেঙে গেছে আমার।'

কথার উত্তরে কাউকে একটি কথাও বলতে না শুনে তিনি অস্বস্তিতে আঙুল

মটকাতে লাগলেন। মাথা ঘুরিয়ে এদিক–সেদিক তাকাতে লাগলেন।

ঘরটি মস্ত বড়। প্রায় হলঘরের মতো। জরুরী পরিস্থিতিতে হাজার দুয়েক বিজ্ঞানীর বসার জায়গা আছে। আজ অবশ্য এসেছেন আটাশ জন। বসবার ব্যবস্থা হয়েছে নিয়ন্ত্রণকক্ষের পাশের ফাঁকা জায়গাটায়। পর্দা টেনে নিয়ন্ত্রণকক্ষকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। অদ্ভুত ধরনের ঘর। শীতকালে জমে যাওয়া হ্রদের জলের মত মসৃণ মেঝে। কালো পাথরের ইমিটেশনে তৈরি দেয়াল, দেখা যায় না এমন উঁচুতে ছাদ।

যেখানে বিজ্ঞানীরা বসে আছেন, তার পাশের ঘরটিতে মহাশূন্যের এ–প্রান্ত থেকে ও–প্রান্ত পর্যন্ত উড়ে–যাওয়া স্টেশন, অভিযাত্রী দল, সন্ধানী দলের সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করছে কম্পিউটর সিডিসি। বিজ্ঞানীদের হাজার বছরের সাধনায় তৈরি, মানুষের মস্তিষ্কের নিওরোনের[১] নিখুঁত অনুকরণে তৈরি নিওরোন যার জন্য প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে। কে বলবে, আজকের এ বৈঠকে হয়তো কম্পিউটর সিডিসিও অংশ গ্রহণ করবে, নয় তো ঠিক তার পাশের ঘরেই বৈঠক বসানর কোনো কারণ নেই।

'এস. মাথুরের আসার সময় হয়েছে ঠিক দেড় ঘন্টা আগে' কথাগুলি বলে পদার্থবিদ সুরা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অল্প বয়সে অকল্পনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়ে তিনি সম্মানসূচক একটি লাল তারা পেয়েছেন। তাঁর আবিষ্কৃত দ্বৈত অবস্থানবাদ[২] নিয়ে তিন বৎসর ধরেই ক্রমাগত গবেষণা হচ্ছে। সেদিন হয়তো খুব দূরে নয়, যখন 'দ্বৈত অবস্থানবাদ' স্বীকৃতি পেয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা সুরার দিকে তাকিয়ে রইলেন। উত্তেজনায় সুরা অল্প কাঁপছিলেন। তাঁর টকটকে ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কপালের উপর এসে পড়া লালচে চুলগুলি বাঁ হাতে সরিয়ে তিনি দৃঢ় গলায় বললেন,

'একটি মিনিটও যেখানে আমাদের কাছে দামী, মাথুর কি করে সেখানে দেড় ঘন্টা দেরি করেন ভেবে পাই না।'

বিরক্তিতে সুরা কাঁধ ঝাঁকাতে লাগলেন। প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, 'মাথুরের মনে রাখা উচিত, সমস্যাটি মারাত্মক।'

বিজ্ঞানীরা নড়েচড়ে বসলেন। সমস্যাটি নিঃসন্দেহে মারাত্মক, হয়তো ইতিমধ্যেই তা তাঁদের গ্রাস করতে শুরু করেছে। এই ঘর, এই গোল কালো রঙের টেবিল, ঘরের ভেতরের ঠান্ডা বাতাস সমস্তই বলছে,

'সময় খুব কম, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।'

পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের ভয়–পাওয়া মুখের ছায়া পড়েছে ঘরের কালো দেয়ালে। বুকের ভেতর শিরশির করা অনুভূতি নিয়ে তাঁরা নীরবে বসে আছেন।

মাঝে মাঝে একেকটা সময় আসে যখন পুরনো ধারণা বদলে দেয়ার জন্যে মহাপুরুষদের মতো মহাবিজ্ঞানীরা জন্মান। কালজয়ী সে সব অতিমানব মানুষের জ্ঞানের সিঁড়ি ধাপে ধাপে না বাড়িয়ে লাফিয়ে ধারণাতীত উঁচু ধাপে নিয়ে যান। বিধাতার মতো ক্ষমতাধর এ সমস্ত মানুষেরা বহু যুগে এক-আধ জন করে জন্মান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ শুরু হয় তখন। মানুষের আদিমতম কামনা, দৃশ্য-অদৃশ্য যাবতীয় বিষয় আমরা নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলব, অজানা কিছুই থাকবে না, অদেখা কিছুই থাকবে না। কোনো রহস্য থাকবে না।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময়টা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের ক্ষমতার কাল চলছে। পুরনো ধারণা বদলে গিয়ে নতুন নতুন সূত্র ঝড়ের মতো এসে পড়ছে। যে সমস্ত জটিল রহস্যের হাজার বৎসরেও সমাধান হয় নি, অতীতের তাবৎ বিজ্ঞানীরা যা অসহায়ভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, তাদের সমাধানই শুধু হয় নি--সে সমাধানের পথ ধরেই নতুন সূত্রাবলী, নতুন ধারণা কম্পিউটরের মেমরি সেলে[৩] সঞ্চিত হতে শুরু হয়েছে। জন্ম হয়েছে ফিহার মতো মহা আঙ্কিকের, যিনি তাঁর তুলনাহীন প্রতিভা নিয়ে ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণের[৪] সমাধান করেছেন মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে। জন্ম হয়েছে পদার্থবিদ সুরার, পদার্থবিদ এস. মাথুরের। মানুষের তৈরি কৃত্রিম নিওরোন নিয়ে তৈরি হয়েছে মানবিক আবেগসম্পন্ন কম্পিউটর সিডিসি। গ্রহ থেকে গ্রহে, মহাকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। কে বলে জ্ঞানের শেষ নেই, সীমা নেই? মানুষের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়তেই হবে জ্ঞানকে। বিজ্ঞানীদের পিছু ফেরবার রাস্তা নেই--আরো জান, আরো বেশি জান।

এমনি যখন অবস্থা, ঠিক তখনি আবিষ্কৃত হল টাইফা গ্রহ[৫]। এন্ড্রোমিডা[৬] নক্ষত্রপুঞ্জের একপাশে পড়ে থাকা ছোট্ট একটি নীল রঙের গ্রহ। চারপাশে উজ্জ্বল ধোঁয়াটে রঙের ছায়াপথের মাঝামাঝি গ্রহ একটি। একটি হঠাৎ আবিষ্কার। বৃহস্পতির কাছাকাছি মহাকাশ গবেষণামন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল WGK-166[৭], একটি সাদা বামন নক্ষত্রকে, যা দ্রুত উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে প্রবল বিস্ফোরণে গুঁড়িয়ে যাবার জন্যে। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে লক্ষ করলেন সাদা বামন নক্ষত্র[৮] থেকে বেরিয়ে আসা বিকিরণ-তেজের প্রায় ষাট ভাগ কেউ যেন শুষে নিচ্ছে। এই প্রকান্ড ক্ষমতাকে কে টেনে নিতে পারে? অন্য কোনো গ্রহের কোনো উন্নত প্রাণী কি এই মহাশক্তিকে কাজে লাগাবার জন্যে চেষ্টা করছে? যদি তা-ই হয় ,তবে সে প্রাণী কত উন্নত?

আবিষ্কৃত হল টাইফা গ্রহ।

বৃহস্পতির কাছাকাছি মহাজাগতিক স্টেশন নিনুপ-৩৭-এর অধিনায়ক টাইফার অনন্যসাধারণ আবিষ্কারক। সেই স্টেশনের সবাই অতি সম্মানসূচক দুই নীল তারা উপাধি পেলেন।

টাইফা গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ হতে সময় লাগল এক বৎসর। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা হকচকিয়ে গেলেন। টাইফা গ্রহের গণিতশাস্ত্রের খবর আসতে লাগল। বিস্মিত বিজ্ঞানীরা কী করবেন বুঝতে পারলেন না। সমস্তই তাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচরে। সেখানে সময় বলে কি কিছুই নেই? সময়কে সব সময় শূন্য ধরা হচ্ছে কেন? বস্তু বলে কি কিছুই নেই? বস্তুকে শূন্য ধরা হচ্ছে কেন? শক্তিকে দুই মাত্রা হিসেবে ব্যবহার করছে কেন?

মহা আঙ্কিক ফিহা, পৃথিবীর সব অঙ্কবিদরা নতুন গণিতশাস্ত্রের নিয়মাবলী পরীক্ষা করতে লাগলেন। ভূতুড়ে সব গণিতবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, কোথেকে কী হচ্ছে? তাদের ফলাফল হিসেবে মহাশূন্যে কোথাও কোনো বস্তু নেই। চারদিকে অনন্ত শূন্য। মানুষ মহাজাগতিক শক্তির একটি আংশিক ছায়া। তাহলে আমাদের ভাবনা-চিন্তা, আমাদের অনুভূতি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রেম, ভালোবাসা সমস্তই কি মিথ্যা? ছায়ার উপরেই জন্ম-মৃত্যু?

পৃথিবীর খবরের কাগজগুলিতে আজগুবি সব খবর বেরুতে লাগল। কেউ কেউ লিখল, টাইফা গ্রহের মানুষেরা পৃথিবী ধ্বংস করে দিচ্ছে। কেউ লিখল, তারা পৃথিবীতে তাদের ঘাঁটি বানাবার জন্যে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে। কেউ লিখল বিজ্ঞানীদের মাথা গুলিয়ে ফেলার জন্যে তারা আজগুবি সব তথ্য পাঠাচ্ছে। গুজবের পিঠে ভর করেই গুজব চলে। টাইফা গ্রহ নিয়ে অজস্র বৈজ্ঞানিক-কল্পকাহিনী লেখা হতে থাকল। দু জন পরিচালক এই নিয়ে থ্রী ডাইমেনশনাল ছবি তৈরি করলেন। ছবির নাম 'নরক থেকে আসছি'। কেমন একটা অদ্ভুত ধারণা ছড়িয়ে পড়ল, টাইফা গ্রহের বিজ্ঞানীরা নাকি পৃথিবীর বিজ্ঞান-পল্লী সিরানে এসে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করছে। মহাশূন্য-গবেষণা বিভাগ, খাদ্য-উৎপন্ন বিভাগ তাদের নিয়ন্ত্রণে। বাধ্য হয়ে এস. মাথুর সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন।

জনসাধারণকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে। অমূলক ভয়ভীতি সরিয়ে দিয়ে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। বিজ্ঞান- পল্লী সিরানে সেবারই সর্বপ্রথম অবিজ্ঞানীরা নিমন্ত্রিত হলেন।

'বিজ্ঞান পরিষদে'র মহাপরিচালক এস. মাথুর বলছি,--

'বিজ্ঞান-পল্লী সিরানে সর্বপ্রথম নিমন্ত্রিত অতিথিরা, আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। শুরুতেই টাইফা গ্রহ সম্বন্ধে আপনাদের যাবতীয় ধারণার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছি। টাইফা গ্রহ নিয়ে আপনারা যত ইচ্ছে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী রচনা করুন, ছবি তৈরি করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। 'নরক থেকে আসছি' ছবিটা আমার নিজেরও অত্যন্ত ভালো লেগেছে।'

গ্যালারিতে বসা দর্শকরা এস. মাথুরের এই কথায় হৈহৈ করে হাততালি দিতে লাগলেন। তালির শব্দ কিছুটা কমে আসতেই এস. মাথুর তাঁর নিচু ও স্পষ্ট কথা

বলার বিশেষ ভঙ্গিতে আবার বলে চললেন, 'আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা উন্নত ধরনের প্রাণীর সন্ধান টাইফা গ্রহে পেয়েছি।'

এক জন দর্শক চেঁচিয়ে বললেন, 'তারা কি দেখতে মানুষের মতো?'

'তারা দেখতে কেমন তা দিয়ে আমার বা আপনার কারো কোনো প্রয়োজন নেই। তবে তারা নিঃসন্দেহে উন্নত জীব। তারা ওমিক্রন[১০] রশ্মির সাহায্যে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আমরা ওমিক্রন রশ্মির যে সংকেত পাঠাচ্ছি, তা তারা বুঝতে পারছে এবং তারা সেই সংকেতের সাহায্যেই আমাদের খবর দিচ্ছে। এত অল্প সময়ে সংকেতের অর্থ উদ্ধার করে সেই সংকেতে খবর পাঠান নিঃসন্দেহে উন্নত শ্রেণীর জীবের কাজ।'

হলঘর নিঃশব্দ হয়ে এস. মাথুরের কথা শুনছে। শুধু কয়েকটা মুভি ক্যামেরার সাঁ সাঁ ছুট্‌ ছুট্‌ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। এস. মাথুর বলে চললেন, 'আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, টাইফা গ্রহ গণিত ও পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন সূত্রাবলী সম্পর্কে যা বলতে চায় তা হতে পারে না, তা অসম্ভব।'

কথা শেষ না হতেই নীল কোট পরা এক সাংবাদিক বাঘের মতো লাফিয়ে উঠলেন, চেঁচিয়ে বললেন, 'কেন হতে পারে না? কেন অসম্ভব? আমরা বুঝতে পারছি না বলে?'

এস. মাথুর বললেন, 'তাদের নিয়মে সময় বলে কিছু নেই। এক জন অনায়াসে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে। এ অসম্ভব ও হাস্যকর।'

সাংবাদিক চড়া গলায় বললেন, 'কেন হাস্যকর? হাজার বছর আগেও তো পৃথিবীতে টাইম মেশিন নিয়ে গল্প চালু ছিল।'

এস. মাথুর বললেন, 'গল্প ও বাস্তব ভিন্ন জিনিস। আপনি একটি গল্পে পড়লেন যে একটি লোক হঠাৎ একটি পাখি হয়ে আকাশে উড়ে গেল। বাস্তবে আপনি সে রকম কোনো পাখি হয়ে উড়ে যেতে পারেন না। পারেন কি?'

কথা শেষ না হতেই দর্শকরা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল এবং বিক্ষিপ্তভাবে হাততালি পড়তে লাগল। সাংবাদিক লাল হয়ে বললেন, 'আমি পাখি হবার কথা বলছি না। আপনি কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন।'

এস. মাথুর হাসিমুখে বললেন, 'না, আমি এড়িয়ে যাচ্ছি না। টাইম মেশিনের কল্পনা কতটুকু অবাস্তব তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরুন একটা টাইম মেশিন তৈরি করলাম, মেশিনে চড়ে আমরা চলে গেলাম অতীতে, যখন আপনার জন্মই হয় নি। আপনার বাবার বয়স মাত্র বার। মনে করুন আপনার সেই বার বৎসর বয়সের বাবাকে আমি খুন করে আবার টাইম মেশিনে চড়ে বর্তমানে এসে হাজির হলাম। এসে দেখি আপনি সিরান-পল্লীতে দাঁড়িয়ে আমার বক্তৃতা শুনছেন। অথচ তা হতে পারে না কারণ আপনার বাবা বার বৎসর বয়সে মারা গেছেন।

অতএব আপনার জন্মই হতে পারে না।'

সাংবাদিক বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি, আমাকে ক্ষমা করবেন।'

কিছুক্ষণ আর কোনো কথাবার্তা শোনা গেল না। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন মহামান্য ফিহা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ, দুর্লভ তিন লাল তারা সম্মানের অধিকারী, ত্রিমাত্রিক যৌগিক সময় সমীকরণের নির্ভুল সমাধান দিয়ে যিনি সমস্ত বিজ্ঞানীদের স্তম্ভিত করে রেখেছেন। ফিহা মাথা নিচু করে হেঁটে গেলেন মাথুরের কাছে, বললেন, 'আমি কিছু বলব।'

সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল। ফিহা বলে চললেন, 'কাল আমি সারারাত ঘুমুতে পারি নি, আমার একটা পোষা বেড়ালছানা আছে, সাদা রঙের, ধবধবে সাদা, বিলিয়ার্ড বলের মতো। ওর কী একটা অসুখ করেছে, সারারাত বিরক্ত করেছে আমাকে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ভোর রাতে ঘুমুতে গেছি, হঠাৎ মনে হল টাইফা গ্রহের বিজ্ঞান নিশ্চয়ই নির্ভুল। আচমকা মনে হল, সময় সংক্রান্ত আমার যেসব সূত্র আছে, সেখানে সময়কে শূন্য রাখলেও উত্তর নির্ভুল হয়, শুধু বস্তুকে ভিন্ন খাতায় নিয়ে যেতে হয়। আমি দেখাচ্ছি করে।'

ফিহা ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে চলে গেলেন। একটির পর একটি সূত্র লিখে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অঙ্ক কষে চললেন। পরবর্তী পনের মিনিট শুধু চকের খসখস শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। ফিহা এক সময় বোর্ড ছেড়ে ডায়াসে উঠে এসে বললেন, 'সবাই বুঝতে পেরেছেন আশা করি?' দর্শকদের কেউই বুঝতে পারেন নি কিছুই। শুধু অঙ্ক কষার ধরন-ধারণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। সবাই মাথা নাড়ালেন, যেন খুব বুঝতে পেরেছেন। ফিহা বললেন, 'এখন মুশকিল হয়েছে কি জানেন? তারা এত উপরের স্তরে পৌঁছে গেছে যে তাদের কোনো কিছুই এখন আর আমাদের ধারণায় আনা সম্ভব নয়। তাদের গণিত বলুন, তাদের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা-- কিছুই নয়।

এবার বিজ্ঞানীদের ভিতর একজন দাঁড়িয়ে বললেন, 'কেন সম্ভব নয়?'

ফিহা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বোকার মতো কথা বলবেন না। মানুষ যেমন উন্নত, পিপীলিকাও তার স্কেলে অর্থাৎ তার প্রাণিজগতে উন্নত। এখন মানুষ কি পারবে পিপীলিকাকে কিছু শেখাতে? গণিত শেখাতে পারবে? পদার্থবিদ্যা শেখাতে পারবে? পিপীলিকার আগ্রহ যতই থাকুক না কেন।'

সভাকক্ষে তুমুল হাতাতালি পড়তে লাগল। এস. মাথুর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আপনারা হৈচৈ করবেন না। এইমাত্র নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে একটা মারাত্মক খবর এসেছে। আজকের অধিবেশন এই মুহূর্তেই শেষ।'

এস. মাথুর উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। যিনি তাঁকে এসে কানে কানে খবরটি দিয়েছেন তিনিও ঘনঘন জিব বের করে ঠোঁট ভেজাচ্ছেন।

'মারাত্মক খবরটি কী? আমরা জানতে চাই।' দর্শকরা চেঁচাতে লাগলেন। বসে-

থাকা বিজ্ঞানীরাও উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মাথুরের দিকে।

মাথুর ভীত গলায় বললেন, 'কিছুক্ষণ আগে নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে জানান হয়েছে, হঠাৎ করে ভোজবাজির মতো টাইফা গ্রহটি হারিয়ে গেছে। কোনো বিস্ফোরণ নয়, কোনো সংঘর্ষ নয়, হঠাৎ করে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া। যেখানে গ্রহটি ছিল, সেখানে এখন শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনারা দশ মিনিটের ভেতর হলঘর খালি করে চলে যান। এক্ষুণি বিজ্ঞানীদের বিশেষ জরুরী বৈঠক বসবে। সভাপতিত্ব করবেন মহামান্য ফিহা।'

ফিহা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার এক্ষুণি বাড়ি যাওয়া প্রয়োজন। বেড়াল-ছানা রাত থেকে কিছু খায় নি। তাকে গ্লুকোজ ইন্টারভেনাস দিতে হবে।'

মাথুর বললেন, 'আপনি চলে গেলে কী করে হবে?'

ফিহা বললেন, 'আমি থাকলেই বুঝি সেই গ্রহটা আবার ফিরে আসবে?'

সেদিন সন্ধ্যাতেই আভ্যন্তরীণ বেতার, বহির্বিশ্ব বেতার থেকে জরুরী নির্দেশাবলী প্রচারিত হল--

'আমি বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালক এস. মাথুর বলছি।

'এই মুহূর্তে থেকে পৃথিবীর উপনিবেশ মঙ্গল ও চন্দ্র এবং পৃথিবীর যাবতীয় মহাজাগতিক স্টেশনে চরম সংকট ঘোষণা করা হল। টাইফা গ্রহ যে রকম কোনো কারণ ছাড়াই মহাশূন্যে মিশে গেছে, তেমনি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রও মিশে যাচ্ছে। আমাদের কম্পিউটর সিডিসি কত পরিধি, কোন পথে এবং কত গতিতে এই অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, তা বের করতে সক্ষম হয়েছে। দেখা গিয়েছে যে এই গতিপথ চক্রাকার। তা টাইফা গ্রহ থেকে শুরু হয়ে আবার সেখানেই শেষ হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবী, চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শনি এই আওতায় পড়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে পৃথিবী আর এক বৎসর তিন মাস পনের দিন পর এই দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হবে। বিজ্ঞানীরা কী করবেন তা স্থির করতে চেষ্টা করছেন। আপনাদের প্রতি নির্দেশ--

'এক. আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না। আতঙ্কগ্রস্ত হলে এই বিপদ থেকে যখন রক্ষা পাওয়া যাবে না, তখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে লাভ কী?

দুই. যার যা করণীয় তিনি তা করবেন।

তিন. কোনো প্রকার গুজব প্রশ্রয় দেবেন না। মনে রাখবেন পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সব সময় আপনাদের সঙ্গেই আছেন। যা অবশ্যম্ভাবী, তাকে হাসিমুখে বরণ করতে হবে নিশ্চয়ই, তবু বলছি বিজ্ঞানীদের উপর আস্থা হারাবেন না।'

কালো টেবিলের চারপাশে নিচু চেয়ারগুলিতে বিজ্ঞানীরা বসে আছেন। পদার্থবিদ সুরা বললেন, 'আমরা কি অনন্তকাল এখানে বসে থাকব? এস. মাথুর যদি পাঁচ মিনিটের ভেতর না আসেন তবে আমি চলে যাব।'

ঠিক তক্ষুণি এস. মাথুর এসে ঢুকলেন। এক রাতের ভিতরেই তাঁর চেহারা বদলে গিয়ে কেমন হয়ে পড়েছে। চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত, গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে। কোনো রকমে বললেন,

'আমি দুঃখিত, আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি এতক্ষণ চেষ্টা করছিলাম ফিহাকে আনতে। তিনি কিছুতেই আসতে রাজি হলেন না। প্রেইরি অঞ্চলে চলে গেছেন হাওয়া বদল করতে। এত বড় বিপদ, অথচ--।'

সুরা মুখ বিকৃত করে বললেন, 'ওর প্রাণদন্ড হওয়া উচিত, যতবড় প্রতিভাই হোক, প্রাণদন্ডই তার যোগ্য পুরস্কার।' মাথুর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

হাতলে হাত রাখবার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

এত অল্প সময়ে কী করে যে গতি এমন বেড়ে যায় ভাবতে ভাবতে লী বাতাসের ধাক্কা সামলাতে লাগল। হাতল খুব শক্ত করে ধরা আছে, তবু দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। বাঁ হাতে মস্ত একটা ব্যাগ থাকায় সে হাতটা অকেজো। দেরি করবার সময় নেই, টুরিস্ট ট্রেনগুলি অসম্ভব গতিতে চলে। কে জানে হয়তো এরই মধ্যে ঘন্টায় দু'শো মাইল দিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে হাতের কালো ব্যাগটা ছুটে বেরিয়ে যাবে।

'এই মেয়ে, ব্যাগ ফেলে দু হাতে হাতল ধর।'

বুড়োমতো একজন ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন। ঠিক কখন যে তিনি দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, লী লক্ষই করে নি। সে চেঁচিয়ে বলল, 'ব্যাগ ফেলা যাবে না। আপনি আমার কোমরের বেল্ট ধরে টেনে তুলুন না দয়া করে।'

লীর ধাতস্থ হতে সময় লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ধন্যবাদ। আরেকটু দেরি হলে উড়েই যেতাম।'

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। লজ্জিতভাবে বললেন, 'এই কামরার–বিপদ সংকেতের বোতামটা আমি খুঁজে পাই নি, পেলে এত অসুবিধা হত না।'

'ঐ তো বোতামটা, কী আশ্চর্য, এটা দেখেন নি!'

'উঁহু। বুড়ো মানুষ তো।'

লীর মনে হল এই লোকটি তার খুব চেনা। যেন দীর্ঘকালের গভীর পরিচয়। অথচ কোথায়, কী সূত্রে, তার কিছুই মনে নেই।

লী বলল, 'আপনাকে চিনি চিনি মনে হচ্ছে।'

'হচ্ছে নাকি?'

'আপনি সিনেমায় অভিনয় করেন? সিনেমার লোকদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে খুব চেনা চেনা মনে হয়।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনি কখনো সিনেমার অভিনেতাদের রাস্তায় দেখেন নি?'

'না।'

'আমি দেখেছি। হাপারকে দু'দিন দেখেছি।'

'তুমি কি নিজেও সিনেমা কর?'

'না। কেন বলুন তো?'

'খুব সুন্দর চেহারা তোমার, সেই জন্যেই বলছি।'

'যান! বেশ লোক তো আপনি।'

'কী নাম তোমার?

'লী।'

'শুধু লী?'

'হ্যাঁ, শুধু লী।'

লী চুলের ক্লিপ খুলে চুল আঁচড়াতে লাগল। বুড়ো ভদ্রলোক হাসতে হাসতে পা নাচাতে লাগলেন। লী বলল, 'এই সম্পূর্ণ কামরা আপনি রিজার্ভ করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি খুব বড়লোক বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যি বলছি, আমারও খুব বড়লোক হতে ইচ্ছে করে।'

'কী কর তুমি?'

'প্রাচীন বই বিভাগে কাজ করি। জানেন, আমি অনেক প্রাচীন বই পড়ে ফেলেছি।'

'বেশ তো।'

'জানেন, 'হিতার' বলে একটা বই পড়ে আমি কত যে কেঁদেছি।'

'তুমি দেখি ভারী ছেলেমানুষ, বই পড়ে বুঝি কেউ কাঁদে?'

'আপনি বুঝি বই পড়েন না?'

'পড়ি, তবে কাঁদি না। তাছাড়া বাজে বই পড়ার সময় কোথায় বল?'

লী বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তার মনে হল বুড়ো ভদ্রলোকটি তাকে খুব ভালো করেই চেনেন। কথা বলছেন এমনভাবে, যেন কতদিনের চেনা। অথচ কথার ভিতর কোনো মিল নেই। লী বলল, 'পৃথিবী যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এতে আপনার খারাপ লাগে না?'

'না।'

'কেন?'

'ধ্বংস তো একদিন হতই।'

'কিন্তু আপনি যে মরে যাবেন।'

'আর পৃথিবী ধ্বংস না হলেই বুঝি আমি অমর হয়ে থাকব?'

লী চুপ করে থাকল। হু হু করে ছুটে চলেছে গাড়ি। ভদ্রলোক শুয়ে শুয়ে নিবিষ্ট

মনে কী যেন পড়ছেন, কোনো দিকে হুঁশ নেই। কী এমন বই এত আগ্রহ করে পড়া হচ্ছে, দেখতে গিয়ে লী হতবাক। শিশুদের একটা ছড়ার বই। আবোল-তাবোল ছড়া। লী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ছড়ার বই পড়তে আপনার ভালো লাগছে?'

'খুব ভালো লাগছে। পড়লে তোমারও ভালো লাগবে, এই দেখ না কী লিখেছে--

কর ভাই হল্লা
নেই কোনো বল্লা
চারিদিকে ফল্লা

লী বিস্মিত হয়ে বলল, 'বল্লাই বা কী আর ফল্লাই বা কী? আবোল-তাবোল লিখলেই হল?'

ভদ্রলোক বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, 'না, কোনো অর্থ অবশ্যি নেই, তবে শুধু মাত্র ধ্বনি থেকেই তো একটা অর্থ পাওয়া যাচ্ছে।'

'কী রকম?'

'ছড়াটা শুনেই কি তোমার মনে হয় নি যে, কোনো অসুবিধে নেই, হল্লা করে বেড়াও। তাই না?'

লী মাথা নাড়ল। সে ভাবছিল, লোকটা কে হতে পারে, এত পরিচিত মনে হচ্ছে কেন? তাকানর ভঙ্গি, কথা বলার ভঙ্গি, সমস্ত যেন কত চেনা, অথচ কিছুতেই মনে আসছে না।

নিঃশব্দে ট্রেন চলছে। সন্ধ্যা হয়ে আসায় হলুদ বিষণ্ন আলো এসে পড়েছে ভেতরে। এ সময়টাতে সবকিছুই অপরিচিত মনে হয়। জানালা দিয়ে তাকালেই দ্রুত সরে সরে যাওয়া গাছগুলিকেও মনে হয় অচেনা। সঙ্গী ভদ্রলোক কুন্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। লী কিছু করার না পেয়ে ধুসর রঙের টেলিভিশন সেটটি চালু করে দিল। সেই একঘেয়ে পুরনো অনুষ্ঠান। ঘন ঘন জরুরী নির্দেশাবলী, 'গুজব ছড়াবেন না। বিজ্ঞানীরা আপনাদের সঙ্গেই আছেন। মহাসংকট আসন্ন, সেখানে ধৈর্য হারান মানেই পরাজয়।'

এই জাতীয় খবর শুনলে মন খারাপ হয়ে যায় লীর। ভূতুড়ে টাইফা গ্রহ সবকিছু কেমন পাল্টে দিল। লীর কতই বা বয়স, কিছুই দেখা হয় নি। মঙ্গল গ্রহে নয়, বুধে নয়, এমন কি চাঁদে পর্যন্ত যা নি। এমনি করেই সব শেষ হয়ে যাবে? লীর চোখ ছলছল করতে থাকে। একবার যদি দেখা করা যেত মাথুর কিংবা ফিহার সাথে। নিদেনপক্ষে সিরান-পল্লীর যে কোনো এক জন বিজ্ঞানীর সঙ্গে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা কারো সঙ্গেই দেখা করবেন না। তাঁরা অসম্ভব ব্যস্ত। চেষ্টা তো লী কম করে নি।

'কী হয়েছে লী?'

লী চমকে বলল, 'কই, কিছু হয় নি তো।'

'কাঁদছিলে কেন?

'কাঁদছি না তো। '

'পৃথিবীর জন্যে কষ্ট হয়?'

'পৃথিবীর জন্যে নয়, আমার নিজের জন্যেই কষ্ট হয়।'

'আচ্ছা আমি তোমার মন ভালো করে দিচ্ছি, একটা হাসির গল্প বলছি।'

'বলুন।'

ভদ্রলোক বলে চললেন, 'জীববিদ্যার এক অধ্যাপক প্রতিদিন দুপুরে বড়সড় একটা মটন চপ খেয়ে ক্লাস নিতে যান। একদিন তিনি ক্লাসে এসে বললেন, 'আজ তোমাদের ব্যাঙের হৃৎপিন্ড পড়াব। এই দেখ একটি ব্যাঙ।' ছেলেরা সমস্বরে বলল, 'ব্যাঙ কোথায় স্যার, এটি তো একটি চপ।' অধ্যাপক বিব্রত হয়ে বললেন, 'সে কী! আমি তাহলে কী দিয়ে লাঞ্চ সেরেছি?'

লী ম্লান হেসে চুপ করে রইল। ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি হাসলে না যে? ভালো লাগে নি?'

'লেগেছে। কিন্তু টেলিভিশন দেখলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। ইচ্ছা হয় একবার মাথুর কিংবা ফিহার সঙ্গে দেখা করি।'

'তাদের সঙ্গে দেখা করে তুমি কী করবে?'

'আমার কাছে একটি অদ্ভুত জিনিস আছে। একটি খুব প্রাচীন বই। পাঁচ হাজার বছর আগের লেখা, মাইক্রোফিল্ম[১১] করা। বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ পেয়েছি।'

'কী আছে সেখানে?'

'না পড়লে বুঝতে পারবেন না। সেখানে ফিহার নাম আছে, সিরান–পল্লীর কথা আছে, এমন কি পৃথিবী যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সে কথাও আছে।'

বুড়ো ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন, 'আরে, থাম থাম। পাঁচ হাজার বছর আগের বই, অথচ ফিহার নাম আছে!'

লী উত্তেজিত হয়ে বলল, 'সমস্ত না শুনলে আপনি এর গুরুত্ব বুঝতে পারবেন না।'

'আমি এর গুরুত্ব বুঝতে চাই না। আমি উদ্ভট কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করি না।'

লী রেগে গিয়ে বলল, 'আপনি উদ্ভট কোনো কিছুতে বিশ্বাস করেন না, কারণ আপনি নিজেই একটা উদ্ভট জিনিস।'

ভদ্রলোক হা হা করে হেসে ফেললেন। লী বলল, 'আমি যদি মাথুর কিংবা ফিহা কিংবা সিরান–পল্লীর কারো সঙ্গে দেখা করতে পারতাম, তবে দেখতেন কেমন হৈচৈ পড়ে যেত।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি কোথায় নামবে?'

'স্টেশন ৫০০৭–এ।'

'তৈরি হও। সামনেই ৫০০৭। বেশ আনন্দে কাটল তোমাকে পেয়ে। তবে তুমি ভীষণ কল্পনাবিলাসী, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।'

'কল্পনাবিলাসীরা তো অল্পতেই রাগে, জানেন না?'

ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল ট্রেন। ব্যস্ত হয়ে ভদ্রলোক একটা ওভারকোটের পকেট থেকে নীল রঙের ত্রিভুজাকৃতির একটা কার্ড বের করে লীকে বললেন, 'তুমি ভীষণ রেগে গেছ মেয়ে, নাও তোমাকে খুশি করে দিচ্ছি। এইটি নিয়ে সিরান–পল্লীর যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে, যার সঙ্গে ইচ্ছা কথা বলতে পারবে। খুশি হলে তো? রাগ নেই তো আর?'

লী দেখল নীল কার্ডে জ্বলজ্বল করছে তিনটি লাল তারা। নিচে ছোট্ট একটি নাম--ফিহা। স্বপ্ন দেখছে না তো সে? ইনিই মহামান্য ফিহা! এই জন্যেই এত পরিচিত মনে হচ্ছিল?

লীর চোখ আবেগে ঝাপসা হয়ে এল।

ফিহা বললেন, 'নেমে যাও মেয়ে, নেমে যাও, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে।'

'কে?'

'আমি সুরা. ভেতরে আসতে পারি?'

'এস।'

ঘরে হালকা নীল রঙের বাতি জ্বলছিল। মাথুর টেবিলে ঝুঁকে কী যেন পড়ছিলেন, সুরার দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

'এত রাতে আপনার ঘরে আসার নিয়ম নেই, কিন্তু--'

সুরা চেয়ার টেনে বসলেন। তাঁর স্বভাবসুলভ উদ্ধত চোখ জ্বলতে লাগল। মাথুর বললেন, 'এখন কোনো নিয়ম-টিয়ম নেই সুরা। তুমি কি কিছু বলতে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি এখন কিছু শুনতে চাই না।। চার রাত ধরে আমার ঘুম নেই। আমি ঘুমুতে চাই। এই দেখ আমি একটা প্রেমের গল্প পড়ছি। মন হালকা হয়ে সুনিদ্রা হতে পারে, এই আশায়।'

সুরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলেন। 'আমিও ঘুমাতে পারি না, তার জন্যে আমি রাত জেগে জেগে প্রেমের গল্প পড়ি না। অবসর সময়টাও আমি ভাবতে চেষ্টা করি।'

'সিডিসির রিপোর্ট তো দেখেছ?'

'হ্যাঁ দেখেছি। ধ্বংস রোধ করার কোনো পথ নেই।'

'যখন নেই, তখন রাতে একটু শান্তিতে ঘুমুতে চেষ্টা করা কি উচিত নয়? চিন্তা এবং পরিকল্পনার জন্যে তো সমস্ত দিন পড়ে রয়েছে।'

'থাকুক পড়ে। আমি একটা সমাধান বের করেছি।'

মাথুর প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, 'তুমি বলতে চাও পৃথিবী রক্ষা পাবে?'

'না।'

'তবে?'

সুরা কথা না বলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মাথুরের দিকে। ঠান্ডা গলায় বললেন, 'আপনার এ সময় উত্তেজনা মানায় না। আপনি অবসর গ্রহণ করুন।'

'তুমি কী বলতে চাও, বল।'

'আমি একটি সমাধান বের করেছি। পৃথিবী রক্ষা পাবার পথ নেই, কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকবে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পর আবার সভ্যতার জন্ম হবে। ফিহার মতো, মাথুরের মতো, সুরার মতো মহাবিজ্ঞানীরা জন্মাবে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

'সুরা তুমি নিজেও উত্তেজিত।'

'দুঃখিত। আপনি কি পরিকল্পনাটি শুনবেন?'

'এখন নয়, দিনে বলো।'

'আপনাকে এখনি শুনতে হবে, সময় নেই হাতে।'

সুরা ঘরের উজ্জ্বল বাতি জ্বেলে দিলেন। মাথুর তাকিয়ে রইলেন সুরার দিকে। দুর্লভ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এই যুবকটিকে হিংসা হতে লাগল তাঁর। সুরা খুব শান্ত গলায় বলে যেতে লাগলেন-- শুনতে শুনতে মাথুর এক সময় নিজের রক্তে উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলেন।

বছর ত্রিশেক আগে 'মীটস' নামে একটা মহাশূন্যযান তৈরি করা হয়েছিল। আদর করে তাকে ডাকা হত দ্বিতীয় চন্দ্র বলে। আকারে চন্দ্রের মতো এত বিরাট না হলেও সেটিকে ছোটোখাটো চন্দ্র অনায়াসে বলা যেত। মহাজাগতিক রশ্মি থেকে সংগৃহীত শক্তিতে একটি কল্পনাতীত বেগে চলবার মতো ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুটি পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরি ছিল এরই মধ্যে। একটি ছিল মহাকাশের বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জে প্রাণের বিকাশ সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যে। বিজ্ঞানী মীটসের তত্ত্বাবধানে এই অসাধারণ যন্ত্রযান তৈরি হয়েছিল-- নামকরণও হয়েছিল তাঁর নাম অনুযায়ী। এটি তৈরি হয়েছিল তাঁরই একটি তত্ত্বের পরীক্ষার জন্যে।

মীটস দেখলেন নক্ষত্রপুঞ্জ NGC 1303[১২] আলোকের চেয়ে দ্রুত গতিতে সরে যাচ্ছে। আলোর কাছাকাছি গতিসম্পন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পাওয়া গেছে অনেক আগে, এই প্রথম তিনি বিজ্ঞানের সূত্রে সম্ভব নয় এমন একটি ব্যাপার পরখ করলেন। তিনি অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন এবং খুব অল্প সময়ে এর ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, আলোর গতি ধ্রুব নয়। এটি ভিন্ন ভিন্ন পরিমন্ডলে ভিন্ন-- স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতির নিয়মাবলীও ভিন্ন ভিন্ন পরিমন্ডলে ভিন্ন। মীটস এটা ব্যাখ্যা করেই চুপ করে গেলেন। তৈরি করলেন মহাশূন্যযান-- মীটস, যা পাড়ি দেবে এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ ছাড়িয়েও বহুদূরে NBP203 নক্ষত্রপুঞ্জে[১৩]। সেখানে পৌঁছুতে তার যুগের পর যুগ লেগে যাবে, কিন্তু পৌঁছুবে ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে মীটসের ধারণা সত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। তাঁর দুর্ভাগ্য মহাশূন্যযানটি প্রস্তুত হবার পরপর

তিনি মারা যান। তাঁর পরিকল্পনাও স্থগিত হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা তখন প্রতি–বস্তুর ধর্মকে বিশেষ সূত্রে ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

সুরার পরিকল্পনা আর কিছুই নয়, পৃথিবীর একদল শিশু মীটসে করে সরিয়ে দেওয়া। শিশুরা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র মহাশূন্যযানের ভিতর শিক্ষা লাভ করবে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হবে মহাশূন্যযানের এক লাইব্রেরি কক্ষে। এই সব শিশু বড় হবে। তাদের ছেলেমেয়ে হবে, তারাও শিখতে থাকবে, তারাও বড় হবে--

'থাম থাম বুঝতে পারছি।' মাথুর হাত উঁচিয়ে সুরাকে থামালেন। বললেন, 'কতদিন তারা এ রকম ঘুরে বেড়াবে?'

'যতদিন বসবাসযোগ্য কোনো গ্রহ না পায়। যতদিন মহাশূন্য থাকবে, ততদিন তো খাদ্যের কোনো অসুবিধা নেই।'

'তা নেই– তা নেই। কিন্তু--'

'আবার কিন্তু কিসের? মহাশূন্যযান তৈরি আছে, কাজ যা করতে হবে তা হল ল্যাবরেটরি দুটি সরিয়ে মাইক্রোফিল্ম লাইব্রেরি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বসান, তার জন্যে তিন মাস সময় যথেষ্ট। এ দায়িত্ব আমার।'

মাথুর চুপ করে রইলেন। সুরা অসহিষ্ণু হয়ে মাথা ঝাঁকালেন, 'আপনার চুপ করে থাকা অর্থহীন। মানুষের জ্ঞান এভাবে নষ্ট হতে দেয়া যায় না।'

'তা ঠিক। কিন্তু সিরানদের মতামত-----'

'কোনো মতামতের প্রয়োজন নেই। এ আমাকে করতেই হবে, আমি কম্পিউটর সিডিসিকে নির্দেশ দিয়ে এসেছি মহাশূন্যযানটির যাত্রাপথ বের করতে। সিডিসিকে মহাশূন্যযানে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। মহাশূন্যযান নিয়ন্ত্রণ করবে সে।'

'তুমি নির্দেশ দিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ, আমি সমস্ত নিয়ম–কানুন ভেঙে এ করেছি। আমি আপনাকেও মানি না-- আপনার মস্তিষ্ক–বিকৃতি ঘটেছে। গত একমাস আপনি প্রত্যেক মীটিং–এ আবোল–তাবোল বকেছেন। আপনি বিশ্রাম নিন।'

সুরা উজ্জ্বল বাতি নিভিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

মাথুর হতভম্ব হয়ে বের হয়ে এলেন ঘরের বাইরে। অন্ধকারে কে যেন ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ দেখলে পাথরের মূর্তি মনে হয়। মাথুর ডাকলেন, 'কে ওখানে?'

'আমি ওলেয়া।'

'ওখানে কী করছেন?'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখছি। আমার একটি ছেলে চাঁদে এ্যাকসিডেন্ট করে মারা গিয়েছিল। আপনার হয়তো মনে আছে।'

'আছে। কিন্তু এত দূরে এসে চাঁদ দেখছেন? আপনার ঘর থেকেই তো দেখা

যায়।'

'তা যায়। আমি এসেছিলাম আপনার কাছে। এসে দেখি সুরা গল্প করছেন আপনার সঙ্গে, তাই বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম।'

'বলুন কী বলবেন।'

'আমাকে ছুটি দিন আপনি। বিজ্ঞানীরা তো কিছুই করতে পারছেন না। শুধু শুধু এখানে বসে থেকে কী হবে? মরবার আগে আমি আমার ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে থাকতে চাই।'

'তা হয় না ওলেয়া।'

'কেন হয় না?'

'আপনি চলে গেলে অন্য সবাই চলে যেতে চাইবে। সিরান–পল্লীতে কেউ থাকবে না।'

'নাই–বা থাকল, থেকে কী লাভ?'

'শেষ মুহূর্তে আমরা একটা বুদ্ধি তো পেয়েও যেতে পারি।'

'আপনি বড় আশাবাদী মাথুর।'

'হয়তো আমি আশাবাদী। কিন্তু আপনি নিজেও তো জানেন, পৃথিবী আরো একবার মহাসংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। সৌর বিস্ফোরণে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। অথচ দু' 'শ বছর আগের বিজ্ঞানীরাই সে সমস্যার সমাধান করেছেন। আমরা তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি জানি, আমাদের ক্ষমতা অনেক বেশি।'

ওলেয়া অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়লেন। শুকনো গলায় বললেন, 'আমি কোনো ভরসা পাচ্ছি না। এই মহাসংকট তুচ্ছ করে ফিহা বেড়াতে চলে গেলেন। আপনি নিজে এখন পর্যন্ত কিছু করতে পারেন নি। সুরার যত প্রতিভাই থাকুক, সে তো শিশুমাত্র, এ অবস্থা––।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল, সুরা উত্তেজিতভাবে হেঁটে আসছেন। হাত দুলিয়ে হাঁটার ভঙ্গিটাই বলে দিচ্ছে একটা কিছু হয়েছে।

'মহামান্য মাথুর।'

'বল।'

'এইমাত্র একটি মেয়ে এসে পৌচেছে। তার হাতে মহামান্য ফিহার নিজস্ব পরিচয়–পত্র রয়েছে।'

'সে কী!'

'মেয়েটি বলল, সে একটি বিশেষ কাজে এসেছে, কী কাজ তা আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বলবে না।'

'কিন্তু ফিহার পরিচয়–পত্র সে পেল কোথায়?'

'ফিহা নিজেই নাকি তাকে দিয়েছেন।'

'আশ্চর্য!'

লী নিজেও বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল। সিরান এলাকায় এমন অবাধে ঘুরে বেড়াবে তা কখনো কল্পনা করে নি। ফিহার ত্রিভুজাকৃতি কার্ডটি মন্ত্রের মতো কাজ করছে। অনেকেই যে বিস্ময়ের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে আছে, তাও সে লক্ষ করল। বুড়োমতো এক ভদ্রলোক বিনীতভাবে লীর নামও জানতে চাইলেন।

মাথুর বললেন, 'শুনেছি আপনি ফিহার কাছ থেকে আসছেন?'

'জ্বি।'

'আপনি কি তাঁর কাছ থেকে কোনো খবর এনেছেন?'

'জ্বি না।'

'তবে?'

'আমি একটা বই নিয়ে এসেছি, আপনি সে বইটি আশা করি পড়বেন।'

'কী নিয়ে এসেছেন?'

'একটি বই।'

লী তার ব্যাগ থেকে বইটি বের করল।

'কী বই এটি?'

'পড়লেই বুঝতে পারবেন। আশা করি আজ রাতেই পড়তে শুরু করবেন।'

মাথুর হাত বাড়িয়ে বইটি নিলেন। বিস্ময়ে তাঁর ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল। লী বলল, 'আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। আমি কি এক গ্লাস পানি খেতে পারি?'

ফিহা গাড়ি থেকে নামলেন সন্ধ্যাবেলা। স্টেশনে আলো জ্বলছিল না। চারদিক কেমন চুপচাপ থমথম করছে। যাত্রী বেশি নেই, যে কয়জন আছে তারা নিঃশব্দে চলাফেরা করছে। বছর পাঁচেক আগেও একবার এসেছিলেন ফিহা। তখন কেমন গমগম করত চারদিক। ট্যুরিস্টের দল হৈহৈ করে নামত। অকারণ ছোটাছুটি, ব্যস্ততা, চেঁচামেচি--চমৎকার লাগত। এখন সব বদলে গেছে। ফিহার কিছুটা নিঃসঙ্গ মনে হল।

'আমার আসতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল।' ফিহা তাকিয়ে দেখলেন, নিকি পৌঁচেছে। নিকিকে তার করা হয়েছিল স্টেশনে থাকার জন্যে। ফিহা বললেন, 'এমন অন্ধকার যে?'

'কদিন ধরেই তো অন্ধকার।'

'কেন?'

'পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ। সমস্তই বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করছেন। জানেন না?'

'না।'

'একটা উপগ্রহ ছাড়া হচ্ছে। এখানকার পৃথিবীর কিছু শিশুকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হবে, যাতে করে শেষ পর্যন্ত মানুষের অস্তিত্ব বেঁচে থাকে। সুরার পরিকল্পনা।'

'অ।'

দু' জনে নীরবে হাঁটতে লাগলেন। ফিহা বললেন, 'সমস্ত বদলে গেছে।'

'হ্যাঁ। সবাই হতাশ হয়ে গেছে। উৎপাদন বন্ধ, স্কুল-কলেজ বন্ধ, দোকানপাট বন্ধ। খুব বাজে ব্যাপার।'

'হুঁ।'

'আপনি হঠাৎ করে এ সময়ে?'

'আমি কিছু ভাবতে এসেছি। নিরিবিলি জায়গা দরকার।'

'টাইফা গ্রহ নিয়ে?'

'হুঁ।'

'আপনার কী মনে হয়? কিছু করা যাবে?'

'জানি না, হয়তো যাবে না, হয়তো যাবে। ঘর ঠিক করেছ আমার জন্যে?'

'জ্বি।'

'আমার একটা কম্পিউটর প্রয়োজন।'

'কম্পিউটর চালাবার মতো ইলেকট্রিসিটি কোথায় পাবেন?'

'ছোটখাটো হলেও চলবে। কিছু হিসাব-টিসাব করব। আছে সে রকম?

'তা আছে।'

বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দু' কামরার ঘর একটা। ফিহার পছন্দ হল খুব। নিকি বড় দেখে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ফিহা বসে বসে খবরের কাগজ দেখতে লাগলেন। এ কয়দিন তাঁর বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। অথচ ইতিমধ্যে বেশ পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীতে। সবচে আগে তাঁর চোখে পড়ল শীতলকক্ষের খবরটি। শীতলকক্ষ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শীতলকক্ষের সমস্ত ঘুমন্ত মানুষদের জাগান হয়েছে, তারা ফিরে গেছে আত্মীয়স্বজনদের কাছে। কী আশ্চর্য।

পৃথিবীতে শীতলকক্ষ স্থাপনের যুগান্তকারী পরিকল্পনা নিয়েছিলেন নেতেনটি। ভারি চমৎকার একটি ব্যবস্থা। নব্বুই বছর বয়স হওয়ামাত্র যেতে হবে শীতলকক্ষে। সেখানে তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হবে আরো এক 'শ বছর। এর ভেতর তারা মাত্র পাঁচবার কিছুদিনের জন্যে তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে ফিরে যেতে পারবেন। তারপর আবার ঘুম। ঘুমোতে ঘুমোতেই নিঃশব্দ মৃত্যু। নেতেনটির এই সিদ্ধান্তের খুব বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল প্রথম দিকে, পরে অবশ্য সবাই মেনে নিয়েছিলেন। তার কারণও ছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞান তখন এত উন্নত যে একটি মানুষ অনায়াসে দেড় 'শ বছর বাঁচতে পারে। অথচ নব্বুই বছরের পর তার পৃথিবীকে দেবার মতো কিছুই থাকে না। বেঁচে থাকা সেই কারণেই অর্থহীন। কাজেই শীতলকক্ষের শীতলতায় নিশ্চিন্ত ঘুম। মানুষটি বেঁচে থাকলে তার পিছনে যে খরচটি হত তার লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র খরচ এখানে। হার্টের বিট সেখানে ঘন্টায় দু'টিতে নেমে আসে, দেহের তাপ নামে শূন্য ডিগ্রীর কাছাকাছি। সেখানে শরীরের

প্রোটোপ্লাজমকে[১৪] বাঁচিয়ে রাখতে খুব কম শক্তির প্রয়োজন।

শীতলকক্ষের সব মানুষ জেগে উঠে তাদের প্রিয়জনদের কাছে ফিরে গেছে-- এ খবর ফিহাকে খুব আলোড়িত করল। দু'-তিন বার পড়লেন খবরটি। নিজের মনেই বললেন, 'সত্যিই কি মহাবিপদ? সমস্ত-নিয়ম কানুন ভেঙে পড়ছে এভাবে। না-- তা কেন হবে--'

'যারা কোনো দিন পৃথিবীকে চোখেও দেখল না, তাদের কথা কি কখনও ভেবেছেন ফিহা?'

নিকি চা নিয়ে কখন যে ফিহার সামনে এসে বসেছে এবং চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে, ফিহা তা লক্ষই করেন নি।

'কাদের কথা বলছ নিকি?'

'মানুষদের কথা, যাদের জন্ম হয়েছে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে মহাকাশযানে কিংবা অন্য উপগ্রহে। জানেন ফিহা, পৃথিবীতে ফিরে এসে একবার শুধু পৃথিবীকে দেখবে, এই আশায় তারা পাগলের মতো--'

'নিকি, তুমি জান আমি কবি নই। এসব বাজে সেন্টিমেন্ট আমার ভালো লাগে না।'

'আমি দুঃখিত। চায়ে চিনি হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'আপনার আর কিছু লাগবে, কোনো সহকারী?'

'না, তার প্রয়োজন নেই। তুমি একটা কাজ করবে নিকি?'

'বলুন কি কাজ।'

'আমার বাবা-মা শীতলকক্ষ থেকে বেরিয়ে হয়তো আমাকে খুঁজছেন।'

'তাঁদের এখানে নিয়ে আসব?'

'না না। তাঁরা যেন আমার খোঁজ না পান' আমি একটা জটিল হিসাব করব। খুব জটিল।'

'ঠিক আছে।'

রাতে বাতি নিভিয়ে ফিহা সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন। মাথার কাছে মোমবাতি রেখে দিলেন। রাত-বিরেতে ঘুম ভেঙে গেলে আলো জ্বালিয়ে পড়তে ভালোবাসেন, এই জন্যে। চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছে, এমন সময় একটি অদ্ভুত ব্যাপার হল। ফিহার মনে হল ঘরের ভিতর কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারে আবছা মতো একটা মূর্তি দেখতে পেলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে?'

'আমি।'

'আমিটি কে?'

'বলছি। দয়া করে বাতি জ্বালাবেন না।'

ফিহা নিঃশব্দে বাতি জ্বালালেন। আশ্চর্য। ঘরে কেউ নেই। তিনি বাতি হাতে

বাইরের বারান্দায় দাঁড়ালেন। চাঁদ উঠেছে আকাশে। চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে।

'কাল সকালে ডাক্তারের কাছে যাব। আমি অসুস্থ, আবোল–তাবোল দেখছি। জটিল একটা অঙ্ক করতে হবে আমাকে। এ সময়ে মাথা ঠান্ডা রাখা প্রয়োজন।' ফিহা মনে মনে বললেন।

বাকি রাতটা তাঁর বারান্দায় পায়চারি করে কাটল।

মাথুর ঘরের উজ্জ্বল আলো নিভিয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে দিলেন। 'সমস্ত বইটা পড়তে আমার এক ঘন্টার বেশি লাগবে না।' মনে মনে এই ভাবলেন। আসন্ন বিপদের হয়তো তাতে কোনো সুরাহা হবে না, তবু তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরে। সে তুলনায় এ তো অনেক বড় অবলম্বন। স্বয়ং ফিহা বলে পাঠিয়েছেন যেখানে।

রাত জেগে জেগে মাথুরের মাথা ধরেছিল। চোখ করকর করছিল। তবু তিনি পড়তে শুরু করলেন। বাইরে অনেক রাত। বারান্দায় খ্যাপার মতো হাঁটছেন সুরা। খটখট শব্দ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকক্ষে। সমস্ত অগ্রাহ্য করে মাথুর পড়ে চললেন। মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে বলতে লাগলেন, 'আশ্চর্য। কী আশ্চর্য। তা কী করে হয়? না না অসম্ভব।'

''—–আমি নিশ্চিত বলতে পারি যিনি এই বই পড়ছেন, রূপকথার গল্প *ভেবেই পড়ছেন। অথচ এখানে যা যা লিখেছি একদিন আমি নিজেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। মাঝে মাঝে আমারো সমস্ত ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। মনে হয়, হয়তো আমার মাথার দোষ হয়েছিল, বিকারের ঘোরে কত কী দেখেছি। কিন্তু আমি জানি মস্তিষ্ক বিকৃতিকালীন স্মৃতি পরবর্তী সময়ে এত স্পষ্ট মনে পড়ে না। তখনি সমস্ত ব্যাপারটাকে সত্য বলে মনে হয়। বড়রকমের হতাশা জাগে। ইচ্ছে করে মরে যাই। ঘুমুতে পারি না, খেতে পারি না, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। এই জাতীয় অস্থিরতা ও হতাশা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি লিখতে শুরু করলাম এই আশায়, যে, কেউ একদিন আমার লেখা পড়ে সমস্তই ব্যাখ্যা করতে পারবে। অনেক সময়ই তো দেখা গেছে আজ যা রহস্য, কাল তা সহজ স্বাভাবিক সত্য। আজ যা বুদ্ধির অগম্য, কাল তা–ই সহজ সামান্য ঘটনা।*

আমার সে রাতে ঘুম আসছিল না। বাগানে চেয়ার পেতে বসে আছি। ঘরে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। আনা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে তার মার কাছে বেড়াতে গেছে। বিশেষ কাজ ছিল বলে আমি যেতে পারি নি। ফাঁকা বাড়ি বলেই হয়তো আমার বিষণ্ন লাগছিল। সকাল সকাল শুয়েও পড়েছিলাম। ঘুম এল না–– মাথা দপদপ করতে লাগল। এক সময় 'দূর ছাই' বলে বাগানে চেয়ার টেনে বসলাম। এপ্রিল মাসের রাত। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে, খুব সুন্দর জ্যোৎস্না হয়েছে। এত পরিষ্কার আলো যে মনে হতে লাগল অনায়াসে এই আলোতে বই পড়া যাবে। মাঝে

মাঝে মানুষের ভিতরে যে রকম ছেলেমানুষি জেগে ওঠে, আমারো তেমনি জেগে উঠল। খুব ইচ্ছা হতে লাগল একটা বই এনে দেখেই ফেলি না পড়া যায় কিনা। চারদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। নির্জনতায় কেমন ভয়ভয় লাগে, আবার ভালোও লাগে। চুপচাপ বসে আবোল-তাবোল কত কি ভাবছি, এমন সময় একটা হালকা গন্ধ নাকে এল, মিষ্টি গন্ধ। কিছু ভালো লাগে না, অস্বস্তি বোধ হয়। কিসের গন্ধ এটি? বের করতে চেষ্টা করতে লাগলাম এবং অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, গন্ধের তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। হাত-পা অসাড় হয়ে উঠতে লাগল। যতই ভাবছি এইবার উঠে দৌড়ে পালাব, ততই সমস্ত শরীর জমে যাচ্ছে। ভীষণ ভয় হল আমার। সেই সময় ঘুম পেতে লাগল। কিছুতেই ঘুমাব না, নিশ্চয়ই কোনো বিষাক্ত গ্যাসের খপ্পরে পড়েছি, ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ছাড়া ছাড়া কাটা কাটা ঘুম। চোখ মেলতে পারছিলাম না, তবে মিষ্টি গন্ধটা নাকে আসছিল তখনও।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি মনে নেই। ঘুম ভাঙল মাথায় তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে যাচ্ছে, নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে, তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ। চোখ মেলে আমি দিন কি রাত বুঝতে পারলাম না। কোথায় আছি, আশেপাশে কাদের ফিসফিস শব্দ শুনছি কে জানে? চোখের সামনে চোখ-ধাঁধানো হলুদ আলো। বমি করার আগের মুহূর্তে যে ধরনের অস্বস্তি বোধ হয়, সে ধরনের অস্বস্তি বোধ নিয়ে আমি জেগে রইলাম।

বুঝতে পারছি সময় বয়ে যাচ্ছে। আমি একটি অদ্ভুত অবস্থায় আছি। অচেতন নই, আবার ঠিক যে চেতনা আছে তাও নয়। কিছু ভাবতে পারছি না। আবার শারীরিক যাতনাগুলিও সুস্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে। আমার মনে হল দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। চোখের সামনে তীব্র হলুদ আলো নিয়ে আমি যেন অনন্তকাল ধরে জেগে আছি। মাঝে মাঝে একটা বিজবিজ শব্দ কানে আসে-- লক্ষ লক্ষ মৌমাছি এক সঙ্গে উড়ে গেলে যে রকম শব্দ হত, অনেকটা সেই রকম।

আমি কি মারা গেছি? আমি কি পাগল হয়ে গেছি? এই জাতীয় চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। হয়তো আরো কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকলে সত্যি পাগল হয়ে যেতাম। কিন্তু তার আগেই কে যেন মিষ্টি করে বলল, 'একটু ধৈর্য ধরুন, খুব অল্প সময়।'

স্পষ্ট গলার স্বর, নিখুঁত উচ্চারণ। আমার শুনতে একটুও অসুবিধে হল না। সমস্ত মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত করে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আপনি কে? আমার কী হয়েছে?'

গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরুল না। কিন্তু তবুও শুনলাম কেউ যেন আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, সেই আগের মিষ্টি নরম গলা।

'একটু কষ্ট করুন। অল্প সময়। খুব অল্প সময়। বলুন আমার সঙ্গে, এক--'

'এক।'

'বলুন, দুই।'

আমি বললাম। সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তেই থাকল। হাজার ছাড়িয়ে লক্ষ ছাড়িয়ে বাড়তেই থাকল, বাড়তেই থাকল। আমি নেশাগ্রস্তের মতো আওড়াতে থাকলাম। আমার চোখের উপর উজ্জ্বল হলুদ আলো, বুকের ভেতর হা হা করা তৃষ্ণা। অর্ধ-চেতন অবস্থায় একটি অচেনা অদেখা ভৌতিক কণ্ঠের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটির পর একটি সংখ্যা বলে চলছি। যেন কত যুগ কত কাল কেটে গেল। আমি বলেই চলেছি-- বলেই চলেছি।

এক সময় মাথার ভিতর সব জট পাকিয়ে গেল। নিঃশ্বাস ফেলার মতো অতি সামান্যতম বাতাসও যেন আর নেই। বুক ফেটে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। আমি প্রাণপণে বলতে চেষ্টা করলাম, 'আর নয়, আমাকে মুক্তি দিন। আমি মরে যেতে চাই -- আমি মরে যেতে চাই।'

আবার সেই গলা, 'এইবার ঘুমিয়ে পড়ুন।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম নেমে এল। আহা কী শান্তি! কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছি দ্রুত। হলুদ আলো ফিকে হয়ে আসছে। শারীরিক যন্ত্রণাগুলো ভোঁতা হয়ে আসছে--শরীরের প্রতিটি কোষ যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা, কী শান্তি!

জানি না কখন ঘুম ভাঙল। খুব স্বাভাবিকভাবে চোখ মেললাম। একটা ধাতব চেয়ারে বসে আছি। চেয়ারটি গোলাকার একটি ঘরের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে। ঠিক আমার মাথার কাছে ছোট্ট একটি নল দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। ঘরের বাতাস যেন একটু ভারি। বাতাসের সঙ্গে লেবু ফুলের গন্ধ মিশে আছে। আমি ভালো করে চারদিক দেখতে চেষ্টা করতে লাগলাম। গোল ঘরটিতে কোনো দরজা-জানালা নেই। চারদিক নিশ্ছিদ্র। ঘরে কোনো বাতি নেই। তবু সমস্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অদৃশ্য কোনো জায়গা থেকে নীলাভ আলো আসছে হয়তো।

আমার তখন প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। কোথায় আছি, আমার কী হয়েছে-- এ সমস্ত ছাড়িয়ে শুধুমাত্র একটি চিন্তাই আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেটি হল ক্ষুধা। আমার ধারণা ছিল, হয়তো আগের মতো কথা বলতে পারব না, তবু বললাম, 'আমি কোথায় আছি?'

সে শব্দ পরিষ্কার শোনা গেল। গোলাকার ঘরের জন্যই হয়তো সে শব্দ চমৎকার প্রতিধ্বনিত হল। এবং আশ্চর্য, সে শব্দ বাড়তেই থাকল--

'আমি কোথায় আছি? আমি কোথায় আছি? আমি কোথায় আছি--?'

এক সময় যেন মনে হল লক্ষ লক্ষ মানুষ এক সঙ্গে চিৎকার করছে। আমি নিজের গায়ে চিমটি কাটলাম। দশ থেকে এক পর্যন্ত উল্টো দিকে গুণলাম, আমি কি অচেতন অবস্থায় এসব শুনছি, না সত্যি কিছু জ্ঞান এখনো অবশিষ্ট আছে, তা জানার জন্যে।

এখন লিখতে খুব অবাক লাগছে, সেই অবস্থাতেও কী করে আমি এতটা স্বাভাবিক ছিলাম! অবশ্যি সে সময়ে আমার মনে হয়েছিল সম্ভবত আমার মাথায়

চোট লেগে মস্তিষ্কের কোনো এক অংশ অকেজো হয়ে পড়েছে। অবাস্তব দৃশ্যাবলী দেখছি। এক সময় প্রচন্ড খিদে সত্ত্বেও আমার ঘুম পেল। ঘুমিয়ে পড়বার আগের মুহূর্তেও শুনতে পেলাম সমুদ্রগর্জনের মতো কোলাহল।

'আমি কোথায় আছি? আমি কোথায় আছি--?'

কতক্ষণ এভাবে কাটিয়েছিলাম মনে নেই। এক সময় সমস্ত জড়তা কেটে গিয়ে শরীর ঝরঝরে হয়ে গেল। খিদে নেই, তৃষ্ণা নেই, আলস্য নেই। যেন ছুটির দুপুরবেলাটা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছি। চোখ মেলতে ভয় লাগছিল, কে জানে আবার হয়তো সেই সব আজগুবি ব্যাপার দেখতে থাকব। কান পেতে আছি যদি কিছু শোনা যায়। না, কোনো সাড়াশব্দ নেই। চারদিক সুনসান।

'তোমার চা।'

চমকে তাকিয়ে দেখি আনা, আমার স্ত্রী, দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনের সঙ্গী হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। ঝকঝকে রোদ উঠেছে বাইরে। আমি শুয়ে আছি আমার অতি পরিচিত বিছানায়। টেবিলের উপর আগের মতো আগোছাল বইপত্র পড়ে আছে। কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! আমি প্রায় লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লাম। চেঁচিয়ে বললাম,

'আনা আমার কী হয়েছে?'

আনা চায়ের পেয়ালা হাতে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করেই মনে হল, এই মেয়েটি অন্য কেউ, এ আনা নয়। যদিও সেই চোখ, সেই ঢেউ খেলান বাদামী চুল, গালের মাঝামাঝি লাল রঙের কাটা দাগ। আমি ভয়ে কাতর গলায় বললাম, 'তুমি কে? তুমি কে?'

'আমি আনা।'

'না তুমি আনা নও।'

'আমি কি দেখতে আনার মতো নই?'

'দেখতে আনার মতো হলেও তুমি আনা নও।'

'বেশ নাই-বা হলাম, চা নাও।'

আমি আবার বললাম, 'দয়া করে বল তুমি কে?'

'বলছি। সমস্তই ধীরে ধীরে জানবে।'

'আমি কোথায় আছি?'

'তুমি তোমার পৃথিবী থেকে বহু দূরে। ভয় পেয়ো না, আবার ফিরে যাবে। তোমাকে আনা হয়েছে একটা বিশেষ প্রয়োজনে।'

'কারা আমাকে এখানে এনেছে?'

'এখানে যাদের বাস, তারা এনেছে। যারা আমাকে তৈরি করেছে তারা। চতুর্মাত্রিক জীবেরা[১৫]।'

'তোমাকে তৈরি করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমাকে তৈরি করা হয়েছে তোমার সুখ ও সুবিধার জন্যে। তাছাড়া আমি তোমাকে অনেক কিছু শেখাব। আমার মাধ্যমেই তুমি এদের সঙ্গে কথা বলবে।'

'কাদের সঙ্গে কথা বলব?'

'যারা তোমাকে নিয়ে এসেছে।'

'যারা আমাকে নিয়ে এসেছে তারা কেমন? তারা কি মানুষের মতো?'

'তাদের তুমি দেখতে পাবে না। এরা চতুর্মাত্রিক জীব। পৃথিবীর মানুষ ত্রিমাত্রিক[১৬] জিনিসই শুধু দেখতে পায় ও অনুভব করতে পারে। সেগুলি তাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চতুর্মাত্রিক জগৎ তোমাদের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে না।'

শুনতে শুনতে আমার গা ছমছম করতে লাগল। এসব কী বলছে সে। ভয় পেয়ে আমি মেয়েটির হাত ধরলাম। এই অদ্ভুত তৈরি পরিবেশে তাকেই আমার একান্ত আপন জন মনে হল। মেয়েটি বলল, 'আমাকে তুমি আনা বলেই ভাববে। আনার সঙ্গে যেভাবে আলাপ করতে, সেইভাবেই আলাপ করবে। আমাকে ভয় পেয়ো না। তোমার যা জানতে ইচ্ছে হবে আমার কাছ থেকে জেনে নেবে। আমি তো তোমাকে বলেছি, আবার তুমি ফিরে যাবে তোমার সত্যিকার আনার কাছে।'

আমি বললাম, 'এই যে আমি আমার ঘরে শুয়ে আছি, নিজের বইপত্র টেবিলে পড়ে আছে, এসবও কি আমার মতো পৃথিবী থেকে আনা হয়েছে?'

'এইগুলি আনতে হয় নি। তৈরি করা হয়েছে। ইলেকট্রন, প্রোটন এই সব জিনিস দিয়ে তৈরি হয় এটম। বিভিন্ন এটমের বিভিন্ন অনুপাতে তৈরি হয় এক একটি বস্তু। ঠিক তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'কোনো বস্তুর প্রতিটি ইলেকট্রন, প্রোটন কী অবস্থায় আছে এবং এটমগুলি কীভাবে আছে, সেগুলি যদি জানা থাকে এবং ঠিক সেই অনুপাতে যদি ইলেকট্রন, প্রোটন এবং এটম রাখা যায় তবেই সেই বস্তুটি তৈরি হবে। ঠিক তো?'

'হয়তো ঠিক।'

'কিছু শক্তি খরচ করলেই হল। এইভাবেই তোমার ঘর তৈরি হয়েছে। আমিও তৈরি হয়েছি। এখানকার জীবরা মহাশক্তিধর। এই হচ্ছে তোমার প্রথম পাঠ। হ্যাঁ, এবার চা খাও। দাও, চায়ে চুমুক দাও।'

আমি চায়ে চুমুক দিলাম। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি আনা অল্প অল্প হাসছে। আমার সে মুহূর্তে এই মেয়েটিকে সত্যি সত্যি আনা বলেই ভাবতে ইচ্ছে হল।

আমার নিজের অনুভূতি কখনো খুব একটা চড়া সুরে বাঁধা ছিল না। সহজ স্বাভাবিক জীবনযাপন করে এসেছি। হঠাৎ করেই যেন সব বদলে গেল। নিজেকে যদিও ঘটনাপ্রবাহের উপর সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছিলাম, তবু একটা ক্ষীণ আশা সব

সময় লালন করেছি--হয়তো এক সময় দেখব আশেপাশে যা ঘটছে সমস্তই মায়া, হয়তো একটা দুঃস্বপ্ন দেখছি। এক্ষুণি স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠব। মেয়েটি বলল, 'কী ভাবছ?'

'কিছু ভাবছি না। আচ্ছা একটা কথা--'

'বল।'

'কী করে এসেছি আমি এখানে?'

'সেই জটিল প্রক্রিয়া বোঝবার উপায় নেই।'

'এটা কেমন জায়গা?'

'কেমন জায়গা তা তোমাকে কী করে বোঝাব? তুমি ত্রিমাত্রিক জগতের লোক, আর এটি হচ্ছে চতুর্মাত্রিক জগৎ।'

'কিছুই দেখা যাবে না?'

'চেষ্টা করে দেখ। যাও, বাইরে পা দাও। দরজাটা আগে খোল। কী দেখছ?'

আমার সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল। চারিদিকে ঘন ঘোলাটে হলুদ আলো। পেটের ভেতরে চিনচিনে ব্যথা। মাথা ঘুরতে লাগল আমার।

'থাক আর দেখবার কাজ নেই, এসে পড়।'

আমার মনে হল মেয়েটি যেন হাসছে আপন মনে। আমি চুপ করে রইলাম। মেয়েটি বলল, 'তুমি অল্প কিছুদিন থাকবে এখানে। তারপর তোমাকে পাঠান হবে একটা ত্রিমাত্রিক জগতে, সেখানে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

আমি বললাম, 'তুমি থাকবে তো সঙ্গে?'

'নিশ্চয়ই। আমি তোমার এক জন শিক্ষক।'

'আচ্ছা একটা কথা--।'

'বল।'

'এখানকার জীবদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ কী করে হয়?'

'আমি জানি না।'

'তাদের সম্বন্ধে কিছুই জান না?'

'না।'

'তাদের সঙ্গে তোমার কথা হয় না?'

'না।'

'আমার সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা হবে তা তাদের কী করে জানাবে?'

'তাদের জানাতে হবে না। আমি কি নিজের থেকে কিছু বলি তোমাকে? যা বলি সমস্তই ওদের কথা। চুপ করে আছ কেন? তোমাকে তো আগেই বলেছি, তুমি তোমার নিজের জায়গায় ফিরে যাবে।'

'তোমাকে ধন্যবাদ।'

দিন-রাত্রির কোনো তফাৎ ছিল না বলেই আমি ঠিক বলতে পারব না,

ক'দিন সেই ছোট্ট ঘরটিতে ছিলাম। ক্ষুধা–তৃষ্ণা আগের মতোই হয়। নিজের বাসায় যে ধরনের খাবার খাওয়া হত, সেই ধরনের খাবারই দেওয়া হয় এখানে, আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হল সেই মেয়েটি, যে দেখতে অবিকল আনার মতো, অথচ আনা নয়। খুবই আশ্চর্যের কথা, মেয়েটির সঙ্গে আমার ভারি ঘনিষ্ঠতা হল। মাঝে মাঝে আমার প্রচন্ড ভ্রম হত এ হয়তো সত্যি আনা। সে এমন অনেক কিছুই বলতে পারত, যা আনা ছাড়া অন্য কারো বলা সম্ভব নয়। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এসব কী করে জানলে?'

মেয়েটি হেসে বলেছে, 'যে সমস্ত স্মৃতি আনার মেমরি সেলে আছে, সে সমস্ত স্মৃতি আমার ভেতরেও তৈরি করা হয়েছে। আনার অনেক কিছুই মনে নেই, কিন্তু আমার আছে।'

আমি এসব কিছুই মেলাতে পারছিলাম না। এ কেমন করে হয়। একদিন নখ দিয়ে আঁচড়ে দিলাম মেয়েটির গালে, সত্যি সত্যি রক্ত বেরোয় কিনা দেখতে। সত্যিই রক্ত বেরিয়ে এল। সে অবাক হয়ে বলল, 'এসব কী ছেলেমানুষি কর?'

'দেখি, তুমি সত্যি মানুষ না অন্য কিছু।'

এর ভেতর আমি অনেক কিছু শিখলাম। অনেক কিছুই বুঝতে পারি নি। আনার আন্তরিক চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞান এমনিতেই আমি কম বুঝি। চতুর্মাত্রিক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল।

'চতুর্মাত্রিক জীবরা কি কোনো খাদ্য গ্রহণ করে?'

'না, করে না।'

'এরা কেমন? অর্থাৎ ব্যাপারটি কী?'

'এরা হচ্ছে ছড়িয়ে থাকা শক্তির মতো? যেমন মনে কর এক গ্লাস পানি। পানির প্রতিটি অণু একই রকম। কোনো হেরফের নেই। সমস্ত অণু মিলিতভাবে তৈরি করেছে পানি। এরাও সে রকম। কারোর কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই। সম্মিলিতভাবেই তাদের পরিচয়। তাদের জ্ঞান সম্মিলিত জ্ঞান।'

'এদের জন্ম–মৃত্যু আছে?'

'শক্তি তো সব সময় অবিনশ্বর নয়। এরও বিনাশ আছে। তবে আমি ঠিক জানি না কী হয়।'

'জ্ঞান–বিজ্ঞানের চর্চা কী রকম হয়?'

'কী রকম হয় বলতে পারব না, তবে তারা দ্রুত সৃষ্টির মূল রহস্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।'

একদিন আনা বলল, 'আজ তোমাকে ত্রিমাত্রিক গ্রহে নিয়ে যাওয়া হবে।'

আমি বললাম, 'সেখানে আমি নিঃশ্বাস ফেলতে পারব তো?' আনা হো হো করে হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই। সেটি তোমার নিজের গ্রহ বলতে পার। তোমার জন্মের

প্রায় দু হাজার বৎসর পর পৃথিবীর মানুষের একটা ছোট্ট দল এখানে এসেছিল। তারপর আরো তিন হাজার বৎসর পার হয়েছে। মানুষেরা চমৎকার বসতি স্থাপন করেছে সেখানে। ভারি সুন্দর জায়গা!'

'আমার জন্মের পাঁচ হাজার বৎসর পরের মানুষদের কাছে আমি কী করে যাব?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি চতুর্মাত্রিক জগতে আছ। এখানে ত্রিশ হাজার বৎসর আগেও যা, ত্রিশ হাজার বৎসর পরেও তা।'

'তার মানে আমার বয়স কখনো বাড়বে না?'

'নিশ্চয়ই বাড়বে। শরীরবৃত্তির নিয়মে তুমি বুড়ো হবে।'

'কিন্তু ভবিষ্যতে যাওয়ার ব্যাপারটা কেমন?'

'তুমি কি একটি সহজ সত্য জান?'

'কী সত্য?'

'তুমি কি জান যে, কোনো যন্ত্রযানের গতি যদি আলোর গতির চেয়ে বেশি হয়, তবে সেই যন্ত্রযানে করে ভবিষ্যতে পাড়ি দেয়া যায়?'

'শুনেছি কিছুটা।'

'চতুর্মাত্রিক জগৎ একটা প্রচন্ড গতির জগৎ। সে গতি আলোর গতির চার গুণ বেশি। সে গতি হচ্ছে ঘূর্ণায়মান গতি। তুমি নিজে চতুর্মাত্রিক জগতে আছ। কাজেই অবিশ্বাস্য গতিতে ঘুরছ। যে গতি অনায়াসে সময়কে অতিক্রম করে।'

'কিন্তু আমি যতদূর জানি-- কোনো বস্তুর গতি যখন আলোর গতির কাছাকাছি আসে, তখন তার ভর অসীম হয়ে যায়।'

'তা হয়।'

'তাহলে তুমি বলতে চাও আমার ভর এখন অসীম?'

'না। কারণ তুমি বস্তু নও, তুমি এখন শক্তি।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তুমি তৈরি হয়ে থাক। তোমাকে নিয়ে ত্রিমাত্রিক জগতে যাব এবং তার পরই তোমার কাজ শেষ।'

ভিতরে ভিতরে আমি তীব্র কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। কী করে কী হচ্ছে? আমাকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত কী করা হবে, তা জানার জন্যে আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, এত উদ্যোগ আয়োজন নিশ্চয়ই কোনো একটি অশুভ শক্তির জন্যে।

দাঁতের ডাক্তারের কাছে দাঁত তুলতে গেলে যেমন বুক-কাঁপান আতঙ্ক নিয়ে বসে থাকতে হয়, বিভিন্ন গ্রহে যাবার জন্যে আমি তেমনি আতঙ্ক নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

যদিও অন্য একটি গ্রহে যাবার কথা ভেবে আতঙ্কে আমার রক্ত জমে যাচ্ছিল, তবু যাত্রাটা কী করে হয়, তা জানার জন্যে প্রচন্ড কৌতূহলও অনুভব করছিলাম। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটি এত হঠাৎ করে হল যে, আমি ঠিক কী যে হচ্ছে তাই বুঝতে পারলাম না।

দেখলাম চোখের সামনে থেকে আচমকা পরিচিত ঘরটি অদৃশ্য হয়েছে। চারিদিকে চোখ-ধাঁধান হলুদ আলো--যার কথা আমি আগেও অনেক বার বলেছি। মাথার ভিতরে তীক্ষ্ণ তীব্র যন্ত্রণা। যেন কেউ সূক্ষ্ম তলোয়ার দিয়ে সাঁই করে মাথাটি দু' ফাঁক করে ফেলেছে। ঘুরঘুর করে উঠল পেটের ভিতর, পা ও হাতের পাতাগুলি জ্বালা করতে লাগল। আগেই বলেছি সমস্ত ব্যাপারটি খুব অল্প সময়ের ভিতর ঘটে গেল। সমস্ত অনুভূতি উল্টেপাল্টে যাবার আগেই দেখি চৌকোণা একটি ঘরে আমি দাঁড়িয়ে আছি একা, মেয়েটি পাশে নেই। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, তার চারপাশে অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি। চকচকে ঘড়ির ডায়ালের মতো অজস্র ডায়াল। কোনোটির কাঁটা স্থির হয়ে আছে। বড় বড় লিভার জাতীয় কিছু যন্ত্র। গঠনভঙ্গি দেখে মনে হয় হাত দিয়ে চাপ দেবার জন্যে তৈরি। টাইপ রাইটারের কী-বোর্ডের মতো বোতামের রাশ। প্রতিটিতেই হালকা আলো জ্বলছে। মাথার ঠিক উপরে সাঁ সাঁ করে পাখা ঘুরছে। পাখাটির আকৃতিও অদ্ভুত। ফুলের কুঁড়ি ফুটে উঠছে, আবার বুঁজে যাচ্ছে--এই রকম মনে হয়। কোনো বাতাস আসছে না সেখান থেকে। পিঁ পিঁ করে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ হচ্ছে কেবল। হঠাৎ পরিষ্কার শুনলাম, 'দয়া করে অল্প কিছু সময় অপেক্ষা করুন। বড় বড় করে নিঃশ্বাস ফেলুন। আলোর বেগে এসেছেন আপনি এখানে। আপনার শরীরের প্রতিটি অণু থেকে গামা রশ্মি[১৭] বিকিরণ হচ্ছে, আমরা এটি বন্ধ করছি। কিছুক্ষণের ভিতরেই আপনি আসবেন আমাদের মধ্যে। আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি।'

আমি চুপ করে কথাগুলি শুনলাম। যেভাবে বলা হল সেভাবেই নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলাম। আবার তাদের গলা শোনা গেল, 'আপনি দয়া করে আমাদের কতগুলি প্রশ্নের জবাব দিন।'

আমি বললাম, 'প্রশ্ন করুন, আমি জবাব দিচ্ছি।'

'আপনার কি ঘুম পাচ্ছে?'

'না।'

'আপনার কি মাথা ধরেছে?'

'কিছুক্ষণ আগে ধরেছিল, এখন নেই।'

'আচ্ছা বলুন তো ঘরে কী রঙের আলো জ্বলছে?'

'নীল।'

'ভালো করে বলুন, সবুজ নয় তো?'

'না, সবুজ নয়।'

'হালকা নীল?'

'না, ঘন নীল। আমাদের পৃথিবীর মেঘশূন্য আকাশের মতো।' উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তা একটু যেন হকচকিয়ে গেলেন। কারণ পরবর্তী কিছুক্ষণ আর কোনো প্রশ্ন শোনা গেল না।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রশ্নকর্তা এবার থেমে থেমে বললেন, 'আপনি কি জানেন, আমাদের পূর্বপুরুষ একদিন পৃথিবী থেকেই এ গ্রহে এসেছিলেন?'

'আমি জানি।'

'আপনি আমাদের একান্ত আপন জন। আপনি এখানে এসেছেন, সেই উপলক্ষে আজ আমাদের জাতীয় ছুটির দিন।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী আশ্চর্য! আপনারা জানতেন আমি এসেছি?'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনাদের এ গ্রহের নাম?'

'টাইফা।'

আমি লক্ষ করলাম, ঘরের নীল আলো কখন চলে গেছে। সবুজাভ আলোয় ঘর ভরে গেছে। আমি বললাম, 'শুনুন, আমি এবার সবুজ আলো দেখছি।'

বলবার সঙ্গে সঙ্গে একটি অংশ নিঃশব্দে ফাঁক হয়ে যেতে লাগল। আমি দেখলাম অসংখ্য কৌতূহলী মানুষ অপেক্ষা করছে বাইরে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি সেই গ্রহ থেকে এসেছি, যেখান থেকে তাদের পূর্বপুরুষ একদিন রওয়ানা হয়েছিল। অজানা সেই গ্রহের জন্যে সমস্ত ভালোবাসা এখন হাত বাড়িয়েছে আমার দিকে।

যাঁরা আমার চার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বেশ বয়স্ক। একটু অবাক হয়ে লক্ষ করলাম দীর্ঘ পাঁচ হাজার বৎসর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গ্রহে কাটিয়ে মানুষের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। সাধারণ মানুষের চেয়ে শুধু একটু লম্বা, চেহারা একটু সবুজাভ--এই পরিবর্তনটাই চট করে চোখে পড়ে। চোখগুলি অবশ্য খুব উজ্জ্বল। মনে হয় অন্ধকারে বেড়ালের চোখের মতো আলো ছড়াবে।

'আমার নাম ক্রিকি।' বলেই তাদের একজন আমার ঘাড়ে হাত রাখলেন। অল্প হেসে বললেন, 'আপনি আমাদের কথা ঠিক বুঝতে পারছেন তো?'

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। লম্বাটে ধরনের মুখ, ঢেউ খেলান লম্বা চুল। মুখভর্তি দাড়ি গোঁফে একটা জঙ্গুলে চেহারা। আমি বললাম, 'খুব ভালো বুঝতে পারছি। আপনারা কি এই ভাষাতেই কথা বলেন?'

'না, আমরা আমাদের ভাষাতেই কথা বলছি। আমাদের সবার সঙ্গেই অনুবাদক যন্ত্র আছে। আসুন, আমার নিজের ঘরে আসুন।'

আমার খুব ইচ্ছে করছিল, বাইরে ঘুরে ঘুরে সব দেখি। এখানকার আকাশ কী রকম? গাছপালাই-বা কেমন দেখতে। প্রথম দিকে আমার যে নিস্পৃহ ভাব ছিল

এখন আর সেটি নেই। আমি তীব্র উত্তেজনা অনুভব করছিলাম, যা-ই দেখছি তা-ই আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে। ক্রিকি বললেন, 'আমাদের এই গবেষণাগারে চারটি ভাগ আছে। সবচেয়ে জটিল এবং সবচেয়ে জরুরী বিভাগ হচ্ছে সময় পরিভ্রমণ বিভাগ। জটিলতম কারিগরি বিদ্যা কাজে খাটান হয়েছে। এখান থেকেই সময়ের অনুকূলে ও প্রতিকূলে যাত্রা করান হয়। যেমন আপনি এলেন। তার পরই আছে অনঅধীত গণিত বিভাগ। দু'রকম গণিত আছে, একটি হচ্ছে ব্যবহারিক, অন্যটি অনঅধীত-- অর্থাৎ যে গণিত এখনো কোনো কাজে খাটান যাচ্ছে না। আমাদের এখানকার গণিত বিভাগটি হচ্ছে অনঅধীত গণিত বিভাগ।

'তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগটি কি?'

'তৃতীয়টি হচ্ছে পদার্থবিদ্যা বিভাগ, চতুর্থটি প্রতি-পদার্থ[১৮] বিভাগ। এ দুটির কাজ হচ্ছে অনঅধীত গণিতকে ব্যবহারিক গণিতে পরিণত করা। আসুন আমি আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। আপনি ক্লান্ত নন তো?'

'না না, আমি ঠিক আছি। আমার সব দেখেশুনে বেড়াতে খুব ভালো লাগছে।'

'প্রথমে আপনাকে নিয়ে যাব গণিত বিভাগে। অবশ্য সেটি আপনার ভালো লাগবে না।'

গণিত বিভাগ দেখে আমি সত্যিই হকচকিয়ে গেলাম। হাসপাতালের লম্বা ঘরের মতো মস্তো লম্বা ঘর। রুগীদের যেমন সারি সারি বিছানা থাকে, তেমনি দু'ধারে বিছানা পাতা। তাদের মধ্যে অদ্ভুত সব বিকৃত শরীর শুয়ে আছে। সবারই বয়স পনের থেকে কুড়ির ভিতরে। আমাদের দেখতে পেয়ে তারা নড়েচড়ে বসল।

ক্রিকি বললেন, 'আপনি যে কয়দিন এখানে থাকবেন, সে কয়দিন আপনাকে গণিত বিভাগেই থাকতে হবে। গণিত বিভাগের প্রধান-- যিনি এই গবেষণাগারের মহা পরিচালক, তাঁর তাই ইচ্ছে।'

আমি ক্রিকির কথায় কান না দিয়ে বললাম, 'এরা কারা?' প্রশ্ন শুনে ক্রিকি যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। অবশ্যি আমি তখন খুব অবাক হয়ে সারবন্দী পড়ে থাকা এই সব অসুস্থ ছেলেদের দিকে তাকিয়ে আছি। কারো হাত-পা শুকিয়ে সুতার মতো হয়ে গিয়েছে, কারো চোখ নেই, কেউ ধনুকের মতো বেঁকে পড়ে আছে। কারো শরীরে আবার দগদগে ঘা। আমি আবার বললাম, 'এরা কারা বললেন না?'

ক্রিকি থেমে থেমে বললেন, 'এরা গণিতবিদ। টাইফা গ্রহের গণিতের যে জয়-জয়কার, তা এদের জন্যেই।' কথা শেষ না হতেই শুয়ে-থাকা অন্ধ একটি ছেলে চেঁচিয়ে বলল, 'টাইফা গ্রহের উন্নত গণিতের মুখে আমি থুতু দিই।' বলেই সে থুঃ করে একদলা থুতু ফেলল। ক্রিকি বললেন, 'এই ছেলেটার নাম নিনাষ। মহা প্রতিভাবান।'

আমি বললাম, 'এরা এমন পঙ্গু কেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ক্রিকি বললেন, 'মায়ের পেটে থাকাকালীন এদের জীনে[১৯] কিছু অদলবদল করা হয়েছে। যার ফলে মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশের বিশ্লেষণী ক্ষমতা হাজার গুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু ওরা ঠিক মানবশিশু হয়ে গড়ে ওঠে নি। সুতীব্র গামা রশ্মির রেডিয়েশনের ফলে যে সমস্ত জীন শরীরের অন্য অংশ নিয়ন্ত্রণ করত, তা প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার ফলস্বরূপ এই বিকলাঙ্গতা। বিজ্ঞান সব সময়ই কিছু পরিমাণে নিষ্ঠুর।'

'এরা কি জন্ম থেকেই অঙ্কবিদ?'

'না। বিশিষ্ট অঙ্কবিদরা এদের বেশ কিছুদিন অঙ্ক শেখান।'

'কিন্তু এ তো ভীষণ অন্যায়।'

ক্রিকি বললেন, 'না, অন্যায় নয়। শারীরিক অসুবিধে ছাড়া এদের তো অন্য কোনো অসুবিধে নেই। তাছাড়া এরা মহা সম্মানিত। বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে সব সময় কিছু ব্যক্তিগত ত্যাগের প্রয়োজন।'

'এ রকম কত জন আছে?'

'আছে বেশ কিছু। কারো কারো কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ এখনো শিখছে।'

'কত দিন কর্মক্ষমতা থাকে?'

'পাঁচ থেকে ছ'বছর। অত্যধিক পরিশ্রমে এদের মস্তিষ্কের নিওরোন নষ্ট হয়ে যায়।'

'তাদের দিয়ে কী করা হয় তখন?'

'সেটা নাই-বা শুনলেন।'

'কিন্তু আমি এদের সম্বন্ধে জানতে চাই। দয়া করে বলুন। বৎসরে কত জন এমন বিকলাঙ্গ শিশু আপনারা তৈরি করেন?'

'সরকারী নিয়মে প্রতিটি মেয়েকে তার জীবদ্দশায় একবার প্রতিভাবান শিশু তৈরির জন্য গামা রশ্মি বিকিরণের সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। তবে সবগুলি তো আর সফল হয় না। চলুন যাই অন্য ঘরগুলো ঘুরে দেখি।'

আমার যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। আমি দেখলাম, হাতে একতাড়া কাগজ নিয়ে এক জন হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এল অন্ধ ছেলেটির কাছে। ব্যস্ত হয়ে ডাকল, 'নিনাষ, নিনাষ।'

'বলুন।'

'এই হিসাবটা একটু কর। নবম নৈরাশিক গতি ফলকে বৈদ্যুতিক আবেশ দ্বারা আয়নিত করা হয়েছে, পটেনশিয়ালের পার্থক্য ছয় দশমিক শূন্য তিন মাইক্রোভোল্ট। আউটপুটে কারেন্ট কতো হবে?'

'বারো এম্পিয়ার হবার কথা, কিন্তু হবে না।'

লোকটি লাফিয়ে উঠে বলল, 'কেন হবে না?

'কারণ নবম নৈরাশিক একটি ভেক্টর সংখ্যা। কাজেই গতির দিকনির্ভর। ভেক্টরের সঙ্গে স্কেলারের যোগ এভাবে করা যায় না।'

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। ক্রিকিকে বললাম, 'আমি এই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করতে পারি?'

ক্রিকি একটু দোমনা ভাবে বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

আমি নিনাষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমি তোমার বন্ধু। তোমার সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই।'

'আমার কোনো বন্ধু নেই। চলে যাও এখান থেকে, নয়তো তোমার গায়ে থুতু দেব।'

ক্রিকি বললেন, 'আপনি চলে আসুন। এরা সবাই কিছু পরিমাণে অপ্রকৃতিস্থ। আসুন আমরা পদার্থবিদ্যা বিভাগে যাই।'

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, 'আমার বিশ্রাম প্রয়োজন, আমার মাথা ঘুরছে।'

ক্রিকি আমার হাত ধরে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'আপনি বিশ্রাম করুন। আমি পরে এসে আপনাকে নিয়ে যাব।' অবাক হয়ে দেখি আনার মতো দেখতে মেয়েটি সেই ঘরে হাসিমুখে বসে আছে। তাকে দেখে কেমন যেন ভরসা হল। সে বলল, 'এই জায়গা কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

'নাও, খাবার খাও। এখানকার খাবার ভালো লাগবে খেতে।'

টেবিলে বিচিত্র ধরনের রকমারি খাবার ছিল। সমস্তই তরল। যেন বিভিন্ন বাটিতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ গুলে রাখা হয়েছে। ঝাঁঝালো ধরনের টক টক লাগল। যা দিয়েই তৈরি হোক না কেন, খুবই সুস্বাদু খাবার। মেয়েটি বলল, 'তুমি খুব শিগগীরই দেশে ফিরবে।'

'কবে?'

'তোমার হিসাবে এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে।'

'কিন্তু কী জন্য আমাকে এখানে আনা হয়েছে? আমাকে দিয়ে তোমরা কী করাতে চাও?'

মেয়েটি বলল, 'গণিত বিভাগের প্রধানের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?'

'না, হয় নি।'

'তিনি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলবেন।'

গণিত বিভাগের প্রধানের সঙ্গে ঘন্টাখানেকের মধ্যে আলাপ হল। ক্রিকি আমাকে নিয়ে গেল তাঁর কাছে। গোলাকার একটি ঘরের ঠিক মধ্যিখানে তিনি বসে ছিলেন। ঘরে আর দ্বিতীয় কোনো আসবাব নেই। সে ঘরে একটা জিনিস আমার খুব চোখে লাগল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সমস্তই গাঢ় সবুজ রঙে রাঙান। এমন কি যে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন, তার রঙও গাঢ় সবুজ। আমাকে দেখে ভদ্রলোক

অত্যন্ত মোটা গলায় বলে উঠলেন, 'আমি গণিত বিভাগের প্রধান মিহি। আশা করি আপনি ভালো আছেন।'

আমি হকচকিয়ে গেলাম। অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ণ চোখের চাউনি। আমার ভেতরটা যেন কেটে কেটে দেখে নিচ্ছে। শক্ত সমর্থ চেহারা--সমস্ত চোখে-মুখে অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের ভাব। তিনি বললেন, 'ক্রিকি তুমি চলে যাও। আর আপনি বসুন।'

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, 'কোথায় বসব? মেঝেতে?'

'হ্যাঁ। কোনো আপত্তি আছে? আপত্তি থাকলে আমার চেয়ারে বসুন।' বলে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বললাম, 'আমার বসবার তেমন প্রয়োজন নেই। আপনি কী বলবেন বলুন।'

'আপনি কি জানেন, কী জন্যে আপনাকে এখানে আনা হয়েছে?'

'না, জানি না।'

'কোনো ধারণা আছে?'

'কোনো ধারণা নেই।'

'বলছি। তার আগে আমার দু'-একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো। আপনি যে ভবিষ্যতে পাঁচ হাজার বৎসর পাড়ি দিয়েছেন সে সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে?'

'না, আমার কোনো ধারণা নেই।'

'আপনি যে উপায়ে ভবিষ্যতে চলে এসেছেন সে উপায়ে অতীতেও চলে যেতে পারেন। নয় কি?'

'আমি ঠিক জানি না। আমাকে নিয়ে কী করা হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে না পারলেও খুব অসুবিধে নেই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মানুষের জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ।'

'আমি কিছুই জানি না। স্কুলে আমি সমাজবিদ্যা পড়াতাম। বিজ্ঞান সম্পর্কে আমি একেবারে অজ্ঞ।'

'আপনাকে বলছি--মন দিয়ে শুনুন। মানুষ কিছুই জানে না। তারা সময়কে অতিক্রম করতে পারে না। শূন্য ও অসীম--এই দুইয়ের প্রকৃত অর্থ জানে না। সৃষ্টির আদি রহস্যটা কী, তাও জানে না। পদার্থের সঙ্গে শক্তির সম্পর্ক তার জানা, কিন্তু তার সঙ্গে সময়ের সম্পর্কটা অজানা। প্রতি-পদার্থ কী তা সে জানে, কিন্তু প্রতি-পদার্থে সময়ের ভূমিকা কী, তা সে জানে না। অথচ জ্ঞানের সত্যিকার লক্ষ্য হচ্ছে এই সমস্ত রহস্য ভেদ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই সব রহস্য মানুষ কখনো ভেদ করতে পারবে না, তার ফলস্বরূপ একটি ক্ষুদ্র গন্ডিতে

ক্রমাগত ঘুরপাক খাওয়া। আপনি বুঝতে পারছেন?'

'*বুঝতে চেষ্টা করছি।*'

'*একটা সামান্য জিনিস ভেবে দেখুন, NGK১২৩২০ গ্রহটিতে মানুষ কখনো যেতে পারবে না। আলোর গতিতেও যদি সে যায়, তবু তার সময় লাগবে এক লক্ষ বৎসর।*'

'সেখানে যাওয়া কি এতই জরুরি?'

'নিশ্চয়ই জরুরি। অবিকল মানুষের মতো, একচুলও হেরফের নেই-- এ জাতীয় প্রাণের বিকাশ হয়েছে সেখানে। অপূর্ব সে গ্রহ! মানুষের সমস্ত কল্পনাকে অতিক্রম করেছে তার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য। অথচ মানুষ কখনো তার নাগাল পাবে না। তবে--'

'তবে কী?'

'যদি মানুষকে বদলে দেয়া যায়, যদি তাদের মুক্তি দেয়া হয় ত্রিমাত্রিক বন্ধন থেকে, যদি তাদের নিয়ে আসা যায় চতুর্মাত্রিক জগতে-- তবেই অনেক কিছু তাদের আয়ত্তে এসে যাবে। তার জন্যে দরকার চতুর্মাত্রিক জগতের মহাজ্ঞানী শক্তিশালী জীবদের সাহায্য। মানুষ অবশ্যি ত্রিমাত্রা থেকে চতুর্মাত্রায় রূপান্তরের আদি সমীকরণের প্রথম পর্যায় শুরু করেছে। এবং তা সম্ভব হয়েছে একটি মাত্র মানুষের জন্যে। সে হচ্ছে ফিহা।'

'ফিহা?'

'হ্যাঁ, ফিহা। তার অসাধারণ মেধার তুলনা মেলা ভার। অথচ তিনি সঠিক পথে এগুচ্ছেন না। এই সমীকরণের দুটি সমাধান আছে। তিনি একটি বের করেছেন, অন্যটি বের করতে চেষ্টা করছেন না।'

'কিন্তু এখানে আমার ভূমিকাটি কী? আমি কী করতে পারি?'

'আপনি অনেক কিছুই করতে পারেন। চতুর্মাত্রিক জীবরা ফিহাকে চান। ফিহার অসামান্য মেধাকে তাঁরা কাজে লাগাবেন।'

'বেশ তো, আমাকে তাঁরা যে ভাবে এনেছেন, ফিহাকেও সেভাবে নিয়ে এলেই তো হয়।'

'সেই ভাবে নিয়ে আসা যাচ্ছে না বলেই তো আপনাকে আনা হয়েছে। সিরানরা পৃথিবীর মানুষদের ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মি২১ থেকে বাঁচানর জন্যে পৃথিবীর চারদিকে শক্তিবলয়২২ তৈরি করেছে। চতুর্মাত্রিক জীবরা শক্তিবলয় ভেদ করতে পারেন না, মানুষ যা অনায়াসেই পারে। সেই কারণে ফিহাকে আনা যাচ্ছে না।'

'আমি সেখানে গিয়ে কী করব?'

'ফিহাকে নিয়ে আসবেন আপনি। সম্ভব না হলে ফিহাকে হত্যা করবেন।'

'আপনি এসব কী বলছেন!'

'যান বিশ্রাম করুন গিয়ে, এ নিয়ে পরে আলাপ হবে। যান যান। দাঁড়িয়ে

থাকবেন না।'

আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেরিয়ে এলাম। এই মুহূর্তে আমার সেই মেয়েটিকে প্রয়োজন। সে হয়তো অনেক কিছু বুঝিয়ে বলবে আমাকে। গিয়ে দেখি মেয়েটি কৌচের উপর ঘুমিয়ে রয়েছে। শ্রান্ত মানুষেরা যেমন ঘুমোয়, অবিকল তেমনি।

এত নিখুঁত মানুষ যারা তৈরি করতে পারে তাদের আমার হঠাৎ দেখতে ইচ্ছে হল। এরাই কি ঈশ্বর? সৃষ্টি এবং ধ্বংসের অমোঘ ক্ষমতা হাতে নিয়ে বসে আছে? প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে মহাপুরুষদের কথা আছে, তাঁরা ইচ্ছেমতো মৃতকে জীবন দিতেন। ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে পারতেন। কে জানে হয়তো মহাক্ষমতার অধিকারী চতুর্মাত্রিক জীবদের দ্বারাই এসব হয়েছে। নকল মানুষ তৈরি করে তাদের দিয়ে ভেলকি দেখিয়েছে। আনার মতো মানুষ যারা নিখুঁত ভাবে তৈরি করে, তাদের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়।

আনাকে ঘুমন্ত রেখেই বেরিয়ে এলাম। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালাম কিছু সময়। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় মনে হল পথ হারিয়েছি। আমার নিজের ঘরটিতে ফিরে যাব, তার পথ পাচ্ছি না। কাউকে জিজ্ঞেস করে নিই ভেবে একটা বন্ধ দরজায় টোকা দিলাম। খুব অল্প বয়স্ক এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত, 'আসুন, আসুন। আপনার কাছে যাব বলে তৈরি হচ্ছিলাম। সত্যি বলছি।'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'কী করেন আপনি?'

'আমি এক জন ডাক্তার।'

'এখানে ডাক্তারও আছেন নাকি?'

'নিশ্চয়ই। মস্ত বড় টীম আমাদের। আমি একজন স্নায়ু বিশেষজ্ঞ। আমরা সবাই মিলে একটা ছোট্ট গবেষণাগার চালাই।'

'খুব অল্প বয়স তো আপনার!'

'না না, যত অল্প ভাবছেন তত অল্প নয়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ছাড়া কি বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়?' বলেই ভদ্রলোক হো হো করে হাসতে লাগলেন, যেন খুব একটা মজার কথা।

'জানেন, আমার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন থেকেই আমি এখানে। একটি দিনের জন্যেও এর বাইরে যেতে পারি নি। সেই বয়স থেকে স্নায়ু নিয়ে কারবার আমার। বাজে ব্যাপার।'

'তার মানে এই দীর্ঘ সময়ে একবারও আপনি বাবা-মার কাছে যান নি?'

'না। এমনকি আমার নিজের গ্রহটি সত্যি দেখতে কেমন তাও জানি না। তবে শুনেছি সেটি নাকি অপূর্ব। বিশেষ করে রাতের বেলা। অপূর্ব সব রঙ তৈরি হয় বলে শুনেছি। তাছাড়া দিন-রাত্রি সব সময় নাকি হু হু করে বাতাস বইছে। আর সেখানকার ঘরবাড়ি এমনভাবে তৈরি যে একটু বাতাস পেলেই অপূর্ব বাজনার

মতো আওয়াজ হয়।'

'আপনি কি কখনো যেতে পারেন না সেখানে?'

ডাক্তার অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কী করে যাব? আমাদের এই সম্পূর্ণ গবেষণাগারটি একটি চতুর্মাত্রিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা।'

'তার মানে?'

'একটা ডিম কল্পনা করুন। কুসুমটি যেন আমাদের গবেষণাগার, একটি ত্রিমাত্রিক জগৎ। ডিমের সাদা অংশটি হল চতুর্মাত্রিক জগৎ এবং শক্ত খোলটি হচ্ছে আমাদের প্রিয় গ্রহ টাইফা।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরকম করা হল কেন?'

'চতুর্মাত্রিক জীবদের খেয়াল। তবে আপনাকে একটা ব্যাপার বলি শুনুন, ঐ সব মহাপুরুষ জীবদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য, সমস্ত ত্রিমাত্রিক জগৎ বিলুপ্ত করা। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই গবেষণাগার। বুঝতে পারছেন?'

'না।'

'না পারলেই ভালো।'

'আপনি কি এসব সমর্থন করেন না?'

'না। কেন করব? আমি বাইরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের খবর কিছু কিছু রাখি। আমি জানি ফিহা ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণের কাজে হাত দিয়েছেন। অসম্ভব মেধা তাঁর। সমীকরণের সমাধান হওয়ামাত্র চতুর্মাত্রিক জগতের রহস্যভেদ হয়ে যাবে মানুষের কাছে, বুঝলেন? আর এতেই মাথা ঘুরে গেছে সবার। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তারা ফিহাকে নিয়ে আসবার জন্যে। কিন্তু কলা! কাঁচকলা! ফিহাকে আনতে গিয়ে কাঁচকলাটি খাও।'

আমি লক্ষ করলাম ডাক্তার ভদ্রলোক ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। হাত নাড়তে নাড়তে বললেন, 'মানুষেরা পৃথিবীর চারিদিকে শক্তিবলয় তৈরি করেছে। কিন্তু চতুর্মাত্রিক জীবদেরও সাধ্য নেই, সেই বলয় ভেদ করে। হাঃ হাঃ হাঃ--।'

হাসি থামলে কাতর গলায় বললাম, 'আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। দয়া করে আমায় আমার ঘরটি দেখিয়ে দেবেন? আমার কিছুই ভালো লাগছে না।'

তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। অবসন্ন ভাবে হাঁটছি। কী হতে যাচ্ছে কে জানে। আবছা আলোয় রহস্যময় লম্বা করিডোর। দুই পাশের প্রকাণ্ড সব কামরা বিচিত্র সব যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। অথচ এদের কোনো কিছুর সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই। আমি আমার জায়গায় ফিরে যেতে চাই, যেখানে আমার স্ত্রী আছে, আমার দু'টি অবোধ শিশু আছে-- দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে অবোধ ভালোবাসা আছে।

পরবর্তী দু' দিন, অনুমানে বলছি-- সেখানে পৃথিবীর মতো দিন-রাত্রি নেই, আমার ওপর বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল। একেক বার একেকটি ঘরে ঢুকি।

বিকট সব যন্ত্রপাতি আমার চারপাশে বসান হয়। তারপর ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা। একটি পরীক্ষা শেষ না হতেই অন্যটি শুরু। বিশ্রাম নেই, নিঃশ্বাস ফেলার অবসরটুকু নেই। আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করি না। কী হবে প্রশ্ন করে? নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি ভাগ্যের হাতে। ক্লান্তিতে যখন মরমর হয়েছি, তখন বলা হল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন চব্বিশ ঘন্টা পূর্ণ বিশ্রাম। তারপর আমাকে পাঠান হবে পৃথিবীতে।

সমস্ত দিন ঘুমালাম। ঘুম ভাঙল দরজায় মৃদু টোকার শব্দ শুনে।

'গণিত বিভাগের একটি ছেলে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। কিছু বলবে, খুব জরুরি।' রোগামতো লোকটি খুব নিচু গলায় বলল কথাগুলি।

আমি বললাম, 'কে সে?'

'নিনাষ। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।'

আমি নীরবে তাকে অনুসরণ করলাম। আমার মনে হল কিছু একটা হয়েছে, থমথম করছে চারদিক। আনার মতো মেয়েটিও নেই কোথাও।

সবাই যেন অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। আমি যেতেই উৎসুক হয়ে নড়ে-চড়ে বসল সবাই। 'তুমি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলে?'

নিনাষ বলল, 'হ্যাঁ। আপনি জানেন কি, টাইফা গ্রহ অদৃশ্য হয়েছে?'

'আমি কিছুই জানি না।'

'তাহলে আমার কাছ থেকে জানুন। অল্প কিছুক্ষণ হল সমস্ত গ্রহটি চতুর্মাত্রিক গ্রহে পরিণত করা হয়েছে। কেমন করে জানলাম? ত্রিমাত্রিক গ্রহকে চতুর্মাত্রিক গ্রহে পরিণত করার নির্দিষ্ট হিসাব আমরা করেছি। আমরা সব জানি। শুধু যে টাইফা গ্রহই অদৃশ্য হয়েছে তাই নয়, একটি বৃত্তাকার স্থান ক্রমশই চতুর্মাত্রিক জগতে প্রবেশ করছে এবং আপনার পৃথিবী সেই বৃত্তের ভিতরে। বুঝলেন?'

আমি বললাম, 'আমার তাহলে আর প্রয়োজন নেই?'

'এই মুহূর্তে আপনাকেই তাদের প্রয়োজন। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই চুপ করে বসে নেই। নিশ্চয় তারা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে চেষ্টা করবে--ফিহার মতো বিজ্ঞানী যেখানে আছেন। আমি খুব ভালো করে জানি, মহাজ্ঞানী ফিহা একটা বুদ্ধি বের করবেনই। যাক, ওসব ছেড়ে দিন। আপনাকে কী জন্যে পাঠান হবে জানেন?'

'না।'

'আপনাকে পাঠান হবে, যেন ফিহা পৃথিবী রক্ষার কোনো পরিকল্পনা করতে না পারেন, তাই দেখতে। ফিহার যাবতীয় কাগজপত্র আপনাকে নষ্ট করে ফেলতে বলবে। এমন কি প্রয়োজন হলে আপনাকে বলবে ফিহাকে হত্যা করতে। কিন্তু শুনুন, তা করতে যাবেন না। বুঝতে পারলেন? টাইফা গ্রহ চলে গেছে--পৃথিবী যেন না যায়।'

ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি আনা হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। আমাকে বলল,

'সুসংবাদ। তুমি অল্প কিছুক্ষণের ভিতর পৃথিবীতে যাবে। তোমাকে কী করতে হবে তা মিহি বুঝিয়ে বলবেন।'

'আনা, চতুর্মাত্রিক জীবরা যখন তোমার মতো মানুষ তৈরি করতে পারে, তখন ওদের পাঠালেই পারত পৃথিবীতে, ওরাই করতে পারত যা করার।'

'তৈরি মানুষ শক্তিবলয় ভেদ করতে পারে না।'

'কিন্তু আনা, তোমরা আমাকে যা করতে বলবে তা আমি করব না।'

'নিনাষ কিছু বলেছে তোমাকে, না?'

'ঠিক সে জন্যে নয়। আমার মন বলছে আমি যা করব তা অন্যায়।'

'বাজে কথা রাখ--তুমি করবেই।'

'আমি করবই? যদি না করি?'

'না করলে ফিরে যেতে পারবে না তোমার স্ত্রী-পুত্রের কাছে। খুব সহজ সত্য। তুমি কি তোমার ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যেতে চাও না?'

'চাই।'

'তা ছাড়া আরেকটা দিক ভেবে দেখ। তোমার তো কিছু হচ্ছে না। তুমি তোমার কাজ শেষ করে পৃথিবীতে নিজের ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যাবে। তারও পাঁচ হাজার বছর পর পৃথিবীর পরিবর্তন হবে। তার আগে নয়। এস, মিহির কাছে যাই, তিনি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন। ও কি, তুমি কাঁদছ নাকি?'

'না, আমি ঠিক আছি।'........."

বইটি অর্ধসমাপ্ত। এরপর আর কিছু নেই। উত্তেজনায় মাথুর হাঁপাতে লাগলেন। সেই মেয়েটি কোথায়, যে তাকে এই বইটি দিয়ে গেছে? তার সঙ্গে এই মুহূর্তে কথা বলা প্রয়োজন। মাথুর ঘরের বাতি নিভিয়েই বেরিয়ে এলেন। বাইরে ভোরের আলো ফুটেছে। ঘুমন্ত সিরান-পল্লীর ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে নির্জন পথ। মাথুরের অল্প শীত করছিল। মেয়েটি কোথায় আছে তা তিনি জানেন। দরজায় টোকা দিতেই লী বলল,

'কে?'

'আমি। আমি মাথুর।'

লী দরজা খুলে দিল। মাথুর খুব ঠান্ডা গলায় বললেন,

'বইটির শেষ অংশ কোথায়?'

'শেষ অংশ আমি পাই নি। আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি।'

মাথুর ধীরে ধীরে বললেন, 'লোকটি তার অভিজ্ঞতার কথা লিখে যেতে পেরেছে। তার মানেই হল সে ফিরে এসেছে নিজের জায়গায়। অর্থাৎ তার উপর যে দায়িত্ব ছিল তা সে পালন করেছে। সহজ কথায় ফিহাকে পৃথিবী রক্ষার কোনো পরিকল্পনা করতে দেয় নি। ফিহাকে আমাদের বড্ডো প্রয়োজন।'

মাথুর আপন মনে বিড়বিড় করে উঠলেন, এক সময় নিঃশব্দে উঠে এলেন।

নিকি ঘরে ঢুকে থমকে গেল।

সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে ফিহা শুয়ে আছেন। ন'টার মতো বাজে। এই সময় তিনি সাধারণত আঁক কষেন, নয়তো দুলেদুলে বাচ্চাদের মতো বই পড়েন। নিকি বলল, 'আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে?'

ফিহা বললেন, 'শরীর নয়, মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কাল সারারাত আমি ভূত দেখেছি।'

'ভূত!'

'হ্যাঁ, জ্বলজ্যান্ত ভূত। মানুষের গলায় কথা বলে। বাতি জ্বাললেই চলে যায়। আবার ঘর অন্ধকার করলে ফিরে আসে। অদ্ভুত ব্যাপার। সকালবেলা শুয়েশুয়ে তাই ভাবছি।'

নিকি বলল, 'রাত-দিন অঙ্ক নিয়ে আছেন। মাথাকে তো আর বিশ্রাম দিচ্ছেন না, সেই জন্যে এসব হচ্ছে। ভালো করে খাওয়াদাওয়া করুন। এক জন ডাক্তার আনব?'

'না না, ডাক্তার-ফাক্তার লাগবে না। আর বিশ্রামের কথা বলছ? সময় তো খুব অল্প। যা করতে হয় এর ভেতর করতে হবে।'

নিকি দেখল, ফিহা খুব সহজভাবে কথা বলছেন। সাধারণত দুটি কথার পরই তিনি রেগে যান। গালিগালাজ করতে থাকেন। রাগ খুব বেশি চড়ে গেলে হাতের কাছে যে কাগজটা পান তা কুচিকুচি করে ফেলেন। রাগ তখন একটু পড়ে। নিকি ভাবল, রাতে নিশ্চয়ই এমন কিছু হয়েছে, যার জন্যে আজ ফিহার গলায় এরকম নরম সুর। নিকি চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'কী হয়েছিল ফিহা। ভূতটা কি আপনাকে ভয় দেখিয়েছিল?'

'না, ভয় দেখায় নি। বরং খুব সম্মান করে কথা বলেছে। বলেছে, এই যে চারিদিকে রব উঠেছে মহাসংকট, মহাসংকট--এসব কিছু নয়। শুধুমাত্র পৃথিবীর ডাইমেনশন বদলে যাবে, আর নতুন ডাইমেনশনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুবর্ণ সুযোগ। এবং সেখানে নাকি আমার মতো বিজ্ঞানীর মহা সুযোগ-সুবিধা। কাজেই আমি যেন এমন কিছু না করি যাতে এই মহাসংকট কেটে যায়। এই সব।'

'আপনি তার কথা শুনে কী করলেন?'

'প্রথমে কাঁচের গ্লাসটা ছুঁড়ে মেরেছি তার দিকে। তারপর ছুঁড়ে মেরেছি এ্যাসট্রেটা। এতেও যখন কিছু হল না, তখন বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছি।'

নিকি অবাক হয়ে বলল, 'আমার যেন কেমন কেমন লাগছে। সত্যি কি কেউ এসেছিল?'

'আরে না। আসবে আবার কি? ত্রিমাত্রিক জগৎকে চতুর্মাত্রিক জগতে পরিণত

করবার জন্যে আমি এক সময় কতকগুলি ইকোয়েশন সমাধান করেছিলাম, জান বোধ হয়? গত কয়েক দিন ধরেই কেন জানি বারবার সে কথা মনে হচ্ছে। তাই থেকে এসব দেখছি। মাথা গরম.হলে যা হয়। বাদ দাও ওসব। তুমি কি চা দেবে এক কাপ?'

'আনছি, এক্ষুণি নিয়ে আসছি।'

রাত্রি জাগরণের ফলে ফিহা সত্যি সত্যি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আগে ভেবে রেখেছিলেন, আজ সমস্ত দিন কাজ করবেন এবং সমস্ত দিন কোনো খাবার খাবেন না। ফিহা সব সময় দেখেছেন যখন তাঁর পেটে এক কণা খাবার থাকে না, ক্ষুধায় সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসে, তখন তাঁর চিন্তাশক্তি অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। বিস্ময়কর যে কয়টি আবিষ্কার তিনি করেছেন, তা ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই করেছেন। আজ অবশ্যি কিছু করা গেল না। পরিকল্পনা অনুযায়ী নিকি সকালের খাবার দিয়ে যায় নি। গত রাতে যদি এই জাতীয় আধিভৌতিক ব্যাপারগুলি না হত, তাহলে এতক্ষণে কাজে লেগে পড়তেন।

'এই নিন চা। আমি সঙ্গে কিছু বিস্কিটও নিয়ে এসেছি।'

'খুব ভালো করেছ।'

নিকি একটু ইতস্তত করে বলল, 'ফিহা, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'বল, বল।'

'আগে বলুন আপনি হাসবেন না?'

'হাসির কথা হলেও হাসব না?'

'হাসির কথা নয়। আমি--মানে আমার মনে ক'দিন ধরেই একটা ভাবনা হচ্ছে, আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না।'

ফিহা বললেন, 'বলেই ফেল। কোনো প্রেমের ব্যাপার নাকি?'

'না না, কী যে বলেন! আমার মনে হয় আমরা যদি পৃথিবীটাকে সরিয়ে দিতে পারি তার কক্ষপথ থেকে, তাহলে বিপদ থেকে বেঁচে যেতে পারি। নয় কি?'

ফিহা হো হো করে হেসে ফেললেন। নিকি বলল,

'কেন, পৃথিবীটাকে কি সরান যায় না?'

'নিশ্চয়ই যায়। তুমি যদি মঙ্গল গ্রহটা পরম পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাহায্যে গুঁড়িয়ে দাও, তাহলেই সৌরমন্ডলে মধ্যাকর্ষণজনিত সমতা ব্যাহত হবে। এবং পৃথিবী ছিটকে সরে যাবে।'

'তা হলেই তো হয়। পৃথিবীকে নিরাপদ জায়গায় এই করে সরিয়ে নিলেই হয়।'

'কিন্তু একটা গ্রহ উড়িয়ে দিলে যে প্রচন্ড বিস্ফোরণ হবে তাতে পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাবে। আর পৃথিবীকে অল্প একটু সরালেই তো

জীবনধারণ একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠবে। ধর, পৃথিবী যদি সূর্যের একটু কাছে এগিয়ে আসে, তাহলেই উত্তাপে সুমেরু–কুমেরুর যাবতীয় বরফ গলে মহাপ্লাবন। আর সূর্য থেকে একটু দূরে সরে গেলে শীতে আমাদের শরীরের প্রোটোপ্লাজম পর্যন্ত জমে যাবে। বুঝলে?'

নিকির চেহারা দেখে মনে হল সে ভীষণ হতাশ হয়েছে। ফিহা চুপচাপ চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি এখন আর তাঁর নেই। নিকির সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি নিজেও একটু উৎসাহিত হয়ে পড়েছেন। নিকির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন,

'আমি অবাক হয়ে লক্ষ করছি, প্রতিটি মেয়ে পৃথিবী রক্ষার জন্যে এক–একটি পরিকল্পনা বের করে ফেলেছে। ট্রেনে আসবার পথে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা, সেও নাকি কী বই পেয়েছে কুড়িয়ে, পাঁচ হাজার বছরের পুরনো বই–– তাতেও নাকি পৃথিবী কী করে রক্ষা করা যায় তা লেখা আছে। হা–হা–হা।'

নিকি চুপ করে রইল। বেচারী বেশ লজ্জা পেয়েছে। লাল হয়ে উঠেছে চোখ–মুখ। ফিহা বললেন, 'নিকি, তুমি কি আমার কথায় লজ্জা পেয়েছ?'

'না।'

'এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে, তোমরা সবাই কিছু–না–কিছু ভাবছ। আমার ভেতর কোনো রকম ভাবালুতা নেই। তবু তোমাদের এসব কান্ডকারখানা দেখে মনে হয়, যে পৃথিবীর জন্যে সবার এত ভালোবাসা–– তা নষ্ট হয় কী করে!'

নিকি বলল, 'আপনি কিছু ভাবছেন ফিহা?'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। ঠান্ডা মাথায় ভাববার জন্যেই তো এমন নির্জন জায়গায় এসেছি। আমি প্রাণপণে বের করতে চেষ্টা করছি কী জন্যে এমন হচ্ছে। সেই বিশেষ কারণটি কী হতে পারে, যার জন্যে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সমস্ত গ্রহ–নক্ষত্র লাপাত্তা হয়ে যাচ্ছে। অথচ সেই নির্দিষ্ট জায়গার বাইরে কিছুই হচ্ছে না। যেই মুহূর্তে কারণ জানা যাবে, সেই মুহূর্তে পৃথিবী রক্ষার উপায় একটা কিছু হবেই। আমার বয়স হয়েছে, আগের মতো খাটতে পারি না, তবু মাথার ধার একটুও ভোঁতা হয় নি। তুমি বিশ্বাস কর আমাকে।'

আবেগে নিকির চোখে পানি এল। ফিহার চোখে পড়লে তিনি রেগে যাবেন, তাই সে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'একটু আসছি।'

ফিহা ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। হাতে সিগারেট জ্বলছে। হেঁটে বেড়াচ্ছেন ঘরের ভেতর। মনে মনে বলছেন, 'কিছু একটা করা প্রয়োজন। কিন্তু কী করে সেই কিছু একটা হবে, তাই ভেবে পাচ্ছেন না। অন্ধকারে হাতড়ানর কোনো মানে হয় না। ফিহা গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, 'নিকি।'

নিকি দৌড়ে এল' ফিহা বললেন, 'আমি মাথুরের সঙ্গে একটু আলাপ করি,

কী বল? ঐ মেয়েটা কী কাণ্ডকারখানা করে বেড়াচ্ছে তা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই। আমি এক্ষুণি যোগাযোগ করে দিচ্ছি।'

মাথুরের চিন্তাশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছে। লীর নিয়ে আসা বইটির শেষ অংশ নেই, এতেই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। এদিকে ফিহার কোনো খোঁজ নেই। সিরান-পল্লীর বিজ্ঞানীরা তাঁকে বয়কট করেছেন। কাজকর্ম চালাচ্ছে সুরা। সুরা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে, 'মাথুরের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' সমস্তই মাথুরের কানে আসে। মহাকাশ প্রযুক্তি-বিদ্যা গবেষণাগারের তিনি মহাপরিচালক, অথচ তাঁর হাতে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নেই।

মাথুর সময় কাটান শুয়ে শুয়ে। নিজের ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার কথা মনেও হয় না তাঁর। দশ থেকে পনেরটি খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। কাজ বলতে এই। রাতের বেলা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ঘুমুতে যান। ঘুম হয় না, বিছানায় ছটফট করেন।

সেদিনও খবরের কাগজ দেখছিলেন। সরকারী নির্দেশ থাকার জন্যেই কোথাও মহাবিপদের কোনো উল্লেখমাত্র নেই, অথচ সমস্ত খবরের মূল কথাটি হচ্ছে, বিপদ এগিয়ে আসছে পায়ে-পায়ে। পাতায় পাতায় লেখা, শহরে আইনশৃঙ্খলা নেই, খাদ্য সরবরাহ বিঘ্নিত, যানবাহন চলাচল বন্ধ, কল-কারখানার কর্মীরা কাজ ছেড়ে বিনা নোটিশে বাড়ি চলে যাচ্ছে। ছয় জন তরুণী আতঙ্ক সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে বসেছে। পড়তে পড়তে মাথুরের মনে হল তিনি নিজেও কি আত্মহত্যা করে বসবেন কোনো দিন?

ট্রিইই, ট্রিইই।

যোগাযোগের স্বচ্ছ পর্দা নীলাভ হয়ে উঠল। মাথুর চমকে তাকালেন সেদিকে। এ সময়ে তাঁর সঙ্গে কে কথা বলতে চায়?

'মাথুর, আমি ফিহা বলছি। কেমন আছ তোমরা?'

মাথুর উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন। 'পাওয়া গেছে, ফিহাকে পাওয়া গেছে।'

'মাথুর, লী বলে সেই পাগলা মেয়েটি এসেছিল?'

'জ্বি এসেছিল।'

'সে কি এখনো আছে তোমার কাছে?'

'না, সে চলে গেছে। ফিহা, আপনার সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা ছিল।'

'কী কথা? আমি এখন একটু ব্যস্ত।'

'শত ব্যস্ত থাকলেও আপনাকে শুনতে হবে। আপনি কি ইদানীং কোনো আজগুবি ব্যাপার দেখেছেন, কেউ এসে কি আপনাকে ভয়টয় দেখাচ্ছে?'

ফিহা একটু অবাক হলেন। থেমে থেমে বললেন, 'তুমি জানলে কী করে!

নিকি কি এর মধ্যেই তোমাকেও এসব জানিয়ে বসে আছে?'

'না না, নিকি নয়। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। আপনাকে সব বোঝান যাবে না। তা ছাড়া সময়ও খুব কম।'

'বেশ, তাহলে জরুরী কথাটাই সেরে ফেল।'

'আপনি ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণের সমাধান করেছিলেন?'

'করেছিলাম, তা তো তোমার মনে থাকা উচিত।'

'মনে আছে ফিহা। কিন্তু আপনার সমীকরণের দুটি সমাধান ছিল।'

'দুটি নয় একটি। অন্যটিতে ইমাজিনারি টার্ম ব্যবহার করা হয়েছিল, কাজেই সেটি বাদ দিতে হবে। কারণ এখানে সমাধানটির উত্তরও ইমাজিনারি টার্মে এসেছিল।'

'ফিহা, আমাদের দ্বিতীয় সমাধানটি দরকার?'

'কেন?'

'দ্বিতীয় সমাধানটি সঠিক সমাধান।'

'মাথুর, একটা কথা বলছি, রাগ করো না।'

'বলুন।'

'তোমার মাথায় দোষ হয়েছে। বুঝতে পারছি, এই পরিস্থিতিতে মাথা ঠিক রাখা খুব মুশকিল।'

'আমার মাথা খুব ঠিক আছে। আমি আপনার পায়ে পড়ি, আমার কথা শুনুন।'

'বেশ বেশ বল।'

'দ্বিতীয় সমাধানটি যদি আমরা সঠিক বলে ধরে নিই, তাহলে আমরা নিজেরাই একটি চতুর্মাত্রিক জগৎ তৈরি করতে পারি।'

'হ্যাঁ, তা করা যেতে পারে। কিন্তু সমাধানটি তো ভুল।'

'সমাধানটি ভুল নয়। আমার কাছে তার প্রমাণ আছে। আচ্ছা ফিহা, ধরুন এক দল বিজ্ঞানী একটি নির্দিষ্ট পথের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রকে চতুর্মাত্রায় পরিবর্তিত করছেন, এখন তাঁদের আমরা আটকাতে পারি, যদি সেই পথে আগেই আমরা একটি চতুর্মাত্রিক জগৎ তৈরি করে রাখি।'

'মাথুর, তোমার কথায় আমি যেন কিসের ইঙ্গিত পাচ্ছি। মাথুর, এসব কী বলছ?'

'আমি ঠিক কথাই বলছি ফিহা। আপনি কি সমাধানটি নিজে এখন একটু পরীক্ষা করবেন?'

ফিহা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমি করছি, আমি এক্ষুণি করছি। আর তুমি নিজেও করে দেখ, সুরাকে বল করে দেখতে। সমাধানটি লিখে নাও।'

ফিহা একটির পর একটি সংখ্যা বলে যেতে লাগলেন।

মাথুর এক মনে লিখে চললেন। দু' জনের চোখ-মুখ জ্বলজ্বল করছে।

সন্ধ্যা হয় নি তখনো, শেষ বিকেলের লালচে আলো গাছের পাতায় চিকচিক করছে। ফিহা বারান্দায় চেয়ার পেতে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বিকাল হলেই তাঁর মনে এক ধরনের বিষণ্ন অনুভূতি হয়।

নিকি চায়ের পেয়ালা হাতে বাইরে এসে দেখে, ফিহা ভ্রূ কুঁচকে দূরের গাছপালার দিকে তাকিয়ে আছেন। বাতাসে তাঁর রূপালি চুল তিরতির করে উড়ছে। নিকি কোমল কণ্ঠে ডাকল, 'ফিহা।'

ফিহা চমকে উঠে ফিরে তাকালেন। নিচু গলায় প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'নিকি! আমার মনে হয় জ্ঞান–বিজ্ঞানের সাধনা অর্থহীন।'

নিকি কিছু বলল না, চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। ফিহা বললেন, 'জ্ঞান–বিজ্ঞান তো মানুষের জন্যে, আর একটি মানুষ কতদিন বাঁচে? তার মৃত্যুর সাথে সাথেই জ্ঞান–বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সব সম্পর্কের ইতি। ঠিক নয় কি?'

নিকি শক্ত মুখে বলল, 'না ঠিক নয়।' ফিহা চুপ করে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। একটু অস্বস্তির সাথে নিকি বলল, 'দেখুন ফিহা, আপনার সাথে তর্ক করা আমার সাজে না। কিন্তু নবম গণিত সম্মেলনে আপনি একটা ভাষণ দিয়েছিলেন––।'

'কী বলেছিলাম আমার মনে নেই।'

'বলেছিলেন, মানব জাতি জন্মমুহূর্তেই একটা অত্যন্ত জটিল অঙ্ক কষতে শুরু করছে। এক–এক যুগে এক–এক দল মানুষ এসেছে, আর সে জটিল অঙ্কের এক একটি ধাপ কষা হয়েছে। অজানা নতুন নতুন জ্ঞান মানুষের ধারণায় এসেছে।'

'বেশ।'

'আপনি বলেছিলেন, একদিন সে অঙ্কটির সমাধান বের হবে। তখন স[illegible] রহস্যই এসে যাবে মানুষের আওতায়। বের হয়ে আসবে মূল রহস্য কী। [illegible] ছুটি হচ্ছে সেই দিন।'

ফিহা বললেন, 'এইসব বড় বড় কথা অর্থহীন নিকি।'

নিকি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে এলোমেলোভাবে ব[illegible]া ফিহাকে লক্ষ করল। তারপর বলল, 'আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন [illegible]

'না নিকি, আজ আমার মতো সুস্থ আর কেউ নেই। [illegible] থেমে অন্যমনস্ক স্বরে ফিহা বললেন, 'পৃথিবী রক্ষার উপায় বের হয়েছে [illegible]পৃথিবী এবারেও বেঁচে গেল।'

ফিহা বসে বসে সন্ধ্যা মিলান দেখলেন। [illegible]ঠে আসতে দেখলেন। তাঁর মনে হল, এত ঘনিষ্ঠভাবে প্রকৃতিকে তিনি এর[illegible] কখনো দেখেন নি। তাঁর কেমন যেন বেদনাবোধ হতে লাগল। যাব[illegible]কৃতিক সৌন্দর্য মানুষের মনে সুপ্ত

বেদনাবোধ জাগিয়ে তোলে কেন কে জানে! এক সময় নিকি ভিতর থেকে ডাকল, 'ফিহা ভিতরে এসে পড়ুন। ভারি ঠান্ডা পড়েছে।'

ফিহা নিঃশব্দে উঠে এলেন। চাবি ঘুরিয়ে নিজের ঘরের দরজা খুলে বিরক্ত গলায় বললেন, 'আবার-- আবার এসেছ তুমি?'

ভৌতিক ছায়ামূর্তি অন্ধকারে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। তার হাতে অদ্ভুত একটি সুঁচাল যন্ত্র। সে হতাশাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ফিহা।'

'আমি তখনি ক্ষমা করব, যখন তুমি আমার ঘর ছেড়ে চলে যাবে।'

'কিন্তু ফিহা, আমি ঘর ছেড়ে চলে যেতে আজ আসি নি।'

'তবে কী জন্যে এসেছ?'

'আপনাকে হত্যা করতে।'

ফিহা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'তাতে তোমার লাভ?'

'তাহলেই আমি আমার ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যেতে পারব।'

ফিহা মৃদু গলায় বললেন, 'ঠিক আছে। কীভাবে হত্যা করবে?'

'আমার কাছে শক্তিশালী রেডিয়েশন গান আছে মহামান্য ফিহা?'

ফিহা জানালা খুলে দিলেন। বাইরের অপরূপ জোছনা ভাসতে ভাসতে ঘরের ভেতর চলে এল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফিহা অভিভূতের মতো বললেন, 'দেখ দেখ, কী চমৎকার জোছনা হয়েছে!'

ছায়ামূর্তির রেডিয়েশন গানের অগ্নিঝলক সেই জোছনাকে ম্লান করে দিল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যেই। আবার সেই উথাল-পাথাল আলো আগের মতোই নীরবে ফুটে রইল।

পরিশিষ্ট

পৃথিবী কিন্তু ধ্বংস হয়ে যায় নি।

সুরার কথা তো আগেই বলেছি। অসাধারণ চিন্তাশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। সম্মানসূচক এক লালতারা পেয়েছিলেন খুব কম বয়সেই। শেষ পর্যন্ত তিনিই ফিহার চতুর্মাত্রিক সময় সমীকরণটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

আর সেই স্ত্রী-পুত্রের মায়ায় অন্ধ যুবকটি? চতুর্মাত্রিক জগতের জীবরা যাকে পাঠাল ফিহাকে হত্যা করবার জন্যে?

না, তার উপর পৃথিবীর মানুষের কোনো রাগ নেই। তার লেখা থেকেই তো মাথুর জানলেন ফিহার চতুর্মাত্রিক সময় সমীকরণটি, যা তিনি ভুল ভেবে ফেলে রেখেছিলেন-- তা ভুল নয়।

আর তার সাহায্যেই তো চতুর্মাত্রিক মহাপ্লাবন রোধ করা গেল।

তারপর কত যুগ কেটে গেছে।

কত নতুন জ্ঞান, নতুন পথ, আপনি এসে ধরা দিয়েছে মানুষের হাতে। এখন শুধু ছুটে চলা, জ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে সৃষ্টির মূল রহস্যের দিকে। ফিহার মত নিবেদিত-প্রাণ 'বিজ্ঞানীরা' কতকাল ধরে

অপেক্ষা করে আছেন কবে মানুষ বলবে,

'তোমাদের আত্মত্যাগ মানুষদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তোমাদের সাধনা আমরা ভুলি নি। আমরা আমাদের কাজ শেষ করেছি। আমাদের কাছে কোনো রহস্যই আর রহস্য নয়।'

ঠিক সন্ধ্যাবেলা পুবের আকাশে যে ছোট্ট তারাটি অল্প কিছুক্ষণের জন্যে নীল আলো জ্বেলে আপনিতেই নিভে যায়, পৃথিবীর মানুষ সেটি তৈরি করেছেন ফিহার স্মরণে। সেই কৃত্রিম উপগ্রহটির সিলঝিন[২৩] নির্মিত কক্ষে পরম যত্নে রাখা হয়েছে ফিহার প্রাণহীন দেহ। সে সব কতকাল আগের কথা।

আজও সে উপগ্রহটি ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর চারিদিকে। হিসেব মতো জ্বলে উঠছে মায়াবী নীল আলো। পৃথিবীর মানুষ যেন বলছে, 'ফিহা, তোমাকে আমরা ভুলি নি, আমাদের সমস্ত ভালোবাসা তোমাদের জন্যে। ভালোবাসার নীল আলো সেই জন্যেই তো জ্বেলে রেখেছি।'

নির্ঘন্ট

১। নিওরোন ঃ মস্তিষ্কের যে সব কোষে স্মৃতি সঞ্চিত থাকে।

২। দ্বৈত অবস্থানবাদ ঃ একই সময়ে একই স্থানে দুটি বস্তুর উপস্থিতির সম্ভাবনা সম্পর্কীয় সূত্র। (কাল্পনিক)

৩। মেমরি সেল ঃ মস্তিষ্কের নিওরোন সেলের অনুকরণে কম্পিউটারে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা তথ্য সংরক্ষণ করার সেল।

৪। ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণ ঃ ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক বস্তুর যোগসূত্র সম্পর্কিত সূত্র। (কাল্পনিক)

৫। টাইফা ঃ তিন লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দুরবর্তী একটি গ্রহ। (কাল্পনিক)

৬। এন্ড্রোমিডা ঃ ছায়াপথের মতোই একটি নীহারিকা, যা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী।

৭। WGK 166 ঃ একটি সাদা বামন নক্ষত্র। (কাল্পনিক)

৮। সাদা বামন নক্ষত্র ঃ নক্ষত্রের মৃত্যু হওয়ার পূর্বে ক্ষুদ্রকায় অবস্থা। সূর্যও একটি স্তর পার হয়ে ক্ষুদ্রকায় সাদা বামন নক্ষত্রের রূপ নেবে।

৯। সিরান ঃ ঘটনা বর্ণিত সময়ে বিজ্ঞানীদের সম্মানসূচক উপাধি। (কাল্পনিক)

১০। ওমিক্রণ রশ্মি ঃ অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এবং অতি শক্তিশালী বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ, যা অন্তর্নীহারিকাপুঞ্জ যোগাযোগে [illegible] করা হয়। (কাল্পনিক)

১১। মাইক্রোফিল্ম ঃ বই ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্যে ক্ষুদ্রকায় ফটো তুলে রাখার পদ্ধতি।

১২। NGC 1303 ঃ দূরবর্তী কোয়াজার। (কাল্পনিক)

১৩। NBP 203 ঃ সাতাত্তর লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জ। (কাল্পনিক)

১৪। প্রোটোপ্লাজম ঃ জীবকোষের জীবন্ত অংশটুকু।

১৫। চতুর্মাত্রিক জগৎ ঃ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, সময়-- এই চারটি মাত্রা নিয়ে গঠিত অদৃশ্য বস্তু। ত্রিমাত্রিক বস্তু যেরূপ চতুর্মাত্রা সময়ে পরিভ্রমণ করে, চতুর্মাত্রিক বস্তু ঠিক সেরূপ পঞ্চম মাত্রায় পরিভ্রমণ করে। (কাল্পনিক)

১৬। ত্রিমাত্রিক জগৎ ঃ দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা নিয়ে গঠিত বস্তু। আমাদের দৃশ্যমান জগৎ সম্পূর্ণই ত্রিমাত্রিক।

১৭। গামা রশ্মি ঃ উচ্চ কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ।

১৮। প্রতি-পদার্থ ঃ যে বিশেষ ধরনের পদার্থ সাধারণ পদার্থের সংস্পর্শে এসে উভয়েই অদৃশ্য হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়

১৯। জীন ঃ জীবকোষের যে অংশটুকু প্রাণীদেহে পৈতৃক গুণাবলী বহন করে।

২০। NGK ১২৩ ঃ এক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরবর্তী একটি গ্রহ। (কাল্পনিক)

২১। মহাজাগতিক রশ্মি ঃ মহাজগৎ থেকে নিয়ত যে শক্তিকণা পৃথিবীর বুকে আঘাত করছে।

২২। শক্তিবলয় ঃ ঘটনাবর্ণিত সময়ে মহাজাগতিক রশ্মি ক্ষতিকর রূপ নেয়ার পর পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য আয়োনোস্ফিয়ারে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট শক্তিশালী চৌম্বকীয় ক্ষেত্র। (কাল্পনিক)

২৩। সিলঝিন ঃ ১১৯তম ধাতু সিলঝিনিয়াম ও এষ্টিনিয়ামের সংমিশ্রণে তৈরি বিশেষ ঘাতসহ সঙ্কর ধাতু। (কাল্পনিক)

অচিনপুর

১

মরবার পর কী হয়?

আট–ন' বছর বয়সে এর উত্তর জানবার ইচ্ছে হল। কোনো গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে চিন্তার বয়স সেটি ছিল না, কিন্তু সত্যি সত্যি সেই সময়ে আমি মৃত্যুরহস্য নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়েছিলাম।

সন্ধ্যাবেলা নবু মামাকে নিয়ে গা ধুতে গিয়েছি পুকুরে। চারিদিক ঝাপসা করে অন্ধকার নামছে। এমন সময়ে হঠাৎ করেই আমার জানবার ইচ্ছে হল, মরবার পর কী হয়? আমি ফিসফিস করে ডাকলাম, 'নবু মামা, নবু মামা।'

নবু মামা সাঁতরে মাঝপুকুরে চলে গিয়েছিলেন। তিনি আমার কথা শুনতে পেলেন না। আমি আবার ডাকলাম, 'নবু মামা, রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'আর একটু।'

'ভয় লাগছে আমার।'

একা একা পাড়ে বসে থাকতে সত্যি আমার ভয় লাগছিল। নবু মামা উঠে আসতেই বললাম, 'মরবার পর কী হয় মামা?' নবু মামা রেগে গিয়ে বললেন, 'সন্ধ্যা বেলা কী বাজে কথা বলিস?' নবু মামা ভীষণ ভীতু ছিলেন, আমার কথা শুনে তাঁর ভয় ধরে গেল। সে সন্ধ্যায় দু' জনে চুপি চুপি ফিরে চলেছি। রইসুদ্দিন চাচার কবরের পাশ দিয়ে আসবার সময় দেখি, সেখানে কে দু'টি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রেখে গেছে। দু'টি লিকলিকে ধোঁয়ার শিখা উড়ছে সেখানে থেকে। ভয় পেয়ে নবু মামা আমার হাত চেপে ধরলেন।

শৈশবের এই অতি সামান্য ঘটনাটি আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। পরিণত বয়সে এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। ছোট একটি ছেলে মৃত্যুর কথা মনে করে একা কষ্ট পাচ্ছে। এ ভাবতেও আমার খারাপ লাগত।

সত্যি তো, সামান্য কোনো ব্যাপার নিয়ে ভাববার মতো মানসিক প্রস্তুতিও যার নেই, সে কেন কবরে ধূপের শিখা দেখে আবেগে টলমল করবে? কেন সে একা একা চলে যাবে সোনাখালি? সোনাখালি খালের বাঁধান পুলের উপর বসে থাকতে থাকতে এক সময় তার কাঁদতে ইচ্ছে হবে?

আসলে আমি মানুষ হয়েছি অদ্ভুত পরিবেশে। প্রকাণ্ড একটি বাড়ির অগুনতি রহস্যময় কোঠা। বাড়ির পেছনে জড়াজড়ি করা বাঁশবন। দিনমানেই শেয়াল ডাকছে চারিদিকে। সন্ধ্যা হব-হব সময়ে বাঁশবনের এখানে-ওখানে জ্বলে উঠছে ভূতের আগুন। দোতলার বারান্দায় পা ছড়িয়ে বিচিত্র সুরে কোরান পড়তে শুরু করেছে কানাবিবি! সমস্তই অবিমিশ্র ভয়ের।

আবছা অন্ধকারে কানাবিবির দুলে দুলে কোরান-পাঠ শুনলেই বুকের ভেতর ধক্ করে উঠত। নানিজান বলতেন, 'কানার কাছে এখন কেউ যেও না গো।' শুধু কানাবিবির কাছেই নয়, মোহরের মা পা ধোয়াতে এসে বলত, 'পুলাপান কুয়াতলায় কেউ যেও না।' কুয়াতলায় সন্ধ্যাবেলায় কেউ যেতাম না। সেখানে খুব একটা ভয়ের ব্যাপার ছিল। ওখানে সন্ধ্যাবেলায় যেতে নেই।

চারিদিকেই ভয়ের আবহাওয়া। নানিজানের মেজাজ ভালো থাকলে গল্প ফাঁদতেন। সেও ভূতের গল্প : হাট থেকে শোল মাছ কিনে ফিরছেন তাঁর চাচা। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। শ্রাবণ মাস, বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ছেড়ে বাড়ির পথ ধরেছেন, ওমনি পেছন থেকে নাকী সুরে কে চেঁচিয়ে উঠল, 'মাঁছটা আঁমারে দিঁয়ে যাঁ।'

রাতের বেলা ঘুমিয়ে-পড়া ছেলেমেয়েদের জাগিয়ে এনে ভাত খাওয়াত মোহরের মা। লম্বা পাটিতে সারি সারি থালা পড়ত। ঘুম-ঘুম চোখে ভাত মাখাচ্ছি, এমন সময় হয়তো ঝুপ করে শব্দ হল বাড়ির পেছনে। মোহরের মা খসখসে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'পেতত্নি নাকি? পেতত্নি নাকি রে?'

নবু মামা প্রায় আমার গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে চাপা সুরে বলত, 'ভয় পাচ্ছি, ও মোহরের মা, আমার ভয় লাগছে।'

নানাজানের সেই প্রাচীন বাড়িতে যা ছিল, সমস্তই রক্ত জমাট-করা ভয়ের। কানাবিবি তার একটিমাত্র তীক্ষ্ণ চোখে কেমন করেই না তাকাত আমাদের দিকে। নবু মামা বলত, 'ঐ বুড়ি, আমার দিকে তাকালে কঞ্চি দিয়ে চোখ গেলে দেব।' কানাবিবি কিছু না বলে ফ্যালফ্যালিয়ে হাসত। মাঝেমধ্যে বলত, 'পুলাপান ডরাও কেন? আমি কিতা? পেত্নী?' পেত্নী না হয়েও সে আমাদের কাছে অনেক বেশি ভয়াবহ ছিল। শুধু আমরা নই, বড়োরাও তাকে সমীহ করে চলতেন। আর সমীহ করবে নাই-বা কেন? বড়ো নানিজানের নিজের মুখ থেকে শোনা গল্প।

তাঁর বাপের দেশের মেয়ে কানাবিবি। বিয়ের সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। ফাই-ফরমাস খাটে। হেসে-খেলে বেড়ায়। এক দিন দুপুরে সে পেটের ব্যথায়

মরোমরো। কিছুতেই কিছু হয় না, এখন যায় তখন যায় অবস্থা। নানাজান লোক পাঠিয়েছেন আশু কবিরাজকে আনতে। আশু কবিরাজ এসে দেখে সব শেষ। বরফের মতো ঠাণ্ডা শরীর। খাটিয়ায় করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাঁশ কাটতে লোক গেল। নানিজান মড়ার মাথার কাছে বসে কোরান পড়তে লাগলেন। অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল ঠিক তখনই। আমার নানিজান ভয়ে ফিট হয়ে গেলেন। নানাজান আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইয়া মাবুদ, ইয়া মাবুদ', কারণ কানাবিবি সে–সময়ে ভালো মানুষের মতো উঠে বসে পানি খেতে চাচ্ছে। এর পর থেকে স্বভাব–চরিত্রে আমূল পরিবর্তন হল তার। দিনরাত নামাজ রোজা। আমরা যখন কিছু কিছু জিনিস বুঝতে শিখেছি তখন থেকে দেখছি, সে পাড়ার মেয়েদের তাবিজ–কবজ দিচ্ছে। সন্ধ্যা হতে–না--হতেই দোতলার বারান্দায় কুপি জ্বালিয়ে বিচিত্র সুরে কোরান পড়ছে। ভয় তাকে পাবে না কেন?

এ তো গেল রাতের ব্যাপার। দিনের বেলাও কি নিস্তার আছে? গোল্লাছুট খেলতে গিয়ে যদি ভুলে কখনো পুবের ঘরের কাছাকাছি চলে গিয়েছি, ওমনি রহমত মিয়া বাঘের মতো গর্জন করে উঠেছে, 'খাইয়া ফেলুম। ঐ পোলা, কাঁচা খাইয়া ফেলামু। কচ কচ কচ।' ভয়ানক জোয়ান একটা পুরুষ শিকল দিয়ে বাঁধা। ব্যাপারটাই ভয়াবহ! বদ্ধ পাগল ছিল রহমত মিয়া, নানাজানের নৌকার মাঝি। তিনি রহমতকে স্নেহ করতেন খুব, সারিয়ে তুলতে চেষ্টাও করেছিলেন। লাভ হয় নি।

এ সমস্ত মিলিয়ে তৈরি হয়েছে আমার শৈশব। গাঢ় রহস্যের মতো ঘিরে রয়েছে আমার চারিদিক। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অল্প বয়সের ভয়কাতর একটি ছেলে তার নিত্যসঙ্গী নবু মামার হাত ধরে ঘুমুতে যাচ্ছে দোতলার ঘরে। নবু মামা বলছেন, 'তুই ভিতরের জানালা দু'টি বন্ধ করে আয়, আমি দাঁড়াচ্ছি বাইরে।' আমি বলছি, 'আমার ভয় করছে, আপনিও আসেন।' মামা মুখ ভেংচে বলছেন, 'এতেই ভয় ধরে গেল।' টেবিলে রাখা হ্যারিকেন থেকে আবছা আলো আসছে। আমি আর নবু মামা কুকুরকুণ্ডলী হয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি। নবু মামা শুতে–না–শুতেই ঘুম। একা একা ভয়ে আমার কান্না আসছে। এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে হৈচৈ শোনা গেল। শুনলাম, খড়ম পায়ে খটখট করে কে যেন এদিকে আসছে। মোহরের মা মিহি সুরে কাঁদছে, আমি অনেকক্ষণ সেই কান্না শুনে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। জানতেও পারি নি সে–রাতে আমার মা মারা গিয়েছিলেন।

সে–রাতে আমার ঘুম ভেঙেছিল ফজরের নামাজের সময়। জেগে দেখি বাদশা মামা চুপচাপ বসে আছেন চেয়ারে। আমাকে বললেন, 'আর ঘুমিয়ে কি করবি, আয় বেড়াতে যাই।' আমরা সোনাখালির খাল পর্যন্ত চলে গেলাম। সেখানে পাকা পুলের উপর দু' জনে বসে বসে সূর্যোদয় দেখলাম। প্রচণ্ড শীত পড়েছিল সে–বার। কুয়াশার চাদরে গাছপালা ঢাকা। সূর্যের আলো পড়ে শিশিরভেজা পাতা চকচক করছে। কেমন অচেনা লাগছে সবকিছু। মামা অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'রঞ্জু, আজ তোর খুব

দুঃখের দিন। দুঃখের দিনে কী করতে হয়, জানিস?'

'না।'

'হা হা করে হাসতে হয়। হাসলেই আল্লা বলেন, একে দুঃখ দিয়ে কোনো লাভ নেই। একে সুখ দিতে হবে। বুঝেছিস?'

'বুঝেছি।'

'বেশ, তাহলে হাসি দে আমার সঙ্গে।'

এই বলে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বাদশা মামার খুব মোটা গলা ছিল। তাঁর হাসিতে চারিদিক গমগম করতে লাগল। আমিও তাঁর সঙ্গে গলা মেলালাম। বাদশা মামা বললেন, 'আজ আর বাসায় ফিরে কাজ নেই, চল শ্রীপুর যাই। সেখানে আজ যাত্রা হবে।' আমি মহা খুশি হয়ে তাঁর সঙ্গে চললাম।

কত দিনকার কথা, কিন্তু সব যেন চোখের সামনে ভাসছে।

২

বাদশা মামার সঙ্গে আমার কখনো অন্তরঙ্গতা হয় নি। অথচ আমরা একই ঘরে থাকতাম। দোতলার সবচেয়ে দক্ষিণের ঘরে দুটো খাটের একটিতে বাদশা মামা, অন্যটিতে আমি আর নবু মামা। সারা দিন বাদশা মামার দেখা নেই। রাতে কখন যে ফিরতেন, তা কোনো দিনই জানি নি। ঘুম ভাঙার আগে আগেই চলে গেছেন। কোনো কোনো রাতে ঘুম ভেঙে গেলে দেখেছি, গুনগুন করে কী পড়ছেন। যেদিন মেজাজ ভালো থাকত, সেদিন খুশিখুশি গলায় বলতেন, 'রঞ্জু, শোন তো দেখি, কেমন হচ্ছে বলবি।' আমি হঠাৎ ঘুমভাঙা অবস্থায় কী হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না। মামা দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বলা শুরু করেছেন–

'এ রাজ্যপাট যায় যাক,
কোনো ক্ষতি নাই
কিন্তু ত্রিদিব তুমি
কোথা যাবে?'

ভরাট গলা ছিল তাঁর, সমস্ত ঘর কেঁপে কেঁপে উঠত। মাঝপথে থেমে গিয়ে বলতেন, 'দাঁড়া, পোশাকটা পরে নিই, পোশাক ছাড়া ভালো হয় না। তোল, নবুকে ঘুম থেকে তোল।' নবু মামার ঘুম ভাঙালেই প্রথম কিছুক্ষণ নাকী সুরে কাঁদত। বাদশা মামা বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'গাধা! দেখ না কি করছি।' তারপর দু' জনেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকি বাদশা মামার দিকে। আলমারি খুলে তিনি মুকুট বের করেছেন, জরিদার পোশাক পরেছেন। তারপর একা একাই অভিনয় করে চলেছেন। আমরা দুই শিশু মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছি।

বাদশা মামা প্রথম থেকেই আমাদের কাছে দূরের মানুষ। যিনি জরির পোশাক পরে রাত দুপুরে আমাদের অভিনয় দেখান, তিনি কাছের মানুষ হতে পারেন না। বাড়ির মানুষের কাছেও তিনি দলছাড়া। খুব ছোটবেলায় নানাজান তাঁকে এক বার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। যে-ছেলে স্কুল পালিয়ে যাত্রাদলে চলে যায়, নানাজানের মতো লোক তাকে ঘরে রাখতে পারেন না। খবর শুনে ছোট নানিজান খাওয়াদাওয়া ছাড়লেন। মরোমরো অবস্থা। নানাজান লোক পাঠিয়ে বাদশা মামাকে ফিরিয়ে আনলেন। সেই থেকে তিনি বাদশা মামাকে ঘাঁটান না। বাদশা মামাও আছেন আপন মনে।

বাদশা মামা আমার শিশুচিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিলেন। শিল্পীরা সব সময়ই শিশুদের আকর্ষণ করে। হয়তো শিশুরাই প্রতিভার খবর পায় সবার আগে, কিন্তু বাদশা মামা দারুণ অসুখী ছিলেন। যে-সামাজিক পদমর্যাদা তাঁর ছিল, তা নিয়ে যাত্রাদলের মানুষদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারতেন না। অথচ তাঁর চিন্তা-ভাবনার সমস্ত জগৎ যাত্রাদলকে ঘিরে। মাঝে মাঝেই তাঁকে দেখেছি বারান্দায় চেয়ার পেতে চুপচাপ বসে আছেন। যদি গিয়ে বলেছি, 'মামা, কী করেন?'

'কিছু না।'

সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়েছে, মামা তেমনি বসেই আছেন। কেউ যদি গিয়ে বলেছে, 'বাদশা তোর কী হয়েছে রে?'

'কিছু না।'

মাঝে মাঝেই এ রকম হ'ত তাঁর। নানাজান তখন ক্ষেপে যেতেন। ছোট নানিজানকে ডেকে বলতেন, 'ভাং ধরেছে নাকি? শক্ত মুগুর দিয়ে পেটালে ঠিক হয়, বুঝেছ?' নানিজান মিনমিন করে কী কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করেন। তারপর একসময় দেখা যায়, তিনি বাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছেন।

নানাজানকে সবাই ভয় করতাম আমরা। দোতলা থেকে একতলায় তিনি নেমে এলে একতলা নীরব হয়ে যেত। খুব কমবয়সী শিশু, যাদের এখনো বিচারবুদ্ধিও হয় নি, তারাও নানাজানকে দেখলে ফ্যাকাসে হয়ে যেত। ভয়টাও বহুলাংশে সংক্রামক।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙত নানাজানের কোরানপাঠের শব্দে। মোটা গলা, টেনে টেনে একটু অনুনাসিক সুরে অনেকক্ষণ ধরে পড়তেন। তখন মাথায় থাকত লাল রংয়ের ঝুঁটিওয়ালা একটা ফেজ টুপি। খালি গা, পরনে সিল্কের ধবধবে সাদা লুঙ্গি। হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে ঝুঁকে ঝুঁকে অনেকক্ষণ ধরে পড়তেন। পড়া শেষ হয়ে গেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতেন। ছোট নানিজান এই সময়ে জামবাটিতে বড়ো এক বাটি চা তৈরি করে নিয়ে যেতেন। নানাজান চুকচুক করে অনেকটা সময় নিয়ে চা খেতেন। তারপর নিজের হাতে হাঁসের খোঁয়াড় খুলে দিতেন। পাশেই মুরগির খোঁয়াড়, সেটিতে হাতও দিতেন না। হাঁসগুলি ছাড়া পেয়ে দৌড়ে যেত পুকুরের

দিকে। তিনিও যেতেন পিছু পিছু। সমস্তই রুটিন-বাঁধা, এক চুলও এদিক-ওদিক হবার জো নেই।

কিছু কিছু মানুষ ভাগ্যকে নিজের হাতে গড়ে, আবার কারো কারো কাছে ভাগ্য আপনি এসে ধরা দেয়। নানাজান এ দু'টির কোনোটির মধ্যেই পড়েন না। পূর্বপুরুষের গড়ে-যাওয়া সম্পদ ও সম্মানে লালিত হয়েছেন। কিন্তু অসংযমী হন নি। অহংকার ছিল খুব, সে-অহংকার প্রকাশ পেত বিনয়ে। হয়তো কোনো আত্মীয়-কুটুম্ব এসেছে বেড়াতে, নানাজান ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বারবার বলছেন, 'গরিবের ঘরে এসেছেন, কী দিয়ে খেদমত করি, বড়ো সরমিন্দায় পড়লাম, বড়ো কষ্ট হল আপনার। ওরে তামুক আন, আর খাসি ধর দেখি একটা ভালো দেখে।' যিনি এসেছেন, আয়োজনের বাহুল্য দেখে তিনি লজ্জায় পড়ে যেতেন।

পঁয়ত্রিশ বছর আগের দেখা চিত্র। স্মৃতি থেকে লিখছি। সে-স্মৃতিকে বিশ্বাস করা চলে।

আমরা যারা ছেলে-ছোকড়ার দলে, তাদের প্রতি নানাজানের কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। একা একা থাকতেন সারাক্ষণই। বড়ো নানিজান তো কিছু পরিমাণে অপ্রকৃতিস্থই ছিলেন। তিনি দোতলা থেকে নামতেন কালেভদ্রে। ছোট নানিজানও যে কখনো হালকা সুরে নানাজানের সঙ্গে আলাপ করছেন, এমন দেখি নি কখনো। খালারাও আমাদের মতো দূরে দূরে থাকতেন। ক্ষমতাবান লোকরা সব সময়ই এমন নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে যায়।

কেন জানি না, আমার নিজের খুব ইচ্ছে হ'ত, নানাজানের সঙ্গে ভাব করি। ঘুমাতে যাবার আগে কত দিন ভেবেছি, নানাজান যেন এসে আমাকে বলছেন--'আয় রঞ্জু, বেড়াতে যাই।' আমি তাঁর হাত ধরে চলেছি বেড়াতে। কত দিন ভেবেছি, আজ ঘুম থেকে উঠেই নানাজানের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব।

কিন্তু সে আর হয়ে ওঠে নি। ঘুম ভাঙতেই তাড়া পড়েছে, 'ওজু করে পড়তে যা, ওজু করে পড়তে যা।' মৌলভী সাহেব বসে আছেন বাইরের ঘরে। আমরা সবাই আমপারা হাতে করে একে একে হাজির হচ্ছি। মেয়েরা ডান পাশে, ছেলেরা বাঁ পাশে। সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ উঠছে, 'আলিফ দুই পেশ উন, বে দুই পেশ বুন'। নাশতা তৈরি হওয়ামাত্র আরবি পড়া শেষ। তারপর ইংরেজি, বাংলা আর অঙ্কের পড়া। পড়াতে আসতেন রাম মাষ্টার। ভারি ভালো মাষ্টার। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। নবু মামা ছাড়া বানিয়েছিলেন--

'রাম মাষ্টার বুড়া
এক পা তার খোঁড়া'

স্কুলে যাবার আগে পর্যন্ত পড়াতেন তিনি। তাঁর কাছে পড়ত শুধু ছেলেরাই। মেয়েদের

আরবি ছাড়া অন্য কিছু পড়বার প্রয়োজন ছিল না। তারা ঘরের কাজ করত, জরি দিয়ে লতাপাতা ফুল বানাত, বালিশের ওয়াড়ে নকশা তুলে লিখত, 'ভুল না আমায়'। রাম মাষ্টার চলে যেতে যেতে স্কুলের বেলা হয়ে যেত। স্কুল শেষ হয়ে গেলে তো খেলারই পাট। সূর্য ডুবে অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত চলত হৈহৈ। ফুরসত ফেলার সময় নেই। এর মধ্যেই লিলি এসে আমাকে নিয়ে যেত বাড়ির ভেতর। সে নিজেকে সব সময় ভাবত আমার এক জন অভিভাবক। সে যে আমার বড়ো বোন এবং নানাজানের এই প্রকাণ্ড বাড়িতে আমিই যে তার সবচেয়ে নিকটতম জন, তা জানাতে তার ভারি আগ্রহ ছিল।

শাড়ি-পরা হালকা-পাতলা শরীর কোনো ফাঁকে আমার নজরে পড়ে গেলেই মন খারাপ হয়ে যেত। অবধারিতভাবে সে হাত ইশারা করে আমায় ডাকবে। ফিসফিস করে বলবে, 'কাল সবাই দু'খান করে মাছ ভাজা খেয়েছে, আর তুই যে মোটে একটা নিলি?'

'একটাই তো দিয়েছে আমাকে।'

'বোকা কোথাকার! তুই চাইতে পারলি না? আর দুধ দেবার সময় বলতে পারিস না, আরেক হাতা দুধ দাও মোহরের মা।'

'দুধ ভালো লাগে না আমার।'

'ভালো না লাগলে হবে? স্বাস্থ্য ভালো করতে হবে না? বেকুব কোথাকার!'

এই বলে সে হয়তো কাঁচা-মিঠা গাছের আম এনে দিল আমার জন্য। আবার কোনো দিন হয়তো ডেকে নিয়ে গেল বাড়ির পেছনে। আগের মতো গলা নেমে গেছে খাদে। ফিসফিস করে বলছে, 'কী ভাবিস তুই, আমরা কি ফ্যালনা? বড়ো নানিজানের সম্পত্তির অংশ পাব না আমরা? নিশ্চয়ই পাব। বড়ো নানিজানের মেলা সম্পত্তি। আর আমাদের মা হচ্ছে তার একমাত্র মেয়ে। আমরা দু' জনেই শুধু ওয়ারিসান। বুঝলি?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

'কাঁচকলাটা বুঝেছিস। হাঁদার বেহদ্দ তুই। ছি ছি. এতটুকু বুদ্ধিও নেই! নে, এটা রাখ তোর কাছে।'

তাকিয়ে দেখলাম, চকচকে সিকি একটা।

'কই পেয়েছ?'

'আমার ছিল,' বলেই লিলি আবার ফিসফিস করে বলল, 'দেখিস, আবার গাধার মতো সবাইকে বলে বেড়াবি না।'

'না, বলব না।'

লিলির ভাবভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, পয়সাটা অন্যভাবে যোগাড় করেছে সে। আমরা দু' ভাই-বোন কখনো হাতে পয়সা পেয়েছি, এমন মনে পড়ে না। অল্প বয়সে স্নেহটাকে বন্ধন মনে হ'ত। না চাইতেই যা পাওয়া যায় তা তো সব সময়ই

মূল্যহীন।

লিলিকে ভালো লাগত কালেভদ্রে। যেদিন সে খেয়ালের বসে সামান্য সাজ করে, লজ্জা মেশান গলায় আমাকে দোতলায় ডেকে নিয়ে যেত, সেদিন তাকে আমি সত্যি সত্যি ভালোবাসতাম। কিংবা কে জানে অল্প বয়সেই হয়তো করুণা করতে শিখে গিয়েছিলাম। সে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে নাক মুখ অল্প লাল করে বলত-- 'আমার বিয়ে হয়ে গেলে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, তুই থাকবি আমার সঙ্গে।'

'কবে বিয়ে?'

'হবে শিগ্‌গির।'

তারপরই যেন নেহায়েত একটা কথার কথা, এমনিভাবে বলে বসত, 'দেখ তো রঞ্জু, শাড়িতে আমাকে কেমন মানায়।'

'ভালো।'

'কিন্তু আমার নাকটা যে একটু থ্যাবড়া।'

এ বাড়ির কাউকেই লিলি দেখতে পারত না। ভেবে পাই না কেমন করে এত হিংসা পুষে সে বড়ো হয়েছে। আমি ছাড়া আর একটিমাত্র মানুষের সঙ্গে তার অল্পবিস্তর খাতির ছিল। তিনি আমাদের বড়ো নানিজান। বড়ো নানিজান থাকতেন দোতলায় বাঁদিকের সবচেয়ে শেষের ঘরটায়। অন্ধকার ছোট একটি কুঠুরি। জানালার সামান্য যে ফাঁক দিয়ে আলো-বাতাস আসে, তাও গাবগাছের ঝাঁকড়া ডালপালা অন্ধকার করে রেখেছে। আলো-বাতাসহীন সেই অল্পপরিসর ঘরে বড়ো নানিজান রাত-দিন বসে আছেন। দেখে মনে হবে নানাজানের দেড় গুণ বেশি বয়স। মাথায় সমস্ত চুল পেকে ধবধব করছে। দাঁত পড়ে গাল বসে গেছে। নিচের মাঢ়ীতে একটিমাত্র নোংরা হলুদ দাঁত। মাঝেমধ্যে তিনি রেলিং ধরে কাঁপা কাঁপা পায়ে নিচে নেমে আসতেন। কী ফূর্তি তখন আমাদের! সবাই ভিড় করেছি তাঁর চারপাশে। নানিজান মস্ত একটি মাটির গামলায় দু' পয়সা দামের হলুদ রঙের হেনরী সাবান গুলে ফেনা তৈরি করেছেন। ফেনা তৈরি হলেই ঢালাও হুকুম--'মুরগি ধইরা আন।' মুরগি ধরে আনবার জন্য ছোটাছুটি পড়ে যেত আমাদের মধ্যে। সব মুরগি নয়। শুধু ধবধবে সাদা মুরগি ধরে আনবার পালা। নানিজান সেগুলিকে সাবান গোলা পানিতে চুবিয়ে পরিষ্কার করতেন। পাশেই বালতিতে নীল রং গোলা থাকত। ধোয়া হয়ে গেলেই রং-এ চুবিয়ে ছেড়ে দেয়া। কী তুমুল উত্তেজনা আমাদের মধ্যে!

টগরের সঙ্গে যখন এ গল্প করলাম, সে নিচের ঠোঁট উল্টে দিয়ে বলল, 'এত মিথ্যে কথাও তোমার আসে? ছিঃ ছিঃ।'

মিথ্যে নয় বলে তাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারলাম না। বড়ো নানিজানকে নিয়ে কত বিচিত্র সব গল্প আছে। তাঁর ভূতে পাওয়ার গল্পটিও আমি টগরকে শুনিয়েছিলাম।

বড়ো নানিজানের অভ্যেস ছিল সন্ধ্যাবেলা পুকুরে সাঁতার কেটে নাওয়া। তখন কার্তিক মাস। অল্প অল্প হিম পড়েছে। নানিজান গিয়েছেন অভ্যেস মতো গোসল সারতে। সূর্য ডুবে অন্ধকার হল, তাঁর ফেরবার নাম নেই। মোহরের মা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে পুকুরঘাটে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে, কোমর জলে দাঁড়িয়ে তিনি থরথর করে কাঁপছেন। মোহরের মা ভয় পেয়ে বলল, 'কী হয়েছে গো?'

নানিজান অস্পষ্টভাবে টেনে টেনে বললেন, 'ও মোহরের মা, টেনে তোল আমাকে, আমি উঠতে পারি না, কত চেষ্টা করলাম উঠতে।'

টগর বলল, 'হিস্টিরিয়া ছিল তোমার নানির। ভূত-ফুত কিছু নয়। তোমার বড়ো নানিজানের ছেলেমেয়ে হয় নি নিশ্চয়ই।'

না, হিস্টিরিয়া ছিল না তাঁর। আর ছেলেমেয়ে যে ছিল না তাও নয়। বড়ো নানিজানের একটিমাত্র মেয়ে ছিল। হাসিনা। সবাই ডাকত হাসনা। তিনি আমার আর লিলির মা।

হাসনা তিন মাসের একটি শিশুকে কোলে করে আর চার বছরের একটি মেয়ের হাত ধরে এ বাড়িতে এসে উঠেছিল। কোনো একটি বিশেষ ঘটনার কাল্পনিক চিত্র যদি অসংখ্য বার আঁকা যায়, তাহলে এমন একটি সময় আসে যখন সেই কাল্পনিক চিত্রকেই বাস্তব বলে ভ্রম হয়। আমি মা'র এ বাড়িতে আসার ঘটনাটি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই। প্রতিটি ডিটেল অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হ্যারিকেন আর কুপি মিলিয়ে পনের-বিশটি বাতি জ্বলছে এখানে-ওখানে। বিল থেকে ধরে আনা মাছের গাদার চারপাশে বসে বউ-ঝিরা মাছ কুটছেন আর হাসি-তামাশা করছেন। হাসনা এল ঠিক এ সময়ে। অত্যন্ত জেদী ভঙ্গিতে সে উঠোনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখতে পেয়ে সবাই অবাক হয়ে নেমে এল উঠোনে, খড়ম খটখট করে নানাজান নেমে এলেন দোতলা থেকে। আর হাসনা শুকনো চোখে দেখতে লাগল সবাইকে।

হাসনার বিয়েতে সারা গাঁর দাওয়াত ছিল।

হিন্দুরা মুসলমান-বাড়িতে এখন ইচ্ছে করে মাংস খেতে আসেন, তখন আসতেন না। হিন্দুদের জন্যে ঢালাও মিষ্টির ব্যবস্থা। নাম-করা কারিগর রমেশ ঠাকুর বিয়ের দু' দিন আগে বাড়িতে ভিয়েন বসালেন।

আত্মীয়-কুটুম্বের জায়গা হয় না ঘরে, নতুন ঘর উঠল এদিকে-ওদিকে। গাঁয়ের দারোগা খেতে এসে আঁৎকে উঠে বলল, 'করেছেন কি খান সাহেব? এ যে রাজরাজড়ার ব্যাপার!' নানাজান হাসিমুখে বললেন, 'প্রথম মেয়ের বিয়ে, সবাইকে না বললে খারাপ দেখায়, সবাই আত্মীয়-স্বজন।'

গ্রামের নিতান্ত গরিব চাষীও মেয়ের বিয়েতে দু' বিঘা জমি বিক্রি করে ফেলে, হালের গরু বেচে দেয়। আর নানাজান তো তখন টাকার উপর শুয়ে।

হাতি আনতে লোক গেল হালুয়াঘাট। সেখানে কালুশেখের দু'টি মাদী হাতি আছে। বন থেকে কাঠের বোঝা টেনে নামায়। বিয়ের আগের রাতে মাহুতকে ঘাড়ে করে মাতু এসে দাঁড়াল। উৎসাহী ছেলেমেয়েরা কলাগাছের পাহাড় বানিয়ে ফেলল উঠোনে। মাহুতের সঙ্গে দু' দণ্ড কথা বলার জন্যে কী আগ্রহ সবার। 'মাহুত সাহেবের কি একটু তামাক ইচ্ছে করবেন?'

হাতির পিঠে চড়ে বর এসে নামল। লোকে লোকারণ্য। ভিড়ের চাপে গেট ভেঙে পড়ে, এমন অবস্থা। জরির মালায় বরের মুখ ঢাকা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কলমা পড়ানর আগে জরির মালা সরান হবে না। সেও রাত একটার আগে নয়। বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে বর বন্ধুদের নিয়ে সিগারেট খেতে গেল বাইরে। অমনি হৈহৈ করে উঠল সবাই--'দেখেছি! কী রং! যেন সাহেবদের রং। রাজপুত্র এসে দাঁড়িয়েছে যেন!'

লিলিরও বিয়ে হল এই বাড়িতে। দশ-পনের জন বন্ধু নিয়ে রোগামতো একটি ছেলে বসে রইল বাইরের ঘরে। নিতান্ত দায়সারা গোছের বিয়ে। ভালো ছেলে পাওয়া গেছে, এই তো ঢের। তাছাড়া গয়নাটয়নাও তো নেহায়েত কম দেওয়া হয় নি। মায়ের গলার হার, হাতের ছ'গাছা চুড়ি, নানিজান দিলেন কানের দুল, ছোট নানিজান নাম-লেখা আংটি। কবুল বলতে গিয়ে লিলি তবু কেঁদেকেটে অস্থির। নানাজানের প্রবল ধমকের এক ফাঁকে কখন যে কবুল বলেছে তা শুনতেই পেল না কেউ।

ন' মাইল পাল্‌কি করে গিয়ে ট্রেন। ট্রেন পর্যন্ত উঠিয়ে দিয়ে আসব আমি আর নবু মামা। বেডিংপত্তর নিয়ে দু' জন কামলা আগে আগে চলে গিয়েছে। পাল্‌কির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারি না, বারবার পিছিয়ে পড়ি। নবু মামা বললেন, 'পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে, আমি জুতা খুলে ফেললাম।'

সজনেতলা এসে পাল্‌কি থামল। বেহারারা জিরোবে। পান-তামুক খাবে। লিলি পাল্‌কির ফাঁক থেকে হাত বাড়িয়ে ডাকল, 'দুষ্টামি করবি না তো রঞ্জু?'

'না।'

'আমার জন্য কাঁদবি না তো?'

'না, কাঁদব না।'

'কাঁদবি না কিরে গাধা? বোনের জন্য না কাঁদলে কার জন্য কাঁদবি? আমার কি আর কেউ আছে?'

ট্রেন ছেড়ে দিল।

এই বাড়ি ঐ বাড়ি করে ট্রেন দ্রুত সরে যাচ্ছে। নবু মামা কাঁদছেন হু-হু করে। বেহারা এসে বলল, 'দু'জনে এসে বসেন পাল্‌কিতে, ফিরিয়ে নিয়ে যাই।'

লিলিকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে এসে আমার বয়স যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেল। মনে হল কিছু কিছু চিরন্তন রহস্য যেন বুঝতে পরছি।

৩

আশ্বিন মাস আসতেই সাজ সাজ পড়ে গেল স্কুলে।

স্কুলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। গান আবৃত্তি তো হবেই, সেইসঙ্গে নাটক হবে স্টেজ বেঁধে। 'হিরণ্য রাজা' নাটকের নাম। হিরণ্য রাজার পার্ট করেছেন বাদশা মামা। উৎসাহের সীমা নেই আমাদের। খালারাও ঘ্যানঘ্যান করতে লাগলেন নাটক দেখবার জন্যে। মেয়েদের জন্যে পর্দাঘেরা আলাদা জায়গা করা হয়েছে। এ-বাড়ির মেয়েরা আগে কখনো নাটকফাটক কিছুই দেখে নি। দেখবার শখ খুব। ছোট নানি আর্জি নিয়ে গেলেন নানাজানের কাছে।

'এ সব কি দেখবে? না, না।' বলে প্রথম দিকে প্রবল আপত্তি তুললেও শেষের দিকে তাঁকে কেমন নরম মনে হল। সুযোগ বুঝে নানিজান বলে চলছেন, 'এক দিনের মোটে ব্যাপার। আমোদ-আহ্লাদ তো কিছু করে না।'

'না--করে না! রাত-দিনই তো আমোদ চলছে। আচ্ছা যাক, পাল্কি করে যেন যায়।'

স্কুলঘরে স্টেজ সাজান হয়েছে। হ্যাজাকের আলোয় ঝলমল করছে চারিদিক। হ্যারিকেন হাতে নিয়ে গ্রামের লোকজন আসছে কাতারে কাতারে। পর্দায় আড়াল-করা মেয়েদের জায়গায় তিল ধারণের ঠাঁই নেই। আমি আর নবু মামা বসেছি মেয়েদের সঙ্গে। ছোট নানি আর দু' খালা চাদর গায়ে চুপচাপ বসে আছেন। নাটক শুরু হতে হতে রাত হয়ে গেল। বাদশা মামা সেজেছেন হিরণ্য রাজা। এমন মহান রাজা--দীন-দুঃখীদের জন্য সমস্ত বিলিয়ে দিচ্ছেন। দুশ্চরিত্র মন্ত্রী ঘোঁট পাকাচ্ছে তলে তলে। রাজা আপনভোলা মানুষ, কিছু জানতেও পারছেন না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছি সবাই। একসময় হিরণ্য রাজা মনের দুঃখে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। রানীও চলেছেন তাঁর পিছু পিছু। নানিজান চমকে বললেন, 'মেয়ে কোত্থেকে এল! কার মেয়ে?'

'ও হচ্ছে হারু দাদা, মেয়ে সেজেছে।'

'ওমা, হারু নাকি!'

নানিজানের চোখে আর পলক পড়ে না। বিবেকের পার্ট করল আজমল। খালারা কাঁদতে কাঁদতে চাদর ভিজিয়ে ফেলল। শেষ দৃশ্যে হিরণ্য রাজা মন্ত্রীকে বলছেন--

এই রাজ্য তুমি লও ভাই। কাজ নাই রাজ্যপাটে
আমি বনবাসে যাব।
সেইখানে শান্তি আপার।

ছোট খালা বললেন, 'বেকুবটা মন্ত্রীকে মেরে ফেলে না কেন?'

মন্ত্রী বলছে, 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ হোক রাজা, বৃথা তর্কে কোনো ফল নাই।' ঝনঝন যুদ্ধ

শুরু হয়ে গেল। নবু মামা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। নানিজান পেছনে থেকে চেঁচাচ্ছেন 'ও নবু বস, দেখতে পাচ্ছি না। বসে পড়।' কী [illegible] মৃত্যুতে সবার চোখে জল। বাদশা মামার জয়জয়কার। কী পাটটাই না করলেন।

নানাজানও যে শেষ পর্যন্ত অভিনয় দেখবেন, তা কেউ ভাবি নি। পাল্‌কিতে খালারা উঠতে যাবে, এমন সময় তিনি এসে হাজির। 'বাদশা তো বড়ো ভালো করেছে।' এই বলে পাল্‌কিতে ওঠবার তাড়া দিয়ে তিনি চলে গেলেন হেডমাষ্টার সাহেবের বাড়ি। সেখানে তাঁর রাতের দাওয়াত।

বাড়ি গেয়ে দেখি মেহমানে বাড়ি ভর্তি, নান্দিপুর থেকে নানাজানের ফুপাতো বোন এসেছেন ছেলেমেয়ে নিয়ে। সকাল সকালই পৌছতেন, নৌকার দাঁড় ভেঙে যাওয়ায় দেরি হয়ে গেছে। আমি আর নবু মামা অবাক হয়ে গেলাম মেহমানদের মধ্যে অদ্ভুত সুন্দর একটি মেয়েকে দেখে। নানাজানের ফুপাতো বোনের বড়ো মেয়ে। ডাকনাম এলাচি। এমন সুন্দরও মানুষ হয়!

দু' মাসের ভেতর এলাচির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল বাদশা মামার। আপাত কার্যকারণ ছাড়াই যে-সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার ঘটে তাই কেমন করে পরবর্তী সময়ে মানুষের সমস্ত জীবন বদলে দেয়, ভাবতে অবাক লাগে।

সে রাতে নাটক দেখে সবাই বাদশা মামার উপর মহা প্রসন্ন ছিলেন। বাড়ি এসে দেখেন, ফুলের মতো একটি মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাদশার সঙ্গে এর বিয়ে হলে কেমন হয়? এই ভাবনা চকিতে খেলে গেল সবার মনে। এলাচি স্থায়ীভাবে নানাজানের বাড়িতে উঠে এলেন। নাম হয়ে গেল লালবউ, আমি ডাকতাম লাল মামী, নবু মামা ডাকত লাল ভাবী। টকটকে বর্ণ, পাকা ডালিমের মতো গাল। আর কী নামেই-বা ডাকা যায়?

নবু মামা এবং আমি দু' জনে একই সঙ্গে লাল মামীর প্রেমে পড়ে গেলাম। সদা ঘুরঘুর করি, একটু যদি ফুট-ফরমাশ করতে দেন এই আশায়। লাল মামী কাকে বেশি খাতির করেন, আমাকে না নবু মামাকে--এই নিয়ে ঝগড়া হয়ে যায় দু' জনের। স্কুলে যাবার পথে বই-খাতা নামিয়ে হয় হাতাহাতি।

লাল মামীর বরই খাবার ইচ্ছে হয়েছে, খেলা বন্ধ করে দু' জনেই ছুটেছি ইন্দু সাহার বাড়ি। ইন্দু সাহার বাড়িতে দু'টি বরই গাছ, মিষ্টি যেন গুড়। লাল মামীর ইচ্ছে হয়েছে কামরাঙ্গা খাবেন, ঝাল লঙ্কা মাখিয়ে। বাড়ির পেছনে বিস্তৃত বন। এখানে-ওখানে গাছ আছে লুকিয়ে। দু' জনেই গেছি বনে।

মেয়েরা খুব সহজেই ভালোবাসা বুঝতে পারে। লাল মামী আমাদের দু' জনকেই বুঝে ফেললেন। পোষা বেড়ালের মতো আমরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বেড়াই। মোহরের মা বলে, 'পুলা দুইটা মাইয়া স্বভাবের, এসব ভালো না গো।'

আমি আর নবু মামা তখন নির্বাসিত হয়েছি পাশের ঘরে। কতটুকুই-বা দূরে?

লাল মামী হাসছেন, আমরা শুনতে পারছি। লাল মামী বলছেন, 'উঁহু চুল ছিঁড়ে গেল।' আমরা উৎকর্ণ হয়ে শুনছি। লাল মামী যদি কখনো বলেছেন, 'এই যা, আজ খাওয়ার পানি আনি নাই', ওমনি নবু মামা তড়াক করে লাফিয়ে পড়েছে বিছানা ছেড়ে, 'ভাবী, পানি নিয়ে আসছি আমি।'

একঘেয়ে কোনো আকর্ষণই আকর্ষণ থাকে না। মায়ের প্রতি মানুষের অন্ধ ভালোবাসাও ফিকে হয়ে আসে একঘেয়েমির জন্যেই। ভাই-বোনের ভালোবাসার ধরনও বদলাতে থাকে। লাল মামীর প্রতি আমাদের ভালোবাসা ফিকে হওয়ার কোনো ভয় ছিল না। তাঁর মতো বিচিত্র স্বভাবের মেয়ে আমি পরবর্তী জীবনে আর একটিমাত্র দেখেছিলাম।

যে-কথা বলছিলাম--লাল মামী আমাদের বিচিত্রভাবে আকর্ষণ করলেন। হয়তো আমি আর নবু মামা দু' জনে বসে আছি তাঁর ঘরে। মামী হুকুম করলেন, 'নবু, দরজা বন্ধ করে দে। খোল, এবার আলমারি খোল। রাজার পোশাকটা বের কর তো।'

আমি আঁৎকে উঠে বলেছি, 'বাদশা মামা মেরে ফেলবে।'

ঠোঁট উল্টে মামী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করছেন, 'নে তুই, এই মুকুটটা পরে ফেল। নবু, তুই কি সাজবি, সন্ন্যাসী?'

নবু মামা বললেন, 'তুমি কি সাজবে আগে বল?'

'আমি রানী সাজব।'

'তাহলে আমি রাজা সাজব।'

ততক্ষণে আমি ঢলঢলে মুকুটটা মাথায় পরে ফেলেছি। তারস্বরে চেঁচাচ্ছি, 'না, আমি রাজা সাজব।'

মামী বললেন, 'যুদ্ধ হোক দু' জনার মধ্যে। যে জিতবে, সে-ই রাজা।' কথা শেষ না হতেই নবু মামা ঝাঁপিয়ে পড়েন আমার উপর। দু' জনে ধুলোমাখা মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে থাকি। যেন এই যুদ্ধে জীবনমরণ নির্ভর করছে। আল্লাহ্ জানেন, নবু মামা এই লিকলিকে শরীরে এত জোর পান কী করে।

জয়-পরাজয় নির্ধারিত হতে দীর্ঘ সময় লাগে। মুখে নখের রক্তাভ আঁচড়ে, ধূলিধূসরিত শার্ট নিয়ে যখন যুদ্ধজয়ী রাজা দাঁড়ান, তখন মামী নির্বিকার ভঙ্গিতে বলেন, আজ আর না, আজ থাক, যা তোরা আমার জন্য তেঁতুল নিয়ে আয়।'

'বল তো তুই, টানলে ছোট হয় কোন জিনিস?'

লাল মামী বিছানায় শুয়ে পা দোলাতে দোলাতে বলেন। হাজার চিন্তাতেও মাথায় সে-জিনিসটার নাম আসে না, টানলে যা ছোট হতে থাকে।

'পারলি না? দেশলাই আন, আমি দেখাচ্ছি।'

নবু মামা দৌড়ে দেশলাই নিয়ে আসেন। মামী আমাদের দু' জনের স্তম্ভিত

চোখের সামনে ফস করে একটা বার্ডসাই সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকেন। কোন ফাঁকে জানি বাদশা মামার কাছ থেকে যোগাড় করে রেখেছিলেন। আমাদের দু' জনের নিঃশ্বাস পড়ে না। মামী বলেন, 'এই দেখ, যতই টানছি ততই ছোট হচ্ছে।' আমরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকি মামীর দিকে। মামী আধখাওয়া সিগারেট বাড়িয়ে ধরেন আমাদের দিকে, শান্ত গলায় বলেন, 'নে, এবার তোরা টান। হাঁ করে দেখছিস কি? কষে টান দে। নইলে তো বাড়িতে বলে দিবি।' মামীর মুখের গন্ধ দূর করবার জন্যে পানি আনতে হয়, এলাচ দানা আনতে হয়। সেই সঙ্গে মামীর প্রতি আমাদের এক নিষিদ্ধ আকর্ষণ জড়ো হতে থাকে।

বাড়ির বউ–ঝিরা লাল মামীকে বিষদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। এ কেমন ধারা বউ? লাজ নেই, সহবত নেই।

কোথায় শাশুড়িকে দেখে এক হাত ঘোমটা দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, তা নয়––টগবগিয়ে ঘোড়ার মতো চলে যায়। নতুন বউ রান্নাঘরে গিয়ে বসুক না দু' দণ্ড। ননদের হাত থেকে আনাজ নিয়ে জোর করে কুটে দিক, তা নয়––গলায় বাঁশ দিয়ে হাসছে হিহি হিহি। মোহরের মা সময় বুঝে ছড়া কাটে––

'রূপ আর কয় দিনের?
নিমতা ফুল যয়দিনের!'

নিমতা ফুল সকালবেলাতেই ফোটে, রোদ একটু তেতে উঠতেই ঝরঝর করে ঝরে পড়ে। কিন্তু যার জন্যে বলা, সে শুনছে কই? শাশুড়ি মুখের উপর কিছু বলেন না। লোকে বলবে, 'বউ–কাটকী শাশুড়ি'। কী লজ্জার কথা!

একমাত্র চাবিকাঠি বাদশা মামা! সে–ই তো পারে বউয়ের রীতিনীতি শুধরে দিতে। কিন্তু দেখেশুনে মনে হয়, বউ যাদু করেছে বাদশা মামাকে।

বিয়ের পরপরই বাদশা মামা ভয়ানক বদলে গেছেন। চালচলনে কথাবার্তায় ভয়ানক অস্থিরতা এসেছে। আগে সমস্ত দিন বাইরে পড়ে থাকতেন। রাতের বেলা খেতে আসতেন, বাড়ির সঙ্গে এইটুকুই যা সংযোগ। এখন সমস্ত দিন বাড়িতে থাকেন। কিন্তু সেও অন্যরকম থাকা। হয়তো মিনিটখানিকের জন্যে লাল মামীর ঘরে এসেছেন, চোখেমুখে ব্যস্ততার ভাব। যেন কোনো দরকারী জিনিস খুঁজে পাচ্ছেন না। লাল মামী ভ্রূ কুঁচকে বললেন,

'কী চাও?'

'কিছু না––কিছু না।'

বলে মামা বিব্রত ভঙ্গিতে চলে গেলেন। বসে রইলেন বাইরের ঘরে একা একা। আবার হয়তো এলেন কিছুক্ষণের জন্যে, আবার বাইরে গিয়ে বসে থাকা। নানিজান এক দিন বললেন, 'বাদশা, কী হয়েছে রে?'

বাদশা মামা কিছু বললেন না। ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

সবাই অবাক হল, যেদিন বাদশা মামা কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে

উধাও হয়ে গেলেন। নানাজান সে দিনই প্রথম লাল মামীর ঘরে এসে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'এলাচি, বাদশার কী হয়েছে?'

লাল মামী চুপ করে রইলেন।

নানাজান বললেন, 'তোমাদের মিল হয় না কেন? কী ব্যাপার?'

মামী চুপ করে রইলেন।

নানাজান শান্তগলায় বললেন, 'এলাচি, সরফরাজ খানের বাড়িতে কোনো বেচাল হয় না। খেয়াল থাকে যেন।'

নানাজান বেরিয়ে এসে ছোট নানিজানকে কিছুক্ষণ অকারণে বকে নিচে নেমে গেলেন। সারা দিন বাড়ি থমথম করতে লাগল। সে–সন্ধ্যায় কানাবিবি যখন সাপ খেলান সুরে কোরান পড়তে শুরু করল, তখন--কেন জানি না--ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগল।

তৃতীয় দিনের দিন সকালবেলা বাদশা মামা ফিরে এলেন। ভেতরের বাড়িতে না এসে বাইরের ঘরে বসে রইলেন। নানিজান এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন ভেতরবাড়িতে। মামা সারাক্ষণই সংকুচিত হয়ে রইলেন। যখন লাল মামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল তিনি ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন।

সবচেয়ে অবাক হওয়ার ব্যাপারটি হল রাতে। বাদশা মামা লাল মামীর ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। মামী বললেন, 'কে?'

বাদশা মামা নিষ্প্রাণ গলায় বললেন, 'আমি।'

এদিকে পাশের ঘরে আমি আর নবু মামা কান খাড়া করে বসে আছি। কিন্তু আর কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। বাদশা মামা নিচু গলায় বললেন, 'দরজাটা খোল।'

লাল মামী কোনো সাড়াশব্দ করলেন না। শেষ পর্যন্ত বাদশা মামা আমাদের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমরা তিন জন একখাটে শুয়ে রইলাম। মামা বারবার বলছেন, 'কাউকে বলবি না, খবরদার।'

'না।'

'বললে কান ছিঁড়ে ফেলব দু' জনের, মনে থাকে যেন।'

৪

ভাদ্রমাসের প্রথম দিকে নবু মামা অসুখে পড়লেন, কালান্তক ম্যালেরিয়া। হাত–পা শুকিয়ে কাঠি, পেট পুরে ঢোল। উঠোনে ছেলেমেয়েরা হুল্লোড় করে বেড়ায়, নবু মামা চাদর গায়ে দিয়ে জলচৌকিতে বসে বসে দেখে। ম্যালেরিয়ার তখন খুব ভালো ওষুধ বেরিয়েছে। গাঢ় হলুদ রং–এর কুইনাইন ট্যাবলেট। সেকালের এক পয়সার মতো বড়ো। আস্ত গেলা যায় না, গলায় আটকে থাকে। সপ্তাহে এক দিন খাবার

নিয়ম, ম্যালেরিয়া হোক আর না-হোক। ওষুধ খেলেই কানে ভোঁ ভোঁ করত, মাথা হাল্‌কা হয়ে যেত।

কুইনাইন খেয়ে খেয়ে একসময় নবু মামার জ্বর সারল। শরীর খুব দুর্বল। নিজে নিজে দাঁড়াতে পারে না। মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সারা দিন ঘ্যানঘ্যান করে, এটা খাবে ওটা খাবে। খিটখিটে মেজাজ। যদি কোনো কারণে লাল মামী আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছেন, অগ্নি তার রাগ হয়ে গেছে। 'ওর দিকে তাকিয়ে হাসছ কেন? আমার দিকে তাকিয়ে হাস।' শুনে লাল মামী নিষ্ঠুরের মতো বলে বসেন, 'তোর দিকে তাকিয়ে হাসব কি রে, তুই তো চামচিকা হয়ে গেছিস?'

নুব মামার আকাশ-ফাটান কান্না থামাবার জন্যে লাল মামীকে অনেকক্ষণ নবু মামার দিকে তাকিয়ে হাসতে হয়। স্বাস্থ্যের জন্যে নবু মামার স্কুল যাওয়াও বন্ধ। রোগা শরীর পেয়ে বিভিন্ন রোগ ইচ্ছেমতো ছেঁকে ধরছে। আজ সর্দি তো কাল জ্বর, পরশু পেট নেমেছে।

কানাবিবির দেওয়া তাবিজের বোঝা গলায় নিয়ে নবু মামা বেচারার মতো ঘুরে বেড়ায়। রাতের বেলা বড়ো জ্বালাতন করে। কিছুক্ষণ পরপর পানি খেতে চায়। পানি খাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তার পেচ্ছাবের বেগ হয়। পেচ্ছাব করানও কি কম হাঙ্গামা? হ্যারিকেন জ্বালাতে হয়, নবু মামা হাতে নেন একটা টর্চ। আমাকে গিয়ে ডেকে তুলতে হয় নানিজানকে। নানিজান আর আমি বসে থাকি বারান্দায়। নবু মামা টর্চ ফেলে ভয়ে ভয়ে যান। তাতেও রক্ষা নেই, ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠছেন, 'ওটা কি, ঐ যে গেল?'

'কিছু না, শেয়াল।'

'শেয়াল? তবে ছায়া পড়ল না কেন?'

'অন্ধকারে ছায়া পড়বে কি রে হাঁদা?'

নানিজান বিরক্ত হয়ে বলেন।

এই হল নিত্যকার রুটিন।

খাওয়া নিয়েও কি কম হাঙ্গামা? আজ ইচ্ছে হয়েছে কই মাছ ভাজা খাবেন। কই মাছ যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া বন্ধ। সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

শেষ পর্যন্ত পীর-ফকির ধরা হল। ধর্মনগরের সুফী সাহেবের পানিপড়া আনবার জন্যে আমি আর বাদশা মামা নৌকা করে ধর্মনগর রওনা হলাম। দু' দিনের পথ। উজান ঠেলে যেতে হয়। সঙ্গে চাল-ডাল নিয়ে নিয়েছি। নৌকাতেই খাওয়াদাওয়া। বাদশা মামা এই দীর্ঘ সময় চুপচাপ কাটালেন। সন্ধ্যার পর নৌকার ছাদে উঠে বসেন। নেমে আসেন অনেক রাতে। সারা দিন শুয়ে শুয়ে ঘুমান। দেখলেই বোঝা যায় ভরসা-হারান মানুষ। কিন্তু কি জন্যে ভরসা হারিয়েছেন, তা বুঝতে না পেরে আমার খারাপ লাগে।

সপ্তম দিনে ফিরলাম। সুফী সাহেব খুব খাতির–যত্ন করলেন আমাদের। তাঁর অনুরোধে বাড়িতে চার দিন থেকে যেতে হল। কথা নেই, বার্তা নেই, বাদশা মামা সুফী সাহেবের মুরিদ হয়ে গেলেন। মাথায় সব সময় টুপি, নিয়ম করে নামাজ পড়ছেন। যতই দেখি, ততই অবাক হই।

আমার অবাক হওয়ার আরো কিছু বাকি ছিল। বাড়িতে ফিরে জানলাম, নবু মামা খুলনা জেলার মনোহরদীপুরে চলে যাচ্ছেন। কিছু দিন সেখানে থাকবেন। খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা, শরীর ফিরলে চলে যাবেন রাজশাহী। নানাজানের খালাতো ভাই থাকেন সেখানে। সরকারী জরিপ বিভাগের কানুনগো। নবু মামা সেখানে থেকেই পড়াশোনা করবেন। নানাজান নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন। বাড়িতে তারই আয়োজন চলছে। নবু মামা আগের চেয়েও মিইয়ে গিয়েছেন। আমাকে ধরা–গলায় বললেন, 'লাল ভাবীকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।'

আমি ভেবেই পেলাম না একা একা আমি কী করে থাকব। নবু মামা আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাকে ছাড়া একা একা স্কুলে যাচ্ছি, এই দৃশ্য কল্পনা করলেও চোখে পানি এসে যায়। নবু মামার আমার জন্যে কোনো মাথা ব্যথা নেই, তার মুখে শুধুই লাল ভাবীর কথা। আমি বললাম, 'নবু মামা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।'

'আমি কী করে নিয়ে যাব? তুই বাবাকে বল।'

নানাজানকে বলবার সাহস আমার নেই। আমি লাল মামীকে ধরলাম। মামী তখন বারান্দায় বসে সুঁচ–সুতো নিয়ে কী যেন করছিলেন। আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে সমস্ত খুলে বললাম। চুপ করে তিনি সমস্ত শুনলেন। আমার কথা শেষ হতেই বললেন, 'যা তো, দৌড়ে তোর ছোট খালার কাছ থেকে একটা সোনামুখী সুঁচ নিয়ে আয়। বলবি আমি চাইছি।'

সুঁচ এনে দিয়ে আমার কাতর অনুরোধ জানালাম।

'বলবেন তো মামী? আজই বলতে হবে। আজ সন্ধ্যাবেলাতেই।'

মামী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কি ঘ্যানঘ্যান করিস, পরের বাড়িতে আছিস যে হুঁস নেই? ইচ্ছে হয় নিজে গিয়ে বল।'

এর কিছুদিন পরই পানসি নৌকা করে নানাজান আর নবু মামা চলে গেলেন। যাবার সময় নবু মামার সে কী কান্না! কিছুতেই যাবেন না। লাল মামীর শাড়ি চেপে ধরেছে। তারস্বরে চেঁচাচ্ছে–

'আমি যাব না, যাব না।'

লাল মামী শুকনো গলায় বললেন, 'শাড়ি ছাড়, শাড়ি ধরে চেঁচাচ্ছিস কেন?'

৫

নবু মামা চলে যাবার পর আমার কিছু করবার রইল না। আম–কাঁঠালের ছুটি হয়ে

গেছে স্কুলে। সারাদিন বাড়িতে ঘুরে বেড়াই। বিকেলবেলাটা আর কিছুতেই কাটে না। রোদের তাপ একটু কমতেই হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই সোনাখালি। হেঁটে যেতে যেতে কত আজগুবি চিন্তা মনে আসে। যেন কোনো অপরাধ ছাড়াই দেশের রাজা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। হুকুম হয়েছে আমার ফাঁসি হবে। রাজ্যের সমস্ত লোক ফাঁসির মঞ্চের চারদিকে জড়ো হয়েছে। আমি তাকিয়ে দেখি, এদের মধ্যে লাল রঙের পোশাক পরা একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলছে, 'না, এ ছেলে কোনো দোস করে নি, এর ফাঁসি হবে না।' বলতে বলতে মেয়েটি কেঁদে ফেলেছে। আমি বলছি, 'না, হোক, আমার ফাঁসি হোক।' মেয়েটি অপলকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার মুখের গড়ন অনেকটা লাল মামীর মতো।

সোনাখালি পাকাপুলে অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকতাম। সেই সময়ে আমার মন থেকে ভূতের ভয় কেটে গিয়েছিল। একেক দিন নিশীথ রাত্রে একা একা ফিরেছি। অন্ধকারে একা ফিরতে ফিরতে কত বার চমকে উঠেছি নাম-না-জানা পাখির ডাকে। কিন্তু ভয় পাই নি কখনো। রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়ালেই মোহরের মা ভাত বেড়ে দেয়, 'নাও, খেয়ে গুষ্টি উদ্ধার কর।' এই সব কথা কখনো গায়ে মাখি না।

আমি সে-সময় অনেক বড়ো দুঃখে ডুবে ছিলাম। ছোটখাট কষ্টের ব্যাপার, যা প্রতিদিন ঘটত, এই নিয়ে সেই কারণেই কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

দিন আর কাটতে চায় না কিছুতেই। স্নেহ, ভালোবাসা ছাড়া কোনো মানুষই বাঁচতে পারে না। আমি সে-কারণেই হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে সময় কাটাই। কেন জানি না, অসুখটাই ভালো লাগে। সকাল থেকে সন্ধ্যা শুয়ে শুয়ে ঘুমান ছাড়া অন্য কাজ নেই। মাঝেমধ্যে বাদশা মামা এসে বসেন। নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক কিছু কথাবার্তা হয়। মামা হয়তো বললেন, 'বেশি করে দুধ খা, শরীরে জোর হবে।'

'আচ্ছা মামা খাব।'

'পীরপুরে জন্মাষ্টমীর মেলা, যাবি নাকি দেখতে?'

'অসুখ সারলে যাব।'

মামা থাকেন অল্পক্ষণ। কথা বলেন ছাড়া-ছাড়া ভঙ্গিতে। দেখে শুনে বড়ো অবাক লাগে। তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। গাল বসে গিয়ে কেমন প্রৌঢ় মানুষের মতো দেখায়।

লাল মামী বড়ো একটা আসেন না। হয়তো দরজার বাইরে থেকে বললেন, 'রঞ্জুর জ্বর আবার এসেছে নাকি?'

'না মামী, জ্বর নেই।'

'না থাকলেই ভালো।' এই বলে তিনি ব্যস্তভাবে চলে যান। তাঁর যাওয়ার পথে তৃষিত নয়নে তাকিয়ে থাকি। সে-সময়ে লাল মামীকে আমি একই সঙ্গে

ভালোবাসি আর ঘৃণাও করি। কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি এ ধরনের দ্বৈত অনুভূতি—সেই আমার প্রথম। পরবর্তী সময়ে অবশ্যি আরো অনেকের জন্যেই এমন হয়েছে।

ঠিক এ সময়ে আমার সফুরা খালার সঙ্গে অল্পমাত্রায় ঘনিষ্ঠতা হল। তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হবে, এ আমার খুব ছোটবেলাকার বাসনা। তিনি আমার চেয়ে বৎসরখানেকের বড়ো হবেন। খুব চুপচাপ ধরনের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, তিনি একা একা হেঁটে বেড়াচ্ছেন বারান্দায়। হাতে একটা লাঠি। মাঝে মাঝে মেঝেতে ঠক করে শব্দ করছেন আর মুখে বলছেন, 'উড়ে গেল পাখি'। প্রথম দিন এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি তো আকাশ থেকে পড়েছি। তিনি আমাকে দেখতে পান নি, কাজেই তিনি লাঠি হাতে ঠকঠক করতে লাগলেন আর পাখি ওড়াতে লাগলেন। আমি যখন গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'খালা কী করেন?'

লজ্জায় খালার চোখে পানি এসে গেল। কোনো রকমে বললেন, 'কিছু না, আমি খেলি।'

তার পরও খালাকে এমন অদ্ভুত খেলা খেলতে দেখেছি। লজ্জা পাবেন, এই জন্যে আমি তাঁর সামনে পড়ি নি। তাঁর সঙ্গে ভাব করবার আমার খুব ইচ্ছে হ'ত। কিন্তু তিনি আমাকে দেখলে ভারি লজ্জা পেতেন।

অসুখের সময় প্রায়ই সফুরা খালা এসে দাঁড়াতেন আমার দরজায়। আমি ডাকতাম, 'খালা, ভেতরে আসেন।'

'না, আমি এখানেই থাকি।'

এই বলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন দরজায়। অনেক রকম কথা হ'ত তাঁর সাথে। কী ধরনের কথা, তা আজ আর মনে নেই। মনে আছে, খালা সারাক্ষণই মুখ টিপে টিপে হাসতেন।

খালা মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব গল্প করতেন।

এক দিন এসে বললেন, 'কাল রাতে ভারি আশ্চর্য একটি ব্যাপার হয়েছে রঞ্জু। ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ হাসির শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতেই দেখি একটি ফুটফুটে পরী আমার খাটে বসে আছে। আমি তো অবাক। তারপর পরীটি অনেক গল্প করল আমার সঙ্গে। ভোর হয়ে আসছে যখন, তখন সে বলল—আমি যাই। আমি বললাম—ও ভাই পরী, তোমার পাখায় একটু হাত দেব? সে বলল—দাও না। আমি পরীর পাখায় হাত বুলিয়ে দেখলাম, কী তুলতুলে পাখা। আর সেই থেকে আমার হাতে মিষ্টি গন্ধ। দেখ না শুঁকে।'

আমি সফুরা খালার হাত শুঁকতেই বকুল ফুলের গন্ধ পেলাম। খালা হয়তো অনেকক্ষণ বকুল ফুলের মালা হাতে করে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তারই গন্ধ। সফুরা খালা সত্যি ভারি অদ্ভুত মেয়ে ছিল।

এক রাতে ভারি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। আমি লিলিকে স্বপ্নে দেখলাম। সে

ঠিক আগেকার মতো অভিভাবকসুলভ ভঙ্গি করে বলছে, 'রঞ্জু, তোর একটুও যত্ন হচ্ছে না এখানে। তুই আমার কাছে চলে আয়।'

আমি লিলির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কত দিন হয়েছে সে চলে গেছে। এ দীর্ঘদিনেও তার কথা কেন যে মনে পড়ল না! স্বপ্ন ভেঙে গেলে আমার খুব অবাক লাগল। লিলি যে দেখতে কেমন ছিল, তা পর্যন্ত আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে, তার চিবুকটা লম্বাটে ধরনের ছিল। সেখানে একটা লাল রঙের তিল ছিল। লিলি ছোটবেলায় আমাকে এই তিল দেখিয়ে বলত, 'রঞ্জু, এই তিলটা যদি কপালে থাকত, তাহলে আমি রাজরানী হতাম।'

দীঘদিন পর লিলিকে স্বপ্নে নিখুঁতভাবে দেখলাম। এবং সে-রাতেই ঠিক করলাম ঘুম ভাঙতেই নানাজানের কাছ থেকে ঠিকানা জেনে লিলিকে আমি চিঠি দেব। এই মনে করে আমার খুব ভালো লাগতে লাগল। মনে হল শরীর সেরে গেছে, একটু বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাওয়া খাই।

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই জোছনা দেখে চোখ ছলছলিয়ে উঠল। এমন উথালপাথাল আলো দেখলে মানুষের মনে এত দুঃখ আসে কেন কে জানে?

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। পা যখন ধরে এল, তখন দেয়াল ঘেঁসে বসে রইলাম। হঠাৎ শুনি পাশের ঘরে লাল মামী কাঁদছেন।

কোনো ভুল নেই, স্পষ্ট শুনতে পেলাম। মামাও যেন নিচু গলায় কী একটা বললেন। মামী কান্না থামিয়ে ধমকে উঠলেন, 'কোনো কথা শুনব না আমি।'

বাইরের এই অপূর্ব জোছনার সঙ্গে এই ঘটনা কেমন যেন মিশ খায় না। আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

৬

নানাজান বললেন, 'ঠিকানা নিয়ে কী করবি?'

'চিঠি লিখব।'

'এত দিন পর চিঠি লেখার কথা মনে পড়ল?'

আমি চুপ করে রইলাম। নানাজান একটু কেশে বললেন, 'শরীরের হাল কেমন? জ্বর আছে?'

'জ্বি না।'

'নবু তোর কাছে চিঠিফিটি লেখে?'

'জ্বি, লেখে।'

'পূজার বন্ধে বাড়ি আসবে বলে চিঠি লিখেছে আমার কাছে।' বলতে বলতে নানাজান হঠাৎ কথা থামিয়ে বলেন, 'লিলিরা আগে যেখানে থাকত, এখন সেখানে

নাই। নতুন ঠিকানা তো আমার জানা নাই। আচ্ছা, আমি খোঁজ নিয়ে বলব।'

'লিলি আপনার কাছে চিঠি লেখে নানাজান?'

নানাজান একটু ইতস্তত করে বললেন, 'কম লেখে।'

আশ্বিনের গোড়াতেই নবু মামা এসে পড়লেন।

তাঁকে দেখে আমার চোখে পলক পড়ে না। লম্বায় বেড়েছেন, স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। ঠোঁটের উপর হালকা নীল গোঁফের রেখা। নবু মামা আমাকে দেখে হৈহৈ করে উঠলেন, 'তোর একি হাল রঞ্জু!'

'অসুখ করেছিল আমার। আপনাকে আর চেনা যায় না মামা।'

'স্বাস্থ্য দেখেছিস? দেখ, হাতের মাস্‌ল্‌ টিপে দেখ।'

মাস্‌ল্‌ টিপে দেখার দরকার পড়ে না। নবু মামার স্বাস্থ্য সৌন্দর্য দেখে ঈর্ষা হয় আমার। লাল মামী তো নবু মামাকে চিনতেই পারে না, কে এসেছে ভেবে থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অমনি নবু মাামা খপ করে তাঁর হাত চেপে ধরলেন। মামী বললেন, 'নবু নাকি? তুমি তো বদলে গেছ।'

মামী নবু মামাকে আজ প্রথম তুমি করে বললেন। নবু মামা হেসেই কূল পান না। হাসি থামিয়ে কোনোমতে বললেন, 'ভাবী, তুমি আগের মতোই আছ। না, আগের মতো নয়, আগের চেয়ে সুন্দর।'

অনেক দিন পর নবু মামাকে দেখে কী যে ভালো লাগল! তাছাড়া মামা এত বেশি বদলে গেছেন কী করে, সেও এক বিস্ময়। ছোটবেলায় দু' জনকে তো একই রকম দেখাত। আমি পরম বিস্ময় নিয়ে নবু মামার পিছু পিছু ফিরতে লাগলাম। নবু মামার গল্প আর ফুরোয় না। স্কুলের গল্প, স্কুলের বন্ধুদের গল্প। রাজশাহীর গল্প। এর মধ্যে রাজশাহী থেকে নাটোর রাজবাড়িতে গিয়েছিলেন--তার গল্প। আমি শুনি, আর অবাক হই।

নবু মামা ক্লান্ত হয়ে এসেছিলেন। দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমিও পাশে শুয়ে আছি, কখন নবু মামা জাগবেন সেই আশায়। ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। ছোট নানিজান এসে ডেকে তুললেন। দু' জনে চলে গেলাম লাল মামীর ঘরে। মামীর প্রতি নবু মামার শৈশবের যে-টান ছিল তা দেখলাম এত দিনের অদর্শনে এতটুকুও কমে নি, বরং বেড়েছে।

লাল মামী বললেন, 'নবু, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, পরে গল্প করব তোমার সাথে।' নবু মামা হো হো করে হাসেন, 'না, গল্প এখনি করতে হবে। আর আগের মতো তুই করে ডাকতে হবে।'

এই বলে নবু মামা দরজায় খিল এঁটে দিলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, নবু মামা রহস্যময় ভঙ্গিতে তাঁর প্যান্টের পকেটে হাত দিচ্ছেন, 'তোমার জন্যে কী এনেছি, দেখ ভাবী।'

'কী?'

'বল তো দেখি কী? আন্দাজ কর।'

লাল মামী ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। নবু মামা বললেন, 'ছোটবেলায় আমাদের সিগারেট খাইয়েছিলে। আজ আমি সিগারেট নিয়ে এসেছি। আজকে আবার খেতে হবে।'

'তুমি কি এর মধ্যেই সিগারেট ধরেছ নাকি?'

'না, ধরি নি। তোমার জন্যে এনেছি।'

বলেই নবু মামা নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে লাল মামীর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন।

লাল মামী বললেন, 'আমি সিগারেট খাব না।'

'খেতেই হবে।'

নবু মামা জোর করে মামীর মুখে সিগারেট গুঁজে দিলেন। থুথু করে ফেলে দিয়ে মামী শুকনো গলায় বললেন, 'তুমি বড়ো বেয়াড়া হয়ে গেছ নবু।'

নবু মামা ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কায়দা করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। এক সময় বললেন, 'ভাবী, তোমার কাছে আমি এত চিঠি লিখলাম, জবাব দাও নি কেন?'

'একটা তো দিয়েছি।'

'না, এবার থেকে সব চিঠির জবাব দিতে হবে।'

এই বলে নবু মামা বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'রঞ্জু, চল মাঠে বেড়াই। খুব বাতাস দিচ্ছে। মাঠে হাঁটলে খিদে হবে।'

মাঠে সে-রাতে প্রচুর জোছনা হয়েছে। চকচক করছে চারিদিক। ঠাণ্ডা একটা বাতাস বইছে। নবু মামা চেঁচিয়ে বললেন, 'কী জোছনা, খেতে ইচ্ছে হয়। মনে হয় কপকপ করে খেয়ে ফেলি। নবু মামা মুখ হাঁ করে খাবার ভঙ্গি করতে লাগলো। বিস্মিত হয়ে আমি তাঁর আনন্দ দেখলাম।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরে দেখি, বাদশা মামা জলচৌকিতে চুপচাপ বসে আছেন। নবু মামাকে দেখে নির্জীব কণ্ঠে শুধালেন, 'কখন এসেছিস?'

'সকালে। তুমি কোথায় ছিলে?'

বাদশা মামা বিড়বিড় করে কী বললেন বোঝা গেল না। নবু মামা বললেন, 'তোমার কী হয়েছে?'

বাদশা মামা এর উত্তরেও বিড়বিড় করলেন।

ভাত খেতে খেতে নবু মামা বললেন, 'বাদশা ভাইয়ের কী হয়েছে?'

নানিজান বললেন, 'যাদু করেছে তাকে?'

'কে যাদু করেছে?'

'কে আবার? বউ।'

নবু মামা রেগে গিয়ে বলল, 'কি সব সময় বাজে কথা বলেন!'

নানিজান বললেন, 'কী যে গুণের বউ, তা কি আর এতদিনে জানতে বাকি আছে আমার? বাদশার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি না।'

লাল মামী কখন যে নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, জানতে পারি নি। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'কে যাদু করেছে, মা?'

নানিজান বললেন, 'বউ, তুমি চোখ রাঙিয়ে কথা বল কার সঙ্গে?'

'আমি চোখ রাঙিয়েছি?'

'তুমি কার উপর গরম দেখাও বউ, রূপের দেমাগে তো পা মাটিতে পড়ে না। এদিকে আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারি না আমি। বাঁজা মেয়েমানুষ বলে সারা দুনিয়ার লোকে তোমাকে ডাকে।'

নবু মামা বললেন, 'মা, আপনি চুপ করেন।'

'কেন চুপ করব? কাকে ডরাই আমি? বাদশাকে আজ বললে কাল সে তিন তালাক দেয়।'

লাল মামী বললেন, 'তাই বলেন না কেন? ঐ তো বসে আছে চৌকিতে। যান, গিয়ে বলেন।'

নবু মামা আর আমি দোতলায় উঠে দেখি মামী চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়। আমাদের দেখে উঁচু গলায় বললেন, 'নবু, তুমি কালকে আমাকে বাবার বাড়িতে রেখে আসবে।'

নবু মামা চুপ করে রইলেন।

নবু মামা এক মাস রইলেন আমাদের সঙ্গে। তিনি অনেক গল্পের বই নিয়ে এসেছিলেন, প্রতিদিন সেগুলি পড়া হ'ত। লোহারামের কেচ্ছা বলে একটি বই ছিল--এমন হাসির! নবু মামা পড়তেন, আমি আর লাল মামী শুনে হেসে গড়াগড়ি। ছোট নানিজান এক-এক দিন রেগে ভূত হতেন।

'আস্তে হাসতে পার না বউ? তোমার শ্বশুর শুনলে কী হবে?'

মোহরের মা আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলত--

'যত হাসি তত কান্না
কহে গেল রাম সন্না।'

নবু মামা শুনতে পেলে বলতেন, 'মোহরের মা, তোমার রাম সন্নাকে এই বইটা একটু পড়তে দিও। দেখি, ব্যাটা হাসে কি কাঁদে।'

এক দিন হাসির শব্দ শুনে লাজুক পায়ে সফুরা খালা এসে হাজির। দরজার ওপাশে থেকে ফিসফিস করে বলছে, 'ভাবী, তোমরা কী নিয়ে হাসছ?'

'গল্প শুনে হাসছি। হাসির গল্প।'

সফুরা খালা ভেতরে এসে দাঁড়িয়ে মিটমিট হাসি হাসতে লাগলেন। যেন

আমাদের কোনো গোপন অভিসন্ধি টের পেয়ে গিয়েছেন। তারপর আগের মতো ফিসফিসে গলায় বললেন, 'হাসির গল্প আমার ভালো লাগে না।'

তবু তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে বসে নবু মামার গল্প পড়া শুনলেন। তারপর বললেন, 'চল না, সবাই মিলে দীঘির ঘাট থেকে বেড়িয়ে আসি, এখন তো আর লোকজন নেই।'

সেদিন থেকে আমাদের রুটিন হল, গল্পটল্প পড়ার পর দীঘির ঘাটে বেড়াতে যাওয়া। বেড়াতে বেড়াতে এক দিন নবু মামার উল্লাসের কোনো সীমা থাকত না। স্কুল থেকে শিখে আসা একটা হিন্দি গান বেসুরো গলায় ধরে বসতেন। প্রথম লাইনটি বোধহয় এ-রকম ছিল-

'মাটি মে পৌরণ
মাটি মে শ্রাবণ
মাটি মে তনবন যায়গা।'

পাখির ডানায় ভর করে সময় কাটতে লাগল। অবশ্যি বেড়াতে এসে মাঝে-মধ্যে লাল মামীর ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। সেগুলি ঘটত তখনি, যখন মামী দেখতে পেতেন বাদশা মামা ঘাটের উল্টো দিকে চুপচাপ বসে আছেন। দেখে মনে হয়, যেন মানুষ নয়, উইয়ের টিবি। এতটুকু নড়চড়াও নেই।

দেখতে দেখতে নবু মামার ছুটির দিন ফুরিয়ে গেল। আমার মনে হতে লাগল একা একা আমার থাকতে হলে আমি আর বাঁচব না। যতই যাওয়ার দিন এগিয়ে আসে ততই আমার কষ্ট বাড়তে থাকে। যাবার ঠিক আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ভারি মন নিয়ে লাল মামীর ঘরে বসে আছি। নবু মামাও কথা বলছে না। এমন সময় নিচে থেকে কানাবিবি ডাকল, 'ও এলাচি বেগম, ও এলাচি বেগম।'

লাল মামী বললেন, 'আসছি। কেমন ডাকে দেখ না।'

নবু মামা বললেন, 'তোমার নাম এলাচি কেন ভাবী?'

'আমার মুখে সব সময় এলাচির গন্ধ থাকে, এই জন্যেই এলাচি নাম।'

নবু মামা এগিয়ে এসেছেন, 'আগে তো কোনো দিন বল নি, শুঁকে দেখতাম। দেখি ভাবী, মাথাটা একটু নিচু কর তো।'

'কী পাগলামী কর নবু!'

বলার আগেই নবু মামা লাল মামীর মাথা জাপটে ধরেছে এবং হৈহৈ করে উঠেছে, 'আরে সত্যি তাই। সত্যি এলাচির গন্ধ।'

ছোট নানিজান ঢুকলেন এ সময়। শুকনো গলায় বললেন, 'ও বউ, তোমাকে এক ঘন্টা ধরে ডাকছে কানাবিবি। কানে শুনতেটুনতে পাও তো?'

লাল মামী বললেন, 'কী জন্যে ডাকছে?'

'সে যে তোমাকে গলায় আর কোমরে বাঁধবার জন্যে তাবিজ দিয়েছিল, সেগুলি কী করেছ?'

'ফেলে দিয়েছি।'

'কেন ফেলে দিয়েছ?'

'তাবিজ দিলে কী হবে?'

নানিজান রেগে আগুন হয়ে বললেন, 'কী, এত বড় সাহস তোমার বউ? আল্লাহ্‌র কোরান কালামকে অবিশ্বাস! রোজা নাই, নামাজ নাই। বেহায়া বেপর্দা মেয়ে।'

নবু মামা বললেন, 'মা, আপনি চুপ করেন।'

'না, চুপ করব কেন? বউ, শেষ কথা আমার, তাবিজ দিবা কি না কও।'

লাল মামী বললেন, 'আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন। সে যদি বলে তাবিজ দিলেই আমার ছেলেমেয়ে হবে, তাহলে দেব।'

এমন সময় নিচে প্রচণ্ড হৈচৈ শোনা গেল। আমি আর নবু মামা দৌড়ে গিয়ে দেখি রহমত মিয়া শিকল খুলে কীভাবে যেন বেরিয়ে পড়েছে। হাতের শিকল নাচাচ্ছে, আর বলছে, 'কাঁচা খাইয়া ফেলামু। কাঁচা খাইয়া ফেলামু।'

লোকজন ঘিরে ফেলেছে তাকে। কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। দু'-এক জন লম্বা বাঁশ বাগিয়ে ধরে আছে। নানাজান বললেন, 'কেউ ওরে মারবে না, খবরদার। সাবধানে ধর।'

বহু কসরত করতে হল ধরতে গিয়ে। শিকলের বাড়ি খেয়ে হারিস সর্দার তো প্রায় মরোমরো। নানাজান বললেন, 'যাও, নৌকায় করে পাগল হারামজাদাটাকে এক্ষুনি নান্দিপুরের বাজারে ছেড়ে দিয়ে আস। এঁটো কাঁটা খেয়ে বেশ বেঁচে থাকবে।'

ঘাটে নৌকা তৈরিই ছিল। বহু উৎসাহী সহযাত্রী তৈরি হয়ে পড়ল। একটি জ্বলজ্যান্ত পাগলকে অন্য গ্রামের বাজারে ছেড়ে দিয়ে আসা এ্যাডভেঞ্চারের মতো।

পাগল তো কিছুতেই নৌকায় উঠবে না। চেঁচামেচি চিৎকারে বাড়ি মাথায় তুলেছে। কিন্তু নৌকায় উঠেই তার ভাবান্তর হল। হাত ডুবিয়ে দিল নদীর পানিতে, তারপর খুশিতে হেসে ফেলল।

'আহা, পাগলটার কারবার দেখে বড় মায়া লাগে রে।'

তাকিয়ে দেখি ঘাটের উপর বসে থেকে বাদশা মামা আফসোস করছেন। তাঁর চোখ স্নেহ ও মমতায় চকচক করছে।

পরবর্তী দু' দিন বাড়ির আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত রইল। নবু মামা যে-সকালে চলে যাবেন, সে-সকালে লাল মামীর সঙ্গে কানাবিবির একটা ছোটখাট সংঘর্ষ হয়ে গেল। ঘুম ভেঙেই শুনি লাল মামী বলছেন, 'এ কানাবিবির কাজ। কানাবিবি, তোমার এমন সাহস!'

কানাবিবি বলছে, 'বাড়ির বউ মানুষ কেমন গলায় কথা কয় গো!'

বিষয় আর কিছু নয়। লাল মামী ঘুমুতে গিয়ে দেখেছেন, তাঁর বালিশের নিচে

শাড়ির পাড়ের টুকরো, মাথার চুল, একখণ্ড ছোট হাড়--এই জাতীয় জিনিস সুতো দিয়ে বেঁধে রেখে দেওয়া। বশীকরণের জিনিসপত্র হয়তো। সেই থেকেই এ বিপত্তি।

নবু মামাকে স্টেশনে দিয়ে আসতে আমি সঙ্গে চলেছি। রাত দুটোয় ট্রেন। সন্ধ্যাবেলা খেয়েদেয়ে রওয়ানা হয়েছি। হ্যারিকেন দুলিয়ে একটি কামলা যাচ্ছে আগে আগে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে হু-হু করে। নবু মামা আর আমি গল্প করতে করতে যাচ্ছি। হঠাৎ মামা বললেন, 'ও, তোকে বলা হয় নি, লিলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। শান্তাহার স্টেশনে। প্লাটফরমে বসে ছিল, আমি তাকে চিনতে পারি নি। হঠাৎ ডাকল--নবু মামা না?'

নবু মামা কিছুক্ষণ থেমে বললেন, 'খুব গরিব হয়ে গেছে। রোগা হয়েছে খুব। ময়লা কাপড়চোপড়। এমন খারাপ লাগল দেখে।'

'লিলির বরের সঙ্গে দেখা হয় নি।'

'না। লিলি বলল, আমাকে দেখে লজ্জা পেয়ে নাকি লুকিয়ে আছে কোথায়।'

'আর কিছু বলে নি?'

'তোর কথা জিজ্ঞেস করল। তার অবস্থা একটু ভালো হলেই তোকে নাকি তার কাছে নিয়ে যাবে।'

নবু মামা বললেন, 'তোর মন খারাপ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমারো হয়েছে। বিয়ের পর যখন লিলির শ্বশুরবাড়ি গেল, মনে আছে রঞ্জু?'

'আছে।'

'ট্রেনে উঠে কী কাঁদাটাই না কাঁদল।'

নবু মামা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

৭

সেবার আমি খুব অর্থকষ্টে পড়লাম।

স্কুলের বেতন দিতে হয়। মাঝেমধ্যে চাঁদা দিতে হয়। আগে নবু মামা যখন দিতেন, সেই সঙ্গে আমারটাও দিয়ে দিতেন। এখন আমি একলা পড়েছি। নিজ থেকে কারো কাছে কিছু চাইতে পারি না। পোশাকের বেলায়ও তাই। নবু মামার কাপড়-জামা বরাবর পরে এসেছি। লিলিও প্রায়ই বানিয়ে দিয়েছে। অসুবিধে হয় নি কিছু। এখন অসুবিধে হতে লাগল। কী করব ভেবে পাই না। বাদশা মামার কাছে কিছু চাইতে লজ্জা করে। আমি খুব মুশকিলে পড়ে গেলাম। নিজেকে অবাঞ্ছিত ভাবা খুব কষ্ট ও লজ্জার ব্যাপার। আমার ভারি কষ্ট হতে লাগল। খুব ইচ্ছে হতে লাগল লিলির

কাছে চলে যাই। কিন্তু তার কাছে চিঠি লিখে জবাব পাই না। পুরনো জায়গা ছেড়ে তারা নতুন যেখানে গিয়েছে, তার ঠিকানাও জানায় নি কাউকে।

তাছাড়া নানাজানের সংসারেও নানা রকম অশান্তি শুরু হয়েছে। তাঁর জন্মশত্রু হালিম শেখ জমি নিয়ে মামলা শুরু করেছে। টাকা খরচ হচ্ছে জলের মতো। বৃদ্ধ বয়সে নানাজানকে কোর্ট-কাচারিতে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। বাদশা মামাকে দিয়ে তো কোনো কাজ করাবার উপায় নেই। তিনি জড় পদার্থের মতো হয়ে গিয়েছেন। সুফী সাহেবের বাড়ি থেকে ফেরবার পর বেশ কিছুদিন ধর্ম-কর্ম নিয়ে ছিলেন। লোকে ভালোই বলেছে। এখন সে-সব ছেড়েছেন। নেশা-ভাংও নাকি করেন আজকাল।

সফুরা খালাকে নিয়েও অনেক রকম অশান্তি হচ্ছে। কখন তিনি দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বিয়ের কথাবার্তাও হচ্ছে। এক বার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। ছেলের বাবা মেয়ে দেখে মহা খুশি। এমন ভালো স্বভাবের মেয়ে সে নাকি তার সমস্ত জীবনে দেখে নি। কিন্তু বিয়ে হল না। সফুরা খালাকে নিয়ে তখন নানা রকম রটনা। তার নাকি মাথা খারাপ। রাতেবিরেতে মেয়ে নাকি পুকুরঘাটে একা একা হেঁটে বেড়ায়। এক বার কোনো মেয়ে সম্পর্কে এ জাতীয় কথা ছড়িয়ে পড়াটা খুব খারাপ লক্ষণ। এ নিয়ে ঘরেও অশান্তির শেষ নেই। নানিজান বিনিয়ে বিনিয়ে গানের মতো সুরে কাঁদেন। মাঝে মাঝে আপন মনে বলেন, 'আমার নসীব। বিয়ে করালাম ছেলে, বউটা বাঁজা--মেয়েটাও আধপাগল।'

কিন্তু যাকে নিয়ে এত অশান্তি, সেই সফুরা খালা নির্বিকার। আমি এক দিন সফুরা খালাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'খালা, আপনি নাকি রাতবিরেতে একা একা ঘুরে বেড়ান?'

খালা মৃদু গলায় বলেন, 'একা একা পুকুরঘাটে বসে থাকতে এত ভালো লাগে!'

তাঁকে নিয়ে চারিদিকে যে এত অশান্তি, সেদিকে কিছুমাত্র খেয়াল নেই। আছেন আপন মনে। তাঁর জন্যে আমার খুব কষ্ট হতে শুরু করল। খালাকে আমি তখন ভালোবেসে ফেলেছি।

আসলে খালাকে আমি একটুও বুঝে উঠতে পারি নি। যাবতীয় দুর্বোধ্য বস্তুর জন্যে মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। সেই জন্যেই তাঁর প্রতি আমার প্রবল ভালোবাসা গড়ে উঠল। আমার ইচ্ছে হল তাঁর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব গড়ে উঠুক। কিন্তু তিনি নিজের চারদিকে একটি দেয়াল তুলে দিয়েছিলেন। এই দেয়াল ভেদ করে তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় নেই। নিজের সৃষ্ট জগতেই তিনি ডুবে আছেন। বাইরের প্রতি একটুও খেয়াল নেই। ইচ্ছে হল তো চলে গেলেন পুকুরপাড়ে, একা বেড়াতে গেলেন বাগানে।

এ-সব দেখেশুনে কেন জানি না আমার একটা ধারণা হয়েছিল, সফুরা খালা

বড়ো রকমের দুঃখ পাবে জীবনে। এ–রকম মনে করবার কোনো কারণ ছিল না। *কিন্তু আমার মনে হ'ত, একেই হয়তো intuition বলে।*

পরবর্তী জীবনে দেখেছি আমার ধারণা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। দুঃখ এসেছে এবং অত্যন্ত সহজভাবে জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনার মতো দুঃখকে তিনি গ্রহণ করেছেন। এই মেয়ের গল্প আমি অন্য কোথাও বলব, আজ শুধু হাসান আলির কথাটাই বলি।

হাসান আলি বাজারে কিসের যেন ঠিকাদারী করত। ছাব্বিশ–সাতাশ বৎসর বয়স। ভীষণ গরিব। নানাজানদের কী রকম যেন আত্মীয়। থাকত নানাজানদের বাংলাঘরে। (বাড়ির বহির্মহলে অতিথিঅভ্যাগতের জন্যে নির্মিত ঘরকেই বাংলাঘর বলা হত)।

অত্যন্ত নিরীহ ধরনের ছেলে। যতক্ষণ ঘরে থাকত, ততক্ষণ বসে বসে হিসাবপত্র করত। আমরা সে–সময় তার ঘরে হাজির হলে বিনা কারণে আঁৎকে উঠত। তার পরই সহজ হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে চোখ–মুখ লাল করে এক বিশ্রী কাণ্ড! প্রতি হাটবার দিন দেখতাম, সে অল্প কিছু মিষ্টি কিনে এনেছে। মিষ্টি আনা হয়েছে নানাজানের বাড়ির মানুষদের জন্যেই, কিন্তু দেওয়ার সাহস নেই। অনেক রাতে কাউকে ডেকে হয়তো ফিসফিস করে বলল, 'একটু মিষ্টি এনেছিলাম।' বাড়ির প্রায় মানুষই তখন ঘুমে।

সফুরা খালা এক দিন বললেন, 'ও রঞ্জু, হাসান আলি বলে একটা লোক নাকি থাকে বাইরের ঘরে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আপনি জানলেন কী করে?'

'ও আল্লা, মজার ব্যাপার হয়েছে। পরশুদিন দীঘির পাড়ে একা একা গিয়েছি, দেখি কে–একজন লোক চুপচাপ বসে আছে। আমি বললাম, 'কে ওখানে? লোকটা বলল--আমার নাম হাসান আলি, আমি আপনাদের বাংলাঘরে থাকি। আমি তখন ভাবলাম ফিরে যাই। লোকটা বলল--এত রাতে আপনি একা একা আসেন কেন? কত সাপ–খোপ আছে। আমি বললাম--আপনি তো আসছেন, আপনার সাপের ভয় নাই? লোকটা তখন কী বলল জান রঞ্জু?'

'না।'

'বলল, আপনি বড়ো ভালো মেয়ে। এই বলেই হনহন করে চলে গেলে। কী কাণ্ড দেখেছ?'

এর কিছুদিন পরই শুনলাম হাসান আলি নানাজানের কাছে তাঁর ছোট মেয়েটিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করেছে। নানাজান তো রেগেই আগুন। বাড়িতে হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল। সফুরা খালা শুধু বলেন, 'আহা, বেচারা গরিব বলে কি সবাই এ–রকম করবে! ছিঃ!' লাল মামী ও কথা শুনে বললেন, 'আমাদের সফুরার ভাতারকে নিয়ে কেউ তামাশা করবে না। খবরদার, সফুরা মনে কষ্ট পায়।' নানিজান

লাল মামীর কথা শুনে রেগে যান, চেঁচিয়ে বলেন, 'একি কথা বলার ঢং বউ!'

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না, নানাজান হাসান আলিকে এখানকার বাস উঠিয়ে চলে যেতে বললেন। শরৎকালের এক সকালে নৌকা করে হাসান আলি চলে গেল। দু'টি ট্রাঙ্কের উপর বিবর্ণ সতরঞ্চিতে ঢাকা একটি বিছানা--তার পাশে মুখ নিচু করে বসা হাসান আলি।

সফুরা খালা এর পর থেকেই অস্থির হয়ে পড়লেন। মুখে শুধু এক বুলি, 'বিনা দোষে কষ্ট পেল লোকটা।' নবু মামা অনেক পরে এ ঘটনা শুনে বলেছিলেন, 'আমি থাকলে দিতাম শালার ঘাড়ে গদাম করে এক ঘুষি।' সফুরা খালা বিষণ্ন কণ্ঠে বলেছেন, 'ছিঃ নবু ছিঃ।'

৮

অচিনপুরের গল্প লিখতে লিখতে গভীর বিষাদে মন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। অনুভব করছি সুখ এবং দুঃখ আসলে একই জিনিস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুখ বদলে গিয়ে দুঃখ হয়ে যায়। দুঃখ হয় সুখ। জীবনের প্রবল দুঃখ ও বেদনার ঘটনাগুলি মনে পড়লে আজ আমার ভালো লাগে। প্রাচীন সুখের স্মৃতিতে বুক বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়।

হাসনার কোলে তিন মাস বয়সের যে-শিশুটি এ সংসারে প্রবেশ করেছিল, তার ভূমিকা তো যুক্তিসঙ্গত কারণেই তৃতীয় পুরুষের ভূমিকা হবে। তার উপস্থিতি হবে ছায়ার মতো। সরফরাজ খানের এই পরিবারটির সুখ-দুঃখ তাকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু আমি তাদের জীবনের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবেই না জড়িয়ে পড়লাম। বাদশা মামার মলিন চেহারা দেখলে আমার মন কাঁদে। সফুরা খালা যখন হেসে হেসে বলেন, 'রঞ্জু, আমার খুব ইচ্ছে এক দিন অনেক রাত্রে পুকুরে একা একা সাঁতার কেটে গোসল করি। পুকুরঘাটে তুমি আমার জন্যে একটুখানি দাঁড়াবে রঞ্জু? কেউ যেন জানতে না পারে।' তখন সফুরা খালার জন্যে আমার গাঢ় মমতা বোধ হয়। অথচ আমি নিশ্চিত জানি এক দিন লিলির চিঠি আসবে। আমি এদের সবাইকে পিছনে ফেলে চলে যাব।

হালিম শেখের সঙ্গে পরপর দু'টি মামলাতে নানাজানের হার হল। এত দিন যে-জমিতে নানাজানের দখলিসত্ত্ব ছিল, হালিম শেখের লোকজন লাল নিশান উড়িয়ে ঢোল আর কাঁসর ঘন্টা বাজাতে বাজাতে সে-জমির দখল নিল। গ্রামের লোকজনকে গরু জবাই করে খাওয়াল হালিম শেখ।

জমির পরিমাণ তেমন কিছু নয়। অর্থব্যয়ও হয়েছে সামান্য। নানাজানের মতো

লোকের কাছে সে–টাকা কিছুই নয়। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়লেন। রোজকার মতো উঠোনে বসে কোরান–পাঠ করতে বসেন না। নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন। অত্যন্ত অল্প সময়ের ভেতর স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। খাওয়া কমে গেল। রাতে ঘুমুতে পারেন না। উঠোনে অনেক রাত পর্যন্ত চেয়ার পেতে বসে থাকেন। নানিজান মাথায় হাওয়া করেন, পায়ে তেল মালিশ করে দেন।

দিন সাতেক পর নানাজান ঘোষণা করলেন, তিনি বেশি দিন বাঁচবেন না। সম্পত্তির বিলি–বন্দোবস্ত করতে চান। নবু মামার কাছে চিঠি গেল, তিনি যেন পত্রপাঠ চলে আসেন, পড়াশোনার আর প্রয়োজন নেই। লোক পাঠিয়ে দামী কাফনের কাপড় কেনালেন। কবরের জন্য জায়গা ঠিক করা হল। কবর পাকা করবার জন্য ইট আনান হল। মৌলানা ডাকিয়ে তওবা করলেন। বাড়ির সব[illegible]ই নিঃশব্দ মৃত্যুর প্রস্তুতি দেখতে লাগল। ঠিক এই সময় বড়ো নানিজান মারা গেলেন।

মোহরের মা রোজ সকালে দুধ নিয়ে যায় নানিজানের ঘরে। সেদিন কী কারণে যেন দেরি হয়েছে। দুপুরের দিকে বাটিভর্তি দুধ নিয়ে গিয়েছে। ঘরে ঢুকেই বিকট চিৎকার। মৃত্যু এসেছে নিঃশব্দে। কেউ জানতেও পারে নি, কখন কীভাবে মারা গেলেন।

আমরা সবাই তাঁর ঘরের সামনে ভিড় করে দাঁড়ালাম। পরিপাটি বিছানা পাতা। বালিশের চাদর পর্যন্ত একটুও কোঁচকায় নি। বড়ো নানিজান সেই পরিপাটি বিছানায় শক্ত হয়ে পড়ে আছেন। ইঁদুর কিংবা অন্য কোনো কিছু তাঁর ঠোঁট আর একটি চোখ খেয়ে গিয়েছে। বিকট হাঁ করা সেই মূর্তি দেখে সফুরা খালা 'ও মাগো' 'ও মাগো' বলে কাঁদতে লাগলেন। লাল মামী সফুরা খালার হাত ধরে তাঁকে নিচে নামিয়ে নিয়ে গেলেন।

নানাজানের জন্যে কেনা কাফনের কাপড়ে তাঁর কাফন হল। নানাজানের জন্যে ঠিক করে রাখা জায়গায় কবর হল তাঁর। যে–ইট নানাজান নিজের জন্যে আনিয়েছিলেন, সেই ইট দিয়ে কবর বাঁধিয়ে দেওয়া হল।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমরা সবাই বড়ো নানিজানের কথা ভুলে গেলাম। আগের মতো ঝগড়া, রং–তামাশা চলতে লাগল। বড়ো নানিজানের ঘর থেকে তাঁর সমস্ত জিনিস সরিয়ে ফেলে সংসারের প্রয়োজনীয় পেঁয়াজ–রসুন রাখা হল গাদা করে।

দিন কেটে যেতে লাগল। একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন। সেই একা একা হাঁটতে হাঁটতে সোনাখালি চলে যাওয়া। পুকুরঘাটে রাতের বেলা চুপচাপ বসে থাকা। এর বাইরে যেন আমার জানা কোনো জগৎ নেই। সমস্ত বাসনা–কামনা এইটুকুতেই কেন্দ্রীভূত। এর মধ্যে এক দিন নানাজান আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেছেন। বলেছেন, 'তোমার বড়ো নানিজান তাঁর নিজের সম্পত্তি তোমাকে আর লিলিকে দিয়ে গিয়েছেন দানপত্র করে।'

বড়ো নানিজান তাঁর বাবার কাছ থেকে প্রচুর সম্পত্তি পেয়েছিলেন জানতাম। তার পরিমাণ যে কত তা কেউই জানত না। নানাজান বললেন, 'অনেক জায়গা-জমি, লিলির আসা দরকার। কিন্তু তার ঠিকানাই তো জানা নেই।'

রাজশাহী থেকে খবর এল, স্কুল ফাইনাল দিয়েই নবু মামা কাউকে কিছু না বলে কোলকাতা চলে গেছেন। নানাজানের মুখ গম্ভীর হল। নানিজানের কেন জানি ধারণা, নবু মামা আর কখনো ফিরবে না। তিনি গানের মতো সুরে যখন কাঁদতে থাকেন, তখন বলেন, 'এক মেয়ে পাগল, এক ছেলে বিবাগী, এক বউ বাঁজা'।

শুনলে হাসি পায়, আবার দুঃখ লাগে। বাদশা মামা মাঝেমধ্যে গিয়ে নানিজানকে ধমক দেন, 'কি মা, আপনি সব সময় বাঁজা বউ বাঁজা বউ করেন?'

নানিজান ক্ষেপে গিয়ে বলেন, 'ও বাঁজা বউরে আমি আর কী বলে ডাকব?'

'আহা, এলাচি মনে কষ্ট পায়।'

নানিজান কপালে করাঘাত করেন আর বলেন, 'হা রে বউ, তুই কি যাদুটাই না করলি!'

বাদশা মামা চিন্তিত, বিরক্ত আর ক্লান্তমুখে চলে আসেন।

নবু মামা হঠাৎ করে কোলকাতা চলে যাওয়ায় খুশি মনে হয় শুধু সফুরা খালাকে। আমাকে ডেকে বলেন, 'আমি ছেলে হলে নবুর মতো কাউকে না বলে আমিও চলে যেতাম।'

আট-দশ দিন পর নবু মামা কোলকাতা থেকে টাকা চেয়ে পাঠাল। নানাজান লোক মারফত টাকা পাঠালেন। নির্দেশ রইল, ঘাড় ধরে যেন তাকে নিয়ে আসা হয়। বাড়িতে সিদ্ধান্ত নেয়া হল নবু মামাকে বিয়ে দেওয়া হবে। নানাজান মেয়ে দেখতে লাগলেন। নানিজান মহা খুশি। লাল মামীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন, 'নতুন বউয়ের এক বৎসরের ভেতর ছেলে হবে, আমি স্বপ্ন দেখেছি।'

টাকা নিয়ে লোক যাওয়ার কয়েক দিন পরই নবু মামা এসে পড়লেন। সরাসরি এসে বাড়িতে তিনি উঠলেন না, লোক মারফত খবর পাঠালেন কাউকে কিছু না বলে আমি যেন আজিজ খাঁর বাড়িতে চলে আসি।

আজিজ খাঁর বাইরের ঘরের চেয়ারে নবু মামা গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। মাথায় বেড়েছেন কিছু। গায়ের রং ফর্সা হয়েছে। আমাকে দেখে রহস্যময় হাসি হাসলেন, 'বাড়িতে কেউ জানে না তো আমি এসেছি যে?'

'না।'

'গুড।'

'কী ব্যাপার নবু মামা?'

'একটা প্ল্যান করেছি রঞ্জু। লাল ভাবীকে একেবারে চমকে দেব। গ্রামোফোন কিনেছি একটা। ঐ দেখ টেবিলে।'

আমি হাঁ করে টেবিলে রেখে দেওয়া বিচিত্র যন্ত্রটি তাকিয়ে দেখি। নবু মামা হাসিমুখে বলেন, 'পাঁচটা রেকর্ডও আছে। এক শ' পনের টাকা দাম।'

নবু মামার প্ল্যান শুনে আমার উৎসাহের সীমা থাকে না। রাতের বেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নবু মামা গ্রামোফোন নিয়ে চুপি চুপি যাবেন। যে-ঘরটায় আমি আর নবু মামা থাকি সেই ঘরটায় চুপি চুপি এসে গ্রামোফোন বাজানর ব্যবস্থা করা হবে। গান শুনে হকচকিয়ে বেরিয়ে আসবেন লাল মামী। অবাক হয়ে বলবেন, 'রঞ্জু, কী হয়েছে রে, গান হয় কোথায়?'

তখন হো হো করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসবেন নবু মামা। উৎসাহে নবু মামা টগবগ করছেন। আমি বললাম, 'নবু মামা, এখন একটা গান শুনি।'

নবু মামা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, 'না-না, এখন না। পরে শুনবি। ফার্স্টে কোনটা বাজাব বল তো?'

'কি করে বলব, কোনটা?'

সেদিন সন্ধ্যার আগেভাগেই ঝুমঝুম করে বৃষ্টি নামল। সে কী বৃষ্টি! ঘরদোর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হু-হু করে ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগল। নবু মামা বিরক্ত মুখে বসে রইলেন। রাতের খাওয়াদাওয়া আজিজ খাঁর ওখানেই হল।

রাত যখন অনেক হয়েছে, লোকজন শুয়ে পড়েছে সবখানে, তখন আমরা উঠলাম। বৃষ্টি থামে নি, গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছেই। মাথায় ছাতা ধরে আধভেজা হয়ে বাড়িতে উঠলাম। কাদায় পানিতে মাখামাখি। বাড়িতে জেগে নেই কেউ। শুধু নানাজানের ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। দু' জনে নিঃশব্দে দোতলায় উঠে এলাম। দরজা খোলা হল অত্যন্ত সাবধানে। একটু ক্যাঁচ শব্দ হলেই দু' জনে চমকে উঠছি।

অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে গ্রমোফোন বের করলেন নবু মামা। বহু কষ্ট করে চোঙ ফিট করা হল। দম দিতে গিয়ে বিপত্তি--ঘ্যাসঘ্যাস শব্দ হয়। তবে ভরসার কথা--ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। নবু মামা ফিসফিসেয়ে বললেন, 'কোন গানটা দিয়েছি কে জানে? একটা খুব বাজে গান আছে। এটা প্রথম এসে গেলে খারাপ হবে খুব।'

আমি বললাম, 'নবু মামা, দেরি করছ কেন?'

'দিচ্ছি। বৃষ্টিটা একটু কমুক, নয়তো শুনবে না।'

বৃষ্টির বেগ একটু কমে আসতেই গান বেজে উঠল--

'আমার ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো
তোরে আমি কোথায় রাখি বল?'

লাল মামী গান শুনে মুগ্ধ হবে কি, আমি নিজেই মোহিত হয়ে গেলাম। কী অপূর্ব কিন্নরকণ্ঠে গান হচ্ছে! বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। আবেগে আমার চোখ ভিজে উঠল।

নবু মামা ফিসফিসিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার, ভাবী আসে না যে, ও রঞ্জু!'

আমি সে কথার জবাব দিলাম না। বাইরে তখন ঝড় উঠেছে। জানালার কপাটে শব্দ হচ্ছে খটখট। নবু মামা জানালা বন্ধ করবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি লাল মামী ডাকলেন, 'রঞ্জু, রঞ্জু।'

নবু মামা ফিসফিস করে বললেন, 'চুপ করে থাক, কথা বলবি না।' আমি চুপ করে রইলাম। নবু মামা অন্য রেকর্ড চালিয়ে দিল---

'যদি ভাল না লাগে তো দিও না মন'

লাল মামী দরজায় ঘা দিলেন, 'ও রঞ্জু, কী ব্যাপার, গান হয় কোথায়?' নবু মামা উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে হো হো করে হেসে উঠলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভাবী, তোমার জন্য আনলাম। তোমার জন্য আনলাম।' নবু মামা লাল মামীর হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে এল। কী ফুর্তি তার! লাল মামী বললেন, 'কলের গান না? ছোটবেলায় দেখেছিলাম এক বার। চোঙ আছে? বাতি জ্বালাও না।'

বাতি জ্বালান হল। লাল মামীকে দেখব কী? নবু মামার দিকেই তাকিয়ে আছি। আনন্দে উত্তেজনায় নবু মামার চোখ জ্বলজ্বল করছে। মামী বললেন, 'ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো গানটা আরেক বার দাও।'

সেই অপূর্ব গান আবার বেজে উঠল। বাইরে তখন ঝড়-বৃষ্টি।

সে-রাতের কথা আমার খুব মনে আছে।

একটি মানুষের সামগ্রিক জীবনে মনে রাখবার মতো ঘটনা তো খুব সীমিত। কত মানুষ আছে, সমস্ত জীবন কেটে যায়, কোনো ঘটনাই মনে রাখবার মতো আবেগ তার ভেতর সৃষ্টি করে না। আমি নিজে কত কিছুই তো ভুলে বসে আছি। কিন্তু মনে আছে সে-রাতে গান শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই আমার চোখে পানি এসেছিল। নবু মামা আর লাল মামী যেন দেখতে না পায় সে জন্যে আমি মাথা ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে রয়েছি। নবু মামা বললেন, 'ভাবী, আমার নাচতে মন চাইছে।'

'নাচ না।'

নবু মামা বললেন, 'রঞ্জু, তুই নাচবি আমার সঙ্গে?'

আমি সে-কথার জবাব দিলাম না। মামী বললেন, 'নবু, ঐ রেকর্ডটা আবার।'

'সারা রাত হবে আজকে, বুঝলে ভাবী।'

ক্লান্তি নেই নবু মামার। লাল মামীর উৎসাহও সীমাহীন। শুনতে শুনতে আমার

ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

নবু মামা বললেন, 'গাধা! এত ফাইন গান, আর ঘুমায় কেমন দেখ।'

লাল মামী বললেন, 'আজ তাহলে থাক। ঘুমো তোরা।'

'না–না, থাকবে না। যতক্ষণ ঝড়–বৃষ্টি হবে ততক্ষণই গান হবে।'

কথা শেষ হতে–না–হতেই কড়কড় করে বাজ পড়ল। ফূর্তিতে নবু মামা হো হো করে হেসে ফেললেন। মামী বললেন, 'রঞ্জুর ঘুম পাচ্ছে। এগুলি নিয়ে আমার ঘরে এসে পড় নবু, আমাকে ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো গানটা শুনে শুনে লিখে দিতে পারবি কাগজে?'

'নিশ্চিয়ই পারব। নিশ্চয়ই।'

জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছিল, উঠে বন্ধ করতে গিয়ে দেখি বড়ো নানিজানের ঘরের লাগোয়া গাবগাছটি ভেঙে পড়ে গেছে। কেমন ন্যাড়া দেখাচ্ছে জায়গাটা। ভালোই ঝড়–বৃষ্টি হয়েছে, বাতাস থেমে গেলেও বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। কে জানে গত বারের মতো এবারেও হয়তো বান ডাকবে। গত বার এ–রকম সময়ে বাড়ি থেকে নদীর শোঁ–শোঁ শব্দ শোনা গেছে। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে শুনি নবু মামা বলছেন, 'ভাবী, তুমিও গাও সঙ্গে সঙ্গে।'

'না না, আমি পারব না। তুই গা, মাটি মে পৌরণটা গা।'

নবু মামা হেঁড়ে গলায় গান ধরলেন–

'মাটি মে পৌরণ, মাটি মে শ্রাবণ
মাটি মে তনবন যায়গা
যব মাটি সে সব মিল যায়গা।'

গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাল মামী বললেন, 'দক্ষিণের জানালা বন্ধ কর নবু, ভিজে যাচ্ছি।'

নবু মামা বললেন, 'বাদশা ভাই কোথায়?'

'দু দিন ধরে দেখা নেই। কোথায় কে জানে। 'যদি ভাল না লাগে' গানটা দে। ঘুম আসছে যে আবার। ও নবু, তোর ঘুম পায় না?'

শুনতে শুনতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। ঘুমুতে ইচ্ছে করছিল না। শুয়ে শুয়ে গান শুনতে কী ভালোই না লাগে। ক্রমে ক্রমে ঝড়ের মতো বাতাসের বেগ হল। বাড়ির লম্বা থামে বাতাসের শোঁ–শোঁ শব্দ উঠতে লাগল। দড়াম দড়াম শব্দ করে দরজা নড়তে লাগল। উঠে দাঁড়িয়েছি হ্যারিকেন জ্বালাব বলে, ওমনি সফুরা খালা ডাকলেন, 'রঞ্জু, ও রঞ্জু।'

দরজা খুলে দেখি সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে সফুরা খালা বৃষ্টির ছাটে ভিজছেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'এদিকে গান হচ্ছিল নাকি রঞ্জু?'

'হ্যাঁ, নবু মামা কলের গান বাজাচ্ছিলেন। কলের গান এনেছেন নবু মামা।'

'নবু কোথায়?'

'লাল মামী আর নবু মামা গান বাজাচ্ছেন।'

সফুরা খালা আরো একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'কই, গান শুনছি না তো?'

আমরা দু'জন কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। সফুরা খালা অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'রঞ্জু, আমার ভীষণ ভয় লাগছে।'

১০

সেই অপূর্ব বৃষ্টিস্নাত রাতে যে ভয় করবার মতো কিছু একটি লুকিয়ে ছিল, তা আমি বুঝতে পারি নি। সফুরা খালা শীতে কাঁপছিলেন। তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছিল না, তবু শুধুমাত্র তাঁর কথা শুনেই ধারণা হল, কোথাও নিশ্চয়ই ভয় লুকিয়ে আছে।

সফুরা খালা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত চলে গেলেন, যেন কোনো হিংস্র জন্তু তাঁকে তাড়া করছে। মাতালের মতো বেসামাল পদক্ষেপ। আমি এসে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। মেঘ কেটে গেছে, রোদ উঠেছে ঝকঝকে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই মনের সব গ্লানি কেটে যায়। আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব কিনা ভাবছি, তখন নবু মামা এসে ডাকলেন, 'আয়, মাছ মারতে যাই। নতুন পানিতে মেলা মাছ এসেছে।'

ছিপ, কানিজাল ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে নৌকা করে চললাম দু' জনে হলদাপোতা। কিন্তু নবু মামার মাছ মারার মন ছিল না। অপ্রাসঙ্গিক নানা কথা বলতে লাগলেন। দুপুর পর্যন্ত আমরা ইতস্তত ঘুরে বেড়ালাম। নবু মামার ভাবভঙ্গি আমার কাছে কেমন কেমন লাগল। তিনি যেন বিশেষ কোনো কারণে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিয়ের কথা হলে কিশোরী মেয়েরা যেমন পালিয়ে গিয়ে লজ্জায় লাল হয়, অনেকটা সে-রকম। নবু মামা বললেন, 'রঞ্জু, আমি আর পড়াশুনা করব না।'

'কেন?'

'ভালো লাগে না।'

'কী করবেন তবে?'

'ব্যবসা করব। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব।'

'নানাজান মানবে না।'

'আমি কারো ধার ধারি নাকি?'

বলতে বলতে নবু মামা ঈষৎ হাসলেন। দুপুরে খাওয়ার জন্যে চিঁড়া আর নারিকেল আনা হয়েছিল, তাই খাওয়া হল। হলদাপোতা থেকে আমরা আরো উত্তরে সরে গেলাম।

আমার আর ভালো লাগছিল না, রোদে গা তেতে উঠেছে। ইচ্ছে হচ্ছে ফিরে

যাই, কিন্তু নবু মামা বারবার বলছেন, 'একটা বড়ো মাছ ধরি আগে।'

সন্ধ্যার আগে আগে প্রকাণ্ড একটা কাতল মাছ ধরা পড়ল। সুগঠিত দেহ, কালচে আঁশ বেলাশেষের রোদে ঝকমক করছে। নৌকার পাটাতনে মাছটা ধড়ফড় করতে লাগল। দু' জনেই মহা খুশি। নবু মামা খুব যত্নে বঁড়শি খুলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমি বললাম, 'চলুন ফিরে চলি।'

'চল।'

ভাটার টানে নৌকা ভেসে চলেছে। হঠাৎ করে নবু মামার ভাবান্তর হল। আমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'মাছটা ছেড়ে দিই রঞ্জু?'

'কেন মামা?'

'না, ছেড়ে দি।'

বলেই মাছটা জলে ফেললেন। আমি চুপ করে রইলাম। নবু মামা বললেন, 'একবার আমি একটা পাখি ধরেছিলাম। টিয়া পাখি। তারপর কী মনে করে ছেড়ে দিয়েছি। আমার খুব লাভ হয়েছিল।'

'কী লাভ?'

'হয়েছিল। আজকে মাছটা ছেড়ে দিলাম, দেখিস মাছটা দোওয়া করবে আমার জন্যে।'

নবু মামা পাটাতনে শুয়ে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

বাড়ি এসে দেখি হুলস্থুল কাণ্ড। লাল মামীর সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছে সফুরা খালার। লাল মামী টেনে সফুরা খালার এক গোছা চুল তুলে ফেলেছে, গাল আঁচড়ে দিয়েছে। সফুরা খালা বিষম দৃষ্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। লাল মামী তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। কারো সঙ্গে কথাবার্তা নেই।

বাদশা মামা আধময়লা একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে বলছেন, 'সবাই যদি এলাচির সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে বেচারি কী করবে? কেউ দেখতে পারে না।' ছোট নানিজান শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। এক বার ধমকে দিলেন, 'যা তুই, খামাখা ঘ্যানঘ্যান। ভাল্লাগে না।'

বাদশা মামা উঠোনে গিয়ে বসে রইলেন। বোকার মতো তাকাতে লাগলেন এদিক-সেদিক। নবু মামাকে দেখে বললেন, 'দেখলি নবু, সফুরা কী ঝগড়া করল? এলাচির সারা দিন খাওয়া নাই।'

রাতের খাওয়া শেষ হতে অনেক রাত হল। রান্নাবান্না হতে দেরি হয়েছে। সংসারযাত্রা কিছু পরিমাণে বিপর্যস্ত। খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমুতে এসে দেখি সফুরা খালা বসে আছেন আমাদের ঘরে। সফুরা খালা বললেন, 'তোমাদের জন্যে বাইরের বাংলাঘরে বিছানা হয়েছে। এ ঘরে আমি থাকব।' তাকিয়ে দেখি পরিপাটি করে ঘর সাজান। আমার আর নবু মামার ব্যাবহারিক জিনিসপত্র কিছুই নেই। নবু মামা

বললেন, 'তুই থাকবি কেন এখানে? তোর নিজের ঘর কী হল?'

'আমার ঘরে পানি পড়ে, বিছানা ভিজে যায়।'

নবু মামা কিছুক্ষণ উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হনহন করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। সফুরা খালা বললেন, 'রঞ্জু, তুমি নবুকে চোখে চোখে রাখবে।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে বাদশা মামার সঙ্গে দেখা। বাদশা মামা বললেন, 'রঞ্জু, এলাচি ভাত খেয়েছে কিনা জানিস?'

'জানি না।'

'মোহরের মা বলল, খেয়েছে। তুই একটু খোঁজ নিয়ে আয়।'

'আপনি নিজে যান না মামা।'

'আচ্ছা আচ্ছা, আমি নিজেই যাই।'

লাল মামী সেদিন না-খেয়ে ছিলেন। রাতেও খেলেন না, দুপুরেও ভাত নিয়ে গিয়ে মোহরের মা ফিরে এল। সফুরা খালা অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। কিন্তু লাভ হল না। শেষ পর্যন্ত নানাজান এলেন। বিরক্ত ও দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, 'এ সব কী বউ?'

লাল মামী কথা বললেন না। নানাজান বললেন, 'খাও খাও, ভাত খাও!'

'না, খ.ব না।'

সমস্ত দিন কেটে গেল। সফুরা খালা কাঁদতে লাগলেন। কী বিশ্রী অবস্থা। বাদশা মামা নৌকা করে চলে গিয়েছেন শ্রীপুর। লাল মামীর মাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন একেবারে।

কানাবিবি বারবার বলে, 'বউয়ের কোনো খারাপ বাতাস লেগেছে, না হলে এমন হয়! মুকুন্দ ওঝাকে খবর দেও না এক বার।'

লাল মামীর মা খবর পেয়েই এসে পড়লেন। লাল মামী বলল 'না, আমি কিছুতেই খাব না। এ বাড়িতে কিছু খাব না আমি।' নানাজান বললেন, 'আচ্ছা, মেয়েকে না হয় নিয়েই যান। ক' দিন থেকে সুস্থ হয়ে আসুক।'

ধরাধরি করে লাল মামীকে নৌকায় তোলা হল। নৌকার পাটাতনে বাদশা মামা তাঁর সুটকেস নিয়ে আগে থেকেই বসে আছেন। লাল মামী বাদশা মামাকে দেখেই জ্বলে উঠলেন, 'ও গেলে আমি যাব না। আল্লাহর কসম, আমি যাব না।'

বাদশা মামা চুপচাপ নেমে পড়ে দাঁড়িয়ে বোকার মতো সবার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। যেন কিছুই হয় নি। তাঁর কাণ্ড দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল।

১১

নবু মামার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সবাই। মেয়ে তো আগেই ঠিক করা

ছিল, এবার কথাবার্তা এগুতে লাগল। নানাজান অনেক রকম মিষ্টি, হলুদ রংয়ের শাড়ি ও কানের দুল নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ে দেখতে গেলেন। সঙ্গে গেলেন হেডমাষ্টার সাহেব, আজিজ খাঁ সাহেব। আমিও গেলাম তাঁদের সঙ্গে। কী মিষ্টি মেয়ে, শ্যামলা রং, বড়ো বড়ো চোখ। একনজর দেখলেই মন ভরে ওঠে। দেখে আমার বড়ো ভালো লাগল। পৌষ মাসের মাঝামাঝি দিন ফেলে নানাজান উঠে এলেন।

বাড়িতে একটি চাপা আনন্দের স্রোত বইতে লাগল। সবচেয়ে খুশি সফুরা খালা। হাসি-হাসি মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সবার সঙ্গে বিয়ে নিয়ে গল্প। নবু মামার কিন্তু ভাবান্তর নেই। কী হচ্ছে না-হচ্ছে, তা নিয়ে মাথাব্যথাও নেই। মাছ ধরতে যান। কোথায়ও যাত্রাটাত্রার খবর পেলে যাত্রা শুনতে যান।

গ্রামের মাঠে ফুটবল নেমে গেছে। সারা বিকাল কাটান ফুটবল খেলে। সেন্টার ফরোয়ার্ডে তিনি দাঁড়ালে প্রতিপক্ষ তটস্থ হয়ে থাকে। শীল্ডের অনেক খেলা শুরু হয়ে গেছে। গ্রামের টীম খুব শক্ত। ফাইনালে উঠে যাবে সন্দেহ নেই। নবু মামা প্রাণপণে খেলেন। মরণপণ খেলা। বল নিয়ে দৌড়ে যাবার সময় তাঁর মাথার লম্বা চুল বাতাসে থরথরিয়ে কাঁপে। মাঠের বাইরে বসে বসে মুগ্ধ নয়নে আমি তাই দেখি। রাতের বেলা গরম পানি করে আনি, নবু মামা গরম পানিতে পা ডুবিয়ে অন্যমনস্কভাবে নানা গল্প করেন। লাল মামী প্রসঙ্গে কোনো আলাপ হয় না। তিনি সেই যে গিয়েছেন আর ফেরার নাম নেই। বাদশা মামা প্রতি হাটবারে নৌকা নিয়ে চলে যান। আবার সেই দিনই ফিরে আসেন। লাল মামীর ঘরেই বাকি সময়টা কাটে তাঁর। আমি বুঝতে পারি কোথায়ও সুর কেটে গিয়েছে। ভালো লাগে না। কবে লিলির চিঠি আসবে, কবে আমি চলে যেতে পারব, তাই ভাবি। তখন আমি অনেক রকম স্বপ্ন দেখতে শিখেছি। পরগাছা হয়ে বেঁচে থাকতে ঘেন্না বোধ হচ্ছে, অথচ বেরিয়েও আসতে পারছি না। বড়ো নানিজান অনেক সম্পত্তি নাকি আমাকে আর লিলিকে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাতে আমার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি।

তাছাড়া সে-সময়ে আমি প্রেমেও পড়েছিলাম। অচিনপুরের এই কাহিনীতে যে-প্রেমের উল্লেখ না করলেও চলে, কারণ তার কোনো ভূমিকা নেই এখানে। তবে প্রচণ্ড পরিবর্তন হচ্ছিল আমার মধ্যে---এইটুকু বলা আবশ্যক।

নবু মামার স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট হল তখন। খুবই ভালো রেজাল্ট। ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপ বলে কী-একটা স্কলারশিপ পেলেন। কলেজে ভর্তি হবার জন্যে টাকা-পয়সা নিয়ে নবু মামা রওনা হলেন। নানাজানের ইচ্ছে ছিল, নবু মামা যেন আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু নবু মামার ইচ্ছে প্রেসিডেন্সি কলেজ।

নবু মামার বিয়ের তারিখ ঠিকই থাকল। নবু মামা নিজেও এক দিন মেয়ে দেখে এলেন। সফুরা খালা যখন বললেন, 'মেয়ে পছন্দ হয়েছে?' নবু মামা ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছে।

বারোই ভাদ্র তারিখে নবু মামা চলে গেলেন। আর তেরই ভাদ্র বাদশা মামা শ্রীপুর থেকে আধপাগল হয়ে ফিরে এলেন। আমি ভাসা ভাসা ভাবে শুনলাম, লাল মামী শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবার নাম করে নবু মামার সঙ্গে চলে গিয়েছেন।

কেউ যেন জানতে না পারে, সেই জন্যে বাদশা মামাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হল। তাঁর মাথার ঠিক নেই, কখন কাকে কী বলে বসেন। ছোট নানিজানের ফিটের ব্যারাম হয়ে গেল। সফুরা খালাকে দেখে কোনো পরিবর্তন নজরে পড়ে না, শুধু তাঁর চোখে কালি পড়েছে। মুখ শুকিয়ে তাঁকে দেখায় বাচ্চা ছেলেদের মতো।

নানাজান সেই বৎসরেই হজ করতে গেলেন। যাওয়ার আগে সব সম্পত্তির বিলি-বন্দোবস্ত হল। বাদশা মামাকে সব লিখে-পড়ে দিয়ে গেলেন।

একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন বটগাছ যেন চোখের সামনে শুকিয়ে উঠেছে। সবুজ পাতা ঝরে যাচ্ছে, কাণ্ড হয়েছে অশক্ত। আমি তাই দেখছি তাকিয়ে তাকিয়ে। শৈশবের যে অবুঝ ভালোবাসায় নানাজানের বাড়িটিকে আমি ঘিরে রেখেছিলাম, সেই ভালোবাসা করুণ নয়নে চেয়ে আছে আমার দিকে। কিন্তু আমি তো এখানের কেউ নই। এক দিন চুপচাপ চলে যাব। কেউ জানতেও পারবে না, রঞ্জু নামের আবেগপ্রবণ ছেলেটি হঠাৎ কোথায় চলে গেল।

এত বড়ো বাড়ি, অথচ এই ক' জন মাত্র মানুষ আমরা। রাতের বেলা গা ছমছম করে। মোহরের মা মাঝেমধ্যে চমকে ওঠে, 'ওটা কি গো, ও মা, ভূত নাকি?' গাছের পাতায় বাতাস লেগে সরসর শব্দ হয়।

এ বাড়ির সব কিছুই বদলে গেছে। লাল ফেজটুপি-পরা নানাজান সূর্য ওঠার আগেই উঠোনের চেয়ারে এসে আর বসেন না। 'ফাবিয়ায়ে আলা রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান' ঘুমঘুম চোখে অর্ধজাগ্রত কানে কত বার শুনেছি এই সুর। এখন সকালটা বড়ো চুপচাপ।

ভোরের আলোয় মনের সব গ্লানি কেটে যায়। আমি চাই এ বাড়ির সবার মনের গ্লানি কেটে যাক। নবু মামা ফিরে এসে আগের মতো জোছনা দেখে উল্লাসে চিৎকার করুক : 'কী জোছনা, খেতে ইচ্ছে করে!' সফুরা খালা ঠিক আগের মতো লাঠি হাতে 'পাখি উড়ে গেল' বলে এ সংসারের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট উড়িয়ে দিক। বাদশা মামা তার সাজ-পোশাক পরে হিরণ্য রাজার পার্ট করুক। কিন্তু তা আর হবে না, তা হবার নয়। আমি সংসারের মন্থর স্রোতে গা এলিয়ে দিলাম। কারো সঙ্গেই আজ আমার যোগ নেই। দিন কেটে যেতে লাগল।

১২

টিনের কানেস্তারায় বাড়ি পড়েছে। উচ্চকণ্ঠে কী যেন ঘোষণা করা হচ্ছে। কৌতূহলী

হয়ে দাঁড়াতেই দেখি বাদশা মামা বিব্রত মুখে সারা গায়ে চাদর জাড়িয়ে হাঁটছেন। তার আগে আরেক জনকে টিনে বাড়ি দিয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে কী বলছে। আমি বললাম, 'কী ব্যাপার, মামা?'

'কিছু না, কিছু না।'

'ঢোল দিচ্ছে কে, আপনি নাকি?'

'হুঁ।'

'কিসের জন্যে?'

বাদশা মামা দাঁড়িয়ে পড়লেন। জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'রহমত পাগলার জন্যে ঢোল দিচ্ছি। যদি কেউ পায়, তাহলে পাঁচ টাকা পুরস্কার।'

'কেন, কী হয়েছে?'

বাদশা মামা এগিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু আমি ততক্ষণে তাঁর হাত চেপে ধরেছি। মামা অসহায়ভাবে তাকালেন আমার দিকে। আমি দৃঢ় গলায় বললাম, 'বলেন কী ব্যাপার।'

'রঞ্জু, পাগলটাকে খেদিয়ে দেবার পর থেকে যত অশান্তি শুরু হয়েছে, ফিরিয়ে আনলে যদি সব মিটে--'

মামা আমার হাত ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন।

বাদশা মামা আরো অনেক রকম পাগলামি করতে লাগলেন। নানাজানের একটি আম-কাঁঠালের প্রকাণ্ড বাগান ছিল, জলের দরে সেটি বেচে দিলেন। বিক্রির টাকা দিয়ে নাকি মসজিদ করবেন। ছোট নানিজান কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, 'এসব কী রে বাদশা?'

বাদশা মামা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললেন, তিনি নাকি স্বপ্নে দেখেছেন--সাদা পোশাক-পরা এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁকে বললেন, 'মসজিদ কর, সব কিছু ঠিক হবে।' ছোট নানিজান বললেন, 'বাদশা, তুই মিথ্যা কথা বলছিস।' বাদশা মামা মাথা নিচু করে চলে গেলেন। মসজিদের জন্যে ইট পোড়ান হতে লাগল। ময়মনসিংহ থেকে রাজমিস্ত্রি এল। বিরাট এক মিলাদ মহফিলের মধ্যে মসজিদের কাজ শুরু হল।

নানাজানের দু'টি বিল ছিল। বিলের মাছ থেকে পয়সা আসত বিস্তর। সেই টাকায় সংসারখরচ গিয়েও বেশ মোটা অংশ জমত। বিল দু'টি একই সঙ্গে হাতছাড়া হয়ে গেল। কীভাবে হল, কেউ বলতে পারল না। নানিজান সারা দিন চোখের পানি ফেলতে লাগলেন।

রহিম শেখ একসঙ্গে বেশ কয়েকটি মামলা রজু করল। সমস্তই মিথ্যা মামলা। বাদশা মামা নির্বিকার বসে আছেন মসজিদের সামনে। দেখছেন কী করে ইটের পর ইট বিছিয়ে ভিত তৈরি হচ্ছে। মামলার তদবিরের জন্য ছোট নানিজানকে নিয়ে আমিই যাওয়া-আসা করতে লাগলাম। দীর্ঘ দিন মামলা চলল। দু'টিতে জিত হল

আমাদের, একটি রহিম শেখ পেল।

নানাজান হজ থেকে ফিরে এলেন এই সময়ে। সংসারের তখন ভরাডুবি ঘটেছে। রোজকার বাজারের টাকাতেও টানাটানি পড়তে শুরু করেছে। নানাজান কিছুই বললেন না। ছয় মাসেই তাঁর বয়স ছয় বছর বেড়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি হয়েছে নিষ্প্রভ, একা একা হাঁটতে পারেন না। লাঠিতে ভর না দিয়ে দাঁড়াতে পারেন না। চোখের সামনে সংসারকে ভেঙে পড়তে দেখলেন। তবু সকালবেলায় কোরান শরীফ ধরে বিলম্বিত সুরে পড়তে লাগলেন, 'ফাবিয়ায়ে আলা রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান।' অতএব তুমি আমার কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করিবে?

বৎসর যাবার আগেই সম্পত্তির এক–তৃতীয়াংশ বিক্রি করে দিতে হল। বাদশা মামার মসজিদ ততদিনে শেষ হয়েছে। মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে চমৎকার নকশি–কাটা গম্বুজ। ধবধবে সাদা দেয়ালে নীল হরফে লেখা কলমায়ে তৈয়ব। পাড়ার ছেলেমেয়েরা আমপারা হাতে সকালবেলাতেই মসজিদে ছবক নিতে আসে। দেখেশুনে বাদশা মামা মহাসুখী। মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে মসজিদের সামনে পুকুর কাটিয়ে দিলেন। কী সুন্দর টলটলে জল পুকুরে, পাথরে বাঁধান প্রশস্ত ঘাট।

বাদশা মামাকে দেখে আমার নিজেরও ভালো লাগে। সাদা গোলটুপি পরে চোখে সুর্মা দিয়ে কেমন গর্বিত ভঙ্গিতে নামাজ পড়তে যান। এক দিন আমাকে ডেকে একটু ইতস্তত করে বললেন, 'রঞ্জু, জুমার রাত্রে তাহাযযতের নামাজ পড়ে শুয়েছি, অম্নি স্বপ্নে দেখি––তোর লাল মামী যেন নৌকায় করে ফিরে আসছে। আসবে ফিরে, দেখিস তুই।' বাদশা মামার চোখ আনন্দে চকচক করে।

লাল মামীর কথা ভাবতে চাই না আমি। তবু বড়ো মনে পড়ে। কে জানে কোথায় সংসার পেতেছে তারা। নাকি যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশময়। কোনো দিন কি সত্যি ফিরে আসবে ধসে যাওয়া পরিবারটিকে শেষ বারের মতো দেখে যেতে?

নিজের কথাও আজকাল খুব ভাবি। আজন্ম যে–রহস্যময়তার ভেতর বড়ো হয়েছি তা সরে সরে যায়। মনে হয় কিছুই রহস্য নয়। চাঁদের আলো, ভোরের প্রথম সূর্য সমস্তই রহস্যের অতীত প্রাকৃতিক নিয়মাবলী। যে–নিয়মের ভেতর আমরা জন্মাই, বড়ো হই, দুঃখকষ্ট পাই। দুঃখ ও সুখ কী তা নিয়েও ভাবতে চেষ্টা করি। মোহরের মা যখন তার আজীবন সঞ্চিত পোঁটলা–পুঁটলি নিয়ে অশ্রুসজল চোখে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'ও ব্যাটা রঞ্জু, যাই গো ব্যাটা। তোমার দুঃসময়ে একটা মানুষের বোঝা আর বাড়াইতাম না গো।' তখন আমার কোনো দুঃখবোধ হয় না। এ যেন ঘটতই। তাহলে দুঃখ কী? নতুন করে আবার সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে শুনে ছোট নানিজান যখন উন্মাদের মতো কাঁদেন, তখন বুঝি এই–ই দুঃখ। অথচ সফুরা

খালা যখন হাসিমুখে বলেন, 'গরিব মানুষ হওয়ার অনেক রকম মজা আছে রঞ্জু। তুমি ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াতে পারবে, কেউ কিছু বলবে না।' তখন সব ভাবনা-চিন্তা জট পাকিয়ে যায়।

সন্ধ্যাবেলা আমি নানাজানের হাত ধরে তাঁকে বেড়াতে নিয়ে যাই। হিম লেগে তাঁর কাশি হয়, খুকখুক করে কাশেন। আমি যদি বলি চলেন ঘরে যাই, নানাজান আঁৎকে ওঠেন, 'না-না, আরেকটু--আরেকটু বেড়াই।' পরম নির্ভরতার সঙ্গে তিনি আমার হাত ধরে হাঁটেন। বেলাশেষের সূর্যরশ্মি তাঁর সফেদ দাড়িতে চকচক করে।

১৩

লিলির যে-চিঠির জন্যে পরম আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছিলাম, সে-চিঠি এসে গেছে। লিলি গোটা গোটা হরফে লিখেছে, 'আমি জানি, তুই রাগ করেছিস। কত দিন হল গিয়েছি, কিন্তু কখনো তোর কাছে চিঠি লিখি নি। কী করব বল? এমন খারাপ অবস্থা গেছে আমার। তোর দুলাভাইয়ের চাকরি নেই। বসতবাটিও পদ্মায় ভেঙে নিয়েছে। একেবারে ভিক্ষা করবার মতো অবস্থা। কত দিন যে মাত্র এক বেলা খেয়েছি। তারপর আবার তোর দুলাভাইয়ের অসুখ হল। মরোমরো অবস্থা। এখন অবশ্যি ঠিক হয়ে গেছে সব। তুই অতি অবশ্যি এসে যা রঞ্জু।'

লিলির চিঠি পকেটে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই। সবাইকে ছেড়ে যেতে বড়ো মায়া লাগে। আশৈশব পরিচিত এ বাড়িঘর। বাদশা মামা, নানাজান, লাল মামী, নবু মামা এঁদের সবার স্মৃতির গন্ধ নিয়ে যে-বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ছেড়ে কী করে যাই? আমি উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সোনাখালির পুলের উপর অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকি। নৌকা নিয়ে চলে যাই হলদেপোতা। খুব জোছনা হলে সফুরা খালাকে নিয়ে পুকুরঘাটে বেড়াতে যাই। সফুরা খালা বলেন, 'তুমি কবে যাবে রঞ্জু?'

'যে-কোনো এক দিন যাব।'

'সেই যে- কোনো এক দিনটা কবে?'

'হবে এক দিন।'

একেক রাতে সফুরা খালা কাঁদেন। তাঁর গভীর বিষাদ বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। বুঝতে চাই না। যে-বন্ধন আমাকে এখানে আটকে রেখেছে, কবে তা কাটবে, কবে চলে যাব--তাই ভাবি। নানাজানও মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার যাওয়ার দিন ঠিক হয়েছে?'

'না।'

'তোমার আর লিলির নামে যে-জমিজমা আছে, তার কী হবে?'

'যেমন আছে তেমন থাকবে।'

নানাজান কথা বললেন না। আমি জানি এই জমিটুকুই তাঁদের অবলম্বন।

সে রাতে ভীষণ শীত পড়েছিল। সন্ধ্যা না নামতেই ঘন কুয়াশা চারিদিক আচ্ছন্ন করে ফেলল। রাতের খাওয়ার পর হ্যারিকেন হাতে বাইরের ঘরে আসছি, হঠাৎ দেখি বাদশা মামা দারুণ উত্তেজিত হয়ে দ্রুত আসছেন। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

'রঞ্জু, দেখ দেখ।'

আমি তাকিয়ে দেখলাম, একটু দূরে, লাল মামী একটি বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে বিপন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বাদশা মামা বলে চলেছেন, 'নৌকা করে সন্ধ্যার আগেই এরা দু' জন এসেছে। চুপচাপ বসে ছিল। আমি মসজিদে যাব বলে ওজু করতে গিয়েছি, এমন সময়....'

লাল মামী বাচ্চা মেয়েটির হাত ধরে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। (যে উঠোনে অনেক অনেক দিন আগে আমার মা তাঁর দু'টি ছেলেমেয়ের হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।) কেউ কোনো কথা বলল না। নানাজান চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। ছোট নানিজান যেন কিছুই বুঝছেন না, এমন ভঙ্গিতে তাকাতে লাগলেন। সফুরা খালা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি নিচে নেমে এলেন। বাদশা মামা ব্যস্ত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর গরম শালটা কোথায় সফুরা? এলাচির শীত করছে।'

নবু মামার কথা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। সবাই চুপ করে রইল। একসময় দেখলাম লাল মামী কাঁদছেন।

আমি চুপচাপ বাইরের ঘরে বসে বসে ঝিঁঝির ডাক শুনতে লাগলাম। অনেক রাতে বাদশা মামা আমাকে ডেকে নিলেন। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'তোরা সবাই যদি দূরে দূরে থাকিস, তাহলে এলাচি কী মনে করবে বল? চল রঞ্জু।'

বাদশা মামা আমার হাত ধরলেন।

বহু দিন পর লাল মামীর ঘরে এসে ঢুকলাম। পালঙ্কে লাল মামী আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর কোলের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে বাচ্চা মেয়েটি ঘুমিয়ে। আমি এসে বসতেই লাল মামী একটু সরে গেলেন। আমি বললাম, 'কেমন আছেন মামী?'

মামী মাথা নাড়লেন। বাদশা মামা বললেন, 'মোটেই ভালো না রঞ্জু। দেখ না, স্বাস্থ্য কী খারাপ হয়ে গেছে!' আমি চুপচাপ বসে রইলাম। বাদশা মামা ব্যস্ত হয়ে পুরনো গ্রামোফোন খুঁজে বের করলেন।

আমি বললাম, 'আজ থাক, মামা।'

'না–না শুনি। আমার শোনার ইচ্ছা হচ্ছে।'

লাল মামী মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'না–না থাকুক। গান বাজাতে হবে না।'

তবু গান বেজে উঠল--

'আমার ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো
তোরে আমি কোথায় রাখি বল।'

আমি চলে এলাম। এই অচিনপুরীতে থাকবার কাল আমার শেষ হয়েছে।

নির্বাসন

রাত্রিতে তাঁর ভালো ঘুম হয় নি।

বার বার ঘুম ভেঙেছে---তিনি ব্যস্ত হয়ে ঘড়ি দেখেছেন। না, এখনো রাত কাটে নি। এক বার হিটার জ্বালিয়ে কফি বানালেন, কিছুক্ষণ পায়চারি করে এলেন ছাদে। আবার বিছানায় ফিরে গিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করলেন। ছাড়া-ছাড়া ঘুম, অর্থহীন এলোমেলো স্বপ্ন দেখে আবার ঘুম ভাঙল।

ভোর হতে আর কত দেরি? আকাশে সামান্য একটু আলোর রেখা কখন ফুটবে? কা-কা করে কাক ডাকছে। অন্ধকার একটু যেন ফিকে হয়ে গেল। আর হয়তো বেশি দেরি নেই। তিনি এই শীতেও ঘরের দরজা-জানালা সব খুলে দিলেন। জানালার সমস্ত পর্দা গুটিয়ে ফেললেন। অন্ধকারে কিছুই নজরে আসছে না। কিন্তু তিনি বাতি জ্বালালেন না। হাতড়ে-হাতড়ে ইজিচেয়ারটি খুঁজে বের করলেন। এখানে শুয়ে থেকেই রেডিওগ্রামের সুইচ নাগাল পাওয়া যায়। রেডিওগ্রামে সানাইয়ের তিনটি লং-প্লেইং রেকর্ড সাজান আছে। সুইচ টিপলেই প্রথমে বেজে উঠবে বিসমিল্লাহ্ খাঁর মিয়া কি টৌড়ি। তিনি সুইচে হাত রেখে ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর বহু দিনের স্বপ্ন জরীর বিয়ের দিনের ভোরবেলায় সানাইয়ের সুর শুনিয়ে সবার ঘুম ভাঙাবেন। ঘুম ভাঙতেই সবাই যেন বুঝতে পারে---জরী নামের এ বাড়ির একটি মেয়ে আজ চলে যাবে।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তাঁর চোখে জল এল। বয়স হবার পর থেকে এই হয়েছে। কারণে-অকারণে চোখ ভিজে ওঠে। সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি বড়ো তীব্র হয়ে বুকে বাজে।

একতলায় কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ঘটাং ঘটাং শব্দে টিউবওয়েলে কেউ এক জন পানি তুলছে। মোরগ ডাকছে। ভোর হল বুঝি। তিনি সুইচ টিপলেন।

সানাই শুনলে এমন লাগে কেন? মনে হয় বুকের মাঝখানটা হঠাৎ ফাঁক হয়ে

গেছে। তাঁর অদ্ভুত এক রকমের কষ্ট হতে লাগল। তিনি ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। হু-হু করে শীতের হিমেল বাতাস বইছে। এবার বড়ো আগেভাগে শীত পড়ে গেল। খুব শীত পড়লেই তাঁর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। স্পষ্ট দেখতে পান, কমলালেবু হাতে সাত-আট বছরের একটি বাচ্চা ছেলে বারান্দায় বসে হু-হু করে কাঁপছে। আজও তাঁর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। আহ্ পুরানো কথা ভাবতে এত ভালো লাগে। তিনি মনে মনে বললেন, 'ভাগ্যিস জন্তু-জানোয়ার না হয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছি।'

জরী কি এখনো ঘুমুচ্ছে? আজ ঘুম ভাঙলে তার কেমন লাগবে কে জানে? তাঁর খুব ইচ্ছে হচ্ছে জরীকে ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে আসেন। সে আজ তাঁর সঙ্গে ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখুক। দেখুক, খুব ভোরে চেনা পৃথিবী কেমন অচেনা হয়ে পড়ে। হালকা কুয়াশায় ঢাকা শীতের সকালে কী অপরূপ সূর্যোদয় হয়।

কিন্তু জরীটা বড্ড ঘুমকাতুরে। তিনি কত চেষ্টাই না করেছেন সকালে জেগে ওঠার অভ্যাস করাতে। সে বরাবর আটটার দিকে উঠেছে। বিছানা না ছেড়েই চিৎকার, 'ও মা চা দাও, ও মা চা দাও।' বাসিমুখে চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে উঠে এসেছে দোতলায়। তিনি হয়তো ততক্ষণ রেওয়াজ শেষ করে উঠবেন উঠবেন করছেন। জরী হাসিমুখে বলেছে, 'বড়োচাচা, আজ আপনার গান শুনতে পারলাম না।'

তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'দশটায় ঘুম ভাঙলে কী গান শুনবে জরী? আমার গান শুনতে হলে রাত কাটার আগে উঠতে হবে।'

'কাল ঠিক উঠব বড়োচাচা। এই আপনার সেতার ছুঁয়ে বলছি।'

বলতে বলতেই সেতারের তারে টোকা দিয়েছে জরী। 'গাঁও' করে একটি গম্ভীর আওয়াজ উঠেছে। শুনে জরীর সে কি হাসি।

তিনি মনে মনে বললেন, আজ শুধু জরীর কথা ভাবব। তিনি জরীর মুখ মনে করতে চেষ্টা করলেন। আশ্চর্য, মনে আসছে না তো? এ রকম হয়। খুব ঘনিষ্ঠ লোকজন, যারা সব সময় খুব কাছাকাছি থাকে, হঠাৎ করে তাদের মুখ মনে করা যায় না। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ছাদে উঠে গেলেন।

এ বাড়ির ছাদটি প্রকাণ্ড। ছাদের চারপাশে বড়ো বড়ো ফুলের টবে অযত্নে কিছু গোলাপ-চারা বড়ো হচ্ছে। তিনি ছাদের কার্নিশে ঝুঁকে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সামনে হাত বাড়ালেন। ছাদের এ দিকটায় দু'টি প্রকাণ্ড আমগাছ দিনের বেলাতেও অন্ধকার করে রাখে। চারদিকে অন্ধকার ফিকে হয়ে এলেও এখানে কালো রঙ জমাট বেঁধে আছে। কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। শীতকালে আমের মুকুল হয় নাকি?

'বড়ো চাচা।'

তিনি চমকে পিছনে ফিরলেন। আশ্চর্য! জরী দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পেছনে। ঘুম-জড়ান ফোলা ফোলা মুখ। মেয়েটিকে আজ বড়ো অচেনা মনে হচ্ছে। এত রূপসী

তো জরীকে কখনো মনে হয় নি। বিয়ের আগের দিন সব মেয়ে নাকি গুটিপোকার মতো খোলস ছেড়ে প্রজাপতি হয়ে বেরিয়ে আসে। তিনি হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন।

'বড়োচাচা, কী করছেন একা একা?'

'সানাই শুনছি।'

'আজ আমি খুব ভোরে উঠেছি। আপনি খুশি হয়েছেন চাচা?'

তিনি হাসলেন। জরী একটা হলুদ রঙের চাদর গায়ে জড়িয়েছে। একটু একটু কাঁপছে শীতে?

'জরী, তোর শীত লাগছে?'

'উঁহু। আপনি আজ রেওয়াজ করবেন না চাচা?'

'না মা। আজ আমার ছুটি।'

দু' জনে খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। জরী অস্ফুট স্বরে বলল, 'ইস্, কী কুয়াশা পড়েছে বাবা!'

তিনি একসময় বললেন, 'সানাই শুনতে ভালো লাগছে জরী?'

'লাগছে।'

'কে বাজাচ্ছে জান?'

'জানি না, কে বাজাচ্ছে।'

'বিসমিল্লাহ্ খাঁ, এখন বাজছে মিয়া কি টৌড়ি।'

জরী আরো কাছে সরে এসে কার্নিশে ভর দিয়ে দাঁড়াল। মৃদু গলায় বলল, 'কী সুন্দর লাগছে! আগে জানলে রোজ ভোরে উঠতাম।'

তিনি জরীর দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাসলেন। জরী বলল, 'একটা হালকা সুবাস পাচ্ছেন বড়োচাচা?'

'পাচ্ছি।'

'বলুন তো কিসের?'

তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন। শিউলি ফুলের নাকি? বাগানে একটি শিউলিগাছ আ্যাছে। কিন্তু সে-ফুলের গন্ধ তো হালকা।

এতক্ষণে সূর্য উঠল। গাছে গাছে কাক ডাকছে। কিচির-মিচির করতে করতে দু'টি শালিক এস বসল ছাদে। জরী হাত বাড়িয়ে দু'টি আমের পাতা ছিঁ'ড়ে এনে গন্ধ শুঁকল। তিনি দেখলেন জরী কাঁদছে। তিনি চুপ করে রইলেন। আহা একটু কাঁদুক। এমন একটি সময়ে না কাঁদলে মানায় না। তাঁর ভীষণ ভালো লাগল। তিনি কোমল গলায় বললেন, 'জরী, দেখ সূর্য উঠেছে। এমন সুন্দর সূর্যোদয় কখনো দেখেছিস?'

জরী চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, 'সান্তাহার যাবার সময় এক বার ট্রেনে দেখেছিলাম।'

'দেখ, আজকে আবার দেখ।'

জরী ফিসফিস করে বলল, 'কী সুন্দর!'

বলতে বলতে জরী আবার চোখ মুছল। তিনি নরম গলায় বললেন, 'বোকা মেয়ে, আজকের দিনে কেউ কাঁদে? ঐ দেখ দু'টি শালিক পাখি। দুই শালিক দেখলে কী হয় মা?'

জরী ফিসফিস করে বলল, 'ওয়ান ফর সরো, টু ফর জয়।'

ঠিক তখনি জরীর বন্ধুরা নিচ থেকে 'জরী জরী' করে চেঁচাতে লাগল। জরী নিঃশব্দে নিচে নেমে গেল।

তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। ভোরের এরকম অচেনা আলোয় মন বড়ো দুর্বল হয়ে যায়। আপনাকে ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। বড়ো বেশি মনে পড়ে, দিন ফুরিয়ে গেল। তিনি সুর করে পড়লেন--'ফাবিআয়ে আলা রাব্বিকুমা তুকাজ জিবান।'

কাল রাতে চার বান্ধবী জরীকে নিয়ে একখাটে ঘুমিয়েছিল। এরা অনেক দিন পর একসঙ্গে হয়েছে। লায়লার সঙ্গে জরীর দেখা হয়েছে প্রায় চার বছর পর। আভা ও কনক ময়মনসিংহ থাকলেও দেখাসাক্ষাৎ প্রায় হয় না বললেই চলে। রুনু জরীর দূরসম্পর্কের বোন। স্কুলের পড়া শেষ হবার পর একমাত্র তার সঙ্গেই জরীর রোজ রোজ দেখা হ'ত। পুরনো বন্ধুদের মধ্যে শেলী ও ইয়াসমীন আসে নি।

অনেক দিন পর মেয়ে বন্ধুরা একত্রিত হলে একটা দারুণ ব্যাপার হয়। আচমকা সবার বয়স কমে যায়। প্রতিনিয়ত মনে হয় বেঁচে থাকাটা কী দারুণ সুখের ব্যাপার!

জরীর বন্ধুরা গত পরশু থেকে ক্লান্তিহীন হৈচৈ করে যাচ্ছে। গুজগুজ করে খানিকক্ষণ গল্প, পরমুহূর্তেই উচ্ছ্বসিত হাসি। আবার খানিকক্ষণ গল্প, আবার হাসি। এক জনকে হয়তো দেখা গেল হঠাৎ কী কারণে দল ছেড়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। তার পিছনে পিছনে ছুটছে বাকি সবাই। খিলখিল হাসির শব্দে সচকিত হয়ে উঠছে বাড়ির লোকজন।

গতরাতটা তাদের জেগেই কেটেছে। আভা তার প্রেমের গল্প বলেছে রাত একটা পর্যন্ত। তার প্রেমিকটি এক জন অধ্যাপক। আভার বর্ণনানুসারে দারুণ স্মার্ট ও খানিকটা বোকা। সে তার স্মার্ট প্রেমিকটির দু'টি চিঠিও নিয়ে এসেছিল বন্ধুদের দেখাতে। কাড়াকাড়ি করে দেখতে গিয়ে সে চিঠির একটি ছিঁড়ে কুটিকুটি। অন্যটি থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবাই বানান ভুল বের করতে লাগল। এক-একটি ভুল বের হয়, আর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সবাই।

মাঝরাতে লায়লার হঠাৎ চা খাবার ইচ্ছে হল। কনক বলল, 'চমৎকার, চল সবাই--ছাদে বসে চা খাই।'

রুনু রাজি হল না। তার নাকি ঘুম পাচ্ছে। সে বলল, 'এই শীতে ছাদে কেন?

এখানেই তো বেশ গল্পগুজব করছিস।'

কনক বলল, 'ছাদে আমি গান শোনাব।' সঙ্গে সঙ্গে দলটি চেঁচিয়ে উঠল। গত দু' দিন ধরেই কনককে গাইবার জন্যে সাধাসাধি করা হচ্ছে। লাভ হয় নি। কনক কিছুতেই গাইবে না। লায়লা এক বার বলেই ফেলল, 'একটু নাম হয়েছে, এতেই এত তেল? টাকা না পেলে আজকাল তুই আর গাস না?'

কনক কিছু বলে নি, শুধু হেসেছে।

ধুপধাপ শব্দ করে সবাই যখন ছাদে উঠল, তখন নিশীথ রাত। চারদিকে ভীষণ অন্ধকার। জরী বলল, 'দুর ছাই, জোছনা নেই। আমি ভেবেছিলাম জোছনা আছে।'

আভা বলল, 'আমার ভয় করছে ভাই, গাছের ওপর ওটা কি?'

'ওটা হচ্ছে তোর অধ্যাপক প্রেমিকের এস্ট্রেল বডি। তোকে দেখতে এসেছে।'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। এই হাসির মধ্যেই গান শুরু করল কনক, 'সঘন গহন রাত্রি....'

গান শুরু হতেই সবাই চুপ করে গেল। আভা চাপা গলায় বলল, 'কী সুন্দর গায়! বড়ো হিংসা লাগে।'

কনকের গলা খুব ভালো। ছোটবেলায় কিন্তু কেউ বুঝতে পারে নি, অল্প সময়ে কনকের এত নাম-ডাক হয়ে যাবে। রেডিওতে প্রথম যখন গায় তখন সে কলেজে পড়ে। তার পরপরই তার গানের প্রথম ডিস্ক বের হয়--যার এক পিঠে 'আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই' অন্য পিঠে 'ওগো শেফালী বনের মনের কামনা'।

কনক পরপর চারটি গান গাইল। গানের মাঝখানে জরীর মা চায়ের পট নিয়ে মৃদু অনুযোগের সুরে বললেন, 'নাও তোমাদের চা। এত রাত্রে ছাদে গান-বাজনা কি ভালো? চা খেয়ে ঘুমুতে যাও সবাই।'

কেউ নড়ল না। রুনু বলল, 'কনক, আজ সারা রাত তোমাকে গাইতে হবে।'

জরীর মা-ও এক পাশে বসে পড়লেন। জরীর বড়োচাচাও উঠে এলেন ছাদে। আসর যখন ভাঙল তখন রাত দুটো। জরীর বড়োচাচা বললেন, 'বড়ো ভালো লাগল মা, বড়ো মিঠা গলা। জরীর গলাও ভালো ছিল। কিন্তু সে তো আর শিখল না।'

আভা বলল, 'এখন শিখবে।'

সবাই খিলখিল করে হেসে উঠল। কনক বলল, 'আপনার একটা গান শুনি?'

'অন্য দিন, আজ অনেক রাত হয়েছে। তোমরা ঘুমুতে যাও।'

সে-রাতে করোরই ভালো ঘুম হল না। জরীর বড্ড মন কেমন করতে লাগল। তার ইচ্ছে করল মার কাছে গিয়ে ঘুমোয়। কিন্ত সে মড়ার মতো পড়ে রইল। আভা একবার ডাকল, 'জরী, ঘুমিয়েছিস?' জরী তার জবাব দিল না। একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। শুধু জরী জেগে রইল। বিয়ের আগের রাতে কোনো মেয়ে কি আর ঘুমুতে পারে?

ইনিয়ে বিনিয়ে ভৈরবীর সুরে সানাই বাজছে। যে–সুরটি ওঠানামা করছে সেটি যেন একটি শোকাহত রমণীর বিলাপ। অন্য যে–সুরটি ক্রমাগত বেজে যাচ্ছে সেটি যেন বলছে--কেঁদো না মেয়ে, শোন, তোমাকে কী চমৎকার গান শোনাচ্ছি।

জরীর বন্ধুদের ঘুম ভেঙেছে। জরী ঘরে নেই। লায়লা গাঢ় স্বরে ডাকল, 'ও কনক, কনক।'

'কি?'

'সানাই শুনছিস?'

'শুনছি।'

'ভালো লাগছে তোর?'

'না। খুব মন খারাপ করা সুর।'

তারা সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। আভা গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'জরী, জরী।' জরী ছাদ থেকে আসতেই সবাই দেখল, তার চোখ ঈষৎ রক্তাভ ও ফোলা ফোলা। রুনু বলল, 'রাতে তোর ঘুম হয় নি, না রে?'

'খুব হয়েছে।'

'এখন তোর কেমন লাগছে জরী?'

'কেমন আর লাগবে। ভালোই। আয়, বাগানে বেড়াতে যাই।'

তারা বাগানে নেমে গেল। এ–বাড়ির বাগানটি পুরনো। জরীর দাদার খুব ফুলের শখ ছিল। মালী রেখে চমৎকার বাগান করেছিলেন। বসরাই গোলাপের প্রকাণ্ড একটি ঝাড় ছাড়া এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বাড়ির সর্ব–দক্ষিণে বেশ কিছু হাস্নুহেনাগাছ আছে। সেখানে হাঁটু উঁচু বড়ো বড়ো ঘাস গজিয়েছে। ওদিকটায় কেউ যায় না।

আভা বলল, 'এত সুন্দর বাগান, কেউ যত্ন করে না কেন রে?'

জরী বলল, 'বাগানের শখ নেই কারো। এক পরী আপার ছিল, সে তো আর থাকে না এখানে।'

লায়লা বলল, 'পরী আপা কি আগের মতো সুন্দর আছে?'

'এলেই দেখবি।'

'কখন আসবেন?'

'সকাল সাড়ে আটটায়, ময়মনসিংহ এক্সপ্রেসে।'

কনক বলল, 'এত বড়ো গোলাপ হয় নাকি, আশ্চর্য। জরী, গোলাপ তুলব একটা?'

'তোল না।'

চার জন অলস ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সবাই কিছু পরিমাণে গম্ভীর। লায়লা ঘনঘন কাশছে। কাল রাতে তার ঠাণ্ডা লেগেছে। কনকের দেখাদেখি সবাই গোলাপ ছিঁড়ে খোঁপায় গুঁজেছে। আভা হঠাৎ করে বলল, 'তোদের এখানে বকুলগাছ

নেই, না?'

'উঁহু।'

'আমার হঠাৎ বকুলফুলের কথা মনে পড়ছে। আমাদের স্কুলের বকুলগাছটার কথা মনে আছে তোদের?'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। স্কুলের বকুলগাছটা নিয়ে অনেক মজার মজার ব্যাপার আছে।

জরীর মা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেয়েদের দেখছিলেন। তিনি সেখান থেকে চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'ও জরী, জরী।'

'কী মা?'

'কী করছিস তোরা?'

কনক বলল, 'বেড়াচ্ছি--আপনিও আসুন না খালাম্মা।'

জরীর মা হাসিমুখে নেমে এলেন। মনে হল মেয়েদের দলে এসে তাঁর বয়স যেন হঠাৎ করে কমে গিয়েছে। তিনি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, 'গত রাতে একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম, জরী যেন খুব ছোট হয়ে গিয়েছে। ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগানে। আর জেগে দেখি সত্যি তাই।'

'বললেই হল। আমি বুঝি ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি?'

জরীর মা হাসতে লাগলেন। হালকা গলায় বললেন, 'আমার যখন বিয়ে হয়, তখন এ বাগানটা আরো বড়ো ছিল। আমি রোজ সকালে এখানে এসে একটা করে ফুল খোঁপায় গুঁজতাম।'

বলেই তিনি হঠাৎ লজ্জা পেয়ে গেলেন। লায়লা বলল, 'আসুন খালা, আজ আপনার খোঁপায় ফুল দিয়ে দি।'

'কী যে বল মা, ছিঃ ছিঃ!'

কিন্তু ততক্ষণে কনক একটি ফুল ছিঁড়ে এনেছে। জরীর মা আপত্তি করবার আগেই তারা সেটি খোঁপায় পরিয়ে দিল। তিনি বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি তোমাদের চায়ের যোগাড় করি। আর দেখ, হাস্নুহেনা-ঝাড়ের দিকে যেয়ো না। খুব সাপের আড্ডা ঐদিকে।'

'শীতকালে সাপ কোথায় খালা?'

'না থাক, তবুও যাবে না।'

জরীর মা চলে যেতেই আভা বলল, 'খালা এখনো যা সুন্দর, দেখলে হিংসা লাগে।'

'পরী আপাও ভীষণ সুন্দর। তাই না জরী?'

'হ্যাঁ। আর আমি কেমন?'

'পরী আপা ফার্স্ট ক্লাস হলে তুই ইন্টার ক্লাস, আর আমাদের কনক হচ্ছে এয়ারকণ্ডিশণ্ড ফার্স্ট ক্লাস।'

কনক একটু গম্ভীর হয়ে পড়ল। জরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর খুব মায়াবী চেহারা জরী। রূপবতী হওয়া খুব বাজে ব্যাপার।'

'বাজে হলেও আমি রূপবতী হতে রাজি।'

সবাই হেসে উঠলেও কনক হাসল না। অসাধারণ সুন্দরী হয়ে জন্মানয় সে অনেক বার বাথরুমে দরজা বন্ধ করে কেঁদেছে। অনেক বার তার মনে হয়েছে, সাধারণ একটি বাঙালী মেয়ে হয়ে সে যদি জন্মাত! শ্যামলা রঙ, একটু বোকা-বোকা ধরনের মায়াবী চেহারা। কিন্তু তা হয় নি। পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টির নিচে অনেক যন্ত্রণার মধ্যে তাকে বড়ো হতে হয়েছে। অথচ ছোটবেলায় কেউ যখন বলত, কনকের মতো সুন্দর একটি মেয়ে দেখেছি আজ। তখন কী ভালোই না লাগত!

কুয়াশা কেটে রোদ উঠেছে। ধানী রঙের নরম রোদ। শিশিরভেজা মাটি থেকে আর্দ্র এক ধরনের গন্ধ আসছে। মেয়েদের দলটি গোল হয়ে বসে আছে শিউলিগাছের নিচে। এই গাছটি এক সময়ে প্রচুর ফুল ফোটাত। আজ তার আর সে-ক্ষমতা নেই। কয়েকটি সাদা সাদা ফুল পড়ে আছে। শীতের বাগানে যখন ধানী রঙের রোদ ওঠে এবং সেখানে যদি কয়েকটি মেয়ে চুপচাপ গোল হয়ে বসে থাকে, তাহলে বাগানের চেহারাই পাল্টে যায়। বড়োচাচা অবাক হয়ে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিয়েবাড়ির লোকজন ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের হুটোপুটি আর কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। টিউবওয়েলে ঘটাং ঘটাং করে ক্রমাগত পানি তোলা হচ্ছে। ডেকোরেটরের দোকান থেকে লোকজন এসে গেটের জন্য মাপজোক শুরু করেছে। জরীর বাবা অকারণে একতলা থেকে দোতলায় ওঠানামা করছেন। মাঝে মাঝে তাঁর উঁচু গলা শোনা যাচ্ছে, 'এক ঘন্টা ধরে বলছি এক কাপ চা দিতে। শুধু এক কাপ চা, এতেই এত দেরি? মেয়ের বিয়ে কি আর কারো হয় না?'

আভা হঠাৎ বলল, 'জরী, তোর ছোটচাচার ছেলে কি আমেরিকা চলে গেছে?'

'না, সতের তারিখে যাবে।'

'একাই যাচ্ছে?'

'না। বড়োচাচা সঙ্গে যাবেন।'

কনক বলল , 'কী জন্যে যাচ্ছেন? কই, আমি তো কিছু জানি না?'

জরী অস্বস্তি বোধ করল। থেমে থেমে বলল, 'চিকিৎসা করাতে যাচ্ছে। মেরুদণ্ডে গুলী লেগেছিল। সেই থেকে পেরাপ্লেজিয়া হয়েছে। কোমরের নিচে থেকে অবশ।'

'আমাকে তো কিছু বলিস নি তুই, গুলী লাগল কী করে?'

'আর্মির লেফটেন্যান্ট ছিলেন। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে যখন পাক-আর্মির সাথে যুদ্ধ হয়, তখন গুলী লেগেছে।'

লায়লা বলল, 'জরীর এই ভাইটিকে তো তুই চিনিস, কনক। মনে নেই--এক বার আমরা সবাই দল বেঁধে আনন্দমোহন কলেজে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম? তখন যে একটি ছেলে সন্ন্যাসী সেজেছিল, হঠাৎ নাটকের মাঝখানে তার দাড়ি খুলে পড়ে গেল। ঐ তো আনিস। যা মুখচোরা ছিল।'

জরী একটু হেসে বলল, 'ছোটবেলায় আনিস ভাই ভীষণ বোকা ছিল। একেক বার এমন হাসির কাণ্ড করত! তাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেলেই হয়েছে, হয় সেখানে একটা কাপ ভাঙবে, নয় চেয়ার নিয়ে হঠাৎ গড়িয়ে পড়বে।'

রুনু বলল, 'বাঘের গল্পটা বল জরী, ওটা ভীষণ মজার।'

'না থাক।'

'বল না, শুনি।'

'এক বার আমরা সবাই "জঙ্গল বয়" ছবি দেখে এসেছি। আনিস ভাই ফিরে এসেই বড়চাচার সোয়েটার গায়ে দিয়ে বাঘ সেজেছে। আর আমরা সেজেছি হরিণ। আনিস ভাই হালুম শব্দ করে আমার ঘাড় কামড়ে ধরল। কিছুতেই ছাড়বে না। রক্তটক্ত বেরিয়ে সারা, শেষে বড়োচাচা এসে ছাড়িয়ে দিলেন। দেখ, এখনো দাগ আছে।'

জরীর মা দোতলা থেকে ডাকলেন, 'ও মেয়েরা, চা দেওয়া হয়েছে, এস শিগ্‌গির।' সবাই দেখল, তাঁর মুখ খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এক জন সুখী চেহারার মা, যার খোঁপায় গোঁজা ফুলটি এখনো রয়েছে। হয়তো ফেলে দিতে তাঁর মনে নেই, কিংবা ইচ্ছা করেই ফেলেন নি।

আভা বলল, 'চা খেয়ে আমরা আনিস ভাইয়ের সঙ্গে একটু গল্প করব, কেমন জরী?'

'বেশ তো, করবি।'

'যুদ্ধের গল্প শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।'

কনক বলল, 'কই, আর সানাইয়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো?'

সানাই বাজছিল ঠিকই, কিন্তু বিয়েবাড়ির হৈচৈ এত বেড়েছে যে শোনা যাচ্ছে না।

তারা সবাই দোতলায় উঠে এল। সিঁড়িতে জরীর বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি দ্রুত নামছিলেন। জরীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, 'শুনেছিস কারবার, রশীদ টেলিফোন করেছে--দৈ নাকি পাওয়া যাবে না। জরী, তুই আমার সোয়েটারটা বের করে দে, আমি নিজেই যাই। তাড়াতাড়ি কর। এমন গাধার মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন--' বলে তাঁর খেয়াল হলে বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি নিজেই খুঁজে নেব।' জরীর বন্ধুরা হাসতে লাগল।

সমস্ত শরীর মনে হচ্ছিল অবশ হয়ে যাচ্ছে। কোমরে কাছে চিনচিনে ব্যথা ক্রমশ

তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। সে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল। ব্যাথাটা শুরু হলেই ভীষণ ঘাম হয় ও পানির প্রবল তৃষ্ণা হয়। আজ টেবিলে পানির জগটি শূন্য। বিয়েবাড়ির ব্যস্ততার জন্যেই হয়তো রাত্রিতে পানি রেখে যেতে কারো মনে নেই। আনিস উল্টোদিকে এক শ' থেকে গুনতে শুরু করল। এক শ', নিরানব্বই, আটানব্বই...। কোনো একটা ব্যাপারে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, যাতে ব্যথাটা ভুলে থাকা যায়।

ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা বাজে। অন্য দিন এই সময়ে টিংকু এসে পড়ে। আজ আসে নি। বিয়েবাড়ির হৈচৈ ফেলে সে যে আসবে, এরকম মনে হয় না। তবু দরজার পাশে কোনো একটা শব্দ হতেই আনিস উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। না, টিংকু নয়। আবার তোয়ালে দিয়ে মুখের ঘাম মুছে আনিস কাৎরাতে থাকে। আশি, উনআশি, আটাত্তর, সাতাত্তর...। সাতটা বেজে গেছে। আজ তাহলে টিংকু আর এলই না।

অন্য দিন ভোর ছ'টার মধ্যে দরজায় ছোট ছোট হাতের থাবা পড়ত। চিনচিনে গলা শোনা যেত, 'আনিস, আনিস।'

'কী টিংকুমনি?'

'আমি এসেছি, দরজা খোল।'

আনিসের খাটটি এমনভাবে রাখা, যেন সে শুয়ে শুয়েই দরজার হুক নাগাল পায়। টিংকুর সাড়া পেলেই সে দরজা খুলে দিত। দেখা যেত ঘুম-ঘুম ফোলা মুখে চার বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথাভর্তি লাল চুল। গায়ে কোনো ফ্রক নেই বলে শীতে কাঁপছে। দরজা খুলতেই সে গম্ভীর হয়ে বলবে, 'আনিস, তোমার ব্যথা কমেছে?'

'হ্যাঁ টিংকু।'

'আচ্ছা।'

তারপর সেই লাল চুলের মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়বে বিছানায়। তার হৈচৈ-এর কোনো সীমা থাকবে না। একসময় বলবে, 'আমি হাতি-হাতি খেলব'। তখন কালো কম্বলটা তার গায়ে জড়িয়ে দিতে হবে। একটি কোলবালিশ ধরতে হবে তার নাকের সামনে এবং সে ঘনঘন হুঙ্কার দিতে থাকবে। আনিস বারবার বলবে, 'আমি ভয় পাচ্ছি, আমি ভয় পাচ্ছি'। এক সময় ক্লান্ত হয়ে কম্বল ফেলে বেরিয়ে আসবে সে। হাসিমুখে বলবে, 'আনিস, এখন সিগারেট খাও'। টিংকু নতুন দেয়াশলাই জ্বালাতে শিখেছে, সে সিগারেট ধরিয়ে দেবে। কিন্তু আজ দিনটি শুরু হয়েছে অন্যরকম ভাবে।

আজ টিংকু আসে নি। আনিস আবার ঘড়ি দেখল। সাড়ে সাতটা বাজে। অন্য দিন এ সময়ের মধ্যে তার দাড়ি কামান হয়ে যেত। বাসি জামা-কাপড় বদলে ফেলত। ভোরের প্রথম কাপ চা খাওয়াও শেষ হ'ত। আজ হয় নি। রাত থাকতেই যে অসহ্য ব্যথা শুরু হয়েছে দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে তা যেন ক্রমেই বাড়ছে।

পিপাসায় বুক–মুখ শুকিয়ে কাঠ।

খুট করে শব্দ হল দরজায়। আনিস চমকে উঠে বলল, 'কে, টিংকু নাকি? টিংকু?' কিন্তু টিংকু আসে নি, একটি অপরিচিত ছেলে উঁকি দিচ্ছে। আনিস কড়া গলায় ধমক দিল, 'গেট এওয়ে, গেট এওয়ে।'

ভয়ে ছেলেটির চোখে জল এসে গেল। তার পরনে স্ট্রাইপ–দেওয়া লাল ব্লেজারের শার্ট ও মাপে বড়ো একটি সাদা প্যান্ট। প্যান্ট বারবার খুলে পড়ছে, আর সে টেনে টেনে তুলছে।

আনিস ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'যাও এখানে থেকে––যাও।'

ছেলেটি প্যান্ট ছেড়ে দিয়ে হাত দিয়ে চোখের জল মুছল। অনেক দূর নেমে গেল প্যান্ট। সে ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'আমি হারিয়ে গেছি। আম্মাকে খুঁজে পাই না।'

'কী নাম তোমার?'

'বাবু।'

আনিস খাণিকক্ষণ তাকিয়ে রইল বাবুর দিকে। হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে কোমল সুরে বলল, 'ভেতরে এস বাবু।'

বাবু সংকুচিত ভঙ্গিতে ভেতরে এসে ঢুকল। একটু ইতস্তত করে বলল, 'তুমি কাঁদছ কেন?'

'আমার অসুখ করেছে।'

'পেটে ব্যথা?'

'হুঁ। বস তুমি চেয়ারে। তোমার আম্মাকে খুঁজে দেব। তুমি কোথায় থাক?'

'বাসায় থাকি।'

'কী নাম তোমার?'

'বলেছি তো এক বার।'

'ও, তোমার নাম বাবু। বস একটু।'

আনিস তোয়ালে দিয়ে আবার কপালের ঘাম মুছল। ন'টা বেজে গেছে। রোদ এসেছে ঘরের ভেতরে। একটা ভ্যাপসা ধরনের গরম পড়েছে। বাসি–বিছানা থেকে এক ধরনের ভেজা গন্ধ আসছে। বাবু বসে আছে চুপচাপ, সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আনিসের দিকে।

'আনিস ভাই, ভিতরে আসব?'

দরজার ওপাশে জরীর বন্ধুরা কৌতূহলী চোখে উঁকি দিচ্ছে। এদের মধ্যে এক রুনুকেই আনিস চিনতে পারল।

আনিস বলল, 'জরী আসে নি?'

'না। সে একতলায় আটকা পড়েছে।'

জরীর গায়ে–হলুদের আয়োজন চলছে নিচে। পরীর জন্যে অপেক্ষা করতে

করতেই গায়ে-হলুদের অনুষ্ঠান পিছিয়ে গেল। পরীর আসবার সময় হয়েছে। তাকে আনতে স্টেশনে গাড়ি গিয়েছে।

চিত্রিত পিঁড়িতে বসে আছে জরী। কলসীতে করে পানি এনে রাখা হয়েছে। জরীর সামনে ডালায় বিচিত্র সব জিনিসপত্র সাজান। সেখানে আবার দু'টি প্রদীপ জ্বলছে। রাজ্যের মেয়েরা ভিড় করেছে সেখানে। বরের বাড়ি থেকে পাঠান গায়ে-হলুদের শাড়ি নিয়ে বেশ হৈচৈ হচ্ছে। কাজের বেটিরাও নাকি এত কমদামী শাড়ি পরে না--এ ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে। রুনু এই ফাঁকে তার বন্ধুদের দোতলায় নিয়ে এসেছে। কনক তখন থেকেই আনিসের সঙ্গে দেখা করবার কথা বলছিল।

আনিস বলল, 'ভেতরে আস রুনু। কী ব্যাপার?'

'আনিস ভাই, এরা সবাই জরী আপার বন্ধু, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে।'

আনিস বিরক্তি চেপে কোনো মতে বলল, 'তোমরা বস।'

ঘরে বসবার কিছু নেই। একটিমাত্র চেয়ার, সেটিতে বাবু গম্ভীর হয়ে বসে আছে। আনিস কী বলবে ভেবে পেল না। বিব্রতভাবে বলল, 'হঠাৎ আমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে হল কেন?'

কেউ সে কথার জবাব দিল না। রুনু কনককে দেখিয়ে বলল, 'এর নাম কনক, খুব নামকরা মেয়ে আনিস ভাই। রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। সে-ই আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বেশি ব্যস্ত।'

কনক চুপ করে রইল। আভা বলল, 'আপনি আমাদের যুদ্ধের গল্প বলুন, আনিস ভাই।'

আনিস থেমে থেমে বলল, 'আমি যুদ্ধের কোনো গল্প জানি না।'

'কেন, আপনি আর্মির সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি?'

'করেছি।'

'সেই গল্প বলুন।'

'আমি যুদ্ধের গল্প বলি না।'

আভা মুখ কালো করে ফেলল। লায়লা বলল, 'চল, কনক। যাই, গায়ে-হলুদের সময় হয়ে গেছে।' কনক নড়ল না। থেমে থেমে বলল, 'যুদ্ধের সময় আমি বড়ো কষ্ট করেছি আনিস ভাই। বরিশালের কাছে এক জঙ্গলে আমি, আমার মা আর দুই খালা এক সপ্তাহ লুকিয়ে ছিলাম। এক খালা সেই জঙ্গলেই ভয় পেয়ে মারা গিয়েছিলেন।'

আনিস বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল কনকের দিকে। কনক গাঢ় স্বরে বলল, 'খুব কষ্ট করেছি বলেই যারা যুদ্ধ করেছে তাদের আমার সব সময় খুব আপন মনে হয়।'

কনকের কথার মাঝখানে আনিস হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি খুব অসুস্থ। তোমার সঙ্গে পরে আলাপ করব। রুন্নু, এই ছেলেটিকে নিয়ে যা। সে তার মাকে খুঁজে পাচ্ছে না।'

বাবুকে রুন্নু কোলে তুলে নিতে গেল। বাবু চেয়ারে আরও ভালো করে সেঁটে বসল। আনিসের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি যাব না। আমি এখানে থাকব।'

রুন্নু তাকে দু' হাত ধরে উপরে তুলতেই সে পা ছুঁড়ে কাঁদতে শুরু করল। রুন্নু বলল, 'আনিস ভাই, আমরা যাই?'

'আচ্ছা যাও। কিছু মনে করো না কনক।'

'না—না আনিস ভাই, আমি কিছু মনে করি নি।'

আনিস হাঁপাতে শুরু করল। অসহ্য! খুব ঘাম হচ্ছে। বুক শুকিয়ে কাঠ। দাঁতে দাঁত চেপে সে মনে মনে গুনল—এক শ', নিরানব্বই…। দরজায় টোকা পড়ল। আনিস তাকাল ঘোলা চোখে। বাবু আবার ফিরে এসেছে। আনিস চোখ বন্ধ করে ফেলল। বাবু বলল, 'আমি এসেছি।'

আনিস কোনো মতে বলল, 'বাবু, এক গ্লাস পানি আন।'

আনিসের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। পেথিড্রিন দিতে হবে নাকি কে জানে! বড়োচাচাকে খবর দেওয়া প্রয়োজন।

বাবু পানির খোঁজে বেরিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল ছাদে। সেখানে মিস্তিরিরা সামিয়ানা খাটাচ্ছে। সে অনেকক্ষণ তাই দেখল। তারপর নেমে এল দোতলায়। দোতলা খাঁ-খাঁ করছে। সবাই গিয়েছে গায়ে-হলুদে। সে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

জরীর বড়োচাচা তাঁর রেডিওগ্রাম বন্ধ করে দিয়ে বিরক্ত হয়ে বারান্দায় বসে ছিলেন। বাবু তাকে গিয়ে বলল, 'পানি খাব।' তিনি তাকে পানি খাইয়ে দিলেন। বাবু শান্ত হয়ে আনিসের ঘর খুঁজে বেড়াতে লাগল।

পরীর ট্রেন ভোর সাড়ে আটটার মধ্যে ময়মনসিংহ পৌছানর কথা। কিন্তু গফরগাঁ আসতেই পৌনে ন'টা হয়ে গেল। মেল ট্রেন, অথচ ছোট-বড়ো সব স্টেশন ধরছে। লোক উঠেছে বিস্তর। ছাদে পর্যন্ত গাদাগাদি ভিড়। ফার্স্ট ক্লাস কামরাগুলি অপেক্ষাকৃত ফাঁকা ছিল। কিন্তু কাওরাইদে এক দঙ্গল ছাত্র উঠে পড়ল। বিপদের ওপর বিপদ। পরীর মেয়ে লীনা ক'দিন ধরেই সর্দিতে ভুগছিল। ট্রেনে ওঠার পর থেকে তার জ্বর হু-হু করে বাড়তে লাগল। পরী মেয়েকে কোলে করে জানালার এক পাশে বসেছে, তার অন্য পাশে বসেছে পান্না। পান্না এক দণ্ডও কথা না বলে থাকতে পারে না। সে ক্রমাগত মাকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে ঃ 'এটা কী মা?' 'ঐ লোকগুলি নৌকায় কী করছে মা?' 'ঐ নৌকাটার পাল লাল, আর এইটার সাদা

কেন মা?'

হোসেন সাহেব ট্রেনে উঠেই একটা বই তাঁর নাকের সামনে ধরে রেখেছেন। গাড়ির ভিড়, লীনার জ্বর বা পান্নার প্রশ্নমালা কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারছে না। পরীর বিরক্তি ক্রমেই বাড়ছিল। এক সময় সে ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'রাখ তোমার বই। দেখ মেয়েটার কেমন জ্বর।'

হোসেন সাহেব হাত বাড়িয়ে মেয়ের উত্তাপ দেখলেন। শান্ত গলায় বললেন, 'ও কিছু নয়। এক্ষুণি রেমিশন হবে।'

তিনি বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। পান্না বলল, 'মা, রেমিশন কী?'

'কি জানি কী। চুপ করে বসে থাক।'

গাড়ির অনেকেই কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে পরীর দিকে। পরী সেই ধরনের মহিলা, যাদের দিকে পুরুষেরা সব সময় কৌতূহলী হয়ে তাকায়। চোখে চোখ পড়লেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় না।

রূপবতী মেয়েদের প্রায়ই বড়ো রকমের কোনো ত্রুটি থাকে। পরীর একটিমাত্র ত্রুটি--সে বোকা। হোসেন সাহেব পরীকে বিয়ে করে বেশ হতাশ হয়েছেন। শুধুমাত্র রূপ একটি পুরুষকে দীর্ঘদিন মুগ্ধ করে রাখতে পারে না। পরীর মেয়ে দু'টি মায়ের মতো রূপবতী হয় নি দেখে হোসেন সাহেব খুশি হয়েছেন। মেয়ে দু'টি বাবার গায়ের শ্যামলা রঙ পেয়েছে। চোখ মুখ নাক ফোলা ফোলা। অনেকখানি মিল আছে চাইনিজ বাচ্চাদের সঙ্গে। এবারডীন হসপিটালের এক নার্স হোসেন সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাচ্চাদের মা কি চাইনিজ?' পরী তার মেয়ে দু'টিকে নিয়ে মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তায় ভোগে। বড়ো হলে বিয়ে দিতে ঝামেলা হবে--এই সব ভাবনা তাকে মাঝেমধ্যেই পায়। হোসেন সাহেবকে সে-কথা বলতেই তিনি হো হো করে হাসতে থাকেন। পরী রাগী গলায় বলে, 'এর মধ্যে হাসির কী হল? কালো মেয়েদের কি ভালো বিয়ে হয়? আমি যদি কালো হতাম তুমি আমাকে বিয়ে করতে?' হোসেন সাহেব একটু অপ্রস্তুত হন। মাঝেমধ্যে পরী বেশ গুছিয়ে কথা বলে। হোসেন সাহেব বলেন, 'আমার সঙ্গে তোমার বিয়েটা তাহলে খুব ভালো বিয়ে বলতে চাও?'

পরী তার জবাব দেয় না। কারণ মাঝে মাঝে তার নিজেরই সন্দেহ হয়। যদিও হোসেন সাহেব একটি নিখুঁত ভদ্রলোক এবং তাঁকে বিয়ে করবার ফলেই সে পৃথিবীর অনেকগুলি বড়ো বড়ো দেশ ঘুরে বেড়িয়েছে, তবু কোথাও কিছু অমিল আছে। লণ্ডনে থাকাকালীন প্রথম এটি পরীর চোখে পড়ে। পরীকে সারা দিন একা একা থাকতে হ'ত ফ্ল্যাটে। রেকর্ড বাজিয়ে আর রান্না করে কতটুকু সময়ই-বা কাটে! গল্প করার লোক নেই। পরী ইংরেজি জানলেও বলতে পারে না। আবার বিদেশী উচ্চারণ বুঝতেও পারে না। তার সারাটা দিন কাটত কয়েদীর মতো। হোসেন সাহেব ফিরতেন সন্ধ্যাবেলায়। চা খেয়েই তাঁর পড়াশোনা শুরু হ'ত। পরী

হয়তো একটা গল্প শুরু করেছে। হোসেন সাহেব হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। কিন্তু কিছু দূর বলবার পরই পরী বুঝতে পারত, হোসেনের গল্প শোনার মুড নেই। সে তাকিয়ে আছে পরীর দিকে ঠিকই, কিন্তু ভাবছে অন্য কিছু। পরী আচমকা গল্প বন্ধ করত। হোসেন সাহেব বলতেন, 'তারপর কী হল?'

'থাক। আর ভালো লাগছে না--' এই বলে গম্ভীর হয়ে উঠে যেত পরী। তার আরো খারাপ লাগত, যখন দেখত হোসেন গল্প বন্ধ হওয়ায় খুশিই হয়েছে।

পরী বলল, 'ময়মনসিংহ আর কত দূর?'

হোসেন সাহেব বই থেকে চোখ তুলে বললেন, 'দূর আছে।'

পরী বলল, 'বাই রোডে এলে কত ভালো হত।'

হোসেন সাহেব জবাব দিলেন না। পান্না বলল, "বাই রোডে এলে ভালো হত কেন মা?'

'আর একটা কথা বললে চড় খাবি পান্না।'

পরী ঝাঁঝিয়ে উঠল। পান্না উশখুশ করতে লাগল। আরেকটা কথা জানবার জন্যে তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। সে কয়েক বার মা'র দিকে তাকাল। মা ভীষণ গম্ভীর। কাজেই সে ঝুঁকে এল বাবার কাছে। ফিসফিস করে কানে কানে বলল, 'বাবা, একটা কথা শোন।'

'বল।'

'ঐ যে কারেন্টের তারে পাখি বসে আছে দেখেছ?'

'হুঁ দেখলাম, শালিক পাখি।'

'ঐ পাখিগুলি শক খায় না কেন?'

'টেলিগ্রাফের তারে বসে আছে। টেলিগ্রাফের তারে কারেন্ট নেই, তাই শক খায় না।'

'অ বুঝেছি।'

পরী দেখল, মেয়ে ও বাবা খুব আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। সে আগেও দেখেছে, মেয়ের সঙ্গে আলাপে হোসেনের কোনো ক্লান্তি নেই। তখন আর্জেন্ট কলের কথাও মনে থাকে না। জরুরী টেলিফোন করতে হবে বলে হঠাৎ উঠে পড়ারও প্রয়োজন হয় না। পরীর মনে হল সে দারুণ অসুখী ও দুঃখী। এ রকম মনোভাব তার প্রায়ই হয়। সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

বিলেতে থাকার সময়ও পরী লক্ষ করেছে তার ব্যাপারে হোসেনের কোনো আগ্রহ নেই। প্রায়ই একগাদা চিঠি আসত পরীর। হোসেন সাহেব ভুলেও জিজ্ঞেস করতেন না চিঠি কে লিখল। সে-সব চিঠির জবাব লিখতে একেক সময় গভীর রাত হয়ে যেত। ঘড়ির কাঁটার নিয়মে ঘুমুতে যেতেন হোসেন সাহেব, ভুলেও জিজ্ঞেস করতেন না এত রাত জেগে কোথায় চিঠি লেখা হচ্ছে।

হোসেনের এক বন্ধু প্রায়ই আসত বাসায়। সে পরীর সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা

আলাপ করত। পরী কোনো কোনো দিন ইচ্ছে করেই সেই বন্ধুটির সঙ্গে বেড়াতে যেত। ফিরতে রাত হ'ত প্রায় সময়ই। পরী চাইত, হোসেনের মনে একটু সন্দেহ দেখা দিক। ঈর্ষার কিছু জীবাণু কিলবিল করে উঠুক তাঁর মনে। কিন্তু সে-রকম কিছুই হয় নি। হোসেন নির্বিকার ও নিরাসক্ত। হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিল পরী। লীনা-পান্না এল সংসারে। যমজ মেয়ে একা সামলান মুশকিল। রাত জাগা, কাপড় বদলে দেওয়া, ঘড়ি দেখে দেখে দুধ বানান--এ সব করতে করতে এক সময় পরীর মনে হল সংসারটা এমন কিছু খারাপ জায়গা নয়। হোসেনের মতো স্বামী নিয়ে সুখী হতে বাধা নেই।

কিন্তু হোসেন যদি আরো একটু কাছে আসত! পরীর কত কী আছে গল্প করবার। সে-সব যদি সে মন দিয়ে শুনত। কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে যদি না বলত--পরী, আজ বড়ো ঘুম পাচ্ছে, তাহলে জীবনটা অনেক বেশি অর্থবহ ও সুরভিত হ'ত না?

ময়মনসিংহ এসে গেল প্রায়। এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি স্টেশনে গাড়ি এসে থেমেছে। ছাত্রদের দলটি নেমে যাওয়াতে কামরাটি একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। হোসেন সাহেব বই বন্ধ করে জানালা দিয়ে গলা বের করলেন। চমৎকার ইউনিভার্সিটি। সবুজে সুবজে ছয়লাপ। সাদা রঙের বড়ো বড়ো দালানগুলিকে দ্বীপের মতো লাগছে। রাস্তার দু'পাশে নারকেল গাছের সারি। পরী বলল, 'লীনার জ্বর আর নেই। দেখ তো ক'টা বাজে।'

'দশটা পনের। আড়াই ঘন্টা লেট।'

পান্না বলল, 'আড়াই ঘন্টা লেট হলে কী হয় বাবা?'

'খুব মজা হয়। জুতো পরে নাও পান্না, আর দেরি নেই।'

লীনাকে শুইয়ে রেখে পরী টয়লেটে গিয়ে চুল আঁচড়াল। পান্নার জুতো পরিয়ে দিল। লীনার ঘুম ভাঙিয়ে, তার জামা বদলে দিল। বেশ লাগছে তার। পরী হালকা গলায় বলল, 'জরীর গায়ে-হলুদ কি হয়ে গেল?'

'তোমার জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে।'

পরী হাসিমুখে বলল, 'বউ সাজলে জরীকে কেমন দেখাবে কে জানে?'

হোসেন সাহেব জবাব দিলেন না। তিনি খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন।

দুর থেকে স্টেশনের লাল দালান দেখা যাচ্ছে। লাইন বদল হওয়ার ঘটাং ঘটাং শব্দ আসছে। হোসেন সাহেব হঠাৎ বললেন, 'পরী, আনিসের চিঠির কথাটা মনে আছে? বড়ো কষ্ট লাগছে।'

পরী বলল, 'আনিস বাঁচবে তো?'

'না। স্পাইনাল কর্ডের লম্বোসেকরেল রিজিওন ডেমেইজড। তাছাড়া শুধু পেরাপ্লেজিয়া নয়, আরো সব জটিলতা দেখা দিয়েছে। শুনেছি পেথিড্রিন দিতে হয়।'

পরী গম্ভীর হয়ে পড়ল। হোসেন সাহেব বললেন, 'কাল রাত থেকে আনিসের

চিঠির কথা মনে পড়ছে। তোমার কাছে আছে সেটা।'

'না নেই।'

চিঠিটি আনিস পরীকে অনেক ভণিতা করে লিখেছিল। পাঁচ বৎসরে আনিস মাত্র চারটি চিঠি লিখেছিল। ছয়-সাত লাইনের দায়সারা গোছের চিঠি। কিন্তু শেষ চিঠিটি ছিল সুদীর্ঘ। চিঠিতে অনেক কায়দা-কানুন করে লিখেছে সে জরীকে বিয়ে করতে চায়। কাউকে বলতে লজ্জা পাচ্ছে। তবে জরীর কোনো আপত্তি নেই। এখন একমাত্র ভরসা পরী, পরী যদি দয়া করে কিছু একটা করে তাহলে সারা জীবন সে---ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরী এ চিঠি পেয়ে হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায় নি। সে জোর গলায় বলেছে, 'জরী কিছুতেই রাজি হবে না। ভাইবোনের মতো মানুষ হয়েছি। ছোটবেলায় সবাই এক খাটে ঘুমাতাম।'

কিন্তু হোসেন সাহেব খুব শান্ত গলায় বলেছেন, 'খুব রাজি হবে। আনিসের মতো ছেলে হয় না। তুমি লেখ শ্বশুর সাহেবকে। আমিও লিখব।'

আনিসের চিঠি পড়ে হোসেন সাহেবের বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় নি যে, চিঠিটা আসলে লিখেছে জরী। আনিস শুধু কপি করেছে। চিঠিতে পাঁচবার 'আশ্চর্য' শব্দটি আছে। ঘন ঘন আশ্চর্য ব্যবহার করা জরীর পুরনো অভ্যাস। তার সব চিঠি শুরু হয় এইভাবে, 'আশ্চর্য, বহু দিন আপনাদের চিঠি পাই না।'

আনিস খুবই ভালো ছেলে এতে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। তবু পরী জানত বাবা রাজি হবেন না। তিনি কোনো একটি বিচিত্র কারণে আনিসকে সহ্য করতে পারতেন না। তাছাড়া আনিসের মা বিধবা হবার পরপরই আরেকটি ছেলেকে বিয়ে করে খুলনা চলে যান। এই নিয়েও অনেক কথা ওঠে। সব জেনেশুনে পরীর বাবা আনিসকে পাত্র হিসেবে পছন্দ করবেন কেন? তাছাড়া এত ঘনিষ্ঠভাবে চেনা একটি ছেলেকে কি বিয়ে করা উচিত? পরী খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল।

এর পরপরই স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হল। পরীকে চিঠি লিখতে আর হল না। সে যখন দেশে ফিরে এল, তখন আনিস কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটালে। সেখান থেকে পি জি-তে।

জরী আনিসকে দেখে খুব কেঁদেছিল। আনিস সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলেছে, 'একটা যুদ্ধে অনেক কিছু হয়, জরী।' কত বার জরী গিয়েছে হাসপাতালে, কত কথাই তো হয়েছে, কিন্তু ভুলেও আনিস সেই চিঠির উল্লেখ করে নি। জরীও সে-প্রসঙ্গ তোলে নি। যেন তাদের মনেই নেই, তারা দু' জনে মিলে চমৎকার একটি চিঠি লিখেছিল পরীকে।

গাড়ি ইন্ করেছে স্টেশনে। হোসেন সাহেব বললেন, 'লীনাকে আমার কোলে দিয়ে তুমি নাম পরী।'

পরীকে দেখতে পেয়ে একদল ছেলেমেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ইস এত দেরি,

এদিকে বোধ হয় গায়ে–হলুদ হয়ে গেছে।'

পরী তাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

লীনা হাততালি দিল।

বিয়েবাড়ি খুব জমে উঠেছে।

বাড়ির সামনে খোলা মাঠে ছেলেমেয়েরা হৈহৈ করে চি–বুড়ি খেলছে। তাদের চিৎকারে কান পাতা দায়। শিশুদের আরেকটি দল গম্ভীর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে বাবুর্চিরা রান্না বসিয়েছে, সেখানেও অপেক্ষাকৃত কমবয়সী শিশুদের জটলা। ছাদে সামিয়ানা খাটান হয়ে গেছে। সেখানে চেয়ার–টেবিল সাজান হয়েছে। অনেকেই ভারিক্কি চালে চেয়ারে বসে আছে।

কিশোরী মেয়েদের ছ'–সাত জনের একটি দল জোট বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিয়ে উপলক্ষে তারা আজ সবাই শাড়ি পরেছে। সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করছে যেন তাদেরকে মহিলার মতো দেখায়। এদের মধ্যে শীলা নামের একটি মেয়ে বাড়ি থেকে এক প্যাকেট দামী সিগারেট এনেছে। বিয়েবাড়ির একটি নির্জন আড়াল খুঁজে পেলেই সিগারেট টানা যায়। কিন্তু কোথাও সে–রকম জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। কিশোরীর এই দলটির সবাই কিছু পরিমাণে উত্তেজিত। তারা কথা বলছে ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝেই হেসে উঠছে, তবে সে–হাসির স্বরগ্রামও খুব নিচু।

শেষ পর্যন্ত তারা একটি জায়গা খুঁজে পেল। দোতলায় সবচেয়ে দক্ষিণের একটি ঘর। পুরনো আসবাবে সে–ঘরটি ঠাসা। দু'টি জানালাই বন্ধ বলে ঘরের ভেতরটা আর্দ্র ও অন্ধকার। একটি নিষিদ্ধ কিছু করবার উত্তেজনায় সবাই চুপচাপ।

বড়ো রকমের একটি ঝগড়াও শুরু হয়েছে বিয়েবাড়িতে। এসব ঝগড়াগুলি সাধারণত শুরু করেন নিমান্ত্রিত গরিব আত্মীয়রা। তাঁরা প্রথমে খুব উৎসাহ নিয়ে বিয়েবাড়িতে আসেন, কোনো একটা কাজ করবার জন্যে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু কিছু করতে না পেরে ক্রমেই বিমর্ষ হয়ে ওঠেন। একসময় দেখা যায় একটি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তাঁরা মেতে উঠেছেন। চিৎকারে কান পাতা যাচ্ছে না। বরপক্ষীয়দের তরফ থেকে দু'টি রুই মাছ পাঠান হয়েছিল, মাছ দু'টি নাকি পচা––এই হচ্ছে আজকের ঝগড়ার বিষয়।

তবে সব বিয়েতেই চরম গণ্ডগোলগুলি যেমন ফস করে নিভে যায়, এখানেও তাই হল। দেখা গেল বরপক্ষীয় যারা বিয়ের তত্ত্ব নিয়ে এসেছিল (দু'টি মেয়ে, একটি অল্পবয়সী ছেলে এবং এক জন মাঝবয়সী ভদ্রলোক), মহানন্দে রঙ–খেলায় মেতে গেছে। বরের বাড়ির রোগামতো লম্বা মেয়েটিকে দু'–তিন জনে জাপটে ধরে সারা গায়ে খুব করে কালো রঙ মাখাচ্ছে। মেয়েটি হাত–পা ছুঁড়ছে এবং খুব হাসছে।

রঙ ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপারটা দেখতে দেখতে ক্ষ্যাপামির মতো শুরু হল। একদল

মেয়ে দৌড়াচ্ছে, তাদের পিছু পিছু আরেক দল যাচ্ছে রঙের কৌটো নিয়ে। খিলখিল হাসি, চিৎকার আর ছোটাছুটিতে চারিদিক সরগরম। ছেলেদের দলও বেমালুম জুটে গিয়েছে। অল্পপরিচিত, অপরিচিত মেয়েদের গালে রঙ মাখিয়ে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করছে না। মেয়েরাও যে এ ব্যাপারে কিছু একটা মনে করছে, তা মনে হচ্ছে না। তাদেরও ভালোই লাগছে।

পরী যখন এসে পৌঁছল, তখন বরের বাড়ির রোগা মেয়েটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে--যাকে দেখাচ্ছে ভূতের মতো। পান্না ভয় পেয়ে বলল, 'মা, একটা পাগলী, ওমা, একটা পাগলী।'

পরীকে দেখতে পেয়ে সবাই ছুটে এল। নিমেষের মধ্যে পরীর ধবধবে গাল আর লালচে ঠোঁট কালো রঙে ডুবে গেল। লীনা ও পান্না দু' জনেই হতভম্ব। লীনা বলল, 'এরকম করছে কেন?'

হোসেন সাহেব ব্যাপার দেখে সটকে পড়েছেন। সটান চলে গিয়েছেন দোতলায়

লীনা ও পান্না হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ততক্ষণে রঙ--খেলা চরমে উঠেছে। ভেতরের বাড়ির উঠোনে বালতি বালতি পানি ঢেলে ঘন কাদা করা হয়েছে। মাঝ-বয়েসী একটি ভদ্রমহিলাকে সবাই মিলে গড়াগড়ি খাওয়াচ্ছে সেই কাদায়। ভদ্রমহিলার শাড়ি জড়িয়ে গেছে, ব্লাউজের বোতাম গিয়েছে খুলে। তিনি ক্রমাগত গাল দিচ্ছেন। কিন্তু সেদিকে কেউ কান দিচ্ছে না। সবাই হাসছে, সবাই চেঁচাচ্ছে। লীনা ও পান্নার বিমর্ষ ভাব কেটে গিয়েছে। তারাও মহানন্দে জুটে পড়েছে সে-খেলায়। পান্না স্ফূর্তিতে ঘন ঘন চেঁচাচ্ছে। এমন মজার ব্যাপার সে বহু দিন দেখে নি।

জরী এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। সে সবার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। তার একটু লজ্জা-লজ্জা করছে। পরী কাদামাখা শরীরে জরীকে জড়িয়ে ধরল। জরী বলল, 'আপা, কখন এসেছিস?'

'এই তো এখন। তোর কেমন লাগছে জরী?'

'কী কেমন লাগছে?'

'বিয়ে।'

জরী হাসতে লাগল।

রঙ ছোঁড়াছুঁড়ির হাত থেকে বাঁচবার জন্য হোসনে সাহেব অতিরিক্ত ব্যস্ততায় দোতলায় উঠে এসেছেন। তাঁর গায়ে শার্ক-স্কিনের দামী কোট--নষ্ট হলেই গেল। বিয়েটিয়ের সময় মেয়েদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। উঠোনের কাদায় গড়াগড়ি করাতেও তাদের বাধবে না।

দোতলায় তিনি আনিসের ঘরটি খুঁজে পেলেন না। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন শেষ প্রান্তে। সেখানে কিশোরী মেয়েদের দলটি সিগারেট টানছে। তারা হোসেন

সাহেবকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। তিনি নিজেও বিস্মিত, তবু হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'আনিসের ঘরটা এক জন দেখিয়ে দাও তো।'

কেউ নড়ল না।

আনিসের ব্যথা এখন একেবারেই নেই। শরীর বেশ হালকা ও ঝরঝরে লাগছে। জমাদার এসেছিল ঘর ঝাঁট দিতে, বেডপ্যান সরিয়ে নিতে, তাকে দিয়ে পানি আনিয়ে আনিস দাড়ি কামাল। মুখ ধোওয়া, চুল ব্রাশ করা আগেই হয়েছে। হালকা গোলাপী একটা সিল্কের শার্ট বের করে পরল। বিয়েবাড়ি উপলক্ষে কত লোকজন আসে, এ সময় কি বাসি কাপড়ে ভূত সেজে শুয়ে থাকা যায়? বেশ লাগছে আনিসের। মাঝে মাঝে এরকম চমৎকার সময় আসে। মনে হয় বেঁচে থাকাটা খুব একটা মন্দ ব্যাপার নয়।

খবরের কাগজ দিয়ে গেছে খানিক আগে। আনিস আধশোওয়া হয়ে বসে আছে খবরের কাগজ কোলে নিয়ে। খবরের কাগজ কোলে নিয়ে বসে থাকাটাও রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আনকোরা নতুন কাগজ। এখনো ভাঁজ ভাঙা হয় নি। ইচ্ছা করলেই পড়া শুরু করা যায়। তবে আনিস এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। তার পড়া শুরু হয় ভেতরের পাতা থেকে। হারান-বিজ্ঞপ্তি, পড়াইতে চাই, রেকর্ড-প্লেয়ার বিক্রি, পাত্রী চাই--এইগুলিই তার কাছে বড়ো খবর। পড়তে আনিসের দারুণ ভালো লাগে। এ থেকেই কত মজার মজার জিনিস চোখে পড়ে। একবার রইসুদ্দিন নামের এক ভদ্রলোক বিজ্ঞাপন দিল, 'আকবর ফিরিয়া আস, যাহা চাও, তাহাই হইবে। তোমার মা রোজ প্যানপ্যান করেন।' রোজ প্যানপ্যান করে শব্দটি আনিসের খুব মনে ধরেছিল এবং সে রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, আকবর তার মায়ের কাছে ফিরেছে কিনা তাই ভেবে। আরেক বার আরেকটি বিজ্ঞাপন ছাপা হল--রোকেয়া সুলতানা নামের এক স্কুল-শিক্ষিকার। বর্ণনার ভঙ্গিটি ছিল এই রকম--'আমার বয়স পঁয়ত্রিশ। অবিবাহিতা। নিকট-আত্মীয়স্বজন কেউ বেঁচে নেই। কোনো সহৃদয় ছেলে আমাকে বিয়ে করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আমার চেহারা ভালো নয়।' শেষ লাইনের 'আমার চেহারা ভালো নয়' বাক্যটি একেবারে বুকে বেঁধে। ভদ্রমহিলাকে একটি চিঠি লিখবার দারুণ ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু কী লিখবে ভেবে পায় নি বলে লেখা হয় নি।

'আনিস, কী খবর?'

আনিস তাকিয়ে দেখল, হোসেন সাহেব হাসিমুখে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। এই লোকটিকে আনিস খুব পছন্দ করে। দেখা-সাক্ষাৎ তেমন হয় না, কিন্তু যখনি হয়, আনিসের সময়টা চমৎকার কাটে। হোসেন সাহেব বললেন, 'বাইরে খুব রঙ খেলা হচ্ছে, তোমার এখানে আশ্রয় নিতে এলাম।'

'খুব ভালো করেছেন। কখন এসেছেন?'

'এইমাত্র, কেমন আছ বল?'

'খুব ভালো।'

'তবে যে শুনলাম খুব পেইন হয়। মাঝে মাঝে পেথিড্রিন দিতে হয়।'

'তা হয়। কিন্তু এখন ভালো।'

হোসেন সাহেব কোট খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দিলেন। চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'তোমার জন্যে গল্পের বই পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছ?'

'জ্বি, পেয়েছি।'

'পড়েছ নাকি সব?'

'কিছু কিছু পড়েছি।'

'কী-যে রস পাও গল্পের বইয়ে, তোমরাই জান। তোমার পরী আপার তো বই পেলে আর কথা নেই। এক বার কী-একটা বই পড়ে ফিচফিচ করে এমন কান্না--দুপুরে ভাত খেল না, রাতেও না।'

'কী বই সেটি?'

'কি জানি কী বই। জিজ্ঞেস করো ওকে। যে-লেখক লিখেছে, সে নিশ্চয়ই লিখবার সময় খাওয়াদাওয়া ঠিকঠাক করেছে।'

হোসেন সাহেব হাসতে লাগলেন। আনিসও হাসল। হোসেন সাহেব বললেন, 'এক কাপ চা খেলে হ'ত।'

'আমার এখানে চায়ের সরঞ্জাম আছে। কাউকে ডেকে আনেন।'

'ডাকতে হবে না, আমিই পারব।'

হোসেন সাহেব নিঃশব্দে উঠে গিয়ে হিটার জ্বালালেন। চা, চিনির পট খুঁজে বের করলেন। দু'টি কাপ ধুয়ে টেবিলে এনে রাখলেন। আনিস দেখল, তিনি মৃদু মৃদু হাসছেন। এই লোকটির বেশ কিছু বিচিত্র অভ্যেস আছে। আপন মনে হাসা, আপন মনে কথা-বলা তার মধ্যে পড়ে। এছাড়াও আরো অদ্ভুত অভ্যেস আছে। যেগুলি পরী জানে। কিন্তু পরী সে-সব নিয়ে কারো সঙ্গে গল্প করতে পারে না। তার স্বামী সম্পর্কে সে খুব সজাগ। কেউ তার কোনো দোষ ধরুক, তাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করুক, এসব সহ্য করতে পারে না। বড়োচাচা একবার পরীকে বলেছিলেন, 'তোর ভদ্রলোকটি এমন মিনমিনে কেন রে?' এতেই পরী কেঁদেকেটে অস্থির হয়েছিল। বড়োচাচা অপ্রস্তুতের একশেষ। আবার এও ঠিক, হোসেন সাহেবের সঙ্গে পরীর বনিবনা হয় নি। কুমারী অবস্থায় পরী যে-সব কথা ভেবে একা একা লাল হ'ত তার কোনোটিই বাস্তবের সঙ্গে মেলে নি। এ নিয়ে তার গোপন ব্যথা আছে। আনিস তা জানে। সে হঠাৎ বলল, 'পরী তার বাচ্চা দু'টিকে কেমন আদর করে দুলাভাই?'

'খুব, যাকে বলে এনিমেল লাভ।'

'আর আপনাকে?'

'আমাকে ভয় করে। নাও তোমার চা। মিষ্টি লাগবে কিনা বল।'

আনিস চায়ে চুমুক দিল। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছে। সকালে নাশতা হয় নি, এখন বেলা হয়েছে বারটা। খিদে জানান দিচ্ছে। হোসেন সাহেব বললেন, 'এ রকম করছ কেন? ব্যথা শুরু হল নাকি?'

'না, ও কিছু নয়।'

হোসেন সাহেব সিগারেট ধরালেন। আনিস খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'আপনি কি সুখী?'

'সামটাইমস। একটি মানুষ সারাক্ষণ সুখী থাকতে পারে না। মাঝে মাঝে সুখী হয়। এখন আমি সুখী।'

'কেন?'

'কি জানি কেন। হঠাৎ এসব কথা জিজ্ঞেস করছ যে?'

'দুলাভাই, মাঝে মাঝে আমি এসব নিয়ে ভাবি। কিচ্ছু করবার নেই তো, এই জন্যে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আসলে হ্যাপিনেস বলে আলাদা কিছু নেই।'

আনিসের কথা শেষ হবার আগেই দারুণ হৈচৈ ও চেঁচামেচি শোনা যেতে লাগল। একটি তীক্ষ্ণ মেয়েলী গলায় কে যেন কেঁদে উঠল। ছাদের উপর থেকে হুড়মুড় শব্দ করে একসঙ্গে অনেক লোক নিচে নেমে এল। হোসেন সাহেব আধ-খাওয়া চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

গোলমালটা যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ থেমে গেল। একটি বিয়েবাড়ির হৈচৈ হঠাৎ থেমে গেলে বুকে ধক করে ধাক্কা লাগে। আনিস নিদারুণ অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করছিল।·····হোসেন সাহেবের ফিরে আসতে দেরি হল না। তিনি আবার তাঁর ঠাণ্ডা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। আনিসের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাসলেন। আনিস বলল, 'কী হয়েছিল দুলাভাই?'

'আমার মেয়ে পান্না ডুবে গিয়েছিল পুকুরে।'

'বলেন কী!'

'সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেলেছে।'

'পুকুরে গেল কী করে?'

'মেয়েরা সবাই রঙ খেলে গিয়েছিল গা ধুতে, পান্নাও গিয়েছে।'

হোসেন সাহেব আরেকটি সিগারেট ধরালেন। আনিস দেখল আগুন জ্বালাতে গিয়ে তাঁর হাত কাঁপছে, দেশলাইয়ের কাঠি বারবার নিভে যাচ্ছে। আনিস বলল, 'আপনি পরীর কাছে যান।'

'যাই। সিগারেটটা শেষ করে নিই। পরী কী করছে জান? লীনা-পান্না, তার দু' বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। মাঝে মাঝে অবিকল গরুর মতো গলায় চিৎকার করে কাঁদছে।'

'দুলাভাই, আপনি পরীর কাছে যান।'

'যাই। আনিস, তুমি হ্যাপিনেস সম্পর্কে জানতে চাইছিলে···'

'পরে বলবেন। এখন পরীর কাছে যান।'

'হ্যাঁ, তাই যাই।'

হোসেন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। আনিস দেখল, তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তিনি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাসলেন।

হৈচৈ শুনে বড়োচাচা নিচে নেমে গিয়েছিলেন।

ততক্ষণে পান্নাকে পানি থেকে তোলা হয়েছে এবং পান্নার চার পাশে একটি জটলার সৃষ্টি হয়েছে। সব ক'টি বাচ্চা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। বড়োচাচা কয়েক বার জানতে চেষ্টা করলেন কী হয়েছে। কিন্তু সবাই হৈচৈ করছে, কেউ কিছু বলছে না। তিনি ভিড়ের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলেন পরী তার দুই মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ঠকঠক করে কাঁপছে। পরীর গা ভেজা, তার মাথায় কচুরিপানার ছোট ছোট পাতা লেগে রয়েছে। বড়োচাচা ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন। গলা উঁচিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে রে পরী?'

'পান্না পানিতে ডুবে গিয়েছিল। আভা কোনোমতে তুলেছে।' পরী ঘনঘন চোখ মুছতে লাগল।

বড়োচাচা বললেন, 'তুলেই তো ফেলেছে, তবু কাঁদছিস।'

বড়োচাচা হাসতে লাগলেন। পরীর কাণ্ড দেখে বেশ মজা লাগছে তাঁর। তিনি এক বার ভাবলেন জিজ্ঞেস করেন, পরী নিজেই যে ছোটবেলায় পুকুরে ডুবে মরতে বসেছিল, সেটি কি তার মনে আছে? কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তাঁকে এখন খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছে।

তেইশ বছর আগে একবার পরী ডুবতে বসেছিল। তাকে সেদিন টেনে তুলেছিল পরীর বড়োচাচী। তেইশ বছর পর আবার এক জন পরীর মেয়েকে টেনে তুলল। বাহ্! বেশ মজার ব্যাপার তো! কিন্তু পরীর কি সেই শৈশবের কথা মনে আছে? অনেক বড়ো বড়ো ঘটনা মানুষ চট করে ভুলে যায়। আবার অর্থহীন সামান্য অনেক অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার মানুষের অন্তরে দাগ কেটে বসে যায়।

বড়োচাচার এগার বছরের বিবাহিত জীবনে কত বড়ো বড়ো ঘটনাই তো ঘটেছে। কিন্তু সে-সব ছবি বড়ো ঝাপসা। কষ্ট করে দেখতে হয়, ঠিক ঠিক মনে পড়তে চায় না। শিরীন মরবার সময় তাঁকে যেন কী সব বলেছিল। সে-সব কেমন আবছাভাবে মনে আসে। এমন কি শিরীনের চেহারাও ঠিকঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু একটি ছোট্ট ঘটনা, একটি অতি সামান্য ব্যাপার, আজও কী পরিষ্কার ভাবে মনে আছে তাঁর।

সেদিন ভীষণ গরম পড়েছে। দুপুরে একটু ঘুমিয়েছিলেন। ঘেমে একেবারে নেয়ে গেছেন। ঘুম যখন ভাঙল, তখন বেলা পড়ে গেছে।

তিনি বারান্দার ইজিচেয়ারে এসে বসেছেন। একটি কাক কোত্থেকে এসে কা-

কা শুরু করেছে। তিনি হাত নেড়ে কাক তাড়িয়ে দিলেন, সেটি আবার উড়ে এল, আর ঠিক তখনি শুনলেন ঘরে ভেতর থেকে শিরীন খুব মৃদু স্বরে সুর করে বলছে, 'রসুন বুনেছি, রসুন বুনেছি।'

কত দিন হয়ে গেল, তবু তাঁর মনে হয় যেন সেদিনের ঘটনা। কাকটির তাকানর ভঙ্গিটিও তাঁর মনে আছে। এ রকম হয় কেন মানুষের? বড়ো বিচিত্র মন আমাদের।

বড়োচাচা দুপুরের খাবার খেতে আনিসের ঘরে চলে গেলেন। আনিস অসুস্থ হয়ে এখানে পড়ে আছে প্রায় এগার মাস। এই এগার মাসের প্রতি দুপুরে তিনি আনিসের সঙ্গে খেতে বসেছেন। খাওয়ার ঘন্টাখানিক সময় তিনি আনিসের ঘরে কাটান। এটা-সেটা নিয়ে হালকা গল্পগুজব করেন। আজ ঘরে ঢুকে দেখলেন খাবার দিয়ে গিয়েছে এবং আনিস গোগ্রাসে খাচ্ছে। সে চাচাকে দেখে লজ্জিত হয়ে বলল, 'বড়ো খিদে পেয়েছে চাচা।'

'খিদে পেলে খাবি। আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে নাকি রে গাধা।'

'আপনি হাত ধুয়ে আসুন।'

'তোর শরীর কেমন বল?'

'ভালো।'

'ব্যথা হয় নি, না?'

'সকালের দিকে অল্প হয়েছিল, এখন নেই।'

বড়োচাচা খেতে বসে আনিসের দিকে বারবার তাকাতে লাগলেন। আনিসের চেহারায় তার বাবার চেহারার আদল আছে। খুব পুরুষালি গড়ন। তবে মেয়েদের মতো ছোট্ট বরফি-কাটা চিবুক। এইটুকুতেই তার চেহারায় অনেকখানি ছেলেমানুষী এসে গেছে। আনিস বলল, 'বড়োচাচা, আপনার সানাই শুনে আজ জেগেছি।'

সানাইয়ের কথায় বড়োচাচার মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি যেমন হবে ভেবেছিলেন, তেমনি হয় নি। তিনি চেয়েছিলেন বিয়ের এই আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে একটি সকরুণ সুর কাঁদতে থাকুক। সবাইকে মনে করিয়ে দিক এ-বাড়ির সবচেয়ে আদরের একটি মেয়ে আজ চলে যাচ্ছে। আর কখনো সে জ্যোৎস্নারাতে ছাদে দাপাদাপি করে ভুল সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবে না। কিন্তু তিনি যেমন চেয়েছিলেন, তেমনি হল না। অল্প বেলা বাড়তেই তুমুল হৈচৈ-এ সানাইয়ের সুর ডুবে গেল। তিনি মনমরা হয়ে রেডিওগ্রাম বন্ধ করে দিলেন।

বড়োচাচা হাত ধুয়ে এসে বসলেন আনিসের বিছানায়। আচমকা প্রশ্ন করলেন, 'তোর কি খুব খরাপ লাগছে আনিস?'

'কই? না তো!'

'আমেরিকা থেকে ফিরে এসে একটা সাদাসিধা ভালো মেয়ে বিয়ে করিস

তুই।'

আনিস হেসে ফেলল। বড়োচাচা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হাসির কী হল? হাসছিস কেন?'

'আমি আর বাঁচব না। দিস ইজ এ লস্ট গেম।'

বড়োচাচা কথা বললেন না। আনিসের সিগারেট খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু বড়োচাচা না যাওয়া পর্যন্ত সেটি সম্ভব নয়। সে অপেক্ষা করতে লাগল, কখন তিনি ওঠেন, কিন্তু তিনি উঠলেন না। আনিসের সিগারেট-পিপাসা আরো বাড়িয়ে দিয়ে একটি চুরুট ধরালেন। আনিসের দিকে সরু চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কোনো কারণে আমার ওপর তোর কি কোনো রাগ আছে?'

'কী যে বলেন চাচা! রাগ থাকবে কেন?'

'না, সত্যি করে বল।'

'কী মুশকিল, আমি রাগ করব কেন? কী হয়েছে আপনার বলুন তো।'

'আমার কিছু হয় নি।'

বড়োচাচা হঠাৎ ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কাল রাত থেকে তাঁর মনে হচ্ছিল, আনিসের মনে তাঁর প্রতি কিছু অভিমান জমা আছে। আনিস যদিও এখন হাসছে, তবু সেই হাসিমুখ দেখে তাঁর কষ্ট হতে থাকল। তিনি নিজের মনে খানিকক্ষণ বিড়বিড় করলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে 'যাই আনিস' বলে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

বড়োচাচা হচ্ছেন সেই ধরনের মানুষ, যাঁরা সামান্য ব্যাপারে অভিভূত হন না। আজ আনিসকে দেখে তিনি অভিভূত হয়েছেন। তিনি চাইছিলেন কিছু একটা করেন, কিন্তু কী করবেন তা তাঁর জানা নেই। আনিসের জন্যে তাঁর একটি গাঢ় দুর্বলতা আছে। নিজের দুর্বলতাকে তিনি কোনো কালেই প্রকাশ করতে পারেন না। প্রকাশ করবার খুব একটা ইচ্ছাও তাঁর কোনো কালে ছিল না। কিন্তু আজ তাঁর মন কাঁদতে লাগল। ইচ্ছে হল এমন কিছু করেন যাতে আনিস বুঝতে পারে এই গৃহে তার জন্যে একটি কোমল স্থান আছে। কিন্তু আনিস বড় অভিমানী হয়ে জন্মেছে। তার জন্যে কিছু করা সেই কারণেই হয়ে ওঠে না।

খুব ছোটবেলায় আনিসের যখন এগার-বার বৎসর বয়স, তখনই বড়োচাচা আনিসের তীব্র অভিমানের খোঁজ পান। বড়ো হয়েছে বলে আনিস তখন আলাদা ঘরে ঘুমায়। তার ঘরটি একতলায়। পাশের ঘরে আনিস, জরী ও পরীদের মাষ্টার সাহেব থাকেন। এক রাত্রিতে খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। বড়োচাচা আনিসের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনলেন আনিস কাঁদছে। তিনি ডাকলেন, 'আনিস, কী হয়েছে রে?'

আনিস ফুঁপিয়ে বলল, 'ভয় পাচ্ছি।'

'আয় আমার ঘরে। আমার সঙ্গে থাকবি?'

'না।'

'তাহলে আমি সঙ্গে শুই?'

'না।'

'দরজা খোল তুই।'

আনিস দরজা খুলল না। তিনি অনেকক্ষণ বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বড়োচাচার মনে হল জরীর বিয়ের এই দিনটি আনিসের জন্যে খুব একটা দুঃখের দিন। কিন্তু তাঁর কিছুই করবার নেই।

যে-ছেলেটির সঙ্গে জরীর বিয়ে হচ্ছে, তার খোঁজ বড়োচাচাই এনেছিলেন। তাঁর আবাল্যের বন্ধু আশরাফ আহমেদের বড়ো ছেলে। নম্র ও বিনয়ী। লাজুক ও হৃদয়বান। দেখতে আনিসের মতো সুপুরুষ নয়। রোগা ও কালো। জরীর বাবা আপত্তি করেছিলেন। বারবার বলেছেন, 'ছেলের ধরনধারণ যেন কেমন।' জরীর মারও ঠিক মত নেই। মিনমিন করে বলেছেন, 'ইউনিভার্সিটির মাষ্টার, কয় পয়সা আর বেতন পায়?' কিন্তু বড়োচাচার প্রবল মতের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তিই টিকল না। তাঁর যুক্তি হচ্ছে জরীর মতো একটি ভালো মেয়ের জন্যে এ-রকম এক জন ভাবুক ছেলেই দরকার, যে গল্প-কবিতা লেখে--জরী সুখ পাবে। কিন্তু আপত্তি উঠল সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গা থেকে। বড়োচাচা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

তিনি সেদিন শয্যাশায়ী। দাঁতের ব্যথায় কাতর। সন্ধ্যাবেলা ঘরের বাতি জ্বালেন নি। অন্ধকারে শুয়ে আছেন। জরী এসে কোমল গলায় ডাকল, 'বড়োচাচা।'

'কি জরী?'

'আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।'

বড়োচাচা বিছানায় উঠে বসলেন। বিস্মিত হয়ে বললেন, 'বাতি জ্বালা, জরী।'

'না, বাতি জ্বালাতে হবে না।'

জরী এসে বসল তাঁর পাশে। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে, জরী?'

'বড়োচাচা, আমি--'

'বল, কী ব্যাপার!'

জরী থেমে থেমে বসল, 'বড়োচাচা, আমি ঐ ছেলেটিকে বিয়ে করব না।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'বড়োচাচা, আমি আনিস ভাইকে বিয়ে করতে চাই।'

জরী কাঁদতে লাগল। বড়োচাচা স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'আনিস জানে?'

জরী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'জানে। তাকে আসতে বলেছিলাম, তার নাকি লজ্জা লাগে।'

দু' জনেই বেশ কিছু সময় চুপচাপ কাটাল। বড়োচাচা এক সময় বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

সে-রাতে তিনি একটুও ঘুমুতে পারলেন না। অনেক বার তাঁর ইচ্ছে হল তিনি আনিসের কাছে যান, কিন্তু তিনি নিজের ঘরেই বসে রইলেন। তাঁর অনেক পুরনো

কথা মনে পড়তে লাগল।

জরীর অনেক অদ্ভুত আচরণ অর্থবহ হল। একটি মেয়ে তো শুধু শুধু একা ছাদে বসে কাঁদতে পারে না। সে চোখের জলের কোনো–না–কোনো কোমল কারণ থাকে। আশ্চর্য! এ সব তার চোখ এড়িয়ে গেল কী করে?

বিয়ে বড়োচাচাই ভেঙে দিয়েছিলেন। যদিও কাউকেই বলেন নি, এত আগ্রহ যে–বিয়ের জন্য ছিল হঠাৎ তা উবে গেল কেন।

আজ জরীর বিয়ে হচ্ছে। এবং আশ্চর্য, সেই ছেলেটির সঙ্গেই। মাঝখানে একটি ভালোবাসার সবুজ পর্দা দুলছে ঠিকই, কিন্তু তাতে কী? জীবন বহতা নদী। একটি মৃত্যুপথযাত্রী যুবকের জন্যে তার গতি কখনো থেমে যায় না। থেমে যাওয়া উচিত নয়।

বড়োচাচার কষ্ট হতে লাগল। জরীর জন্য কষ্ট। আনিসের জন্য কষ্ট। এবং সেই সঙ্গে তাঁর মৃতা স্ত্রীর জন্যে কষ্ট। তাঁর ইচ্ছে হল আবার আনিসের ঘরে যান। তার মাথায় হাত রেখে মৃদু গলায় বলেন, 'আনিস তোর মনে আছে, এক বার আমার সঙ্গে জন্মাষ্টমীর মেলায় গিয়েছিলি, সেখানে—'

তিনি আবার আনিসের ঘরে ফিরে এলেন।

আনিস পা দোলাতে দোলাতে সিগারেট টানছিল। বড়োচাচাকে দেখে সে সিগারেট লুকিয়ে ফেলল।

'কিছু বলবেন চাচা?'

'না–না, কিছু বলব না।'

বড়োচাচা আবার ফিরে গেলেন।

দুপুরের রোদ সরে গেছে।

শীতের বিকেল বড্ড দ্রুত এসে যায়। বেলা তিনটে মোটে বাজে, এর মধ্যেই গাছের ছায়া হয়েছে দীর্ঘ, রোদ গিয়েছে নিভে। বৈকালিক চায়ের যোগাড়ে ব্যস্ত রয়েছেন জরীর মা। হাতে সময় খুব অল্প, সন্ধ্যা সাতটার আগেই বরযাত্রী এসে যাবে। তারা খবর পাঠিয়েছে, ন'টার মধ্যেই যেন সব শেষ করে কনে বিদায় দিয়ে দেওয়া হয়।

রান্নাবান্না হয়ে গিয়েছে। ছাদে টেবিল–চেয়ার সাজানও শেষ। এক শ' বরযাত্রীকে এক বৈঠকেই খাইয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। বাড়ির সামনে ডেকোরেটররা চমৎকার গেট বানিয়েছে। সন্ধ্যার পরপরই ইলেকট্রিক বাল্বের আলোয় সেই গেট ঝলমল করবে।

জরীর বাবার অফিস সুপারিনটেনডেন্ট কি মনে করে যেন দুপুরবেলাতে এসে পড়েছেন। জরীর বাবা সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গেই আছেন। জরীর মার হাতে যদিও কোনো কাজ নেই তবু তিনি মুহূর্তের জন্যেও ফুরসত পাচ্ছেন না। আজ তাঁর গোসলও করা

হয় নি, দুপুরের খাওয়াও হয় নি। সারাক্ষণই ব্যস্ত হয়ে ঘুরঘুর করছেন।

এখন তাঁর প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। তবু এই মাথাধরা নিয়েই বিরাট এক কেৎলি চা বানিয়ে নিয়ে এসেছেন।

পাড়ার মেয়ে এবং জরীর বন্ধুরা জরীকে ঘিরে বসেছিল। চা আসতেই অকারণ একটা ব্যস্ততা শুরু হল। কনক বলল, 'জরী, তুই চা খাবি এক কাপ?'

'না, আমার শরীর খারাপ লাগছে।'

'খা না এক ঢোক।'

চায়ে প্রচুর চিনি ও এলাচ দেয়ায় পায়েসের মতো গন্ধ। তবু চমৎকার লাগছে খেতে। জরীর মা বললেন, 'চপ আনতে বলেছি। যে কয়টা পার খেয়ে নাও সবাই--রাতে খেতে দেরি হবে।'

আবার একটা হুল্লোড় উঠল।

কন্যাপক্ষীয় মেহমানদের আসবার বিরাম নেই। রিকশা এসে থামছে। হাসিমুখে নামছে চেনা লোকজন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিশে যাচ্ছে বিয়েবাড়ির স্রোতে। এ-রকম একটা উৎসবে কাউকেই আলাদা করে চেনা যায় না। সবাই বাড়ির লোক হয়ে যায়। আনিসের মা তাই রিকশা থেকে নেমে হকচকিয়ে গেলেন।

আনিসের মা যে আসবেন তা সবাই জানত। তাঁকে চিঠি লিখে জানান হয়েছে, আনিস সতের তারিখে আমেরিকা যাচ্ছে, জটিল অপারেশন হবে, একবার যেন তিনি আসেন। সেই চিঠি পেয়ে আনিসের মা যে এত আগেভাগে এসে পড়বেন, তা কেউ ভাবে নি।

অনেক দিন পরে দেখা, তবু জরীর মা ঠিকই চিনলেন। চিনলেও না চেনার ভান করলেন। বললেন, 'আপনাকে চিনতে পারলাম না তো!'

আনিসের মা কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'আমি আশরাফী, আনিসের মা।'

তাঁর স্বামী ভদ্রলোকটি মোটাসোটা ধরনের গোবেচারা ভালোমানুষ। তিনি বিনীত হেসে বললেন, 'আপা, ভালো আছেন? কার বিয়ে?'

'আমার সেজো মেয়ের।'

বলতে গিয়ে জরীর মার একটু লজ্জা লাগল। কারণ পরীর বিয়ের সময় এদের কোনো খবর দেন নি, জরীর বিয়েতেও না। জরীর মা বললেন, 'আপনারা হাত-মুখ ধোন। আনিসের সঙ্গে দেখা করলে দোতলায় যান।'

আনিসের মা দোতলায় উঠলেন না। তাঁর হয়তো কোনো কারণে লজ্জা বোধ হচ্ছিল। বিয়েবাড়িতে অতিথি হিসেবেও নিজেকে অবাঞ্ছিত লাগছে। কিন্তু তাঁকে তো আসতেই হবে। কারণ, এই বাড়িতে তাঁর একটি অসুস্থ ছেলে আছে। সেই ছেলেটি একসময় এতটুকুন ছিল। দু'টি ছোট ছোট দুধদাঁত দেখিয়ে অনবরত হাসত। কথা শিখল অনেক বয়সে। তাও কি, 'ম' বলতে পারত না। আম্মাকে ডাকত 'আন্না' বলে।

আহ্‌, চোখে জল আসে কেন?

পুরনো কথায় বড়ো মন খারাপ হয়ে যায়। তিনি ছোট ছোট পা ফেলে ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এ বাড়ির লোকজন অনেকেই আজ তাঁকে চিনতে পারছে না, এও এক বাঁচোয়া। চিনতে পারলে আরো খারাপ লাগত। মাঝবয়েসী এক মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি জরীর কী হন?'

তিনি থতমত খেয়ে কি একটা বললেন। লোকজনের সঙ্গ ছেড়ে চলে গেলেন ভেতরের দিকে।

এ বাড়ির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তিনি যখন বউ হয়ে আসেন, তখন দোতলায় একটিমাত্র ঘর ছিল, সেখানে বড়ো ভাসুর থাকতেন। পুকুরপাড়েও কোনো আলাদা ঘর ছিল না। বাড়ির কোনো নামও ছিল না। লোকে বলত 'উকিলবাড়ি'। রিকশা থেকে নেমেই পিতলের নেমপ্লেটে বাড়ির নাম দেখলেন 'কারা কানন'। কে রেখেছে এ নাম কে জানে! বোধহয় বড়ো ভাসুর। এ বাড়ি এখন আর চেনা যায় না। অনেক সুন্দর হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ফুলের বাগানটি নষ্ট হয়ে গেছে। গোলাপঝাড়ে মাত্র অল্প ক'টি ফুল দেখছেন। অথচ একসময় অগণিত গোলাপ ফুটত।

এই গোলাপ নিয়েই কত কাণ্ড। আনিসের বাবার শখ হল গোলাপ দিয়ে খাঁটি আতর বানাবেন। রাশি রাশি ফুল কুচিকুচি করে পানিতে চোবান হল। সেই পানি জ্বাল দেয়া হল সারা দিন। সন্ধ্যাবেলা আতর তৈরি হল, বোটকা গন্ধে তার কাছে যাওয়া যায় না। বাড়িতে মহা হাসাহাসি। আনিসের বাবার মনমরা ভাব কাটাবার জন্যে তিনি সে–আতর মাখলেন। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল 'আতর বৌ'! কী লজ্জা কী লজ্জা! বড়ো ভাসুর পর্যন্ত আতর বৌ বলে ডাকতেন। পরী তখন সবে কথাবলা শিখেছে। 'র' বলতে পারে না, সে ডাকত 'আতল, আতল'। আজ কি সেই পুরনো স্মৃতিময় নাম কারো মনে আছে? জরীর মা যখন নাম জানতে চাইলেন, তখন তিনি কেন সহজ সুরে বললেন না, আমি আতর বৌ?

না, আজ তা সম্ভব নয়। এ বাড়িতে আতর বৌ বলে কেউ নেই। পুরনো দিনের সব কথা মনে রাখতে নেই। কিছু কিছু কথা ভুলে যেতে হয়। তিনি হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির পিছনের খোলা জায়গাটায় এসে পড়লেন। এখানে একটি প্রকাণ্ড পেয়ারাগাছ ছিল, 'সৈয়দী পেয়ারা' বলত সবাই। ভেতরটা লাল টুকটুক। গাছটি আর নেই। আতর বৌ হাঁটতে হাঁটতে পুকুরপাড়ে চলে গেলেন। কী পরিষ্কার পানি, আয়নার মতো ঝকঝক করছে! পুকুরপাড়ের ঘাটটি বাঁধান। তাঁর সময় বাঁধান ছিল না। সে–সময় কাঠের তক্তা দিয়ে ঘাট বাঁধা ছিল। শ্যাওলা জমে পিচ্ছিল হয়ে থাকত সে–ঘাট। পা টিপে টিপে পানিতে নামতে হ'ত। এক বার তো পিছলে পড়ে হাত কেটে গেল অনেকখানি। রক্ত বন্ধ হয় না কিছুতেই, শাড়ি দিয়ে হাত চেপে ধরে ঘরে উঠে এসেছেন। সারা শাড়ি রক্তে লাল। দেখতে পেয়ে আনিসের বাবা সঙ্গে সঙ্গে ফিট।

এমন জোয়ান মানুষ, অথচ একটু-আধটু রক্ত দেখলেই হয়েছে কাজ। আতর বৌ ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন।

তাঁর ক্ষণিকের জন্য মনে হল এ বাড়ি থেকে চলে গিয়ে তিনি ভুল করেছেন। এখানে থাকলে জীবন এমন কিছু মন্দ কাটত না। পরমুহূর্তেই এ-চিন্তা ছেঁটে ফেললেন। পুরনো জায়গায় ফিরে আসবার জন্যই এ-রকম লাগছে হয়তো। তিনি আসলে মোটেই অসুখী নন। তাঁর স্বামী ও পুত্র-কন্যাদের নিয়ে কোনো গোপন দুঃখ নেই। নিজের চারদিকে নতুন জীবনের সৃষ্টি করেছেন। সেখানে দুঃখ, হতাশা ও গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসাও আছে। শুধু যদি আনিস তাঁর সঙ্গে থাকত। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হেসেখেলে বড়ো হ'ত.

কিন্তু এ-বাড়ির সবাই অহংকারী ও নিষ্ঠুর। আনিসকে তারা কিছুতেই ছাড়ল না। অবিমিশ্র সুখী কখনো বোধহয় হতে নেই।

'আতর বৌ এসেছ?'

আতর বৌ চমকে দেখলেন--বড়ো ভাসুর, নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি হাসিমুখে বললেন, 'তুমি বড়ো রোগা হয়ে গেছ আতর বৌ।'

তাঁর মুখে পুরনো দিনের ডাক শুনে আতর বৌ-এর চোখে পানি এল। বড়ো ভাসুর বললেন, 'তোমার ছেলেমেয়েরা সবাই ভালো?'

'জ্বি, ভালো।'

'তাদের নিয়ে আসলে না কেন, দেখত তাদের আনিস ভাইকে।'

'আপনি তো চিঠিতে তাদের আনবার কথা লেখেন নি।'

আতর বৌ আঁচলে চোখ মুছলেন। বড়ো ভাসুর বললেন, 'কাঁদছ কেন?'

'না, কাঁদছি না।'

'আনিসের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

'না।'

'তাহলে তার পাশে গিয়ে একটু বস। তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দাও। আজ আনিসের বড়ো দুঃখের দিন।'

আতর বৌ বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন? আজ দুঃখের দিন কেন?'

বড়ো ভাসুর চুপ করে রইলেন। অনেক দিন পর আতর বৌকে দেখে তাঁর বড়ো ভালো লাগছে। তিনি হঠাৎ কী মনে করে বললেন, 'আতর বৌ, আনিসের বাবাকে কখনো স্বপ্নে দেখ?'

আতর বৌ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে শান্ত গলায় বললেন, 'দেখি।'

'তুমি কিছু মনে করলে না তো?'

'না, কিছু মনে করি নি। স্বপ্নের কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন?'

'এম্নি করেছি। কোনো কারণ নেই।'

আনিস লোকটিকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল। আগে আরো দু'-এক বার দেখা হয়েছে। আজ যদিও অনেক দিন পরে দেখা, তবু চিনতে একটুও দেরি হল না। লোকটি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। আনিসকে তাকাতে দেখে মৃদু গলায় বলল, 'ভেতরে আসব?'

'আসুন।'

লোকটি ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল। মাথার চুল পেকে গেছে। কপালের চামড়া কোঁচকান। চোখ দু'টি ভাসা-ভাসা। সমস্ত মুখাবয়বে একটা ভালোমানুষী আত্মভোলা ভঙ্গি আছে।

'আমি একটু বসলে তোমার অসুবিধে হবে?'

'বসুন বসুন। অসুবিধে হবে কেন?'

'আমাকে চিনতে পেরেছ তো বাবা?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তোমার মাকে নিয়ে এসেছি।'

আনিস চুপ করে রইল। লোকটির বসবার ধরন কেমন অদ্ভুত। পা তুলে পদ্মাসন হয়ে চেয়ারে বসেছেন। সারাক্ষণই হাসছেন আপন মনে। আনিস কী কথা বলবে ভেবে পেল না। দু' জন লোক চুপচাপ কতক্ষণ বসে থাকতে পারে? একসময় আনিস বলল, 'আপনাব ছেলেমেযে কয়টি?'

'দুই মেয়ে এক ছেলে। বড়ো মেয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, কেমিস্ট্রিতে অনার্স, এইবার সেকেণ্ড ইয়ার।'

ছেলেমেয়েদের কথা বলতে পেরে ভদ্রলোকের চোখ উজ্জ্বল হযে উঠল। তিনি ঝুঁকে এলেন আনিসের দিকে। গাঢ় স্বরে বলতে লাগলেন, 'বড়ো মেয়ের নাম নীলা, তোমার মা রেখেছেন। ছোট মেয়ের নাম আমি রেখেছি ইলা। ছেলেটির নাম শাহীন।'

ভদ্রলোক মহা উৎসাহে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন। তেমনি অন্তরঙ্গ সুরে বলতে লাগলেন, 'গত ঈদের সময় নীলা তোমাকে একটা ঈদকার্ড পাঠিয়েছিল। নিজেই এঁকেছে, নদীতে সূর্যাস্ত হচ্ছে। দু'টি বক উড়ে যাচ্ছে। তুমি পাও নি বাবা?'

'পেয়েছিলাম।'

'নীলা ভেবেছিল, তুমিও তাকে একটা পাঠাবে। সে রোজ জিজ্ঞেস করত--বাবা, তোমার ঠিকানায় আমার কোনো ঈদকার্ড এসেছে?'

আনিস লজ্জা পেল খুব। লজ্জা ঢাকবার জন্য জিজ্ঞেস করল, 'ইলা কত বড়ো হয়েছে?'

'ক্লাস নাইনে পড়ে। বৃত্তি পেয়েছে নন-রেসিডেনশিয়াল।'

'দেখতে কেমন হয়েছে?'

'আমার কাছে খুব ভালো লাগে। তবে শ্যামলা রং। নাকটা একটু চাপা। স্কুলের

মেয়েরা তাকে চায়না ডেকে ক্ষেপায়।'

আনিস হো-হো করে হেসে ফেলল। নীলা ও ইলার সঙ্গে দেখা হলে খুব ভালো হ'ত। আনিস মনে মনে ভাবল, ইলার সঙ্গে যদি কখনো দেখা হয় তাহলে সে বলবে--

ইলা হল চায়না
ব্যাঙ ছাড়া খায় না।

ভদ্রলোক বললেন, 'তোমার ভাই-বোনগুলির খুব শখ ছিল তুমি কিছুদিন তাদের সঙ্গে থাক। এক বার তোমার মা খুব করে লিখেছিল, ঠিক না?'

আনিস লজ্জিত হয়ে মাথা নাড়ল। তার মা সেবার শুধু চিঠিই লেখেন নি, এক শ'টি টাকাও পাঠিয়েছিলেন। সে টাকা ফেরত পাঠান হয়েছিল।

ভদ্রলোক উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'ইলা আবার কবিতাও লেখে। স্কুল-ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে তার কবিতা--"রুগ্ণ হওয়ার রহস্য" কবিতার নাম। ভীষণ হাসির কবিতা। দাঁড়াও তোমাকে শোনাই। আমার মনে আছে কবিতাটি।'

ভদ্রলাক চেয়ার থেকে পা নামিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলেন--

'কয়েক হাঁড়ি পাটালী গুড়
সঙ্গে কিছু মিষ্টি দই,
সেরেক খানি চিঁড়ে ছাড়াও
লাগবে তাতে ভাল খই......কি, সবটা বলব?'

আনিস সে-কথার জবাব দিল না, ঘোলাটে চোখে তাকাল। তার নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এসেছে। ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'কী হয়েছে বাবা? তুমি খুব ঘামছ!'

সে-ব্যথাটি আবার শুরু হয়েছে। পা দুটো কেউ যেন জ্বলন্ত আগুনে ঠেসে ধরল। আনিস গোঙাতে শুরু করল। ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। মৃদু স্বরে ডাকলেন, 'ও বাবা শোন, ও আনিস।'

আনিস বিকৃত স্বরে বলল, 'আপনি এখন যান। একা থাকতে দিন আমাকে।'

ভদ্রলোক নড়লেন না। একটা হাত-পাখা নিয়ে সজোরে বাতাস করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন, 'পানি খাবে বাবা? মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?'

আনিস কথা বলতে পারছিল না। ভদ্রলোক অসহায় গলা বললেন, 'কেউ কি এক জন ডাক্তার ডেকে আনবে, আহা বড় মায়া লাগে।'

আনিসের মা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে দেখলেন, আনিস চোখ বন্ধ করে বিছানায় পড়ে আছে আর ইলা-নীলার বাবা প্রবল বেগে হাওয়া করছেন। আনিসের মা ঘরের ভেতর ঢুকলেন না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরে। শুনলেন ইলার বাবা মৃদুস্বরে বলছেন, 'ইয়া রহমানু, ইয়া রহিমু, ইয়া

মালিকু—'

তখন নিচে তুমুল হৈচৈ—এর সঙ্গে 'বর এসেছে বর এসেছে' শোনা গেল, *আতর বৌ নিচে নামলেন। তাঁকে এক জন ডাক্তার খুঁজতে হবে। আনিসের জন্য এক জন ডাক্তার প্রয়োজন।*

একটি লাজুক, ভদ্র ও বিনয়ী ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল জরীর। মুসলমানদের বিয়ে বড় বেশি সাদাসিধা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই উৎসবের সমাপ্তি। যে—ছেলেটির সঙ্গে কোনো জন্মেও জরীর পরিচয় ছিল না, তার সঙ্গে পরম পরিচয়ের অনুষ্ঠানটি এত ক্ষুদ্র হতে দেখে ভালো লাগে না। মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় কী—যেন একটা বাকি থেকে গেল।

জরীর দিকে চোখ তুলে তাকান যায় না। শ্যামলা রংয়ের এই মেয়েটি এত রূপ কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল! দেখে দেখে বুকের ভেতরে আশ্চর্য এক ব্যথার অনুভূতি হয়। ভয় হয়, সেই লাজুক, ভদ্র ও বিনয়ী ছেলেটি কি এই রূপের ঠিক মূল্য দেবে? হয়তো দেবে, কারণ ছেলেটি কবি, মাঝে মাঝে গল্পও লেখে। হয়তো দেবে না, না চাইতে যা পাওযা যায় তার তো কোনো কালেই কোনো মূল্য নেই।

জরী বসে আছে সম্রাজ্ঞীর মতো। তার যে—বন্ধুরা এতক্ষণ ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছিল, তারা এখন খানিকটা দূরে সরে বসেছে। বিয়ের পরপরই অবিবাহিত মেয়েদের থেকে বিবাহিতরা আলাদা হয়ে পড়ে। আভা জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে জরী?'

জরী হাসল। কনক বলল, 'আমার এখনো বিশ্বেস হচ্ছে না, তোর বিয়ে হয়ে গেছে।'

জরীর মা ক্লান্ত ও অবশ ভঙ্গিতে পাশেই বসে। বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকেই তিনি অবিশ্রান্ত কাঁদছেন। জরী অনেকটা সহজ হয়েছে, হালকা দু'—একটা কথাও বলছে। বরের ছোট বোন জরীকে নিয়ে কী—একটা রসিকতা করায় সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে জরীও হেসেছে। একসময় সে বলল, 'মা, বড়োচাচা কোথায়?'

'আনিসের ঘরে, আনিসের অসুখটা খুব বেড়েছে। ডাকব তোর চাচাকে?'

'না। আনিস ভাইয়ের মার সঙ্গে একটু আলাপ করব।'

আতর বৌ ছেলের কাছে ছিলেন না। বারান্দায় একা একা দাঁড়িয়ে ছিলেন। জরী ডাকছে শুনে ঘরে এলেন। জরী বলল, 'ভালো আছেন চাচী?'

'হ্যাঁ মা।'

জরী হঠাৎ তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করল। আতর বৌ বললেন, 'স্বামী ভাগ্যে ভাগ্যবতী হও, লক্ষ্মী মা।'

বরের ছোট বোনটি আবার কী—একটা হাসির কথা বলে সবাইকে হাসিয়ে দিল। আতর বৌ বললেন, 'এই ছোট্টটি দেখেছি জরীকে। কি দুষ্টুই না ছিল! এখন

কেমন বৌ সেজে বসে আছে। অবাক লাগে।'

অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে আনিসের ঘরে। বড়োচাচা, হোসেন সাহেব, আনিসের মা, ইলা–নীলার বাবা, আনিসকে যে–ডাক্তারটি চিকিৎসা করেন তিনি, এবং পরী। সবাই চুপ করে আছে। ব্যথায় আনিসের ঠোঁট নীল হয়ে উঠেছে, তার চোখ টকটকে লাল। সে একসময় বিকৃত স্বরে বলল, 'দুলাভাই, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেন। পেথিড্রিন দেন।'

হোসেন সাহেব আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। বড়োচাচা বললেন, 'হোসেন তুমি পেথিড্রিন দাও।'

হোসেন সাহেব সিরিঞ্জ পরিষ্কার করতে লাগলেন। আনিসের মা থরথর করে কাঁপছিলেন। এক ফাঁকে হোসেন সাহেব তাঁকে বললেন, 'আপনি ভয় পাবেন না, এক্ষুণি ঘুমিয়ে যাবে।'

আনিসের মা বিড়বিড় করে কী বললেন, ভালো শোনা গেল না। ইনজেকশনের পরপরই আনিস পানি খেতে চাইল। রাত কত হয়েছে জানতে চাইল। হোসেন সাহেব বললেন, 'ঘুম পাচ্ছে আনিস?'

'হুঁ।'

আনিসের মা বললেন, 'এখন আরাম লাগছে বাবা?'

'লাগছে।'

আনিসের মা দোওয়া পড়ে ফুঁ দিলেন ছেলের মাথায়। আনিস জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'বাতি নিভিয়ে দাও, চোখে লাগে।'

বাতি নিভিয়ে তারা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নিচে জরীর বিদায়ের আয়োজন চলছে। রাত হয়েছে দশটা। বরযাত্রীরা আর এক মিনিটও দেরি করতে চায় না। কিন্তু ক্রমাগতই দেরি হচ্ছে। কনে–বিদায় উপলক্ষে খুব কান্নাকাটি হচ্ছে। জরীর মা দু' বার ফিট হয়েছেন। জরীকে ধরে রেখেছেন।

বর–কনেকে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে ছবি তোলা হবে। জরী শেষ বারের মতো বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে––তার ছবি। ভাড়া–করা ফটোগ্রাফার ক্যামেরা স্ট্যাণ্ডে লাগিয়ে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে। বর এসে দাঁড়িয়ে আছে কখন থেকে। কনের দেখা নেই। জরীকে বার বার ডাকা হচ্ছে।

ঘরের সব ঝামেলা চুকিয়ে জরী যখন বারান্দায় ছবি তোলবার জন্যে রওয়ানা হয়েছে, তখনি হোসেন সাহেব বললেন, 'জরী, আনিসের সঙ্গে দেখা করে যাও। তার সঙ্গে আর দেখা নাও হতে পারে।'

জরী থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হোসেন সাহেব বরকে বললেন, 'তুমি আর দু' মিনিট অপেক্ষা কর। এ বাড়ির একটি ছেলে খুবই অসুস্থ, জরী তার সাথে দেখা

করে যাক।'

'যদি বলেন, তবে আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।'

'না, তোমার কষ্ট করতে হবে না। তুমি একটু অপেক্ষা কর। এস জরী।'

জরীর সঙ্গে অনেকেই উঠে আসতে চাইছিল। কিন্তু হোসেন সাহেব বারণ করলেন, 'দল-বল নিয়ে রোগীর ঘরে গিয়ে কাজ নেই।'

আনিসের ঘর অন্ধকার। বাইরে বিয়েবাড়ির ঝলমলে আলো। সে-আলোয় আনিসের ঘরের ভেতরটা আবছা আলোকিত। জরী ভেতরে এসে দাঁড়াল। হালকা একটি সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। জরী কী সেন্ট মেখেছে কে জানে! সে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মৃদু স্বরে ডাকল, 'আনিস ভাই, আনিস ভাই।'

কেউ সাড়া দিল না। হোসেন সাহেব বললেন, 'বাতি জ্বালাব, জরী?'

'না, না দুলাভাই।'

জরী নিচু হয়ে আনিসের কপাল স্পর্শ করল। ভালোবাসার কোমল স্পর্শ, যার জন্যে একটি পুরুষ আজীবন তৃষিত হয়ে থাকে। হোসেন সাহেব বললেন, 'ছিঃ জরী, কাঁদে না। এস আমরা যাই।'

ঘরের বাইরে বড়োচাচা দাঁড়িয়ে ছিলেন। জরী তাঁকে জড়িয়ে ধরল। তিনি বললেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে মা। ফি আমানুল্লাহ্, ফি আমানুল্লাহ্।'

নিচে তুমুল হৈচৈ হচ্ছিল। জরী নামতেই তাকে বরের পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। ক্যামেরাম্যান বলল, 'একটু হাসুন।'

সবাই বলল 'হাস জরী, হাস, ছবি উঠবে।'

জরীর চোখে জল টলমল করছে, কিন্তু সে হাসল।

আনিসের ঘুম যখন ভাঙল, তখন কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে। সে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, ঠিক বুঝতে পারছে না। জরী কি চলে গিয়েছে নাকি? উঠোনে সারি সারি আলো জ্বলছে।

গেটের বাতিগুলি জ্বলছে-নিভছে। তার বিছানার খানিকটা অংশ বারান্দার বাতিতে আলোকিত হয়ে রয়েছে।

আনিস ঘাড় উঁচু করে জানালা দিয়ে তাকাল। না, বরের গাড়ি এখনো যায় নি। জরী এখনো এই বাড়িতেই আছে। যাবার আগে দেখা করতে এখানে আসবে নিশ্চয়ই। আনিস তখন কী বলবে ভেবে পেল না। খুব গুছিয়ে কিছু একটা বলা উচিত, যাতে জরীর মনের সব গ্লানি কেটে যায়। কিন্তু আনিস কোনো কথাই গুছিয়ে বলতে পারে না।

জরীকে বিয়ের সাজে কেমন দেখাচ্ছে কে জানে? আনিস হয়তো দেখে চিনতেই পারবে না। জরী কি হুট করে তাকে সালাম করে বসবে নাকি? এই একটি বিশ্রী অভ্যেস আছে তার। ঈদের দিন কথা নেই, বার্তা নেই, সেজেগুজে এসে

টুপ করে এক সালাম। কিছু বললে বলবে--সিনিওরিটির একটা ভ্যালু আছে না? তারপরই খিলখিল হাসি।

আনিস অন্ধকার ঘরে চুপচাপ শুয়ে রইল। ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজে। বরযাত্রীরা তৈরি হয়েছে বিদায় নিতে। সবাই জরীকে ধরাধরি করে উঠোনে নিয়ে এল। রাজ্যের লোক সেখানে এসে ভিড় করেছে। যাবার আগে সবাই একটু কথা বলবে। দু'একটি কী আচার-অনুষ্ঠানও আছে।

আনিস জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে। বরের সাজান গাড়ি ব্যাক করে আরো পিছনে আনা হচ্ছে। গাড়িতে উঠতে যেন কনেকে হাঁটতে না হয়। উপর থেকে জরীর ঝলমলে লাল শাড়ির খানিকটা চোখে পড়ে। খুব আগ্রহ নিয়ে আনিস সেদিকে তাকিয়ে রইল। যাবার আগে জরী নিশ্চয়ই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবে।

'আনিস, আনিস।'

'কে?'

'আমি টিংকুমণি। আমি এসেছি।'

'এস এস।'

'তোমার ব্যথা কমেছ?'

'কমেছে।'

'আচ্ছা।'

সারা দিনের ক্লান্তিতে মেয়েটির মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। চুল এলোমেলো। আজ কেউ তার দিকে নজর দেবার সময় পায় নি। আনিস তাকে বুকের কাছে টেনে নিল। জানালার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ঐ দেখ টিংকু। জরী চলে যাচ্ছে।'

টিংকু সে-কথায় কান দিল না। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমি ব্যথা পেয়েছি, হাত ভেঙে গেছে।'

'আহা আহা! একটু হাতি-হাতি খেলবে টিংকু?'

'না, আমার ঘুম পাচ্ছে।'

ছোট ছোট হাতে আনিসের গলা জড়িয়ে ধরে টিংকু কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল।

ক্রমে ক্রমে রাত বাড়তে লাগল। বাড়ির আলোগুলি নিভে যেতে লাগল। বাগানের গোলাপ আর হাস্নুহেনা-ঝাড় থেকে ভেসে এল ফুলের সৌরভ। অনেক দূরে একটি নিশি-পাওয়া কুকুর কাঁদতে লাগল।

তারও অনেক পরে আকাশে একফালি চাঁদ উঠল। তার আলো এসে পড়ল নিদ্রিত শিশুটির মুখে। জ্যোৎস্নালোকিত একটি শিশুর কোমল মুখ, তার চারপাশে কী বিপুল অন্ধকার! গভীর বিষাদে আনিসের চোখে জল এল। যে-জীবন দোয়েলের, ফড়িংয়ের--মানুষের সাথে তার কোনো কালেই দেখা হয় না।

শ্যামল ছায়া

আমার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন।
উনিস' শ' একাত্তর সনের পাঁচই মে তাঁকে দেশপ্রেমের অপরাধে পাকআর্মি গুলী করে হত্যা করে। সে সময় আমি আমার ছোট ছোট ভাইবোনদের নিয়ে বরিশালের এক গ্রামে লুকিয়ে আছি। কী দুঃসহ দিনই না গিয়েছে! বুকের ভেতর কিলবিল করছে ঘৃণা, লকলক করছে প্রতিশোধের আগুন। স্বাধীনতা-টাধীনতা কিছু নয়, শুধু ভেবেছি, যদি একবার রাইফেলের কালো নলের সামনে ওদের দাঁড় করাতে পারতাম।
ঠিক একই রকম ঘৃণা, প্রতিশোধ গ্রহণের একই রকম তীব্র আকাঙ্ক্ষা সেই অন্ধকার দিনের অসংখ্য ছেলেকে দুঃসাহসী করে তুলেছিল। তাদের যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, কোনো সহায় সম্বল ছিল না, কিন্তু শ্যামল ছায়ার জন্যে গাঢ় ভালোবাসা ছিল। আমার 'শ্যামল ছায়া' সেই সব বন্ধুদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

হুমায়ূন আহমেদ

আবু জাফর শামসুদ্দিন

নৌকা ছাড়তেই ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল।

এ অঞ্চলে বৃষ্টি-বাদলার কিছু ঠিক নেই। কখন যে হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামবে, আবার কখন যে সব মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠবে, কেউ বলতে পারে না।

আমি নৌকার ভেতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লাম। বেশ শীত করছে। ঠাণ্ডা বাতাসে গায়ে কাঁপন লাগে। নৌকা চলছে মন্থর গতিতে। হাসান আলি নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড় টানছে। এত বড়ো নৌকা কী জন্যে নিয়েছে কে বলবে। পানসির মতো আকৃতি। দাঁড় টেনে একে নিয়ে যাওয়া কি সোজা কথা?

এখন বাজছে ন'টা। রাত দুটোর আগে রামদিয়া পৌছান এ নৌকার কর্ম নয়।

গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয়তো হবে। কিন্তু গুণটা টানবে কে? আমি নেই এর মধ্যে, বৃষ্টিতে ভিজে গুণের দড়ি নিয়ে দৌড়ান আমাকে দিয়ে হবে না। সাফ কথা।

বৃষ্টি দেখছি ক্রমেই বাড়ছে। বিলের মধ্যিখানে বৃষ্টির শব্দটা এমন অদ্ভুত লাগে। কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে আবার বাতাসে 'হুঅ' 'হুঅ' আওয়াজ উঠছে। প্যাঁচা ডাকার মতো। ভয় ধরে যায় শব্দ শুনে। ছেলেবেলায় এক বার এ-রকম শব্দ শুনে এমন ভয় পেয়েছিলাম। মানসাপোতার বিলে মাঝি দিক ভুল করেছে। চারদিকে সীমাহীন জল। বড়োরা সবাই ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করছে। তাদের হৈচৈ-এ ঘুম ভেঙে শুনেছি সেই বিচিত্র 'হুঅ 'হুঅ' আওয়াজ। আজও সেই শব্দে ভয় ধরল। কে জানে কেন। আমি কি কোনো অমঙ্গলের আশঙ্কা করছি?

কুটকুট করে মশার কামড় খাচ্ছি। এই বিলের মধ্যে আবার মশা কোথেকে আসে? হাত-পা আর মুখে অল্প কিছু কেরোসিন তেল মেখে নিলে হ'ত। সবাই দোখ্‌ তাই করে। হুমায়ূন ভাইও করেন। মশার উৎপাত থেকে বাঁচা যায় তাহলে। কেরোসিন মাখতে ইচ্ছে হয় না আমার। কি জানি বাবা চামড়ার কোনো ক্ষতিই করে কিনা। হয়তো গাল-টাল ঝলসে কয়লা হয়ে পড়বে। এর চেয়ে মশার কামড় অনেক ভালো। হাণ্ড্রেড টাইমস বেটার।

হুমায়ুন ভাইও দেখি আমার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছেন। তাঁর ধারণা, আমি ঘুমিয়ে রয়েছি। মাথার নিচে থেকে নিঃশব্দে বালিশটা নিয়ে নিলেন। বেশ লোক যা হোক! মজিদ বা আনিস হলে আমি গদাম করে একটা ঘুষি মারতাম। পরিষ্কার একটা হাতের কাজ দেখতে পেত। চালাকি পেয়েছ, না? বালিশ ছাড়া আমি শুয়ে থাকতে পারি না। অনেকেরই দেখি মাথার নিচে কিছু নেই, কিন্তু কেমন ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকায়। আমি পারি না।

বৃষ্টির তো বড়ো বাড়াবাড়ি দেখছি। ঝড়টড় এলে বিপদ। সাঁতার যা জানি, তাতে তিন মিনিটের বেশি ভেসে থাকা যাবে না। নৌকা ডুবলে মার্বেলের গুলির মতো তলিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। অবশ্যি সেটাও খুব একটা মন্দ ব্যাপার হবে না। ওমা, হাসি আসছে কি জন্যে বা! সবাইকে চমকে দিয়ে হেসে উঠব নাকি?

হুমায়ূন ভাই দেখি উঠে বসেছেন। মশা কামড়াচ্ছে বোধ হয়। কিংবা কোনো কারণে ভয় লাগছে। ভয় পেলেই এ রকম অস্থিরতা আসে! মজিদ বলল, 'কি হুমায়ূন ভাই, ঘুম হল না?'

'এই ঝড়-বৃষ্টিতে ঘুম আসে নাকি? তাছাড়া টেনশনের সময় আমার ঘুম হয় না।'

'এক দফা চা খেলে কেমন হয়? বানাব নাকি?'

'বাতাসের মধ্যে চুলা ধরাবে কী করে?'

'হাসান মিয়া ধরাতে পারবে। ও হাসা, লগি মেরে নৌকা দাঁড় করাও গো। চা না খেলে জুত হচ্ছে না। এহ্-হে, তুমি তো ভিজে একেবারে আলুর দম হয়ে গেছ

হাসান আলি।'

ভিজে আলুর দম হয়ে যাওয়াটা আবার কী রকম! এরকম উল্টোপাল্টা কথা শুধু মজিদই বলতে পারে। এক দিন আমাকে এসে বলছে, 'জাফর, যা পরিশ্রম করেছি--একেবারে টমেটো হয়ে গেছি।' পরিশ্রমের সঙ্গে টমেটোর কী সম্পর্ক কে জানে!

নৌকার খুঁটি গেড়ে বসে আছে। এতক্ষণে তাও নৌকার দুলুনিতে বেশ একটা ঝিমুনির মতো এসেছিল, সেটুকুও গেছে। ঘনঘন চা খেয়ে কী আরাম যে পায় লোকে, কে জানে। আনিস দেখি আবার সিগারেটও ধরিয়েছে। নতুন খাওয়া শিখেছে তো, তাই যখন-তখন সিগারেট ধরান চাই। আবার ধোঁয়া ছাড়ার কত রকম কায়দা। নাক-মুখ দিয়ে। হাসি লাগে দেখে। মজিদ বলল, 'আনিস, আমাকে একটা ট্রাফিক পুলিশ দাও দেখি। আরে বাবা, সিগারেটের কথা বলছি।'

'বুঝেছি বুঝেছি, তোমার এইসব ঢং ছাড় দেখি।'

বৃষ্টির বেগ মনে হয় একটু কমেছে। হা-হা করে বাতাস বইছে ঠিকই। মজিদ বলল, 'জাফর মড়ার মতো ঘুমুচ্ছে, দেখেছেন হুমায়ুন ভাই!'

'হেঁটে অভ্যেস নেই তো, টায়ার্ড হয়ে পড়েছে।'

'টায়ার্ড না হাতি, জাফর হচ্ছে কুম্ভকর্ণের ভাতিজা। হেভি ফাইটিং-এর সময়ও দেখবেন মেশিনগানের ওপর মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে।'

সবাই হেসে উঠল হো-হো করে। আমার বেশ মজা লাগছে। আনিস বলল, 'এক কাজ করি, জাফরের কানের কাছে মুখ নিয়ে মিলিটারি মিলিটারি বলে চিৎকার করে উঠি। দেখি জাফর কী করে।' মজিদ বলল, 'দাঁড়া, চায়ের পানি ফুটুক, তারপর।'

ওদের কথাবার্তা এমন ছেলেমানুষী, হাসি লাগে আমার। কী মনে করেছে ওরা। "মিলিটারি মিলিটারি" শুনে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে আমি পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ব নাকি? সরি, এতটা ভয় আমার নেই। আচমকা শুনলে একটু দিশাহারা হব হয়তো, এর বেশি না। সোনাতলায় এক বার মিলিটারির সামনে পড়ে গেলাম না? আমি আর সতীশ ধানক্ষেতে রাইফেল লুকিয়ে একটু এগিয়েছি, অমনি মুখোমুখি। ভাগ্য ভালো-দলের আর কেউ ছিল না আমাদের সঙ্গে। আট-দশটা জোয়ান ছেলে একসঙ্গে দেখলে কি আর রক্ষা ছিল? দু' জন ছিলাম বলেই বেঁচেছি। সতীশ অবশ্যি দারুণ ভয় পেয়েছিল। নারকেলের পাতার মতো কাঁপতে শুরু করেছে। আমি নিজেও হকচকিয়ে গিয়েছি। ছ' জন মিলিটারি ছিল সব মিলিয়ে, যেমন চেহারা তেমন স্বাস্থ্য। তারা জানতে চাইল, কোন বাড়িতে কচি ডাব পাওয়া যাবে। আমরা ওদের খাতির করে আজিজ মল্লিকের বাড়ি নিয়ে গেলাম। সতীশ গাছে উঠে কাঁদি কাঁদি ডাব পেড়ে নামাল। তারা মহাখুশি। এক টাকার একটা নোট দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল সতীশের দিকে। সতীশ সেই নোট হাতে নিয়ে বত্রিশ দাঁতে হেসে ফেলল--যেন

সাত রাজার ধন হাতে পেয়েছে।

প্ল্যান করেছিলাম, রাতের অন্ধকারে এক হাত নেব। কিন্তু ওরা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকল না। দুপুরের রোদ একটু কমতেই রওনা হয়ে গেল।

বৃষ্টি বোধ করি একেবারেই থেমে গেল। চা বানান হচ্ছে শুনছি। ওদের "মিলিটারি মিলিটারি" বলে চেঁচিয়ে ওঠার আগেই উঠে পড়ব কিনা ভাবছি, তখনি অনেক দূরে কোথায় 'হই হই' শব্দ পাওয়া গেল। নিমিষের মধ্যে আমাদের নৌকার সাড়া-শব্দ বন্ধ। চায়ের পানি ফোটার বিজ বিজ আওয়াজ ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজ নেই। হাসান বলল, 'নৌকা আসতাছে।' একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল শরীরে। ধ্বক করে উঠল বুক।

কিসের নৌকা, কাদের নৌকা--কে জানে? মিলিটারিরা অবশ্যি স্পীডবোট ছাড়া নড়াচড়া করে না। তা ছাড়া রাতের বেলা তারা ঘাঁটি ছেড়ে খুব প্রয়োজন ছাড়া নড়ে না। তবে "রাজাকারের" উপদ্রব বেড়েছে। তাদের আসল উদ্দেশ্য লুটপাট করা। এই পথে শরণার্থীদের নৌকা মেঘালয়ের দিকে যায়। সে সব নৌকায় হামলা করলে টাকা-পয়সা গয়না-টয়না পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে অল্পবয়সী সুশ্রী মেয়েও পাওয়া যায়। দূরের নৌকা দেখলাম স্পষ্ট হয়েছে। সেখান থেকে ভয় পাওয়া গলায় কে যেন হাঁক দিল, 'কার নৌকা গো?'

আমাদের নৌকা থেকে মজিদ চেঁচিয়ে বলল, 'তোমার কার নৌকা?'

'ব্যাপারীর নৌকা। মাছ যায়।'

শুনে পেটের মধ্যে হাসির বুদবুদি ওঠে। ব্যাপারী মাছের চালান দেয়ার আর সময় পেল না। আর মাছ নিয়ে যাচ্ছে এমন জায়গায়, যেখানে দেড় টাকায় এক-একটা মাঝারি সাইজের রুই পাওয়া যায়। হুমায়ূন ভাইয়ের গম্ভীর গলা শোনা গেল, 'এই যে মাছের ব্যাপারী, নৌকা আন এদিকে।'

কী আশ্চর্য, এই কথাতেই নৌকার ভেতর থেকে বহুকণ্ঠের কান্না শুরু হয়ে গেল। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের গলার আওয়াজও আছে। এই বাচ্চাগুলি এতক্ষণ কী করে চুপ করে ছিল তাই ভাবি। নৌকার ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। মজিদ বলল, 'ভয় নাই ব্যাপারী; নৌকা কাছে আন।'

'আপনারা কী করেন?'

'ভয় নাই, আমরা মুক্তিবাহিনীর লোক। আস এদিকে, কিছু খবর নেই।'

'মুক্তিবাহিনী, মুক্তিবাহিনী!' আনন্দের একটা হল্লা উঠল নৌকা দু'টিতে। অনেক কৌতূহলী মুখ উঁকি মারল। এরা হয়তো আগে কখনো মুক্তিবাহিনী দেখে নি, শুধু নাম শুনেছে। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় কৌতূহলী মুখগুলি দেখতে ভালো লাগে।

'নমস্কার গো বাবাসকল। আমার নাম হরি পাল। কাসুন্দিয়ার জগৎ পালের নাম তো জানেন। আমি জগৎ পালের ছোট ভাই। আমার আর জ্যাঠার পরিবার আছে এই

নৌকায়। মোট একুশ জন।'

হরি পাল লোকটা বাক্যবাগীশ। কথা বলেই যেতে লাগল। দেখতে পাচ্ছি, তার ঘনঘন তৃপ্তির নিঃশ্বাস পড়ছে। নৌকার ভেতরের ছেলেমেয়েগুলির কৌতূহলের সীমা নেই। ক্রমাগত উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। এদের মধ্যে একটি মেয়ের চেহারা এমন মনকাড়া যে চোখ ফেরান যায় না। আমি বললাম, 'ও খুকি, কী নাম তোমার?'

খুকি জবাব দেবার আগেই হরি পাল বলল, 'এর ডাকনাম মালতী। ভালো নাম সরোজিনী। আর এর বড়ো যে, তার নাম লক্ষ্মী। ভালো নাম কমলা। ও মালতী, বাবুরে নমস্কার দে।' মালতী ফিক করে হেসে ফেলল। হরি পালকে চা খেতে দেওয়া হল এক কাপ। এত তৃপ্তি করে সে বোধ হয় বহু দিন চা খায় নি। খাওয়া শেষে ভোঁস ভোঁস করে কেঁদে ফেলল। তাদের কাছে আমাদের একটিমাত্র জিজ্ঞাসা ছিল--শিয়ালজানী খালে কোনো নৌকা বাঁধা দেখেছে কিনা। আমাদের একটি দল সেখানে থাকার কথা। কিন্তু হরি পাল বা হরি পালের মাঝি, কেউই সে-কথা বলতে পারল না।

হাসান আলি নৌকা ছেড়ে দিল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে দাঁড় পড়ছে। হরি পালদের নৌকাকে পেছনে ফেলে এগচ্ছি, হঠাৎ শুনলাম ইনিয়েবিনিয়ে সে-নৌকা থেকে কে একটি মেয়ে কাঁদছে। হয়তো তার স্বামী নিখোঁজ হয়েছে, হয়তো তার ছেলেটিকে বেঁধে নিয়ে গেছে রাজাকাররা। নিস্তব্ধ দিগন্ত, বিস্তৃত জলরাশি, আকাশে পরিষ্কার চাঁদ--এ সবের সঙ্গে এই করুণ কান্না কিছুতেই মেলান যায় না। শুধু শুধু মন খারাপ হয়ে যায়।

এগারটা বেজে গেছে। দুটোর আগে রামদিয়া পৌছান অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। অবশ্যি তা নিয়ে কাউকে খুব চিন্তিতও মনে হচ্ছে না। আনিস দেখি আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছে। মজিদ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। হাসান আলি নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড় টানছে। আমি বললাম, 'হাসান আলি, দুটোর মধ্যে পৌছতে পারব তো?'

হাসান আলি জবাব দিল না। বিশ্রী স্বভাব তার। কিছু জিজ্ঞেস করলে ভান করবে যেন শুনতে পায় নি। যখন মনে করবে জবাব দেওয়া প্রয়োজন, তখনি জবাব দেবে, তার আগে নয়। আমি আবার বললাম, 'কী মনে হয় হাসান আলি, দুটোর মধ্যে রামদিয়া পৌছব?'

কোনো সাড়াশব্দ নেই। এই জাতীয় লোক নিয়ে চলাফেরা করা মুশকিল। আমি তো সহ্যও করতে পরি না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় দিই রাইফেলের বাঁট দিয়ে মাথায় এক বাড়ি--হারামজাদা ছোটলোক। কিন্তু রাগ সামলাতে হয়। কারণ লোকটা দারুণ কাজের। এ অঞ্চলটা তার নখদর্পণে। নিকষ অন্ধকারে মাঝে মাঝে আমাদের এত সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়েছে যে, মনে হয়েছে ব্যাটা বিড়ালের মতো অন্ধকারেও দেখতে পায়। খাটতে পারে যন্ত্রের মতো।

সারা রাত নৌকা চালিয়ে কিছুমাত্র ক্লান্ত না হয়ে বিশ–ত্রিশ মাইল হেঁটে মেরে দিতে পারে। আবু ভাই হাসান আলির কথা উঠলেই বলতেন, 'দি জায়েন্ট।'

কিন্তু এই এক দোষ, মুখ খুলবে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে শূন্যদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আবার নিজের কাজ করে যাবে। প্রথম প্রথম মনে হ'ত হয়তো কানে কম শোনে। ও আল্লা, শেষে দেখি এক মাইল দূরের ঝিঁঝি পোকার ডাকটিও বুঝি তার কান এড়ায় না। কুড়ালখালির কাছে এক বার--আমাদের সমস্ত দলটি নৌকায় ব'সে। আবু ভাই সে–সময় বেঁচে। তিনি এক ন্যাংটো বাবার গল্প করছেন, আমরা সবাই হো–হো করে হাসছি। এমন সময় হাসান আলি বলল, 'লঞ্চ আসতাছে, উঠেন সবাই পাড়ে উঠেন।'

আমরা কান পেতে আছি। কোথায় কী–বাতাসের হুস হুস শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। আনিস বলল, 'যত সব বোগাস। তারপর কী কী হল?' আবু ভাই বললেন, 'গল্প পরে হবে, এখন উঠে পড় দেখি। হাসান আলি যখন শব্দ শুনেছে, তখন আর ভুল নেই।'

সেবার সত্যি সত্যি দু'টি স্পীডবোট বাজারে এসে ভিড়েছিল। হাসান আলির কথা না শুনলে গোটা দলটা মারা পড়তাম।

আমার অবশ্যি সে রকম মৃত্যুভয় নেই। তবু কে আর বেঘোরে মরতে চায়? আমাদের মধ্যে মজিদের ভয়টাই বোধহয় সবচেয়ে বেশি। কোনো অপারেশনে যাওয়ার আগে কুরআন শরীফ চুমু খাওয়া, নফল নামাজ পড়া, ডান পা আগে ফেলা--এক শ' পদের ফ্যাকরা। গলায় ছোটখাটো ঢোলের আকারের এক তাবিজ। কোন পীর সাহেবের দেওয়া, যা সঙ্গে থাকলে অপঘাতে মরবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কাও নেই। ভাবলেই হাসি পায়।

এ–রকম ছেলে দলে নেওয়া ঠিক নয়। এতে অন্যদের মনের বল কমে যায়। তবে হ্যাঁ, আমি এক শ' বার স্বীকার করি, অপারেশন যখন শুরু হয় তখন মজিদের মাথা থাকে সবচেয়ে ঠাণ্ডা। এক তিল বেতাল নেই। আর 'এইম' পেয়েছে কি, তিনটি গুলীর মধ্যে তার দু'টি গুলী যে টার্গেটে লাগবে এ নিয়ে আমি হাজার টাকা বাজি রাখতে পারি। আমাদের ট্রেনিং দেওয়াতেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার সুরুজ মিয়া। আমরা ডাকতাম বুড্ডা ওস্তাদ। বুড্ডা ওস্তাদ প্রায়ই বলতেন, 'মজিদ ভাইয়ের হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব। আহ্ কী হাত--কী নিশানা, জিতা রাহ!'

মজিদের মতো ছেলের এতটা ভয় থাকা কি ঠিক? মজিদ যদি এ–রকম ভয় পায় তো আমরা কী করি? এক রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি সে হাউমাউ করে কাঁদছে। আমি হতভম্ব। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে মজিদ?'

'কিছু হয় নাই।'

খুব করে চেপে ধরায় বলল, সে স্বপ্নে দেখেছে এক বুড়ো লোক এসে তাকে বলছে--"আব্দুল মজিদ, তোমার গলায় কি গুলী লেগেছে?" এতেই কান্না। শুনে

এমন রাগ ধরল আমার। ছিঃ ছিঃ, এ কী ছেলেমানুষী ব্যাপার! আমি অবশ্যি কাউকে বলি নি।

পরবর্তী এক সপ্তাহ সে কোথাও বেরল না। হেন–তেন কত অজুহাত। আসল কারণ জানি শুধু আমি। কত বোঝালাম––স্বপ্ন তো আর কিছুই নয়, অবচেতন নের চিন্তাই স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু মজিদের এক কথা––তার সব স্বপ্ন নাকি ফলে যায়। এক বার নাকি সে স্বপ্নে দেখিছিল তার ছোট বোন পানি পানি করে চিৎকার করছে, আর সেই বোনটি নাকি ক' দিন পরই অ্যাক্সিডিন্টে মারা গেছে। মরবার সময় 'পানি পানি' করে অবিকল যেমন স্বপ্নে দেখেছিল তেমনি ভঙ্গিতে চেঁচিয়েছে। কী অদ্ভুত যুক্তি!

মৃত্যুর জন্যে ভয় পাওয়াটা একটি ছেলেমানুষী ব্যাপার নয় কি? আমার তাই মনে হয়। যখন সত্যি সত্যি মৃত্যু তার শীতল হাত বাড়াবে, তখন কী করব জানি না, তবে খুব যে একটা বিচলিত হব, তাও মনে হয় না।

তা ছাড়া আমার মৃত্যুতে কারো কিছু আসবে–যাবে না। আমার জন্যে শোক করবার মতো প্রিয়জন কেউ নে[illegible] [illegible]ীয়–স্বজনরা চোখের পানি ফেলবে, চেঁচিয়ে কাঁদবে, বন্ধু–বান্ধবরা মুখ কা[illegible] [illegible]রে বেড়াবে, তবেই না মরে সুখ।

শুনেছি বিলেতে নাকি অনেক ধনী বুড়োবুড়ি বিশেষ এক সংস্থার কাছে টাকা রেখে যায়। এইসব বুড়োবুড়ির কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। সেই বিশেষ সংস্থাটি বুড়োবুড়ির মৃত্যুর পর লোক ভাড়া করে আনে। অদ্ভুত ব্যবস্থা! সত্যি এ–রকম কিছু আছে, না শুধুই গালগল্প? আমাদের দেশে এ–রকম থাকলে আমিও আগেভাগেই লোক ভাড়া করে আনতাম। তারা সুর করে কাঁদতে বসত––"ও জাফর, জাফর র, তুমি কোথায় গেলা রে?" এই কথা মনে উঠতেই দেখি হাসি পাচ্ছে। আমি শব্দে হেসে উঠলাম। আনিস বলল, 'কী হয়েছে, এত হাসি––'

'এমনি হাসছি।'

হঠাৎ হাসান আলি ভয়–পাওয়া গলায় বলল, 'লঞ্চের আওয়াজ আসে।'

আমার বুক ধ্বক করে উঠল। তার মানে হচ্ছে, আমিও ভয় পাচ্ছি। সেই ভয়, যা যুক্তি–তর্ক মানে না, হঠাৎ করে এসে আমাদের অভিভূত করে ফেলে। হুমায়ূন ভাই বললেন, 'নৌকা ভেড়াও হাসান আলি।'

ছপ ছপ দাঁড় পড়ছে। আনিস এবং মজিদ দু'জনেই দু'টি বৈঠা তুলে নিয়েছে। আমরা এখনো লঞ্চের শব্দ শুনি নি, তবে হাসান আলি যখন শুনেছে, তখন আর ভুল নেই।

সাড়াশব্দ শুনে মজিদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে হকচকিয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

আমি বললাম' 'মজিদ, তোমার শ্বশুর সাহেব আসছেন, উঠে বস।'

'কে শ্বশুর, কার কথা বলছ?'

হুমায়ূন ভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তামাশা রাখ, জাফর। হাসান আলি এখনো শুনতে পাচ্ছ?'

হাসান আলি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর হাসিমুখে বলল, 'না, আর শব্দ পাই না।'

খবর পাওয়া গেছে, এই অঞ্চলে কিছু দিন ধরেই একটি স্পীডবোট ঘুরে বেড়াচ্ছে। বর্ষার পানিতে খালবিলগুলি যেই একটু ভরাট হয়েছে, অমনি নামিয়েছে স্পীডবোট। নৌকা করে আমাদের আরো এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কি না, বুঝতে পারছি না। অবশ্যি রামদিয়া পর্যন্ত কী ভাবে যাব, তা ঠিক করবে হাসান আলি। আমাদের রাত দুটোর আগে রামদিয়া পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে তার। হাসান আলি বলল, 'হাঁটাপথে যাওন লাগব। অল্প কিছু প্যাক–কাদা আছে, কিন্তু উপায় আর কী।

মজিদ বলল, 'কয় মাইল পথ?'

'আট–নয় মাইল।'

'আমার শেয়ালের মতো খিদে লেগেছে, হাঁটা মুশকিল।'

আনিস বলল, 'শেয়ালের মতো খিদেটা কী রকম জিনিস?'

'অর্থাৎ মুরগি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

মজিদ হোহো করে হেসে ফেলল।

নৌকা থেকে বেরিয়ে এসে দেখি চাঁদ ডুবে গেছে। কিন্তু খুব পরিষ্কার আকাশ। অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে। নক্ষত্রের আলোয় আবছাভাবে সব নজরে আসে। আনিস বলল, 'দশ মাইল হাঁটা সহজ কর্ম না। হুমায়ূন ভাই অনুমতি দিলে আরেক দফা চা হোক, কী বলেন?'

'বেশ তো, চা চড়াও।'

'হাসান আলি, আদা আছে তোমার কাছে? একটু আদা–চা হোক, গলাটা খুসখুস করছে। জাফর, তুমিও খাবে নাকি হাফ কাপ?'

'না, চা খেলে ঘুম হয় না আমার।'

'ঘুমুবার অবসরটা পাচ্ছ কই?'

ঘুমুবার অবসর সত্যি নেই। তবু অভ্যেসটা তো আছে। হুমায়ূন ভাই দেখি নৌকার ছাদে উঠে বসেছেন। গুনগুন করছেন নিজ মনে। কোন গানটা টিউন করছেন, কে জানে। ঠিক ধরতে পারছি না। আহ্, চমৎকার লাগছে। আড়াল থেকে শুনতে বেশ লাগে। অনুরোধ করতে গেলেই সেরেছে। গাইবেন না কিছুতেই। তাঁর কাছ থেকে গান শোনবার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, এমন একটা ভাব দেখান যে, তিনি কী করছেন তার দিকে তোমার একটুও নজর নেই। হ্যাঁ, এইবার গান শোনা যাচ্ছে--

"শ্যামল ছায়ায় নাই–বা গেলে
না না না নাই–বা গেলে"

'না না' বলবার সময় বেশ কায়দা করে গলা ভাঙছে তো! শুনতে খুব ভালো লাগছে। শান্ত হয়ে আছে বিল। বিলের পানি দেখাচ্ছে কালো আয়নার মতো। কালো আয়নাটা আবার কী? কি জানি কী! তবে কালো আয়নার কথা মনে হয়। আকাশে অসংখ্যা তারা উঠেছে। তারাগুলির জলে ছায়া পড়া উচিত। কী আশ্চর্য, ছায়া পড়ছে না তো! আকাশে যখন খুব তারা ওঠে, তখন নাকি দেশে আকাল আসে। মজিদ বলল, 'সাংঘাতিক খিদে লেগেছে। খালি পেটে চা খাওয়াটা কি ঠিক?'

হুমায়ূন ভাই গান থামিয়ে বললেন, 'খালি পেটে চা না খেতে চাইলে গোটা দুই ডিগবাজি খেয়ে নাও মজিদ। এ ছাড়া আর কোনো খাদ্যদ্রব্য নেই।'

আনিস আবার এই শুনেই ফ্যাফ্যা করে হাসতে শুরু করেছে। এর মধ্যে এত হাসির কী আছে? হুমায়ূন ভাই আবার গুনগুন শুরু করেছেন। তাঁর বোধহয় মন-টন বিশেষ ভালো নেই। কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন না। এমনি তিনি অবশ্যি খুব ফুর্তিবাজ ছেলে। আমার উপর রাগ করেছেন কি?

আজ ভোরে তাঁর সঙ্গে আমার খানিকটা মন কষাকষি হয়েছে। কিন্তু আমি অন্যায় কিছু বলি নি। শুধু বলেছি, মেথিকান্দার এ অপারেশনের দায়িত্ব হুমায়ূন ভাইয়ের নিয়ে কাজ নেই। এতে কী মনে করেছেন তিনি? তাঁর প্রতি আস্থা নেই আমার? তিনি ঠিকই মনে করেছেন। এমন দুর্বল লোকের এ-রকম এ্যাসাইনমেন্টের নেতৃত্ব পাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু আমাদের সাব-সেক্টরে সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড কী মনে করে এটা করলেন কে জানে!

দালাল হাজী মারার ব্যাপারটাই দেখি না কেন। এই লোক কম করে হলেও গোটা ত্রিশেক মানুষ মারিয়েছে। হিন্দুদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে একাকার করেছে। মিলিটারি ক্যাপ্টেনের পিছে পিছে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। সে যখন হলদিয়ার বাজারে ধরা পড়ল আমাদের হাতে, আমি বললাম, 'গাছের সঙ্গে বেঁধে বেয়োনেট দিয়ে শেষ করে দি।' গ্রামের লোকদের একটা শিক্ষা হোক, ভবিষ্যতে আর কেউ দালালী করবার সাহস পাবে না। হুমায়ূন ভাই মাথা নাড়েন। ক্যাম্পে নিয়ে যেতে চান এ্যারেস্ট করে। পাগল নাকি! সেই শেষ পর্যন্ত গুলী করে মারতে হল। হুমায়ুন ভাই সেই দৃশ্যও দেখবেন না। তিনি নদীর পাড়ে চুপচাপ বসে রইলেন। আরে বাবা, তুমি তো মেয়েমানুষ নও। নাচতে নেমেছ, এখন আবার ঘোমটা কিসের? 'You have to be cruel, only to be kind'--আবু ভাই বলতেন সব সময়। আহ্, মানুষের মতো মানুষ ছিলেন আবু ভাই। আবু ভাইয়ের লাশ নিয়ে যখন আসল, তখন বড্ড ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর পায়ে চুমু খাই। আবু ভাইয়ের মতো মানুষগুলি এত অল্প আয়ু নিয়ে আসে কেন? যুদ্ধ শেষ হলে আবু ভাইয়ের মেয়েটিকে দেখতে যাব। তাকে কোলে নিয়ে বলব--। কী বলব তাকে?

হুমায়ূন ভাই দেখি উত্তেজিত হয়ে নেমে আসছেন ছাদ থেকে। কী ব্যাপার, মোটর লঞ্চের আলো দেখা যায় নাকি? আনিস চা ছাঁকতে ছাঁকতে বলল, 'কী

ব্যাপার হুমায়ূন ভাই?'

'কিছু না। অনেকগুলি উল্কাপাত হল। একটা তো প্রকাণ্ড!'

উল্কাপাত শুনেছি খুব অশুভ ব্যাপার। আমার মা বলতেন অন্য কথা। তিনি নাকি কোথায় শুনেছেন উল্কাপাতের সময় কেউ যদি তার গোপন ইচ্ছাটি সশব্দে বলে ফেলে, তাহলে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। এক মজার কাণ্ড হল এক দিন। জ্যামিতি বই হারিয়ে ফেলেছি। সন্ধ্যাবেলা বসে আছি বারান্দায়। আকাশের দিকে চোখ। উল্কাপাত হতে দেখলেই বলব, 'জ্যামিতি বইটা যেন পাই'।

কোথায় গেল সে-সব দিন। মায়ের মুখ আর মনেই পড়ে না। এক দিন কথায় কথায় অবনী স্যার আমাদের ক্লাসে বললেন, 'যে-সব ছেলের মনে মায়ের চেহারার কোনো স্মৃতি নেই, তারা হল সবচে অভাগা।' আমি চোখ বুঁজে ক্লাসের ভেতরেই মায়ের চেহারা মনে আনতে চেষ্টা করলাম। একটুও মনে পড়ল না। সেই যে পড়ল না, পড়লই না। এখনো পড়ে না। স্বপ্নেও যে এক-আধ দিন দেখব, সে উপায়ও নেই। আমার ঘুম এমন গাঢ়--স্বপ্নটপ্নের বালাই নেই। দূর ছাই!

নেমে পড়েছে সবাই। ওরে বাবা রে, কী কাদা! কোমর পর্যন্ত তলিয়ে যাবার দাখিল! হাসান আলি আরেকটু হলে গুলীর বাক্স নিয়ে নদীতে পড়ত। লাইট-মেশিনগানটা সবাই মিলে চাপিয়েছে আমার কাঁধে। নামেই লাইট, আসলে মেলা ওজন। আকাশে গুড়গুড় মেঘ ডাকছে আবার। বৃষ্টি নামলেই গেছি--মজিদের ভাষায় একেবারে "পটেটো চিপস" হয়ে যাব।

হুমায়ূন আহমেদ

আজ সারাটা দিন আমার মন খারাপ ছিল; এখন মধ্যরাত্রি, ছপছপ শব্দে কাদা-ভরা রাস্তায় হাঁটছি। মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এত দিনেও হাঁটার অভ্যেস হল না। আনিস এবং মজিদ কত নির্বিকার ভঙ্গিতেই না পা ফেলছে। এতটুকু ক্লান্ত না হয়েও তারা দশ মাইল হেঁটে পার হবে; বিপদ হবে আমাকে নিয়ে। জাফরও হাঁটতে পারে না। তবে আমার মতো এত সহজে ক্লান্তও হয় না। সমস্ত দলটির মধ্যে আমি সবচেয়ে দুর্বল। শরীরের দিক দিয়ে তো বটেই, মনের দিক থেকেও। তবুও আজকের জন্যে আমিই 'কমাণ্ডার'। 'কমাণ্ডার' শব্দটা শুনতে বড়ো গেঁয়ো। অধিপতি বা দলপতি হলে মানাত। না, আমি তেমন বাংলাপ্রেমিক নই। একুশে ফেব্রুয়ারিতে ইংরেজি সাইন-বোর্ড ভাঙার ব্যাপার আমার কাছে খুব হাস্যকর মনে হয়। যে-কোনো জিনিসের বাড়াবাড়ি আমাকে পীড়া দেয়। আর সে জন্যেই যুদ্ধে এসেছি।

এক মাইলও হাঁটি নি, এর মধ্যেই পা ভারি হয়ে এসেছে। কী মুশকিল! নিঃশ্বাস পড়ছে ঘনঘন। শার্ট ভিজে গিয়েছে ঘামে।

ঢাকা থেকে ভাই, বোন, বাবা, মা সবাইকে নিয়ে একনাগাড়ে ত্রিশ মাইল হেঁটে পৌঁছেছিলাম মির্জাপুর। কী কষ্ট, কী কষ্ট! নিজের জন্যে কিছু নয়। জরী ও পরীর দিকে তাকান যাচ্ছিল না। পরীর ফর্সা মুখ নীল বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে অনেকেই হাঁটছিলেন। কাফেলার মতো ব্যাপার। এক-এক বার হুস করে সুখী মানুষেরা গাড়ি নিয়ে উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। এমন হৃদয়বান কাউকে কি পাওয়া যাবে, যে আমাদের একটুখানি লিফ্‌ট্‌ দেবে! দুঃসময়ে সবাই হৃদয়হীন হয়ে পড়ে। আমাদের সঙ্গে এক জন গর্ভবতী মহিলা ক্লান্ত পায়ে হাঁটছিলেন। তিনি ক্রমাগতই পিছিয়ে পড়ছিলেন। ভদ্রমহিলার স্বামী তা দেখে রেগে আগুন। রাগী গলায় বললেন, 'টুকুস টুকুস করে হাঁটছ যে? তোমার জন্যে আমি মরব নাকি?' এই দীর্ঘপথে কত কথাবার্তা হয়েছে কত জনের মধ্যে। কত অশ্রুবর্ষণ, কত তামাশা--কিছুই আজ আর মনে নেই, কিন্তু ঐ স্বামী বেচারার কথাগুলি এখনো কাঁটার মত বুকে বিঁধে আছে। গর্ভবতী মহিলার শোকাহত চোখ এখনো চোখে ভাসে।

রাস্তাতেই পরীর হু-হু করে জ্বর উঠে গেল। আমি বললাম, 'কোলে উঠবি পরী? পরীর কী লজ্জা। ক্লাস টেনে পড়ে মেয়ে, দাদার কোলে উঠবে কি? পরী অপ্রকৃতিস্থের মতো পা ফেলে হাঁটতেই থাকল। তার হাত ধরে-ধরে চলছি আমি। ঘামে ভেজা গরম হাত, আর কী তুলতুলে নরম! পরীর হাতটা যে এত নরম, তা আগে কখনো জানি নি। জরীর হাত ভীষণ খসখসে, অনেকটা পুরুষালি। কিন্তু পরীর হাত কী নরম, কী নরম!

মীর্জাপুরের কাছাকাছি এসেই পরী নেতিয়ে পড়ল। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে।' বমি করতে লাগল ঘনঘন। বাবা একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়লেন। কোথায় ডাক্তার কোথায় কি? এর মধ্যে গুজব রটে গিয়েছে, ঢাকা থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক দল জোয়ানকে মিলিটারিরা এই দিকেই তাড়া করে আনছে। চারদিকে ছুটোছুটি, চিৎকার, আতঙ্ক। মা এবং জরী ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। বাবা যাকেই পাচ্ছেন তাকেই জিজ্ঞেস করছেন, 'কিছু মনে করবেন না, আপনি কি ডাক্তার?'

ডাক্তার পাওয়া যায় নি, কিন্তু এক ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে তাঁর ট্রাকে আমাদের টাঙ্গাইল পৌঁছে দিলেন। টাঙ্গাইল পৌঁছালাম শুক্রবার সন্ধ্যায়। পরী মারা গেল রোববার রাতে। সন্ধ্যাবেলাতে কথা বলল ভালো মানুষের মতো। বারবার বলল, কোনো মতে দাদার বাড়ি পৌঁছতে পারলে আর ভয় নেই। তাই না বাবা?'

পরীর মৃত্যু তো কিছুই নয়। কত কুৎসিত মৃত্যু হয়েছে চারপাশে। মৃত্যু এসেছে সীমাহীন বীভৎসতার মধ্যে। কত অসংখ্য অসহায় মানুষ প্রিয়জনের এক ফোঁটা চোখের জল দেখে মরতে পারে নি। মরবার আগে তাদের কপালে কোনো স্নেহময় কোমল করস্পর্শ পড়ে নি।

অনেক মধ্যরাত্রিতে যখন অতলস্পর্শী ক্লান্তি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন মনে হয় আমার হাত ধরে টুকটুক পা ফেলে পরী হাঁটছে।

যে-জান্তব পশুশক্তির ভয়ে পরী ছোট ছোট পা ফেলে ত্রিশ মাইল হেঁটে গেছে, আমার সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি তার বিরুদ্ধে। আমি রাজনীতি বুঝি না। স্বাধীনতা-টাধীনতা নিয়ে সে-রকম মাথাও ঘামাই না। শুধু বুঝি. ওদের শিক্ষা দিতে হবে। জাফর প্রায়ই বলে, 'হুমায়ূন ভাই ইচ্ছে করে চোখ বুজে থাকেন।' হয়তো থাকি। তাতে ক্ষতি কিছু নেই। 'আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করি নি, জাফর?'

মনে মনে এই কথা বলে আমি একটু হাসলাম। জাফরের সঙ্গে আজ ভোরে আমার খানিকটা মন কষাকষি হয়েছে। সে চাচ্ছিল আজকের এই এ্যাসাইনমেন্টের নেতৃত্ব যেন আসলাম পায়। জানি না এর পেছনের সত্যিকার কারণটি কি? দলপতির প্রতি আস্থা না থাকা বড়ো বিপজ্জনক। মুশকিল হচ্ছে--আমরা রেগুলার আর্মির লোকজন নই। আনুগত্য হল একটা অভ্যাস, যা দীর্ঘদিনের ট্রেনিং-এর ফলে মজ্জাগত হয়। রেগুলার আর্মির এক জন অফিসারের অনুচিত হুকুমও সেপাইরা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে। কিন্তু আমার হুকুম নিয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করবে। পছন্দ না হলে কৈফিয়ত পর্যন্ত তলব করে বসবে। কাজেই আমার প্রথম কাজ ছিল দলের লোকের আস্থা অর্জন করা। বুঝিয়ে দেওয়া যে, আমার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। কিন্তু আমি তা পারি নি। কাপুরুষ হিসেবে মার্কা-মারা হয়ে গেছি।

যদিও তারা সব সময়ই 'হুমায়ূন ভাই, হুমায়ূন ভাই' করে এবং সবাই হয়তো একটু শ্রদ্ধাও করে, কিন্তু সে-শ্রদ্ধা এক জন যোদ্ধা হিসেবে নয়।

আমার প্রথম ভুল হল আমি হাজী সাহেবের মৃত্যুতে সায় দিতে পারি নি। লোকটার নৃশংসতা সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। মৃত্যুদণ্ড যে তার প্রাপ্য শাস্তি, এতেও ভুল নেই। তবু আমার মায়া লাগল। ষাটের উপর বয়স হয়েছে। মরবার সময় তো এমনিতেই হল। তবু বাঁচবার কী আগ্রহ! সে আমাদের বিশ হাজার টাকা দিতে চাইল। শুনে আমার ইচ্ছে হল, একটা প্রচণ্ড চড় কষিয়ে দি। কিন্তু আমি শান্ত গলায় বললাম--'জাফর, হাজী সাহেবকে ক্যাম্পে নিয়ে চল।' জাফর চোখ লাল করে তাকাল আমার দিকে। থেমে থেমে বলল, 'একে কুকুরের মতো গুলী করে মারব।' হাজী সাহেব চিৎকার করে আল্লাহ্‌কে ডাকতে লাগলেন। এই তিনিই যখন মিলিটারি দিয়ে লোকজন মারিয়েছেন, তখন সেই লোকগুলিও নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌কে ডেকেছিল। আল্লাহ্ তাদের যেমন রক্ষা করেন নি--হাজী সাহেবের বেলায়ও তাই হল। হাজী সাহেব অপ্রকৃতিস্থ চোখে তাকিয়ে মৃত্যুর প্রস্তুতি দেখতে লাগলেন। জাফর এক সময় বলল, 'তওবা-টওবা যা করবার করে নেন। দোওয়া-কালাম পড়েন হাজী সাহেব।' আর তখন হাজী সাহেব চিৎকার করে তাঁর মাকে ডাকতে লাগলেন।

'ও মাইজি গো, ও মাইজি গো।' কতকাল আগে হয়তো এই মহিলা মারা

গেছেন। সেই মহিলাটিকে হাজী সাহেব হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন। আজ রাইফেলের কালো নলের সামনে দাঁড়িয়ে আবার তাঁর কথা মনে পড়ল। আল্লাহ্‌র নাম চাপা পড়ে গেল। এক অখ্যাত গ্রাম্য মহিলা এসে দাঁড়ালেন সেখানে।

আমি পিছিয়ে পড়েছিলাম। আনিস বলল, 'রাইফেলটা আমার কাছে দিন, হুমায়ূন ভাই।' আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। জাফর এবং হাসান আলি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের উঁচু সড়কে উঠে পড়েছে। বেশ কিছু দূর এগিয়ে রয়েছে তারা। দ্রুত পা চালাচ্ছি। উঁচু সড়কে উঠে পড়তে পারলে হাঁটা অনেক সহজ হবে। পরিষ্কার রাস্তা, জল–কাদা নেই। এখান থেকেই আমরা সরাসরি গ্রামের ভেতর দিয়ে চলব। আমি উঠে আসতেই মজিদ বলল, 'জোঁক ধরেছে নাকি দেখেন ভালো করে।' আনিসের পা থেকে তিনটি জোঁক সরান হয়েছে। একটা রক্ত খেয়ে একেবারে কোলবালিশ হয়ে গিয়েছিল।

হাসান আলি টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পায়ে উপর ফেলতে লাগল। না, জোঁকটোক নেই। তবে শামুকে লেগে পা অল্প কেটেছে। জ্বালা করছে। মজিদ বলল, 'একটু রেস্ট নিই, মালগাড়ির মতো টায়ার্ড হয়ে গেছি। দেখি আনিস, একটা সিগারেট।'

আনিস সিগারেটের প্যাকেট খুলল। হাসান আলিও হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। সে আমাদের সামনে খাবে না, তাই একটু সরে গেল। আনিস বলল, 'আপনিও নিন একটা হুমায়ূন ভাই।' সিগারেট টানলে আমার জিভ জ্বালা করে। নিকোটিন জিভের উপর জমা হয় হয়তো। তবু নিলাম একটা। আমাদের এখন সাহস দরকার। আগুনের স্পর্শ সে সাহস দেবে হয়তো। দেয়াশলাই সবে জ্বালিয়েছি, অমনি বাঁশবনের অন্ধকার থেকে কুকুর ডাকতে লাগল। তার পরপরই একটি ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল, 'কেডা, ঐখানে কেডা? কতা কয় না লোকটা। কেডা গো?'

হারিকেন হাতে দু'–চার জন মানুষও বেরিয়ে এল। 'ও রমিজের বাপ, ও রমিজের বাপ' বলে চিকন কণ্ঠে তুমুল চিৎকার শুরু করল একটি মেয়ে। সবাই বড়ো ভয় পেয়েছে। এর মধ্যে অল্পবয়সী একটি শিশু তারস্বরে কাঁদতে শুরু করল। মজিদের উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল, 'ভয় নাই, আমরা।'

'তোমরা কেডা?'

'আমরা মুক্তিবাহিনীর লোক।'

কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের চারপাশে ভিড় জমে উঠল। হারিকেন হাতে ভয়কাতর লোকগুলি ঘিরে দাঁড়াল আমাদের। অস্পষ্ট আলোয় রাইফেলের কালো নল চিকচিক করছে। আমরা তাদের সামনে অষ্টম আশ্চর্যের মতো দাঁড়িয়ে আছি।

'মিয়া সাবরা এট্টু পান তামুক খাইবেন?'

'না। আপনারা এত রাতেও জাগা, কারণ কি?'

'বড়ো ডাকাইতের উপদ্রব। ঘুমাইতাম পারি না। জাইগা বইয়া থাকি।'

'এই দিকে মিলিটারি আসছিল?'

'জ্বি না। তয় রাজাকার আইছিল দুই বার। রমেশ মালাকাররে বাইন্ধা লইয়া গেছে। গয়লা পাড়া পুড়াইয়া দিছে।'

'রাজাকারদের কেউ খাতির যত্ন করেছিল নাকি?'

'জ্বি না, জ্বি না।'

'এই গ্রামের কেউ রাজাকারে নাম লেখাইছে?'

লোকগুলি চুপ করে রইল। জাফর ধমকে উঠল, 'বল ঠিক করে।'

'এক জন গেছে। কী করব মিয়া সাব, পেটে ভাত নাই। পুলাপানডি কান্দে।'

আমি বললাম, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে, চল হাঁটা দিই।'

আনিসের বোধহয় কিছু কথা বলবার ইচ্ছে ছিল। সে অপ্রসন্ন ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল।

আনিসের এই স্বভাব আমি লক্ষ করেছি। মানুষের সপ্রশংস চোখ তার ভারি প্রিয়। যখনি আমাদের ঘিরে কিছু কৌতূহলী মানুষ জড় হয়, তখনি সে খুব ব্যস্ত হয়ে এল এম জি র ব্যারেল নাড়তে থাকে বা খামকাই গুলীর কেসটা খুলে ফেলে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে এমন একটা ভঙ্গি করে, যেন ভারি বিরক্ত হয়েছে। বক্তৃতা দিতেও তার খুব উৎসাহ। দেশের এই দুর্দিনে আমাদের কী করা উচিত, এ সম্বন্ধে তার সারগর্ভ ভাষণ তৈরী। টেপ রেকর্ডারের মতো--চালু করে দিলেই হল। 'গ্রামে গ্রামে প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করতে হবে। চোর, ডাকাত, দালাল নির্মূল করতে হবে। দখলদার বাহিনীকে দাঁত-ভাঙা জবাব দিতে হবে।' ইত্যাদি ইত্যাদি। বক্তৃতা শেষে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বিকট সুরে চেঁচিয়ে ওঠে-'জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু!'

আনিস ছেলেটিকে আমি খুব পছন্দ করি। চমৎকার ছেলে, একটু পাগলাটে। অপারেশনের সময় সব বিচারবুদ্ধি খুইয়ে বসে। গুলী ছোঁড়ে এলোপাথাড়ি। পেছনে সরতে বললে ক্রল করে সামনে এগিয়ে যায়। সামনে এগুতে বললে আচমকা পেছন দিকে দৌড় মেরে বসে।

মেথিকান্দায় প্রথম অপারেশনে গিয়েছি। আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে, একেবারে ফাঁকা ক্যাম্প। চার জন পশ্চিম পাকিস্তানী রেঞ্জার আর গোটা পনের রাজাকার ছাড়া আর কেউ নেই। রাত দুটোয় অপারেশন শুরু হল। আমি আর সতীশ গর্তের মতো একটা জায়গায় পজিশন নিয়েছি। বেশ বড়ো দল আমাদের। সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছি। দলের নেতা হচ্ছেন আবু ভাই। কথা আছে পশ্চিম দিক থেকে আবু ভাই প্রথম গুলী চালাতে শুরু করবেন, তার পরই মাথা নিচু করে খালের ভেতর দিয়ে চলে আসবেন আমাদের কাছে। আমরা সবাই পূর্ব দিকে বসে আছি। আনিস আর রমজান উত্তরে একটা মাটির টিবির আড়ালে চমৎকার পজিশন নিয়েছে। রমজান খুব ভালো মেশিনগানার। বসে আছি তো আছিই, আবু ভাইয়ের গুলী করার কোনো লক্ষণই দেখি না। সবাই অধৈর্য হয়ে উঠেছি। আচমকা আমাদের

উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলীবর্ষণ হতে লাগল। আমরা হতবুদ্ধি। অবশ্যি সবারই পজিশন ভালো। গায়ে গুলী লাগবার প্রশ্নই ওঠে না। তবু একদল ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল আর তার পরই মর্টারে গোলাবর্ষণ হতে লাগল। আমাদের দিকে সবাই চুপচাপ। হতভম্ভ হয়ে গিয়েছি। রমজান মিয়া এই সময় উঁচু গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কেউ ভয় পাবেন না, কেউ ভয় পাবেন না।'

তার পরই রমজান মিয়ার মেশিনগানের ক্যাটক্যাট শব্দ শোনা যেতে লাগল। সতীশকে বললাম, 'শুরু কর দেখি, আল্লাহ্ ভরসা।' আর তখনি মর্টারের গোলা এসে পড়ল। বারুদের গন্ধ ও ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ধোঁয়া পরিষ্কার হতেই দেখি আমি আনিসের কাঁধে শুয়ে। আনিস প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। সবাই যখন পালিয়েছে, সে তখন জীবন তুচ্ছ করে খোঁজ নিতে এসেছে আমার। মেথিকান্দার সেই যুদ্ধে আমাদের চার জন ছেলে মারা গেল। রমজান মিয়ার মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হারালাম।

গুলী লেগে আবু ভাইয়ের ডান হাতের দুটি আঙুল উড়ে গেল। আবু ভাই তারপর একেবারে ক্ষেপে গেলেন। পাঁচ দিন পরই আবার দল নিয়ে এলেন মেথিকান্দায়। সেবারও দ'ুটি ছেলে মারা গেল। তৃতীয় দফায় আবার এলেন। সেবারও তাই হল। মিলিটারিরা তত দিনে মেথিকান্দাকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিয়েছে। চারিদিকে বড়ো বড়ো বাঙ্কার, রাত-দিন কড়া পাহারা। গুজব রটে গেল, মেথিকান্দা মুক্তিবাহিনীর মৃত্যুকূপ। সতীশ বলত, 'যদি বলেন তাহলে গভর্ণর হাউসে বোমা মেরে আসব, কিন্তু মেথিকান্দায় যাব না, ওরে বাপ রে।'

কিন্তু আবু ভাইয়ের মুখে অন্য কথা, 'মেথিকান্দা আমিই কব্জা করব। যদি না পারি, তাহলে গু খাই।' চতুর্থ বারের মতো তিনি বিরাট দল নিয়ে গেলেন সেখানে। সবাই ফিরল, আবু ভাই ফিরলেন না।

পঞ্চম বারের মতো যাচ্ছি আমরা। আমার কি ভয় লাগছে নাকি? 'ছিঃ হুমায়ূন ছিঃ, একটির পর একটি জায়গা তোমাদের দখলে চলে আসছে, মেথিকান্দায় ঘাঁটি করে এক বার যদি সোনারদির রেলওয়ে ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে বিরাট একটা অংশ তোমাদের হয়ে যাবে। আর এত ভয় পাওয়ারই-বা কী? মৃত্যুকে এত ভয় পেলে চলে?' একটা গল্প আছে না--এক নাবিককে এক জন সংসারী লোক জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বাবা কোথায় মারা গেছিলেন?'

'তিনি নাবিক ছিলেন। সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়ে মরেছেন।'

'আর আপনার দাদা?'

'তিনিও ছিলেন নাবিক। মরেছেন জাহাজডুবিতে।'

সংসারী লোকটি আঁৎকে উঠে বলল, 'কী সর্বনাশ। আপনিও তো মশাই নাবিক। আপনিও তো জাহাজডুবি হয়ে মরবেন!'

নাবিকটি বলল, 'তা হয়তো মরব। কিন্তু নাবিক না হয়েও আপনার দাদা

বিছানায় শুয়ে মরেছেন, ঠিক নয় কি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বাবাও বিছানাতেই মরেছেন, নয় কি?'

'হ্যাঁ, হাসপাতালে!'

'আপনিও সেইভাবেই মরবেন। তাহলে বেশ–কমটা হল কোথায়?'

আসল কথা, আমার ভয় লাগছে। সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করছি। ভয় পাওয়াতে লজ্জার কিছু আছে কি? আমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, এই মনে করে গুনগুন করে গান গাইতে চেষ্টা করলাম--'সেদিন দুজনে⋯'। শিস দিয়ে আমি বেশ ভালো সুর তুলতে পারি। কিন্তু গান গাইতে গেলেই চিত্তির। জরী বলে, 'তোমার মীড়গুলি খুব ভালো আসে, আর কিছুই হয় না।' কি জানি বাবা, মীড় কাকে বলে। আমি এত সব জানি না। আমি তো তোর মতো বিখ্যাত শিল্পী নই, গান নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথাও নেই। বাথরুমে গোসল করতে করতে একটু গুনগুন করতে পারলেই হল।

জাফরটা ভীষণ গান–পাগল। যেই গুনগুন করে একটু সুর ধরেছি, অমনি সে পিছিয়ে পড়েছে। এখন সে আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটবে। জাফর যাতে ভালোমতো শুনতে পায়, সেই জন্যে আরেকটু উঁচু গলায় গাইতে শুরু করলাম। আমার গুনগুন শুনেই এই? জরীর গান শুনলে তো আর হুঁশ থাকবে না। জাফরকে এক দিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'গান গায় যে কানিজ আহমেদ, তার নাম শুনেছ?' সে চমকে উঠে বলল, 'নজরুল–গীতি গান যিনি, তাঁর কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'খুব শুনেছি। আপনি চেনেন নাকি?

আমি সে–কথা এড়িয়ে গিয়েছি। যুদ্ধটুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে জাফরকে এক দিন বাসায় নিয়ে যাব। জরীকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দেব, 'এর নাম আবু জাফর শামসুদ্দীন। আমরা একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি।' আর জাফরকে হেসে বলব, 'জাফর, এর নাম হল জরী। আমার ছোট বোন। তুমি চিনলে-চিনতেও পার, গানটান গায়, কানিজ আহমেদ। শুনেছ হয়তো।'

জাফর নিশ্চয়ই চোখ বড়ো করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবে। সেই দৃশ্যটি আমার বড়ো দেখতে ইচ্ছে করছে। তা ছাড়া আমার মনে একটি গোপন বাসনা আছে। জরীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব জাফরের। যুদ্ধের মধ্যে যে–পরিচয়, তার চেয়ে খাঁটি পরিচয় আর কী হতে পারে? জাফরকে আমি ভালোভাবেই চিনেছি।

কিন্তু জরীর কি পছন্দ হবে? বড়ো খুঁতখুঁতে মেয়ে। সমালোচনা করা তার স্বভাব। কেউ হয়তো বাসায় গিয়েছে আমার খোঁজে, জরী আমাকে এসে বলবে, 'দাদা, তোমার এক জন চ্যাপ্টা মতো বন্ধু এসেছে।' অরুণকে সে বলত কাৎলা মাছ। অরুণ রেগে গিয়ে বলেছিল, 'কাৎলা মাছের কী দেখলে আমার মধ্যে?' জরী

সহজভাবে বলেছে, 'তোমার মাথাটা শরীরের তুলনায় বড়ো তো, এই জন্যে। আচ্ছা, রাগ করলে আর বলব না।' আদর দিয়ে-দিয়ে মা জরীর মাথাটি খেয়ে বসে আছেন। অল্প বয়সেই অহংকারী আর আহ্লাদী হয়ে উঠেছে।

কে জানে এর মধ্যে বিয়েই হয়ে গেছে হয়তো। অনেক দিন তাদের কোনো খবর পাই না। শুনেছি বাবা আবার ঢাকা ফিরে এসেছেন। ওকালতি শুরুর চেষ্টা করছেন। দেশে এখন কি আর মামলা-মোকদ্দমা আছে? টাকা-পয়সা রোজগার করতে পারছেন কিনা কে জানে।

ঢাকার অবস্থা নাকি সম্পূর্ণ অন্য রকম। কিছু চেনা যায় না। ইউনিভার্সিটি পাড়া খাঁ-খাঁ করে। দুপুরের পর রাস্তাঘাট নিঝঝুম হয়ে যায়। ঢাকায় বড়ো যেতে ইচ্ছে করে। কত দিন ঢাকায় যাওয়া হয় না। আবার কি কখনো এ-রকম হবে যে নির্ভয়ে ঢাকার রাস্তায় হেঁটে বেড়াব। সেকেণ্ড শো সিনেমা দেখে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে বসে চা খেয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরব।

সলিল কিছু দিন আগে গিয়েছিল ঢাকায়। অনেক গল্প শুনলাম তার কাছে। খুব নাকি বিয়ে হচ্ছে সেখানে। বয়স্থা মেয়েদের সবাই ঝটপট বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। ঘরে রাখতে সাহস পাচ্ছে না। হতেও পারে। সলিল অবশ্যি বেশি কথা বলে, তবুও বিয়ে কি আর হচ্ছে না? বিয়ে হচ্ছে। নতুন শিশুরা জন্মাচ্ছে। মানুষজন হাট-বাজার করছে। জীবন হচ্ছে বহতা নদী।

একি! আবু ভাইয়ের মতো ফিলসফি শুরু করলাম দেখি। আবু ভাই কথায় কথায় হাসাতেন, আবার তার ফাঁকে ফাঁকে এত সহজভাবে এমন সব সিরিয়াস কথা বলে যেতেন--আশ্চর্য। আবু ভাই তাঁর অসংখ্য ভক্ত রেখে গেছেন, যারা তাঁকে দীর্ঘ দিন মনে রাখবে। এই-বা কম কী?

এক দিন হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলেন আবু ভাই। দারুণ খুশি-খুশি চেহারা। মাথার লম্বা চুল ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হুমায়ূন, গুড নিউজ আছে। মিষ্টি খেতে চাও কিনা বল।'

'চাই চাই।'

'ভেরি গুড নিউজটা পরশু শোনাব। মিষ্টি যোগাড় করি আগে, তার পর। পরশু সন্ধ্যায় সবাইকে মিষ্টি খাওয়াব।'

সেই গুড নিউজটি শোনা হয় নি। দারুণ ব্যস্ততা শুরু হল হঠাৎ। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লাম সবাই। এবং সবশেষে আবু ভাই গেলেন মেথিকান্দা।

আবু ভাইয়ের লাশ হাসান আলি বয়ে এনেছিল। বিশেষ কোনো কথাবার্তা বলে নি। হাউমাউ করে কাঁদেও নি। অথচ সবাই সেদিন বুঝেছিলাম, হাসান আলির মন ভেঙে গেছে।

মজিদ ডাকল, 'পা চালিয়ে হুমায়ূন ভাই, আপনি বারবার পিছিয়ে পড়ছেন।' হাসান আলি দেখি হনহন করে এগিয়ে চলছে। এত চুপচাপ থাকে কেন লোকটা?

হাসান আলি

চেয়ারম্যান সাব কইলেন, 'হাসান আলি রাজাকার হইয়া পড়। সত্তুর টাকা মাসমাইনা, তার সাথে খোরাকি আর কাপড়।'

চেয়ারম্যান সাব আমার বাপের চেয়ে বেশি। নেকবক্ত পরহেজগার লোক। তাঁর ঘরের খাইয়া এত বড়ো হইলাম। আমার চামড়া দিয়া চেয়ারম্যান সাহেবের জুতা বানাইলেও ঋণ শোধ হয় না। তাঁর কথা ফেলতে পারি না। রাজাকার হইলাম।

জুম্মাবাদ চেয়ারম্যান সাব আর তাঁর বিবিরে কদমবুসি কইরা গাঁটরি মাথায় লইলাম। চেয়ারম্যান সাব কইলেন, 'আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ হাসান আলি, আল্লাহ্ নেকবান। সাচ্চা দিলে কাম করবা। হালাল পয়সা খাইবা।'

যাওনের আগে মসজিদে গেলাম দোওয়া মাঙতে। গিয়া দেখি মাবুদে এলাহি--মসজিদের মাথার উপর শকুন বইয়া আছে। দুই কুড়ির উপরে বয়স আমার, এত বড়ো শকুন দেখি নাই। মনডা বড়ো টানল। বুকের মধ্যে ছ্যাৎ কইরা উঠল।

আরো একবার মসজিদের উপরে শকুন বইছিল। আমি তখন ছোড। চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়িতে গরু-রাখালের কাম করি। বাপজান কইলেন, 'হাছান, শকুন বইছে মসজিদে। বড়ো খারাপ নিশানা। কেয়ামত নজদিক। বালা-মুসিবত আইব।' বাপজানের কথা মিছা হয় নাই। কলেরায় দেশটা সাফা হইয়া গেল।

মসজিদে মওলানা সাব কইলেন, 'হাসান, তুমি রাজাকার হইতাছ শুনলাম।'

'হ মৌলানা সাব। দোওয়া মাঙতে আইছি।'

'বালা করছ। পাকিস্তানের খেদমত কর। কিন্তু হাসান আলি একটা কথা।'

'কী কথা মৌলানা সাব--'

'শুনতাছি রাজাকার বড়ো অত্যাচার করে। মানুষ মারে, লুটপাট করে, ঘর জ্বালায়। দেইখ বাবা, সাবধান। আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি হইবা। আখেরাতে নবীজীর শেফায়ত পাইবা না।'

মনডা খারাপ হইল। কামডা বোধহয় ভুল হইল। তখনও আমরার গ্রামের মধ্যে রাজাকার-দল হয় নাই। আমরা হইলাম পরথম দল। সাত দিন হইল ট্রেনিং। লেফট রাইট, লেফট রাইট। বন্দুক সাফ করণের কায়দা শিখলাম, গুলী চালাইতে শিখলাম। 'বায়োনেট চারজ' করতে শিখলাম। মিলিটারিরা যত্ন কইরা সব শিখাইল। তারা সব সময় কইত 'তুম সাচ্চা পাকিস্তানী, মুক্তিবাহিনী একদম সাফা কর দো।' মনডার মধ্যে শান্তি পাই না। বুকটা কান্দে। রাইতে ঘুম হয় না। আমরার সাথে ছিল রাধানগরের কেরামত মওলা। সে আছিল রাজাকার কমাণ্ডার। আহা, ফেরেস্তার মতো আদমি। আর মারফতি গান যখন গাইত, চউক্ষে পানি রাখন যাইত না। মাঝেমধ্যেই কেরামত ভাইয়ের গান শুনতাম--

" ও মনা
দেহের ভিতরে অচিন পাখি অচিন সুরে গায়
তার নাগল পাওয়া দায়"

যখন হিন্দুর ঘরে আগুন দেওয়া শুরু হইল, কেরামত ভাই কইলেন, 'এইটা কী কাণ্ড! কোনো দোষ নাই, কিচ্ছু নাই--ঘরে কেন আগুন দিমু?' ওস্তাদজী কইলেন--'ও তো ইন্দু হ্যায়, গাদ্দার হ্যায়।'

কেরামত ভাইয়ের সাহসের সীমা নাই। বুক ফুলাইয়া কইল, 'আগুন নেই দেঙ্গা।'

ওস্তাদজী কইলেন, 'আও হামারা সাথ।' কেরামত ভাই গেলেন। দুই দিন পরে তার লাশ নদীতে ভাইস্যা উঠল। ইয়া মাবুদে এলাহি, ইয়া পরওয়ার দেগার, কী দেখলাম, কী দেখলাম! মাথা একেবারে বেঠিক হইয়া গেল। মিলিটারি যা করে, তাই করি। নিজের হাতে আগুন লাগাইলাম সতীশ পালের বাড়ি, কানু চক্রবর্তীর বাড়ি, পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়ি। ইস, মনে উঠলেই কইলজাটা পুড়ায়।

শেষমেষ মিলিটারিরা শরাফত সাহেবের বড়ো পুলাডারে ধইরা আনল। আহা রে, কী কান্দন ছেলের! এখনো চউক্ষে ভাসে। বি. এ. পাশ দিয়া এম. এ. পড়ত। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমন আচারব্যাভার। ভদ্রলোকের ছেলে যেমন হওনের তেমন। এক দিন বাজারে বইয়া আছি। শরাফত সাহেবের পুলাডার সাথে দেখা। আমারে দেইকা কইল, 'হাছান ভাই, ভাল আছেন?' আমি একটা কামলা মানুষ। আমারে আপনে কওনের কী দরকার? কিন্তু সেই ছেলে শিক্ষিত হইলে কী হইব, মনডা ছিল ফিরিশতার। আহা রে, বন্দুকের সামনে দাঁড়াইয়া কেমন কালা হইয়া গেল চেহারাটা। আমি একটু দূরে খাড়াইয়া আল্লাহ্ রসুলের নাম নিতাছি। আমার মাথার গুণ্ডগোল হইয়া গেছে। কী করতাম ভাইব্যা পাই না। শেষকালে ছেলেডা আমার দিকে চাইয়া কইল, 'হাসান ভাই আমারে বাঁচান।' ক্যাপ্টেন সায়েবের পাও জড়াইয়া ধরলাম। লাভ হইল না। আহা রে, ভাই রে আমার। কইলজাডা পুড়ায়। আমি একটা কুত্তার বাচ্চা। কিছু করবার পারলাম না।

সইন্ধ্যা কালে শরাফত সায়েবের বাড়িত গিয়া দেখি, ঘরদোয়ার অন্ধকার। ছেলেডার মা একলা বইয়া আছে। তারে কেউ গুলীর খবর কয় নাই। আমারে দেইক্যা কইল, 'ও হাছান, আমার ছেলেডা বাঁইচ্চা আছে? আল্লাহ্‌র দোহাই--হাঁছা কথা কইবা।'

আমি তাঁর পা ছুইয়া কইলাম, 'আম্মাজি বাঁইচ্চা আছে, আপনে চাইরডা দানাপানি খান।'

সেই রাইতেই গেলাম মসজিদে। পাক কোরআন হাতে লইয়া কিরা কাটলাম। এর শোধ তুলবাম। এর শোধ না তুললে আমার নাম হাছান আলি না। এর শোধ না তুললে আমি বাপের পুলা না। এর শোধ না তুললে আমি বেজন্মা কুত্তা।

রাত্তিরে ক্যাম্পে ফিরতেই হাবিলদার সাব কইলেন পুর্বের বাঙ্কারে একটা লাশ পইড়া আছে, আমি যেন নদীর মধ্যে ফ্যালাইয়া দিয়া আসি।

কী সর্বনাশের কথা। ইয়া মাবুদে এলাহি। গিয়া দেখি কবিরাজ চাচার ছোট মাইয়াটা। ফুলের মতো মাইয়া গো। বারো–তেরো বছর বয়স, ইয়া মাবুদ ইয়া মাবুদ। কাপড় দিয়া শইলডা ঢাইক্যা কইলাম, 'ভইন, মাপ করিস।' এইটা কি, চউক্ষে পানি আসে কেন? আরে পোড়া চউখ! এখন পানি ফালাইয়া কি লাভ? আগে তো দেখলি না। আগে তো আন্ধা হইয়া রইলি।

সাথের পুলাপানডির বড়ো পরিশ্রম হইতাছে। আল্লাহ্ আল্লাহ্ কইরা যদি রামদিয়া ঘাটে পৌছাইতে পারি, তয় রক্ষা। ইয়া মাবুদ, এই পুলাপানডিরে বাঁচাইয়া রাইখো গো। গরম পীরের দরগাত সিন্নি মানলাম। আমি তিন কালের বুড়া। আমি মরলে কী? এক চেয়ারম্যান সাব ছাড়া কেউ এক ফোঁটা চউক্ষের পানি ফালাইত না। মরণের পরে হাসরের মাঠে যদি কবিরাজ চাচার মাইয়ার সাথে দেখা হয়, তয় মাইয়ার হাত ধইরা কমু, 'ভইন, শোধ তুলছি। এখন কও তুমি আমারে মাফ দিছ কি দেও নাই।'

আবদুল মজিদ

এখন বাজছে একটা।

আর এক ঘন্টার মধ্যে কি রামদিয়া পৌছান যাবে? আমার মনে হয় না। হাসান আলিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কত দূর হাসান আলি?'

জানি জবাব দেবে না, তবু জিজ্ঞেস করেছি, কারণ এখান থেকে রামদিয়া কত দূর তা জানে শুধু হাসান আলি। ব্যাটা নবাবের নবাব, কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবে না। দেব নাকি রাইফেলের বাঁট দিয়ে একটা--?

খিদে যা পেয়েছে, বলবার নয়। মনে হচ্ছে এক গামলা ভাত খেয়ে ফেলতে পারি। সেবার তালুকদার সাহেবের বাসায় জবর খাইয়েছিল। হারামজাদা ভীতুর একশেষ। মুক্তিবাহিনী এসেছে শুনে ভয়ে পেচ্ছাব করে দেবার মতো অবস্থা। আরে ব্যাটা বলদ, তুই কি দালাল নাকি রে? তুই ভয় পাস কী জন্যে? সারাক্ষণ হাত জোড় করে হেঁ হেঁ হেঁ, কী বিশ্রী! তবে যাই হোক, খাইয়েছিল জবর। একেবারে এক নম্বর খানা। পোলাওটোলাও রেঁধে এলাহি কারবার। জিতা রাহ ব্যাটা।' কইমাছ ভাজার স্বাদ এখনো মুখে লেগে রয়েছে। আমাদের খাওয়ার কি আর ঠিক–ঠিকানা আছে? এক বার দু'দিন শুকনো রুটি খেয়ে থাকতে হল, সে রুটিও পয়সার মাল। আবু ভাই বলেছিলেন, 'খিদে পেলে শুধু খাওয়ার কথা মনে হয়। মহসিন হলে ফিস্ট হল এক বার। জনে জনে ফুল রোস্ট। সেই সঙ্গে কাবাব, রেজালা আর দৈ–মিষ্টি। খেয়ে কূল পাই না এমন অবস্থা। বাবুর্চি রাঁধত ফার্স্ট ক্লাস।'

পায়ের কাটাটা জানান দিচ্ছে। ভাঙা শামুকের এমন ধার! প্রথমে ভাবলাম সাপে কামড়াল বুঝি। বর্ষা-বাদলা হচ্ছে সাপের সীজন। এ অঞ্চলে আবার শামুকভাঙা-কেউটের ছড়াছড়ি। ছোবল মেরে শামুক ভেঙে খায়। রাত-বিরাতে এ-রকম একটা সাপের গায়ে পা দিতে পারলে মন্দ হয় না। বন্দুক নিয়ে তাহলে এ রকম আর ঘুরে বেড়াতে হয় না। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি যাকে বলে।

আমার আর ভালো লাগে না, সত্যি। কী হবে দু'-একটা টুশ-টাশ করে? মিলিটারি কমছে কই? বন্যার জলের মতো শুধু বাড়ছে। রাজাকার পয়দা হচ্ছে হু-হু করে। যে অবস্থা, এক-দিন দেখব আমরা কয় জন ছাড়া সবাই রাজাকার হয়ে বসে আছে। আর হবে নাই-বা কেন? প্রাণের ভয় নেই? রাজাকার হলে তাও প্রাণটা বাঁচে। তাছাড়া মাসের শেষে বাঁধা বেতন। লুটপাটের ঢালাও বন্দোবস্ত। দেখেশুনে মনে হয়, দূর শালা রাজাকার হয়ে যাই।

কী আবোল তাবোল ভাবছি! সোহরাব সাহেবের মতো মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি? সোহবার সাহেবকে দেখে কে বলবে, তার মাথাটা পুরো ফরটি-নাইন হয়ে বসে আছে। দিব্যি ভালো মানুষ, মাঝে মাঝে শুধু বলবে, 'ইস, গুলীটা শেষে কপালেই লাগল।'

দু' মাস ছিল বেচারা মুক্তিবাহিনীতে। সাহসী বেপরোয়া ছেলে। আমগাছ থেকে একবার মিলিটারি জীপে গ্রেনেড মেরে এক জন আর্টিলারি ক্যাপ্টেনই সাবাড় করে দিল। দারুণ ছেলে। এক দিন খবর পাওয়া গেল, কোন বাজারে গিয়ে নাকি ধুমসে দিশী মদ গিলে ভাম হয়ে পড়ে আছে। মদের ঝোঁকে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে আর বলছে, 'হায় হায়, ঠিক কপালে গুলী লেগেছে!' আবু ভাইয়ের হুকুমে জাফর গিয়ে খুব বানাল। দুই রদ্দা খেয়ে নেশা ছুটে গেল, কিন্তু ঐ কথাগুলি আর গেল না। রাতদিন বলত, 'ইস কী কাণ্ড, শেষ পর্যন্ত ঠিক কপালে গুলী!' ঘুম নেই খাওয়া নেই, শুধু এই বুলি। এখন কোথায় আছে কে জানে? চিকিৎসা হচ্ছে কি ঠিকমতো? আমার যদি এ-রকম হয় তবে তো বিপদের কথা।

'দাঁড়ান, সবাই দাঁড়ান।'

কে কথা বলে? হাসান আলি নাকি? ব্যাটা আবার হুকুম দিতে শুরু করল কবে থেকে? জায়গাটা ঘুপচি অন্ধকার, চারদিকে বুনো ঝোপঝাড়। পচা গোবরের দম আটকান গন্ধ আসছে। হুমায়ূন ভাই বললেন, 'কী হয়েছে হাসান আলি?'

'কিছু হয় নাই।'

কী হয়েছে তা নিজ চোখেই দেখতে পেলাম। আনিস লম্বালম্বি পড়ে রয়েছে মাটিতে। এত বড়ো একটা জোয়ান চোখের সামনে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল, আমি দেখতেও পেলাম না? কী আশ্চর্য! কী ভাবছিলাম আমি? হাসান আলি ধরাধরি করে তুলল আনিসকে। কাদায়পানিতে সারা শরীর মাখামাখি। হুমায়ূন ভাই অবাক হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে আনিস?'

'কি জানি, মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল।'

'দেখি তোমার হাত। আরে, এ যে ভীষণ জ্বর! কখন জ্বর উঠল?'

'কি জানি কখন।'

'আস, আশেপাশের কোনো বাড়িতে তোমাকে রেখে যাই।'

'আমি হাঁটতে পারব।'

'পারতে হবে না। মজিদ, তুমি ওর হাতটা ধর।'

গায়ে হাত দিয়ে দেখি, সত্যি গা পুড়ে যাচ্ছে। ব্যাটা বলদ, বলবি তো শরীর খারাপ।

হাসান আলি বলল, 'সামনেই মুক্তার সাহেবের বাড়ি। আসেন, সেই বাড়িতেই উঠি।'

জাফর বলল, 'কত দূর হে সেটা?'

'কাছেই, এক-পোয়া মাইল। জুম্মাঘরের দক্ষিণে।'

হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে যায়; জুম্মাঘরও আসে না, এক-পোয়া মাইলেরও ফুরাবার নাম নেই। যতই জিজ্ঞেস করি, 'কত দূর হাসান আলি?' হাসান আলি বলে, 'ঐ যে দেখা যায়।'

মোক্তার সাহেবের বাড়িটি প্রকাণ্ড। গরিব গ্রামের মধ্যে বাড়ির বিশালত্ব চট করে চোখে পড়ে। বাড়ির সামনে প্রশস্ত পুকুর। তার চার পাশে সারি-বাঁধা তালগাছ। আমরা বাড়ির উঠোনে দাঁড়াতেই রাজ্যের কুকুর ঘেউ ঘেউ শুরু করল। কী ঝামেলা রে বাবা! বাড়ির ভেতর থেকে কেউ এক জন পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল, 'আসগর মিয়া, আসগর মিয়া, ও আসগর মিয়া।'

জাফর তার স্বাভাবসুলভ উঁচু গলায় ডাকল, 'বাড়িতে কে আছেন? দরজা খোলেন।'

হঠাৎ করে বাড়ির সব শব্দ থেমে গেল। আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। জাফর আবার বলল, 'ভয় নাই, আমরা মুক্তিবাহিনীর লোক।' তাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। শেষ পর্যন্ত হাসান আলি বলল, 'গনি চাচা, আমি হাসান।' তখনি খুট করে দরজা খুলে গেল। একটি ভয়-পাওয়া মুখ বেরিয়ে এল হারিকেন হাতে।

হাসান আলির কারবার দেখে গা জ্বলে যায়। তার গলা শুনলে যখন দরজা খুলে দেয়, তখন গলাটা একটু আগে শোনালেই হয়। জাফর বলল, 'বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না। এই ছেলেটার শোওয়ার বন্দোবস্ত করেন। আমাদের ভাত খাওয়াতে পারবেন?'

'জ্বি জি, নিশ্চয়ই পারব।'

'আপনার নাম কি?'

'গনি। আব্দুল গনি।'

'ডাক্তার আছে এদিকে?'

'আছে, হোমিওপ্যাথ।'

'দুত্তোরি হোমিওপ্যাথ।'

গনি সাহেব ছাড়া আরো দু' জন লোক জড়ো হয়েছে। তারা চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছে। আনিস তোষকহীন একটি চৌকিতে শুয়ে পড়েছে। গনি সাহেব বললেন, 'কী হয়েছে ওনার? গুলী লেগেছে নাকি?'

'না। আপনি ভেতরে গিয়ে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।'

'জ্বি জ্বি।'

বুড়ো ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে গেলেন। দেখতে-দেখতে বাড়ি জেগে উঠল। কত রকম ধ্বনি শোনা যাচ্ছে--'আমিনা আমিনা' 'হারিকেনটা কই?' 'দূর ধুমসী, ঘুমায় কি!'

ভাগ্য ভালো, বাড়িটি এক পাশে। পাড়ার লোক সেই কারণেই ভেঙে পড়ল না। গনি সাহেব একধামা মুড়ি আর গুড় দিয়ে গেলেন। বললেন, 'অল্পক্ষণের মধ্যেই রান্না হবে।' আনিসকে তুলতে গিয়ে দেখি সে অচৈতন্য। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে।

আনিসের শরীর যে এতটা খারাপ, ধারণা করি নি। নৌকায় ওঠার সময় অবশ্যি এক বার বলেছিল বমি বমি লাগছে। কিন্তু এ রকম অসুস্থ হয়ে পড়বে, কে ভেবেছিল? আনিসটা মেয়েমানুষের মতো চাপা।

দেখতে পাচ্ছি, আনিসকে নিয়ে ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। হাসান আলি পানি ঢালছে মাথায়। জাফর প্রবল বেগে হাতের তালুতে গরম তেল মালিশ করছে। বাড়ির কর্তা, মোক্তার সাহেব বিপন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। এতক্ষণ লক্ষ করি নি পেছন থেকে দেখলে মোক্তার সাহেবকে অনেকটা আমার বাবার মতো দেখায়। ঠিক সে-রকম ভরাট শরীর, প্রশস্ত কাঁধ। আশ্চর্য মিল!

আনিসের জ্ঞান ফিরল অল্পক্ষণেই এবং সে লজ্জিত হয়ে পড়ল। হুমায়ূন ভাই বললেন, 'নাও, দুধটা খাও আনিস।'

'দুধ লাগবে না, দুধ লাগবে না।'

'আহা খাও।'

আনিস বিব্রত মুখে দুধের গ্লাসে চুমুক দিল। আনিসকে কিম্ভুতকিমাকার দেখাচ্ছে। তার ভেজা মাথা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। মুখময় দাঁড়ি-গোঁফের জঙ্গল। তার মধ্যে সরু একটা নাক ঢাকা পড়ে আছে।

জাফর বলল, 'আনিস থাক এখানে।'

হুমায়ুন ভাই বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

রাত দুটো বাজতে বেশি দেরি নেই। রামদিয়ায় আমাদের জন্যে টুনু মিয়ার দল অপেক্ষা করছে। হুমায়ূন ভাই বললেন, 'আনিস, কয়টা বাজে দেখ তো।'

'একটা পঁয়ত্রিশ।'

'বল কী!'

'মোক্তার সাহেব, রামদিয়া কত দূর এখান থেকে?'

'দূর না। দশ মিনিটের পথ।'

হাসান আলি বলল, 'দুইটার আগে পৌছাইয়া দিমু।' ভুলেই গিয়েছিলাম যে হাসান আলির মতো এক জন করিৎকর্মা লোক আছে আমাদের সঙ্গে। সে নাকি যা বলে, তাই করে। প্রমাণ তো দেখতেই পাচ্ছি।

বাড়ির ভেতরে রান্নাবান্না শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছি। চিকণ গলায় কে এক জন মেয়ে ঘনঘন ডাকছে--'ও হালিমা, ও হালিমা।' সেইসঙ্গে দমকা হাসির আওয়াজ। একটা উৎসব উৎসব ভাব। বেশ লাগছে।

সেরেছে! আনিস দেখি বমি করছে! ব্যাপার কি? চোখ হয়েছে টকটকে লাল। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘনঘন। মরেটরে যাবে না তো আবার? দুত্তোরি, কি শুধু আজেবাজে কথা ভাবছি। বুঝতে পারছি, অতিরিক্ত পরিশ্রম আর মানসিক দুশ্চিন্তায় এ রকম হয়েছে। আজ রাতটা রেস্ট নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। একটি ছেলে পাখা করছে আনিসের মাথায়। খুব বাহারে পাখা দেখি। চারিদিকে রঙিন কাপড়ের ঝালর।

জাফরও শুয়েছে লম্বা হয়ে। জাফরের শোওয়া মানেই ঘুম। ঘুম তার সাধা, কোনোমতে বিছানায় মাথাটি রাখতে পারলেই হল। ভাত রান্না হতে-হতে সে তার সেকেণ্ড রাউণ্ড ঘুম সেরে ফেলবে। ফার্স্ট রাউণ্ড তো নৌকাতেই সেরেছে। জাফরের ঘুম আবার সুরেলা। ফুরুৎ ফুরুৎ করে নাক ডাকবে। এই কথা বলেছিলাম বলে এক দিন কী রাগ। মারতে আসে আমাকে। বেশ লোক দেখি তুমি! ফুরুৎ ফুরুৎ করে নাক ডাকতে পারবে, আর আমরা বলতেও পারব না? করলে দোষ নয়, বললে দোষ?

ঠিক আমার বাবার মতো। রাত-দিন কারণে-অকারণে চেঁচাচ্ছেন, আর সেও কি চেঁচানি! রাস্তার মোড় থেকে শুনে লোকে খবর নিতে আসে বাসায় কী হয়েছে। মা এক দিন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী রাত-দিন চেঁচাও!' অমনি বাবার রাগ ধরে গেল। ঘাড়টাড় ফুলিয়ে বিকট চিৎকার, 'কী, আমি চেঁচাই?'

মা সহজ সুরে বললেন, 'এখন কী করছ, চেঁচাচ্ছ না?'

'চুপ রাও। একদম চুপ।'

বাবার কথা মনে হলেই এই হাসির কথাটা মনে পড়ে। এমন সব ছেলেমানুষী ছিল তাঁর মধ্যে। এক বার খেয়াল হল, আমাদের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন সীতাকুণ্ড তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি। দু' মাস ধরে চলল আয়োজন। বাবার ব্যস্ততার সীমা নেই। যাবার দিন এক ঘন্টা আগে স্টেশনে নিয়ে গেলেন সবাইকে, আর সে কি চেঁচানি, 'এটা ফেলে এসেছ ওটা ফেলে এসেছ।' ট্রেন এল, সবাই উঠলাম। পাহাড়প্রমাণ মাল তোলা হল। একসময় ট্রেন ছেড়ে দিল, দেখা গেল বাবা উঠতে পারেন নি। প্রাণপণে দৌড়াচ্ছেন। হাতের কাছে যে-কোনো একটা কামরায় উঠে

পড়লেই হয়, না--তা উঠবেন না। আমরা যে কামরায় উঠেছি, ঠিক সে-কামরায় ওঠা চাই। এক সময় দেখলাম, বাবা হোঁচট খেয়ে পড়েছেন। হুস-হুস করে তাঁর চোখের সামনে দিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, মৃত মানুষরা কি মানুষের মনের কথা টের পায়? যদি পায়, তা হলে বাবা নিশ্চয়ই আমি কী ভাবছি বুঝতে পারছেন? আচ্ছা ধরা যাক, একটি লোককে সবাই মিলে ফাঁসি দিচ্ছে--তাহলে সেই হতভাগ্য লোকটির চোখে-মুখে কী ফুটে উঠবে? হতাশা, ঘৃণা, ভয়....আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি? নয়তো এ রকম অর্থহীন চিন্তা কেউ করে? ও কি, আনিস আবার বমি করছে নাকি? জোর করে দুধটা না খাওয়ালেই হ'ত!

মোক্তার সাহেব এসে চুপি চুপি কী বলছেন হুমায়ূন ভাইকে। কে জানে, এর মধ্যেই কী এমন গোপনীয় কথা তৈরী হয়েছে যা কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে হবে! আরে আরে, এই ব্যাপার! এটা আবার কানাকানি বলতে হবে নাকি? বললেই হয়, 'ভাত দেয়া হয়েছে, খেতে আসেন!' যত বেকুবের দল।

হাসান আলি বলল, 'তাড়াতাড়ি করেন, সময় নাই!' মাতব্বর কোথাকার [illegible] নেই--সেটা তোর কাছে জানতে হবে নাকি?

খেতে বসে দেখি খিদে মরে গেছে। তরকারিতে লবণ হয়েছে বেশি। [illegible] হয়েছে কাদার মতো নরম। চিবাতে হয় না, কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে ফেলা যায়। ভালো হল না মোটেই। জাফর বলল, 'হু নোজ, দিস মে বি আওয়ার লাস্ট মিল।' কথায় কথায় ইংরেজি বলা জাফরের স্বভাব। তার ধরনধারণও ইংরেজের মতো। এই মহা দুর্যোগেও ভোরবেলা উঠেই তার শেভ করা চাই। দুপুরে সাবান মেখে গোসল সারা চাই। দিনের মধ্যে দশ বার চিরুনির ব্যবহার হচ্ছে। রূপ যাদের আছে, তারাই রূপ-সচেতন হয়। এবং এত উলঙ্গভাবে হয় যে বড়ো চোখে লাগে।

আমাদের পাশের বাড়ির রেহানা দশ-এগারো বছর বয়স পর্যন্ত কী চমৎকার মেয়েই না ছিল, কিন্তু যেই তার বয়স তেরো পেরিয়ে গেল, যেই সে বুঝল তার চোখধাঁধান রূপ আছে, অমনি সে বদলে গেল। আহ্লাদী ধরনের টেনে টেনে কথা বলা--'ম-জি-দ ভা-ই', ঘন ঘন ভ্রূ কোঁচকান। জঘন্য, জঘন্য!

হুমায়ূন ভাই বোধহয় কোনো একটা রসিকতা করলেন। ভ্যাক ভ্যাক করে হাসছে সবাই। আমি অন্যমনস্ক ছিলাম বলে শুনতে পাই নি। এখন সবাই হাসছে, আমি মুখ কালো করে বসে আছি। নিশ্চয়ই বোকা-বোকা লাগছে আমাকে। কে জানে, রসিকতাটা হয়তো আমাকে নিয়েই। সবাই যে-ভাবে তাকাচ্ছে আমার দিকে, তাতে তাই মনে হয়। ও কি, হাসান আলিও হাসছে দেখি।

হাসো বাবা, হাসো। যত ইচ্ছে হাস। কিছুক্ষণ পরই যখন বমবম করে মর্টারের শেল ভাঙা শুরু হবে, তখন এত রস আর থাকবে না। কাজেই এই-ই হচ্ছে 'গোল্ডেন আওয়ার'।

'পান আনব। পান খাবেন?'

জিজ্ঞেস করল কে যেন। আমি মাথা নাড়লাম। পানটান লাগবে না রে বাবা। বিনা পানেই চলবে। মুড নেই। পান, সিগারেট, চা--এসব হচ্ছে মুডের ব্যাপার; মুড না থাকলে বিষের মতো লাগে।

হুমায়ূন ভাই বললেন, 'আমরা রওনা হচ্ছি। আনিস, তুমি থাক। ফেরবার পথে তোমাকে নিয়ে যাব।' তিনি তাহলে ফেরবার চিন্তাও করছেন! ভুলে গেছেন নাকি, মেথিকান্দা মুক্তিবাহিনীর মৃত্যুকূপ। আজ যাত্রা থেকেই অলক্ষণ শুরু হয়েছে। নৌকাও ছাড়ল, বৃষ্টিও নামল। হুমায়ূন ভাই একটা প্রচণ্ড উল্কাপাত দেখলেন। আনিস হয়ে পড়ল অসুস্থ। শেষটায় কী হবে কে জানে?

বড়ো অস্থির লাগছে। 'ইয়া মুকাদ্দেমু, ইয়া মুকাদ্দেমু, ইয়া মুকাদ্দেমু'--কে যেন বলেছিল যুদ্ধের সময় এই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো দোওয়া--যার অর্থ 'হে অগ্রসরকারী'। এই দোয়া পড়ে শুধু এগিয়ে যাওয়া।

না, বড়ো খারাপ লাগছে। ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে আর যাব না। সম্ভব হলে ফিরে যাব মৈমনসিংহ। কিন্তু গিয়ে করবটা কী? মা কোথায় আছেন কে জানে? বাবা বেচারা মরে বেঁচেছেন। কোনো দায়দায়িত্ব নেই। কিন্তু আমিই-বা কোন দায়িত্ববান সুপুত্রটি? বাবাকে ধরে নিয়ে গেল মিলিটারি, আমিও এলাম পালিয়ে, অথচ নিশ্চিত জানি মায়ের কোনো সহায়-সম্বল নেই। বোনগুলি বোকার বেহদ্দ। ফিরে গিয়ে হয়তো দেখব "অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট"। কেউ নেই, সব সাফ হয়ে গেছে। মন্দ হয় না খুব। বাঁধা-বন্ধনহীন বল্গাহারা জীবন। কী আনন্দ!

অবশ্যি এমনও হতে পারে দেশ স্বাধীন হবে। আমি মৈমনসিংহ ফিরে যাব। বাবাকে হয়তো তারা প্রাণে মারে নি, তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন। আবার আমরা সীতাকুণ্ড যাব। পাহাড়প্রমাণ জিনিসপত্র তোলা হবে ট্রেনে। একসময় ট্রেন ছেড়ে দেবে, দেখব বাবা প্রাণপণে দৌড়াচ্ছেন। আহ্, চোখে জল আসে কেন?

'মোক্তার সাহেব, দোওয়া রাখবেন। খোদা হাফেজ, আনিস।'

'খোদা হাফেজ। খোদা হাফেজ।'

আনিস সাবেত

আমার মন বলছে আজকের যুদ্ধে হুমায়ূন ভাই মারা যাবেন। নৌকার ছাদে বসে তিনি যখন আপন মনে গুনগুন করছিলেন, তখনি আমার এ কথাটা মনে হয়েছে। কিছুক্ষণ পর তিনি নেমে এসে বললেন, 'অনেকগুলি উল্কাপাত হল। একটা তো প্রকাণ্ড।' তখনি আমি নিশ্চিত হয়েছি। আমার মনের মধ্যে যে-কথাটি ওঠে, তাই সত্যি হয়। এ আমি অনেক বার দেখেছি।

সেবার স্বরূপহাটির রেলওয়ে কালভার্ট ওড়াতে গিয়েছি--আমি, রহমান আর ওয়াহেদ। রহমানের আবার খুব চায়ের নেশা। খুঁজে-খুঁজে চায়ের দোকানও একটা

বের করেছে। বিস্বাদ তেতো চা--তাতে চুমুক দিয়ে রহমান চেঁচিয়ে উঠল, 'ফার্স্ট ক্লাস চা।' আর তখনি কেন জানি আমার মনে হল, রহমানের কিছু-একটা হবে। হলও তাই। হুমায়ূন ভাইয়ের বেলাও কি তাই হবে?

হুমায়ূন ভাইয়ের *ঢাকার বাসার ঠিকানা আছে আমার কাছে।* ১০/৭ বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-৭। দোতলায় থাকেন তাঁর বাবা-মা। যদি সত্যি কিছু হয়, তাহলে এই ঠিকানায় খবর দিতে আমি নিজেই যাব। তাঁর মা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন তাঁর ছেলে কী ভাবে থাকত, কী করত। সব বলব আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তাঁরা হয়তো ছেলে কোথায় মারা গেছে, দেখতে চাইবেন। আমি নিজেই তাঁদের নিয়ে আসব। আমরা আজ যে-পথে এসেছি, সেই পথেই আনব। বলব, 'রাতটা ছিল অন্ধকার। নক্ষত্রের আলোয় আলোয় এসেছি। পথে মোক্তার সাহেবের বাড়িতে ভাত খেয়েছি।' হুমায়ূন ভাইয়ের মা হয়তো মোক্তার সাহেবকে দেখতে চাইবেন। মোক্তার সাহেবকে হয়তো তিনি বলবেন, 'আপনি আমার ছেলেকে শেষ বারের মতো ভাত খাইয়েছেন। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুক।'

'ক্যান কান্দেন?'

আমাকে যে-ছেলেটি বাতাস করছিল, সে অবাক হয়ে আমার কাঁদবার কারণ জানতে চাইছে। ইচ্ছে করে কি আর কাঁদছি? হঠাৎ চোখে জল এল।

'মাথার মধ্যে পানি দিবেন একটু?'

'না।'

'মাথাটা টিপা দিমু?'

'না-না।'

সে দেখি আমার সেবা না-করে ছাড়বে না। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি তো দিব্যি আরাম করে শুয়ে আছি। আর ওরা নিশ্চয়ই কাদা ভেঙে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। রামদিয়া থেকে আরো দু' মাইল উত্তরে মেথিকান্দা। সেখানে তারা হাঁটা-পথে যাবে, না নৌকায়?

টুনু মিয়ার দলে মোট কত জন ছেলে আছে? হুমায়ূন ভাই এক বার বলেছিলেন, কিন্তু এখন দেখি ভুলে বসে আছি। ওদের সাথে দু' ইঞ্চি মর্টারও আছে। মেথিকান্দা আজ নিশ্চয়ই দখল হবে। সুজনতলির রেলওয়ে পুলও উড়িয়ে দেওয়া হবে। সমস্ত অঞ্চলটা বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে স্বাধীন বাংলার ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দেব। ফাইন। কে জানে, এত গোলমালে কেউ কি আর জাতীয় পতাকার কথাটা মনে রাখবে? স্থানীয় লোকজনের কাছে নিশ্চয়ই স্বাধীন বাংলার ফ্ল্যাগ পাওয়া যাবে। আগে তো ঘরে ঘরে ছিল। মিলিটারি আসবার পর সবাই হয় পুড়িয়ে ফেলেছে, নয়তো এমন জায়গায় লুকিয়েছে যে ইঁদুরে খেয়ে গিয়েছে। এমন দিনে একটা ঝকঝকে নতুন ফ্ল্যাগ চাই।

এত দিন শুধু ছোটখাটো হামলা করেছি। বিভিন্ন থানায় ছোটখাটো খণ্ডযুদ্ধের

পর রাতারাতি সরে এসেছি নিরাপদ স্থানে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যতিব্যস্ত করে রাখা। মুহূর্তের জন্যেও যেন শান্তির ঘুম না দিতে পারে। কিন্তু আজকের ব্যাপার অন্য। আজ আমরা খুঁটি গেড়ে বসব। আহা, আবার চোখে জল আসে কেন?

পর্দার আড়াল থেকে সুশ্রী একটি মেয়ে উঁকি দিয়ে আমায় দেখে গেল। বেশ মেয়েটি। ইচ্ছে হচ্ছিল ডেকে কথা বলি। কিন্তু ইচ্ছাটা গিলে ফেলতে হল। এ বাড়িতে কিছু সময় থাকতে হবে আমাকে। এ সময় এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে এ বাড়ির লোকজন বিরক্ত হয়।

'স্লামালিকুম।'

'অলায়কুম সালাম।'

'আমি গনি মিয়ার চাচাত ভাই। উত্তরের বাড়িতে থাকি। মিয়া সাহেবের শরীলডা এখন কেমুন?'

'ভালো।'

শুধু গনি মিয়ার চাচাত ভাই-ই নয়, আরো অনেকেই জড়ো হয়েছে। সম্ভবত আরো লোকজন আসছে। আমার বিরক্ত লাগছে, আবার ভালোও লাগছে। বিরক্ত লাগছে কথা বলতে হচ্ছে বলে, ভালো লাগছে লোকজনদের কৌতূহলী চোখ দেখে। তোমরা তাহলে শেষ পর্যন্ত কৌতূহলী হয়েছ? দেখতে এসেছ মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের? বেশ বেশ।

ইস, কী দিনই না গিয়েছে শুরুতে। গ্রামবাসী দল বেঁধে মুক্তিবাহিনী তাড়া করেছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে। অবশ্যি তাদেরই-বা দোষ দিই কী করে? মিলিটারি রয়েছে ওঁৎ পেতে। যেই শুনেছে অমুক গ্রামে মুক্তিবাহিনী ঘোরাফেরা করছে, হুকুম হল--'দাও ঐ গ্রাম জ্বালিয়ে।' যেই শুনেছে অমুক লোকের বাড়ি মুক্তিবাহিনী এক রাত্রি ছিল, অমনি হুকুম হল, 'অমুক লোককে গুলী করে মার গ্রামের মধ্যিখানে, যাতে সবার শিক্ষা হয়।' আহ্, শুরুতে বড়ো কষ্টের দিন গিয়েছে।

কয়টা বাজে এখন? আমার কাছে ঘড়ি নেই। সময়টা জানা থাকলে হ'ত। বুঝতে পারতাম কখন গুলীর আওয়াজ পাব। অবশ্যি প্রথম শুনব ব্রীজ উড়িয়ে দেবার বিকট আওয়াজ। ব্রীজটা ওড়াতে পারবে তো ঠিকমতো? শুনেছি রেজারর পাহারা দেয় সারা রাত। খুব অস্থির লাগছে। ওদের সঙ্গে গেলেই হ'ত। না-হয় একটু দূরে বসে থাকতাম। রেসের ঘোড়ার মতো হল দেখি। রেসের ঘোড়া বুড়ো হয়ে গেলে শুনেছি অর্ধ-উন্মাদ হয়ে যায়। রেস শুরু হলে পাগলের মতো পা নাচায়।

'আপনার জন্যে দুধ আনব এক গ্লাস?'

সেই সুশ্রী মেয়েটি ঘরের ভেতর ঢুকেছে দেখে অবাক লাগছে। গ্রামঘরের বাড়িতে এ-রকম তো হয় না। বেশ কঠিন পর্দার ব্যাপার থাকে। আমার খানিকটা অস্বস্তি লাগছে। গনি মিয়ার ভাই, যিনি আমার বিছানার পাশে বসেছিলেন, তিনিও আমার অস্বস্তি লক্ষ করলেন।

মেয়েটি আবার বলল, 'আনব আপনার জন্যে এক গ্লাস দুধ?'

'না-না, দুধ লাগবে না।'

'খান, ভালো লাগবে। আনি?'

'আন।'

গনি মিয়ার চাচাত ভাই বললেন, 'বড়ো ভালো মেয়ে। শহরে পড়ে।'

'কী পড়ে?'

'বি. এ. পড়ে। হোস্টেলে থাকে।'

শুনে আমি অপ্রস্তুত। তুমি তুমি করে বলছি, কী কাণ্ড! কামিজ পরে আছে বলেই বোধহয় এত বাচ্চা দেখা যায়। তাছাড়া তার হাবভাবও ছেলেমানুষী।

মেয়েটি মোক্তার সাহেবের বড়ো ভাইয়ের মেয়ে। বড়ো ভাই ও ভাবী দু' জনেই মেয়েটিকে ছোট রেখে মারা গেছেন। মেয়েটি মোক্তার সাহেবের কাছেই বড়ো হয়েছে। পড়াশোনার খুব ঝোঁক, ঢাকায় হোস্টেলে থেকে পড়ে। গণ্ডগোলের আভাস পেয়ে আগেভাগেই চলে এসেছিল।

মেয়েটি দুধের গ্লাস আমার সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখল না, হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম, 'তোমার নাম?'

'হামিদা। হামিদা বানু।'

আমি চুপ করে রইলাম। কী বলব ভেবে পেলাম না। অথচ মেয়েটি দাঁড়িয়েই আছে। হয়তো কিছু কথা শুনতে চায়। যুদ্ধের গল্প শুনতে মেয়েদের খুব আগ্রহ। হামিদা একসময় বলল, 'আমার নামটা খুব বাজে! একেবারে চাষা-চাষা নাম।'

আমি বললাম, 'নাম দিয়ে কী হয়?'

'হয় না আবার, আমার বন্ধুদের কী সুন্দর সুন্দর নাম! এক জনের নাম কিন্নরী, এক জনের নাম স্বাতী।

মোক্তার সাহেব বললেন, 'আপনার জন্যে ডাক্তার আনতে লোক গেছে। ভালো ডাক্তার--এল. এম. এফ.। হামিদা আম্মাজি, ভেতরে যান।'

বাহ্! কী সুন্দর আম্মাজি ডাকছে। মেয়েটি বোধহয় সবার খুব আদরের। মোক্তার সাহেবের কথায় সে ঘাড় ঘুরিয়ে হাসল। আমাকে দেখতে-আসা লোকগুলি চলে যাচ্ছে একে একে। এত তাড়াতাড়ি কৌতূহল মিটে গেল? মোক্তার সাহেব অবশ্যি লোকজনদের ঝামেলা না করবার জন্যে বলছেন। তবুও তাদের আগ্রহ এত কম হবে কেন?

অন্দরমহলের ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে। পর্দার ওপাশে জটলা-পাকান মেয়েদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। হামিদা বলল, 'ওরা আপনাকে দেখতে চায়। মুক্তিবাহিনী কোনো দিন তো দেখে নাই।'

'তুমি দেখেছ নাকি?'

'এই তো আপনাকে দেখলাম।'

বাহ্, বেশ মেয়ে তো। বেশ গুছিয়ে কথা বলে। ইউনিভার্সিটিতে আমাদের সঙ্গে পড়ত--শেলী রহমান। সেও এরকম গুছিয়ে কথা বলত--একেক বার আমাদের হাসিয়ে মারত। শেলী রহমানের বাবা তো পুলিশ অফিসার ছিলেন, মিলিটারির হাতে মারা যান নি তো।

'কয় ভাইবোন আপনারা?'

'আমি একা। ভাইবোন নেই কোনো।'

'ভাইবোন না থাকা খুব বাজে।'

এ কী! গুলীর আওয়াজ শুনলাম না? তাহলে কি শুরু হল নাকি? তিনটে বেজে গেছে এর মধ্যে। আমি ছটফট করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম, 'কয়টা বাজে হামিদা, একটু জেনে আসবে?' মোক্তার সাহেব বললেন, 'দুটো পঁচিশ।' কী আশ্চর্য, এখনো তো যুদ্ধ শুরুর সময় হয় নি।

হামিদা বলল, 'কী হয়েছে?'

'গুলীর আওয়াজ শুনলাম।'

'কই না, না তো!'

'আমি তো শুনলাম নিজ কানে।'

মোক্তার সাহেব বললেন, 'না, গুলীর আওয়াজ নয়। গুলীর আওয়াজ হলে বুঝতাম। কত বার যুদ্ধ হল এখানে।'

মেথিকান্দার আশেপাশে যারা থাকে, গুলীর শব্দ তারা অনেক বারই শুনেছে। অনেক বার ব্যর্থ আক্রমণ হয়েছে এখানে। কিন্তু কেউ মুক্তিবাহিনী দেখে নি, এটা কেমন কথা। হয়তো সবাই বিল পার হয়ে ছোট খাল ধরে এগিয়েছে। আমাদের মতো গ্রামের ভিতর দিয়ে রওনা হয় নি। যাই হোক, এ নিয়ে ভাবতে ভালো লাগছে না। বমি-বমি লাগছে। মাথাটা এমন ফাঁকা লাগছে কেন। ব্রীজটা ঠিকমতো ওড়াতে পারবে তো? এমন যদি হ'ত, সবাই ঠিকঠাক ফিরে এসেছে, কারো গায়ে আঁচড়টি লাগে নি। তা কি আর হবে? কি একটা গান আছে না সুবীর সেনের--"মন নিতে হলে মনের মূল্য চাই"। ও কি, মাথা ঘুরছে নাকি?

'আপনার কী হয়েছে, এ রকম করছেন কেন?'

'কিছু হয় নি। এই তো, এই তো গুলীর শব্দ পাচ্ছি। হামিদা, যুদ্ধ শুরু হল।'

'বাতাসে জানালা নড়ার শব্দ শুনছেন--'

'মর্টারের শেল ফাটার আওয়াজ পাচ্ছ না?'

'আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন। মাথায় পানি দিই?'

মেয়েটির মাথা নিচু হয়ে এসেছে। কিন্নরী না নাম? উঁহু, হামিদা। তাহলে কিন্নরী নাম কার? বেশ সুশ্রী মেয়েটি। গলাটি কী লম্বা! ফর্সা, হাঁসের মতো। ঐ তো, আবার শেল ফাটার আওয়াজ। আহ্ পুরোদমে ফাইট চলছে।

'আপনি নড়াচড়া করবেন না। চুপ করে শুয়ে থাকুন।'

অনেক অপরিচিত মহিলা ঘরের ভেতরে ভিড় করছেন। মোক্তার সাহেবকে *দেখছি না তো। মোক্তার সাহেব কোথায়? এই দাড়িওয়ালা লোকটি কে?*

রামদিয়ার ঘাটে তারা যখন পৌঁছল, তখন আকাশ আবার মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে, বিজলি চমকাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। দমকা বাতাসে শোঁ শোঁ শব্দ উঠছে বাঁশবনে। হুমায়ূন পিছিয়ে পড়েছিল। হোঁচট খেয়ে তার পা মচকে গিয়েছে। সে হাঁটছে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। জাফর গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'হুমায়ূন ব্রাদার, হুমায়ূন ব্রাদার।'

তার ডাকার ভঙ্গিটা ফুর্তিবাজের ভঙ্গি। সব সময় এ-রকম থাকে না। মাঝেমধ্যে আসে। হুমায়ূন হাসল মনে মনে। সেও খুব তরল গলায় সাড়া দিল, 'কী ব্যাপার জাফর?'

'বৃষ্টি আতা হায়। বহুত মজাকা বাত।'

বলতে-বলতেই টুপটুপ করে বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল। জাফর হেসে উঠল হো-হো করে। যেন এ সময় বৃষ্টি আসাটা খুব একটা আনন্দের ব্যাপার।

হাসান আলি মাথার বাক্স নামিয়ে তার উপর বসে ছিল-যদিও বেশ বেগে হাওয়া বইছে, তবু সে লাল গামছা দুলিয়ে নিজেকে হাওয়া করছিল। বৃষ্টি আসতে দেখে সেও কী মনে করে যেন হাসল।

মজিদ একটা সিগারেট ধরিয়েছে। ফুস-ফুস করে ধোঁয়া ছাড়ছে। সে বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এখানে দাঁড়িয়ে তার ক্লান্তি আরো বেড়ে গেল। বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার হাসান আলি, টুনু মিয়ার দল কোথায়?'

হাসান আলি সে কথার জবাব দিল না, গামছা দুলিয়ে হাওয়া করতেই লাগল। মজিদ গলা উঁচিয়ে বলল, 'কথা বলছ না যে, কী ব্যাপার?'

'নৌকা আসতাছে। বিশ্রাম করেন মজিদ ভাই।'

হুমায়ূন ও জাফর এসে বসল হাসান আলির পাশে। বৃষ্টি নামতে-নামতে আবার থেমে গেছে। বসে থাকতে মন্দ লাগছে না তাদের। রামদিয়ার ঘাটে টুনুমিয়ার দলকে না দেখতে পেয়ে তারা সে-রকম অবাক হল না। জাফর হঠাৎ সুর করে বলল, 'ওগো ভাবীজান, মর্দ লোকের কাম।"

তারা সবাই মিনিট দশেক বসে রইল। চারিদিকে ঘন অন্ধকারে মাঝে মাঝে সিগারেটের ফুলকি আগুন জ্বলছে-নিভছে। ঝিঁঝি পোকার একটানা বিরক্তিকর আওয়াজ ছাড়া অন্য আওয়াজ নেই। হাসান আলি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'নৌকা দেখা যায়। উঠেন, সবেই উঠেন।'

দেশী ডিঙ্গি নৌকা ঠেলে উজানে নিয়ে আসছে।

হাসান আলি উঁচু গলায় সাড়া দিল, 'হই হই হই-হা।'

নৌকা থেকে এক জন চেঁচিয়ে উঠল, 'হাসান ভাই নাকি গো? ও হাসান ভাই।'

'কী।'

'ঠিকমতো পৌঁছছেন দেহি।'

হাসান আলি আচমকা প্রগলভ হয়ে উঠল। নৌকা পাড়ে ভিড়তেই নৌকার দড়ি ধরে শিশুর মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'টুনু মিয়া, ও টুনু মিয়া?'

নৌকার ভেতর থেকে একসঙ্গে উঁচু স্বরগ্রামে হেসে উঠল সবাই। টুনু মিয়া লাফিয়ে নামল নৌকা থেকে, বেঁটেখাট মানুষ। পেটা শরীর, মাথার চুল ছোট-ছোট করে কাটা। সে হাসিমুখে এগিয়ে গেল হুমায়ূনের দিকে।

'আমারে চিনছেন কমাণ্ডার সাব? আমি টুনু। বাজিতপুরের টুনু মিয়া। বাজিতপুর থানায় আপনার সাথে ফাইট দিছি।'

হুমায়ুন বলল, 'তোমরা দেরি করে ফেলেছ, আড়াইটা বাজে।'

'আগে কন আমারে চিনছেন কিনা।'

'চিনেছি, চিনেছি। চিনব না কেন?'

'বাজিতপুর ফাইটে আমার বাম উড়াতে গুলী লাগল। আপনে আমারে পিঠে লইয়া দৌড় দিলেন। মনে নাই আপনার?'

'খুব মনে আছে।'

'বাঁচনের আশা আছিল না। আপনে বাঁচাইছেন। ঠিক কইরা কন, আমারে চিনছেন? সেই সময় আমার লম্বা চুল আছিল।'

হুমায়ূন অবশ্যি সত্যি চিনতে পারে নি, তবু আজকের এই মধ্যরাতে স্বাস্থ্যবান হাসি-খুশি এই তরুণটিকে অচেনা মনে হল না। দলের অন্যান্য সবাই নেমে এসেছে। হাসান আলি তাদেরকে কী যেন বলছে, আর তারা ক্ষণে ক্ষণে হেসে উঠছে। কে বলবে এই সব ছেলেদের জীবন-মৃত্যুর সীমারেখা কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ মুছে যাবে।

জাফর বলল, 'আর লোকজন কোথায়?'

'আছে, জায়গা মতোই আছে।'

'তাহলে আর দেরি কেন? নৌকা ছাড়া যাক। হুমায়ূন ভাই কী বলেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, উঠে পড় সবাই।'

নৌকায় উঠে বসতেই বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। নৌকা যদিও ভাটির দিকে যাচ্ছে, তবু বাতাসের ঝাপটায় এগোচ্ছে ধীর গতিতে, মাঝে মাঝে তীরে গজিয়ে-ওঠা বেতঝোপে আটকে যাচ্ছে। যত বারই নৌকা আটকে যাচ্ছে, তত বারই মাঝি দু'টি গাল পাড়ছে, 'ও হালার পুত, ও হারামীর বাচ্চা।' গ্রামের ভেতর দিয়ে নৌকা যাবার সময় মেঘ ধরে গেল। তীরে বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে অনেক কৌতূহলী লোক বসে আছে। দু'-এক জন সাহস করে নিচু গলায় বলছে, "জয় বাংলা"।

মুক্তিবাহিনী চলাচল হচ্ছে এ খবর কী করে পেল কে জানে! হুমায়ূন একটু বিরক্ত হল। মুখে কিছুই বলল না। অবশ্য ভয় পাবার তেমন কিছু নেইও। মিলিটারিরা কিছুতেই এই রাত্রিতে থানার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাইরে বেরুবে না। মজিদ বলল, 'হুমায়ূন ভাই, পজিশন নেব কোথায়? সব খানাখন্দ তো পানিতে ভর্তি। সাপ-খোপও আছে কিনা কে জানে।'

নৌকার অনেকেই এই কথায় হেসে উঠল। মজিদ রেগে গিয়ে বলল, 'হাস কেন? ও মিয়ারা, হাস কেন?' মজিদ রেগে যাওয়াতেই হাসিটা হঠাৎ করেই থেমে গেল। নৌকা নীরব হল মুহূর্তেই। তখনি শোনা গেল, বাইরে ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। মাঝি দু' জন ভিজে চুপসে গেছে। জাফর বলল, 'মাঝিরা তো দেখি গোসল সেরে ফেলেছে।'

'হ গো ভাই, তিন দফা গোসল হইল।'

জাফর সুর করে বলল, 'বাইচ বাইতে মর্দ লোকের কাম।'

মজিদ ক্রমাগতই বিরক্ত হচ্ছিল। ভয় করছিল তার। ভয় কাটানর জন্যেই জিজ্ঞেস করল, 'মর্টার কোথায় ফিট করেছ তোমরা? থানা কত দূর?'

'গোঁসাই পাড়ায়। বেশি দূর না। পরথমে সেইখানে যাইবেন?'

'না-না, যাওয়ার দরকার কী? তাদের কাজ তারা করবে। হুমায়ূন ভাই কী বলেন?'

হুমায়ূন কিছু বলল না, চুপ করে রইল। তার মচকে-যাওয়া পা ব্যথা করছিল। সে মুখ কুঁচকে বসে রইল। তীর থেকে কে এক জন চেঁচিয়ে ডাকল, 'কার নাও? কার নাও?'

নৌকার মাঝি রসিকতা করল, হেঁড়ে গলায় বলল, 'তোমার নাও।'

'নাও ভিড়াও মাঝি, খবর আছে, নাও ভিড়াও।'

নৌকা ভিড়ল না, চলতেই থাকল এবং কিছুক্ষণ পরেই তীব্র টর্চের আলো এসে পড়ল নৌকায়।

'নৌকা ভিড়াও মাঝি, সামনে রাজাকার আছে।'

'কোনখানে?

'শেখজানির খালের পারে বইসা আছে।'

'থাকুক বইসা, তুমি কেডা গো?'

'আমি শেখজানি হাইস্কুলের হেড-মাষ্টার আজিজুদ্দিন। মুক্তিবাহিনীর নাও নাকি?'

'মনে অয় হেই রকমই।'

নৌকা ভিড়ল না, কারণ নৌকা শেখজানির খালে যাচ্ছে না। আজিজুদ্দিন মাষ্টার হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই মাঝরাত্রে সে ছয় ব্যাটারির টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন কে জানে?

এখান থেকেই গ্রামের চেহারাটা বদলাতে শুরু করেছে। দুটি আস্ত বাড়ি, তার পরপরই চারটি পুড়ে–যাওয়া বাড়ি। আবার একটা গোটা বাড়ি নজরে আসছে, আবার ধ্বংসস্তূপ। মিলিটারিরা প্রায় নিয়মিত আসছে এদিকে। লোকজন পালিয়ে গেছে। ফসল বোনা হয় নি। চারিদিক জনশূন্য। নৌকা যতই এগিয়ে যায়, ধ্বংসলীলার ভয়াবহতা ততই বেড়ে ওঠে। আর এগোন ঠিক নয়। রাজাকারদের ছোটখাট দল প্রায়ই নদীর তীর ঘেঁষে ঘুরে বেড়ায়। নজর রাখে রাতদুপুরে কোনো রহস্যজনক নৌকা চলাচল করছে কিনা। তাদের মুখোমুখি পড়ে গেলে তেমন ভয়ের কিছু নেই। তবে আগেভাগেই গোলাগুলীর শব্দে চারিদিক সচকিত করে লাভ কী?

'রুস্তম ভাই, এই রুস্তম ভাই।'

'কেডা গো?'

'আমি চান্দু, পাঞ্জাবী মিলিটারি, হি হি হি। নৌকা থামান।'

নৌকার গতি থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। একটি ছোটখাট রোগা মানুষ লাফিয়ে উঠল নৌকায়। জাফর বলল, ' কী ব্যাপার, কী চাও তুমি?' 'কে তুমি?'

'আমি কেউ না, চান্দু।'

'কী কর তুমি?'

'আমি খবরদারী করি। আপনেরার সাথে যামু। যা করবার কন করুম।'

রুস্তম বলল, 'চান্দুরে লন সাথে, খুব কামের ছেলে। গ্রেনেড নিয়া একেবারে থানার ভিতরে ফালাইব দেখবেন।'

চান্দু গম্ভীর হয়ে বলল, 'নামেন গো ভালোমানুষের পুলারা। জিনিসপত্র যা আছে, আমার মাথায় দেন।' পিনপিনে বৃষ্টি মাথায় করে দলটি নেমে পড়ল। সবে মাটিতে পা দিয়েছে, অমনি দূরাগত বিকট আওয়াজ কানে এল। কী হল, কী হল। দল দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। মজিদ উৎকণ্ঠিত স্বর বের করল, 'হুমায়ূন ভাই, কী ব্যাপার?' উত্তর দিল চান্দু, 'কিছু না। পুল ফাটাইয়া দিছে। সাবাস, ব্যাটা বাপের পুত।'

তা হলে ব্রীজ উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আহ্ কি আনন্দ! ভয় কমে যাচ্ছে সবার। সবাই দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বিকট শব্দটা হুম হুম করে প্রতিধ্বনি তুলল। থানার হলুদ রঙের দালানটি দেখা যাচ্ছে। রঙ দেখা যাচ্ছে না। কাঠামোটা স্পষ্ট নজরে আসছে। থানার আশেপাশে দু' শ' গজের মতো জায়গা পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। ঘরবাড়ি নেই, গাছপালা নেই--খাঁ-খাঁ করছে। অনেক দূর থেকে যাতে শত্রুর আগমন টের পাওয়া যায়, সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা।

তিনটি দলে ভাগ হয়ে অপেক্ষা করছে ছেলেরা। এদেরও অনেক পেছনে আধইঞ্চি মর্টার নিয়ে অপেক্ষা করছে একটি ছোট্ট দল, যে–দলে পেনসনভোগী এক জন বৃদ্ধ সুবাদার আছেন। পুরনো লোক। তার উপর বিশ্বাস করা চলে। উত্তর দিকের ঢালু অঞ্চলটায় রুস্তম একাই আঁট হয়ে বসেছে। মাটি হয়েছে পিছল। এল. এম. জি.

র পা পিছলে আসে। কিন্তু সে সব এখন না ভাবলেও চলে।

চান্দু বসে আছে জাফরের পাশে। তার ইচ্ছে--বুকে হেঁটে থানার সামনে যে-দু'টি বাঙ্কার, সেখানে গ্রেনেড ছুঁড়ে আসে। এ কাজ নাকি সে আগেও করেছে। জাফর কান দিচ্ছে না তার কথায়।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশ আবার পরিষ্কার হয়েছে। তারা দেখা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে হু-হু করে। ঘন্টা দু' য়েকের ভেতর অন্ধকার কেটে গিয়ে আকাশ ফর্সা হবে। শুরু হবে আরেকটি সূর্যের দিন।

কর্দমাক্ত ভেজা জমি। চারপাশের গাঢ় অন্ধকার, ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা--এর মধ্যেই নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে সবাই। কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। রুস্তম ফিসফিস করে বলে, 'পায়ের উপর দিয়ে কী গেল, সাপ নাকি? ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগল।' তার কণ্ঠস্বর অন্য রকম শোনায়। কেউ কোনো জবাব দেয় না। সবাই অপেক্ষা করে সেই মুহূর্তটির জন্যে, যখন মনে হবে পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাইফেলের উপর ঝুঁকে থাকা একেকটি শরীর আবেগে ও উত্তেজনায় কাঁপতে থাকবে থরথর করে।

সবাই গেছে বনে

১

আকাশের দিকে তাকালে মন খারাপ হয়ে যায়।

অবিকল দেশের মতো মেঘ করেছে। চারদিক অন্ধকার করে একটু পরেই যেন কালবৈশাখীর তাণ্ডব শুরু হবে। আনিস কফি খেতে যাচ্ছিল। আকাশ দেখে তার খানিকটা মন খারাপ হয়ে গেল। বড্ড নস্টালজিক মেঘ।

এ্যাণ্ডারসন ব্যস্ত ভঙ্গিতে পার্কিং লটের দিকে এগোচ্ছিল। আনিসকে দেখে থমকে দাঁড়াল, সরু গলায় বলল, 'এখনো বাড়ি যাও নি? প্রচণ্ড থাণ্ডারস্টর্ম হবে। ওয়েদার সার্ভিস স্পেশাল বুলেটিন দিচ্ছে।'

'কফি খেয়েই রওনা হব।'

'লিফট চাও? লিফট দিতে পারি।'

'না, লিফট চাই না।'

এ অঞ্চলে ঝড় বৃষ্টি বড়ো একটা হয় না। সে জন্যেই সম্ভবত লোকজনদের ভয় একটু বেশি। দেখতে দেখতে ক্যাম্পাস ফাঁকা হতে শুরু করেছে। কফি হাউসে মোটেই ভিড় নেই। উইক-এণ্ডে এ-রকম থাকে না কখনো। মেয়েরা সেজেগুজে বসে থাকে। ছেলেরা আসে ডেটের কথা পাকাপাকি করতে।

আনিস কফির পেয়ালা নিয়ে বাঁ দিকে এগিয়ে গেল। কফি হাউসের শেষ মাথায় চার-পাঁচটি ছোট-ছোট ঘর আছে। তিন নম্বর ঘরটি আনিসের খুব প্রিয়। দারুণ ভিড়ের সময়ও সেটি ফাঁকা থাকে। আজ পুরো কফি হাউস ফাঁকা, কিন্তু সেখানে এক জন বুড়ি বসে আছে।

'আমি কি এখানে বসতে পারি?'

বুড়ি সম্ভবত ঘুমুচ্ছিল। আনিসের কথায় নড়েচড়ে বসল।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

বসার পরই আনিসের মনে হল কাজটি ভাল হয় নি। আমেরিকান বুড়িগুলো কথা না বলে থাকতে পারে না। ভ্যাজর ভ্যাজর করে দশ মিনিটের মধ্যে মাথা ধরিয়ে দেয়।

'তুমি ইণ্ডিয়ান নিশ্চয়ই।'

'না, আমি ইণ্ডিয়ান নই।'

'তুমি কি মালয়েশীয়ান?'

'না, আমি বাংলাদেশী।'

'সেটি কোথায়?'

'ইণ্ডিয়া ও বার্মার মাঝামাঝি একটা ছোট দেশ।'

'কত ছোট?'

'বেশ ছোট। নর্থ ডাকোটার অর্ধেক হবে।'

বুড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল আনিসকে। দম ফুরিয়ে গেছে নিশ্চয়ই। বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করবে।

'তুমি কি শুনেছ, সিভিয়ার থাণ্ডারস্টর্ম হবে। স্পেশাল বুলেটিন দিচ্ছে দুপুর থেকে।'

'হ্যাঁ শুনেছি। খুবই খারাপ ওয়েদার।'

'তুমি কি এই ইউনিভার্সিটির ছাত্র?'

'না, আমি এখানকার এক জন টীচার।'

'কোন সাবজেক্ট?'

'কেমিস্ট্রি। পলিমার কেমিস্ট্রি।'

আনিস বড়োই বিরক্তি বোধ করতে লাগল। বুড়িগুলির কৌতূহল সীমাহীন। এরা মানুষদের বড্ড বিরক্ত করতে পারে। বুড়িটি তার ব্যাগ থেকে সিগারেট বের করল। লাইটার জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, 'তুমি কি এমিলি জোহানের নাম শুনেছ?'

'না। কে সে?'

'এখানকার এক জন বড়ো কবি। গত বৎসর রাইটার্স গিল্ড এওয়র্ড পেয়েছে।'

'না, আমি তার নাম শুনি নি। লিটারেচরে আমার তেমন উৎসাহ নেই।'

বুড়ি সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে তার হাত বাড়িয়ে দিল।

'আমি এমিলি জোহান। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম।'

আনিস হকচকিয়ে গেল। বুড়ি থেমে থেমে বলল, 'সমস্ত কফি হাউস ফাঁকা, আর তুমি বেছে বেছে আমার এখানে বসতে এসেছ দেখে ভাবলাম হয়তো আমাকে চেন, গল্প করতে চাও। বুড়িদের সঙ্গে ইচ্ছে করে কে আর বসতে চায় বল?'

আনিস ঠিক কী বলবে ভেবে পেল না। কিছু একটা বলা উচিত।

'তুমি কিন্তু তোমার নাম বল নি এখনো।'

'আমার নাম আনিস সাবেত। তোমার মতো বড়ো কবির সঙ্গে দেখা হয়ে খুব

ভালো লাগল।'

বুড়ি গলার স্বর নামিয়ে ফেলল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'মোটেই বড়ো কবি নই। রাইটার্স গিল্ড এওয়র্ড হচ্ছে একটা সস্তা ধরনের পুরস্কার। এখন পর্যন্ত কোনো বড়ো কবি রাইটার্স গিল্ড এওয়র্ড পায় নি। আমি যখন পেলাম তখন এত মন খারাপ হল যে বলার নয়। বুঝতে পারলাম যে আমি এক জন সস্তা ধরনের কবি, থার্ড রেট।'

বুড়ি উঠে দাঁড়াল। শান্ত স্বরে বলল, 'তোমার সঙ্গে কি আমার আবার দেখা হবে?'

আনিসের উত্তর দেবার আগেই সে থেমে থেমে বলল,

"ওয়ান ফ্লিউ টু দা ইস্ট
ওয়ান ফ্লিউ টু দা ওয়েস্ট।
এ্যাণ্ড ওয়ান ফ্লিউ ওভার দা কাক্কুস নেস্ট।"

আনিস অনেকক্ষণ বসে রইল একা একা। এখান থেকে বাইরের আকাশ দেখা যাচ্ছে না, তবে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে তা চোখে পড়ে। কত তফাৎ! ঝমঝম শব্দ নেই, গাছের পাতার শনশনানি নেই, ব্যাঙ ডাকছে না। বোঝার কোনোই উপায় নেই যে বাইরে আকাশ অন্ধকার করে ঝড়ো হাওয়া বইছে।

'এ্যাটেনশন প্লীজ। এ্যাটেনশন প্লীজ। কফি হাউস দশ মিনিটের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। এ্যাটেনশন প্লীজ।'

কফি হাউস থেকে বেরিয়ে মনে হল বড্ড বোকামি হয়েছে। অনেক আগেই বাড়ি ফেরা উচিত ছিল। ভালো ঝড় হচ্ছে। লোকজন কোথায়ও নেই। পার্কিং লট ধু ধু করছে। আনিস মেমোরিয়াল লাউঞ্জে চলে গেল। মেমোরিয়াল লাউঞ্জে পত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা আছে। একটি প্রকাণ্ড ভিক্টোরিয়ান পিয়ানো আছে। হট চকলেট এবং পেপসির দু'টি ভেণ্ডিং মেশিন আছে। অবস্থা তেমন খারাপ হলে সেখানকার সোফায় আরাম করে রাত কাটান যাবে।

লাউঞ্জের শেষ প্রান্তে একটি ছেলে এবং খুবই অল্পবয়সী একটি মেয়ে জড়াজড়ি করে বসে ছিল। ছেলেটি এক হাত দিয়ে মেয়েটির জামার হুক খোলবার চেষ্টা করছে। মেয়েটি বাধা দেবার একটি ভঙ্গি করছে এবং খিলখিল করে হাসছে। আনিস না দেখার ভান করে ভেণ্ডিং মেশিনের দিকে এগোল। এই সময় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এখানে এরকম হয় না কখনো। হাজারো দুর্যোগেও এদের ইলেকট্রিসিটি ঠিকই থাকে। মনে হচ্ছে মেয়েটি উঠে আসছে সোফা থেকে।

'তোমার কাছে কি সিগারেট আছে?'

'আছে।'

'আমি কি তোমার একটি সিগারেট ধার নিতে পারি?'

আনিস সিগারেট বের করল। মেয়েটি ফস করে লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট

ধরাল। বাদামী রঙের ঢেউ-খেলান চুল মেয়েটির। টানা টানা চোখ। লাইটারের আলোর জন্যেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, আনিসের মনে হল মেয়েটির মুখ যেন এইমাত্র কেউ তুলি দিয়ে এঁকেছে।

'সিগারেটের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

ছেলে-মেয়ে দু'টি পিয়ানোর আড়ালে চলে গেল। মেয়েটি অনবরত হাসছে খিলখিল করে। হাসির ধরন কেমন অসংলগ্ন। নিশ্চয়ই প্রচুর বিয়ার খেয়েছে। আনিস লম্বা হয়ে সোফায় শুয়ে পড়ল। ইলেকট্রিসিটি এখনো আসছে না। ট্রান্সমিশন লাইন কোথায়ও পুড়েটুড়ে গেছে বোধহয়। মেয়েটির চাপা গলার স্বর শোনা যাচ্ছে।

'আহ্ কী অসভ্যতা করছ? হাত সরাও প্লীজ।'

আবার খিলখিল হাসি। তারপর দীর্ঘ সময় আর কিছুই শোনা গেল না। বাইরে ঝড়ের বেগ বাড়ছে। ঘন ঘন বিজলি চমকাচ্ছে। আনিস শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন ঝড় থেমে গিয়েছে। ইলেকট্রিসিটি এসেছে। মেমোরিয়েল ইউনিয়ন আলোয় ঝলমল করছে। ছেলেটি নেই, মেয়েটি টেবিলে পা তুলে বসে আছে একা একা।

'তোমার কাছ থেকে কি আমি আরেকটি সিগারেট নিতে পারি?'

আনিস একটি সিগারেট দিল। মেয়েটি সিগারেট ধরিয়ে ক্লান্ত স্বরে বলল, 'তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে?'

'না। কেন বল তো?'

'গাড়ি থাকলে তোমাকে একটা লিফটের জন্যে অনুরোধ করতাম।'

'সরি, গাড়ি নেই আমার।'

'তুমি থাক কোথায়?'

'টুয়েলভ এ্যাভিন্যু।'

'তোমার সঙ্গে আমি টুয়েলভ এ্যাভিন্যু পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে যেতে পারি, কি বল?'

'তা পার।'

'আমার বড্ড মাথা ধরেছে।'

মেয়েটি বাঁ হাতে তার কপাল টিপে ধরল। আনিস বলল, 'তোমার ছেলে বন্ধুটি কোথায়?'

'ও আমার বন্ধু হবে কেন? কোথায় গেছে কে জানে? ওর সঙ্গে বকবক করেই তো আমার মাথা ধরেছে।'

বৃষ্টি নেই কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। রাস্তায় নেমেই মেয়েটি খুব সহজ ভঙ্গিতে আনিসের হাত ধরল।

'তোমার এ্যাপার্টমেন্টে কি টাইলানল আছে?'

'আছে।'

'মনে হয় আমার জ্বর আসছে। দু'টি টাইলানল এবং গরম কফি খেতে পারলে হ'ত।'

আনিস কথা বলল না। মেয়েটির সত্যি সত্যি জ্বর আসছে। হাত বেশ গরম।

'আমি কি তোমার এ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে এক কাপ গরম কফি খেতে পারি? রাত বেশি হয় নি, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'হ্যাঁ, খেতে পার।'

'আমাকে আরেকটা সিগারেট দাও।'

'মাথা ধরা তাতে আরো বাড়বে।'

'আমি তাতে কেয়ার করি না। আমি কোনো কিছুতেই কেয়ার করি না।'

'তা ভালো।'

'ভালো হোক, মন্দ হোক, আমি কেয়ার করি না।'

বাসার সামনে এসে মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। অবাক হয়ে বলল, 'এত বড়ো বাড়ি! এটা তোমার?'

'ভাড়া দিয়ে থাকি। নিজের নয়।'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি স্টুডেন্ট।'

'না, আমি স্টুডেন্ট নই।'

আনিস টাইলানল নিয়ে এল। পানির বোতল আনল। মেয়েটি ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমার জ্বর আসছে। তোমার কাছে থার্মোমিটার আছে?'

'না, থার্মোমিটার নেই।'

'তোমার গাড়ি থাকলে ভালো হ'ত, আমাকে পৌছে দিতে পারতে।'

'আমি আমার এক বন্ধুকে টেলিফোন করছি। সে তোমাকে পৌছে দেবে।'

'আমি কি তোমার এখানে এক রাত থাকতে পারি? ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমার।'

আনিস চুপ করে রইল। মেয়েটি থেমে বলল, 'কি, থাকতে পারি?'

'তা পার।'

'আমাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দাও। আমার বড্ড খারাপ লাগছে।'

শোবার এই ঘরটি চমৎকার করে সাজান। মেয়েটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল অনেকক্ষণ। তারপর খানিক ইতস্তত করে বলল, 'তুমিও কি শোবে আমার সঙ্গে?'

'না।'

'আরো শোবার ঘর আছে?'

'হ্যাঁ।'

মেয়েটি পায়ের জুতা খুলল। মাথায় স্কার্ফ বাঁধা ছিল, স্কার্ফ খুলে মুখ মুছল।

তারপর খুব সহজভাবে বলল, 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। অবশ্যি তোমার ইচ্ছা হলে আমার সঙ্গে শুতে পার। আমি কিছুই কেয়ার করি না।'

'নাম কি তোমার?'

'মালিশা।'

'শুভরাত্রি মালিশা।'

মালিশা কোনো জবাব দিল না। আনিস ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভাবল, কাজটা বোধহয় ঠিক হল না। এইসব 'হোবো' শ্রেণীর মেয়েদের ঘরে থাকতে দিতে নেই। হয়তো একটি প্রস্টিটিউট। শহরের নষ্ট মেয়েদের এক জন। কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। মন খারাপ হয় শুধু।

টিভিতে জনি কার্সন শো হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট কার্টার দাঁত বের করে কী ভাবে হাসে, তাই দেখাচ্ছে। আহা মরি কোনো অভিনয় নয়, এতেই স্টুডিওর লোকজন হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে। চ্যানেল ফোরে লেট নাইট মুভি শুরু হল। অর্থাৎ রাত বেশি হয় নি। একটা এখনো বাজে নি। আনিস কফি বানাল। ঘুমুতে যাওয়ার আগে কফি খাবার এই একটি বিশ্রী অভ্যাস তার আমেরিকায় এসে হয়েছে।

মালিশা কি কফি খাবে? সম্ভবত না। মেয়েটিকে থাকতে দেওয়া ভুল হয়েছে। ড্রাগস-ট্রাগস খেয়ে এসেছে কিনা কে বলবে? হয়তো রাতদুপুরে চেঁচামেচি শুরু করবে।

আনিস ঘুমুতে গেল অনেক রাতে। বাতি নেভাবার ঠিক আগের মুহূর্তে মনে হল, আজ সন্ধ্যায় যে মহিলা কবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁর নাম মনে পড়ছে না। চমৎকার একটি নাম। খুব সম্ভবত এম দিয়ে শুরু হয়েছে। নামটি মনে না-আসা পর্যন্ত কিছুতেই ঘুম আসবে না। ছটফট করতে হবে বিছানায়। পুরনো সেই রোগ আবার দেখা দিচ্ছে। স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ঘাড়ের পাশের রগ দু'টি ফুলে উঠছে। কাউকে জিজ্ঞেস করলে হয় না? শফিক তো অনেক দিন ধরে আছে এইখানে, এত রাত্রে টেলিফোন করাটা কি ঠিক হবে?

'হ্যালো শফিক? জেগে ছিলে?'

'হ্যাঁ। কী ব্যাপার?'

'আচ্ছা শোন, তুমি কি এখানকার কোনো মহিলা কবিকে চেন? বেশ বয়স ভদ্রমহিলার।'

শফিক বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল, 'কী ব্যাপার আনিস ভাই?'

'কোনো ব্যাপার না, এম্নি জিজ্ঞেস করছি। ভদ্রমহিলার নাম এম দিয়ে শুরু।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কী জন্যে?'

আনিস লাইন কেটে দিল। শফিক এখন নির্ঘাত আবার টেলিফোন করবে। কাজেই এখন প্লাগ থেকে টেলিফোন খুলে রাখা উচিত।

আনিসের সারা রাত ঘুম হল না। ঘুম এল ভোরবেলা।

২

ফার্গো খুবই ছোট শহর।

আমেরিকানরা একে সিটি বলে না, বলে টাউন। সাধারণ একটি সিটিতে যা যা থাকে, এখানে তার সবই অবশ্যি আছে। আকাশছোঁয়া দালানই শুধু নেই। দু'টি নাইট ক্লাব আছে। মেয়েরা সেখানে নগ্ন হয়ে নাচে। একটা বড়ো ক্যাসিনো আছে। সেখানে সপ্তাহে ছ' দিন দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা ব্লাক জ্যাক খেলা হয়। অত্যাধুনিক শপিং মল আছে বেশ কয়েকটি, তবু--ফার্গো সিটি নয়, টাউন। নিউইয়র্ক বা শিকাগো থেকে যে-সব বাঙালী এখানে আসে তারা চোখ কপালে তুলে বলে, 'আরে এ তো আমাদের কুমিল্লা শহর! ভিড় নেই হৈ-চৈ নেই। বাহ্, চমৎকার তো!'

কিন্তু বেশিদিন কেউ থাকে না এখানে। শীতের সময় প্রচণ্ড শীত পড়ে। কানাডা থেকে উড়ে আসে ঠাণ্ডা হাওয়া। থার্মোমিটারের পারদ ক্রমশ নিচে নামতে থাকে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি তাপমাত্রা শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রী নিচে নেমে থমকে দাঁড়ায়। অসহনীয় অকল্পনীয় ঠাণ্ডা। একটা শীত কোনোমতে কাটাবার পরই ফার্গোর মোহ কেটে যায়। ঘরের মধ্যে ছ' মাস বন্দী হয়ে থাকতে পারে কেউ? বাঙালীরা মুখ কুঁচকে বলাবলি করে, 'এখানে মানুষ থাকতে পারে? এখানে বাস করতে পারে পোলার বিয়ার আর সীল মাছ।'

তবু অনেকেই আসে। ঘরবাড়ি কিনে স্থায়ী হয়ে যায় কেউ কেউ। যেমন স্থায়ী হয়েছেন আমিন সাহেব। শহরে বাড়ি করেছেন। মিনেসোটায় পেলিকেন লেকের ধারে সামার হাউস কিনেছেন। বিশ বছর আগে যে-দেশ ছেড়ে এসেছিলেন, আজ আর তার জন্যে মন কাঁদে না।

অথচ শুরুতে কী দিন গিয়েছে! ইউনিভার্সিটি থেকে সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত হয়ে ফিরতেন। ঘরে রাহেলা একা। কিছুই করবার নেই। কতক্ষণ আর টিভির সামনে বসে থাকা যায়? একা একা দোকানে ঘুরতে কার ভালো লাগে? আমিন সাহেব সান্ত্বনা দিতেন, 'আর একটা মাত্র বৎসর। পি. এইচ. ডি করব না। এম. এস. করে ফিরে যাব। আর মাত্র কয়েকটা দিন কষ্ট কর।'

পরিবর্তন হল খুব ধীরে। আমিন সাহেব একদিন অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, রাহেলা চমৎকার ইংরেজি শিখেছে।

'বাহ্, তুমি তো চমৎকার ইংরেজি বল! কোত্থেকে শিখেছ? একেবারে আমেরিকান এ্যাকসেন্ট। কীভাবে শিখলে?'

'টিভি দেখে দেখে শিখেছি। কী আর করব বল?'

দু' বছরের মাথায় চাকরি হল রাহেলার। আহামরি কিছু নয়। রিসার্চ ল্যাবে সূর্যমুখী ফুলের চারা বাছা। সেই বছর গাড়ি কিনলেন আমিন সাহেব। নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান মডেল ডজ পোলারা। প্রকাণ্ড গাড়ি। নিজের গাড়িতে করে স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন ডেভিলস লেকে। রাহেলার মনে হল সে বোধহয় আগের মতো অসুখী

নয়।

দেখতে–দেখতে কত দিন হয়ে গেল। প্রচুর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেশে যাওয়া হয়ে উঠল না। বেড়াতে যাবার জন্যেও নয়। একটা–না–একটা ঝামেলা থাকেই। পি–এইচ. ডি'র বছর দেশে যাবে না। নতুন চাকরি, দেশে যাওয়া যাবে না। ইমিগ্রেশন না হওয়া পর্যন্ত বের হওয়া ঠিক হবে না। নতুন বাড়ি কেনা হয়েছে। এখন বাড়ি ঠিকঠাক করতে হবে, দেশে যাওয়া পিছাতে হবে। প্রথম বাচ্চা হবে, এ সময়টা তো আমেরিকাতে থাকতেই হবে।

তারা প্রথম বারের মতো যখন দেশে গেল তখন রুনকির বয়স চার বছর। প্রায় এক যুগ পর দেশে ফেরা। কি দারুণ উত্তেজনা গিয়েছে। কিন্তু দেশে ফিরে কিছুই ভালো লাগল না। নোংরা ঘরবাড়ি। দেয়ালগুলি ময়লা। রাতের বেলা কেমন অন্ধকার অন্ধকার লাগে চারদিক। মানুষজনও কেমন যেন বদলে গেছে। কেউ যেন ঠিক সহজ হতে পারে না। বড় খালা, যিনি সারা জীবন তুই তুই করে কথা বলতেন, তিনি পর্যন্ত তুমি বলা শুরু করলেন।

এক মাস পরই রুনকি পড়ে গেল অসুখে। যা খায়, কিছুই হজম করতে পারে না। রাহেলা আমেরিকা ফিরে এসে হাঁপ ছাড়ল।

দেখতে–দেখতে কত দিন হয়ে গেল। বিশ বছর অনেক লম্বা সময়। রাহেলার বাবা–মা মারা গেলেন। আমিন সাহেবের বাবা–মা তো আগেই ছিলেন না। কোনো পিছুটান রইল না। রাহেলার সবচেয়ে ছোট বোনটির বিয়ে হয়ে গেল। কোথায় আছে সে, কিছুই জানা নেই। জানবার জন্যে সে রকম উৎসাহও এখন হয় না। সবকিছু যেন হারিয়ে গেছে। আজকাল আয়নায় মুখ দেখলে রাহেলার তীক্ষ্ণ ব্যথা বোধ হয়। মুখের চামড়া শ্লথ হয়ে এসেছে। কানের দু' পাশের সাদা চুল সাপের মতো কিলবিল করে। এখন তাঁর অন্য এক ধরনের আলস্য বোধ হয়। সকালবেলা চেয়ার পেতে বারান্দায় একা একা বসে থাকেন। আমিন সাহেব তাঁকে বিরক্ত করেন না। কেমন একটা দূরত্ব এসে গেছে তাঁদের মধ্যে। মাঝে মাঝে রুনকি আসে ঝড়ের মতো।

'আবার তুমি চেয়ার নিয়ে বসেছ? শিকড় গজিয়ে শেষে তুমি একটা গাছ হয়ে যাবে মা।'

'আয়, তুইও বোস।'

'হুঁ, আমার যেন কোনো কাজ নেই!'

রুনকি দেখতে তাঁর মতো হয় নি, তবু চমৎকার হয়েছে। গায়ের রঙ চাপা, কিন্তু কী কালো শান্ত চোখ। তাকালেই কেমন যেন মন খারাপ হয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রুনকি যখন চুল ব্রাশ করে, তিনি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন। রুনকি ঠোঁট বাঁকায়, 'এমন করে তাকাও কেন মা?'

'কেমন করে তাকাই?'

'কেমন যেন পুরুষ–পুরুষ চোখে তাকাও।'

তিনি তাঁর নিজের মেয়েকে একটুও বুঝতে পারেন না। মাঝে মাঝে অনেক কায়দা করে জিজ্ঞেস করেন, 'তুই কী রকম ছেলে বিয়ে করতে চাস রুনকি?'

'বিয়ের কথা আমি মোটেই ভাবছি না। বছরের পর বছর একটা ছেলের সঙ্গে থাকা বড্ড আগ্‌লি।'

'এসব আবার কী ধরনের কথা?'

'সত্যি কথাই বলছি তোমাকে। যে-সব ছেলে আমার সঙ্গে ডেট করে, তুমি কি ভাবছ আমি ওদের কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবি? হলি কাউ। তাছাড়া ওরাও বিয়ে করতে চায় না। ভুলিয়েভালিয়ে ঘরে নিয়ে শুতে চায়।'

রাহেলা মুখ কালো করে বললেন, 'তুই নিশ্চয়ই ওদের ঘরে যাস না?'

'মা, যাই কি না-যাই সেসব আমি তোমার সঙ্গে ডিসকাস করতে চাই না। আমার বয়েস উনিশ হয়েছে। তোমাদের কোনোই রেসপনসিবিলিটি নেই।'

রাহেলা চান একটি হৃদয়বান এবং বুদ্ধিমান বাঙালী ছেলেকে বিয়ে করবে রুনকি। জীবনে যে-সমস্ত সুখ ও আনন্দের কথা তিনি সারা জীবন কল্পনা করেছেন, তাঁর মেয়ে সে-সব ভোগ করবে। কিন্তু এই দূর দেশে তেমন ছেলে পাওয়া যাবে কোথায়? রাহেলা লং ডিসটেন্সে পরিচিত সবাইকে একটি ছেলের কথা বলেন। খোঁজ যে আসে না, তাও নয়। প্রথমেই জানতে চায় মেয়ের কি ইমিগ্রেশন আছে? বিয়ে করলে এখানে থেকে যাবার ব্যাপারে কোনো সাহায্য হবে কি? মেয়ের ছবি দেখতে চায় না, মেয়েটিকে দেখতে চায় না। গ্রীন কার্ড দেখতে চায়।

আমিন সাহেব নিজের ঘরে বসে কী যেন লিখছিলেন। একতলার সর্বপশ্চিম কোণার ছোট ঘরটি তাঁর নিজস্ব ঘর। ঘরটিতে আসবাব বলতে ছোট একটা লেখার টেবিল, একটা ইজিচেয়ার, বুকশেলফ। বুকশেলফে কয়েকটি রেফারেন্স বই, ন্যাশনাল জিওগ্রাফির কিছু পুরনো সংখ্যা এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' ছাড়া অন্য কোনো বই নেই। আমিন সাহেব মাঝেমাঝেই দরজা বন্ধ করে এই ঘরে বসে কী-যেন লেখেন। রাহেলার কৌতূহল হলেও কখনো কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। আমিন সাহেবের কোনো বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করতে আজ আর তাঁর ভালো লাগে না।

রাহেলা দরজায় দু' বার টোকা দিয়ে মৃদু গলায় বললেন, 'আসব?' জবাব পাবার আগেই তিনি পর্দা সরিয়ে আমিন সাহেবের ঘরে ঢুকলেন। আমিন সাহেব তাঁর লেখাটি আড়াল করবার চেষ্টা করলেন। রাহেলা ভান করলেন যেন তিনি এসব কিছুই লক্ষ করছেন না।

'আমি আজ সন্ধ্যায় কয়েক জনকে খেতে বলেছি।'

আমিন সাহেব কোনো উত্তর দিলেন না।

'তুমি টচি থেকে শুঁটকি মাছ এনে দেবে।'

'শুঁটকি মাছ পাওয়া যায়?'

'মাঝে মাঝে যায়।'

'আমি নিয়ে আসব।'

রাহেলার মনে হল আমিন সাহেব অস্বস্তিবোধ করছেন, যেন তিনি চান না রাহেলা এখানে থাকে। কিন্তু এ-রকম মনে করার কারণ কী? রাহেলা নিজের অজান্তেই বলে ফেললেন, 'কী লিখছ?'

'তেমন কিছু নয়।'

রাহেলা খানিকক্ষণ সরু চোখে তাকিয়ে থেকে দোতলায় চলে গেলেন। দোতলার একেবারে শেষ কামরাটি রুনকির। সে দরজা বন্ধ করে গান শুনছে।

'রুনকি, দরজা খোল তো মা।'

রুনকি দরজা খুলে দিল। তার চোখ ভেজা। মনে হল সে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে।

'কী হয়েছে রুনকি?'

'কিছু না মা। নেইল ডাইমণ্ডের গান শুনছিলাম। ওর গান শুনলে খুব লোনলি ফিলিং হয়।'

রুনকি মিষ্টি করে হাসল। রাহেলা থেমে থেমে বললেন, 'আমি কয়েকটি ছেলেকে খেতে বলেছি। তুমি সন্ধ্যাবেলা যেও না কোথাও।'

'ঠিক আছে, মা।'

'তোমার নীল শাড়িটা পরবে।'

'বেশ। বিশেষ কাউকে আসতে বলেছ?'

রাহেলা ইতস্তত করে বললেন, 'আনিস নামের একটি ছেলে আসার কথা, এন-ডি-এস-ইউয়ের টীচার, খুব ভালো ছেলে।'

'কী করে বুঝলে--খুব ভালো ছেলে?'

'শফিক বলেছে।'

রুনকি হাসি-হাসি মুখে বলল, 'নিশ্চয়ই আনমেরিড। এবং নিশ্চয়ই তুমি চাও আমি খুব ভদ্র-নম্রভাবে তার সঙ্গে কথা বলি।'

'চাওয়াটা কি খুব অন্যায়?'

'না, অন্যায় হবে কেন? তবে মাষ্টারদের আমি দু' চোখে দেখতে পারি না।'

রাহেলা কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। রুনকি বলল, 'তোমার চিন্তার কিছুই নেই। আমি খুব ভদ্র ও নম্র ভাবে থাকব, একটুও ফাজলামি করব না। দেখবে, মিষ্টি মিষ্টি হাসছি শুধু।'

৩

আনিসের ঘুম ভাঙল এগারটায়।

সে কয়েক মুহূর্ত নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না, সত্যি সত্যি এগারটা বাজে! আজ শুক্রবার, সাড়ে ন'টায় একটা ক্লাস ছিল। তিন শ' ছয় নম্বর কোর্স পলিমার রিয়োলজি। এখন অবশ্যি করার কিছুই নেই। মিস ক্যাথরীনকে টেলিফোন করে দিতে হবে। ক্লাস মিস করা তেমন কোনো ব্যাপার নয়। সময় করে নিয়ে নিলেই হবে। কিন্তু ঘুমের জন্যে ক্লাসে না যেতে পারাটা লজ্জার ব্যাপার।

আনিস টেলিফোন হুক লাগান মাত্রই টেলিফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো আনিস ভাই? আমি শফিক।'

'বুঝতে পারছি।'

'কাল রাত থেকে এই নিয়ে ছয় বার টেলিফোন করেছি। আপনি কি টেলিফোন ডিসকানেক্ট করে রেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ভাবলাম, কী ব্যাপার? এদিকে আপনার মহিলা কবির নাম পেয়েছি, নাম হচ্ছে মেরি স্টুয়ার্ট।'

আনিস ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'মেরি স্টুয়ার্ট নয়। ভদ্রমহিলার নাম এমিলি জোহান। রাত্রে মনে করতে পারছিলাম না, এখন মনে হয়েছে।'

'আনিস ভাই, আপনার কি শরীর খারাপ?'

'না, শরীর ঠিক আছে।'

'আমিন সাহেবের বাসায় যাবার কথা মনে আছে তো?'

'আজকে তো নয়, কাল।'

'হ্যাঁ, কাল। শুনুন আনিস ভাই, আমি আসছি।'

'এখন?'

'এই দশ মিনিটের মধ্যে। সিরিয়াস কথা আছে।'

আনিস টেলিফোন রেখে চায়ের পানি বসিয়ে দিল। পানি গরম হতে-হতে হাত-মুখ ধুয়ে আসা যাবে। হাত-মুখ ধুতে গিয়ে মনে পড়ল, আরেকটি প্রাণী আছে। আশ্চর্য, এত বড়ো একটা ব্যাপার এতক্ষণ মনে পড়ল না কেন?

কিন্তু মালিশা ছিল না। ঘরের বিছানা সুন্দর করে পাতা। বিছানার উপর এক টুকরো সাদা কাগজ পড়ে আছে। আনিস দেখল সেখানে পেন্সিলে লেখা--'তুমি ঘুমাচ্ছ দেখে জাগালাম না। অনেক ধন্যবাদ।' আনিসের কেন যেন একটু মন খারাপ লাগল। অথচ মন খারাপ হবার কোনো কারণ নেই। আজকের দিনটি খুবই খারাপ যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এ-রকম খারাপ দিন আসে। কোনো কিছুই ঠিক মতো হয় না।

শফিকের দশ মিনিটের মধ্যে আসার কথা। সে দু' ঘন্টার মধ্যেও এল না। মিস ক্যাথরীনকেও টেলিফোন করে পাওয়া গেল না। ইউনিভার্সিটিতে এখন গিয়ে হাজির হওয়ার কোনো মানে হয় না। আনিসের মনে হল তার জ্বর আসছে। কী ভয়ঙ্কর খারাপ দিন।। টিভি-র নিউজ চ্যানেলে পর্যন্ত একটিও ভালো খবর নেই--

'ক্যান্টাকিতে দু'টি শিশুকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।'

'সল্ট টু ট্রিটির আলোচনা ভেস্তে গেছে।'

'বেলজিয়ামের লিয়েগে শহরে একটি ট্রেন নদীতে পড়ে দেড় শ' লোকের সলিলসমাধি হয়েছে।'

বাগানে চেয়ার সাজান হয়েছে।

রুনকির মনে হল, তার মা কিছুটা বাড়াবাড়ি করছে। দু' বার টেবিলক্লথ পাল্টান হয়েছে। ফুলদানিতে ফুল সাজান হয়েছে। স্টেরিও সিস্টেমকে টেনে আনা হয়েছে বাইরে।

রুনকি বলল, 'মা তুমি বড্ড হুলস্থুল করছ!'

রাহেলা অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁর কপালের চামড়ায় সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ল, 'বাইরে চেয়ার পেতে বসলে বুঝি হুলস্থুল হয়?'

'তা হয় না, কিন্তু ফুলদানি রাখলে হুলস্থুল হয়। তুমি ছয় ডলার খরচ করে ফুল আনিয়েছ মা।'

'বেশ তো, তোমার অপছন্দ হলে ফুলদানি তুলে নাও।'

রুনকি অপ্রস্তুত হল। তার মা স্পষ্টই রেগে গেছেন। সে তার মাকে ঠিক বুঝতে পারে না। অত্যন্ত ছোট কারণে তিনি অসম্ভব রেগে যেতে পারেন। রুনকি হাসিমুখে বলল, 'মা, তুমি যদি চাও তাহলে আমি নীল শাড়িটা পরব।'

'আমার আবার চাওয়াচাওয়ি কি রুনকি? আমি কখনো কারো কাছে কিছু চাই নি।'

রুনকি মুখ কালো করে তার ঘরে চলে গেল। এমন একটি চমৎকার দিন কেমন করেই না নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রুনকি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। এই ঘরে নিজের মনে কাঁদা যায়। উঁচু ভল্যুমে গান বাজান যায়। এটি তার নিজের গোপন পৃথিবী।

টুকটুক করে টোকা পড়ছে দরজায়। নিশ্চয়ই বাবা। এমন শালীন ভঙ্গিতে বাবা ছাড়া আর কেউ দরজা নক করতে পারেন না। রুনকি নরম গলায় বলল, 'কী চাও, বাবা?'

'দরজা খোল বেটি। তোমার জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।'

'কী সারপ্রাইজ?'

'খুলেই দেখ।'

রুনকি বেরিয়ে এল, তার দু' চোখ ভেজা। চুল এলোমেলো।

'তোমার জন্যে একটি গিফট প্যাকেট এসেছে। ইটালি থেকে। ইটালিতে কে আছে তোমার মা?'

'টম। সামার কাটাতে গিয়েছে।'

রুনকি প্যাকেট খুলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্লাস্টার অব প্যারিসের তৈরি অপূর্ব একটি নারীমূর্তি। নিশ্চয়ই মাইকেল এঞ্জেলোর কোনো ভাস্কর্যের ইমিটেশন। রুনকি গাঢ় স্বরে বলল, 'কী সুন্দর, দেখেছ!'

'হ্যাঁ সুন্দর। খুবই সুন্দর।'

'মাকে দেখিয়ে আনি।'

রুনকি ছুটে বেরিয়ে গেল।

রাহেলা রান্নাঘরে। রান্নাবান্নার কাজ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। খাবারদাবার গরম রাখার জন্যে শুধু ওভেনে দিয়ে রাখা। অনেক রকম আয়োজন হয়েছে, তবু রাহেলার মনে হচ্ছে আয়োজন পূর্ণাঙ্গ হয় নি। কাঁচামরিচ নেই ঘরে। হর্নবাকারসে কাঁচামরিচ পাওয়া যায় নি। তিনি বা আমিন সাহেব কেউ অবশ্যি ঝাল খান না, তবে প্রবাসী বাঙালীরা খাবার টেবিলে কাঁচামরিচ দেখতে ভালোবাসে।

'মা দেখ, টম কী পাঠিয়েছে।'

'কোন টম, পাগলা টম?'

রুনকি বেশ বিরক্ত হল। টম আবার ক' জন আছে যে, পাগলা টম বলতে হবে? রুনকি বলল, 'মূর্তিটি আমি বাগানে সাজিয়ে রাখি মা? তোমার অতিথিরা দেখলে অবাক হবে।'

রাহেলা থেমে থেমে বললেন, 'না রুনকি, এটি তোমার ঘরেই থাক। মূর্তিটি অশালীন।'

রুনকি স্তম্ভিত হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঝড়ের বেগে দোতলায় উঠে গেল।

অতিথিদের মধ্যে প্রথম এলেন নিশানাথ রায়। গ্রাণ্ড ফোকস ইউনিভার্সিটির অঙ্কের প্রফেসর। ভদ্রলোকের বয়স ৫৫, কিন্তু দেখায় ৭০-এর মতো। লম্বা দড়ি-পাকান চেহারা। যে-কোনো নিমন্ত্রণে সবার আগে এসে উপস্থিত হন এবং নিরিবিলি একটি কোণ বেছে চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন কিংবা ঘুমান। আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতেও ক্লাস নিতে গিয়ে একই কাণ্ড। তবু তিনি টিকে আছেন, কারণ 'টপলজি'তে এক জন প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁকে এখনো ধরা হয় (যদিও টপলজি তিনি ছেড়েছেন দশ বছর আগে)। অনেকের ধারণা, গ্রাণ্ড ফোকস ইউনিভার্সিটির নাম লোকে জানে, কারণ প্রফেসর নিশানাথ এখানে মাষ্টারি করেন।

নিশানাথ বাবু তাঁর স্বভাবমতো পাঁচটার দিকেই এসে পড়লেন এবং লজ্জিত স্বরে বললেন, 'দেরি করে ফেললাম নাকি?'

আমিন সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'না, দেরি হয় নি। চা দেব, না লিকার?'

নিশানাথ বাবু বিড়বিড় করে কী-যেন বললেন। পরিষ্কার বোঝা গেল না। তিনি বেছে বেছে সবচেয়ে পেছনের একটি চেয়ারে পা উঠিয়ে বসলেন। আমিন সাহেব মার্টিনির একটি বড়ো গ্লাস নিয়ে এসে দেখেন, নিশানাথ বাবু চোখ বন্ধ করে

ফেলেছেন।

'নিশানাথ বাবু নিন, মার্টিনি এনেছি।'

'ইয়ে—— কি যেন বলে, আমি অবশ্যি চা চেয়েছিলাম।'

'চা নিয়ে আসতে পারি, পানি গরম আছে।'

নিশানাথ বাবু তার উত্তর দিলেন না। চুপচাপ বসে রইলেন।

রাত আটটা বেজে গেল। অন্য দু' জন নিমন্ত্রিতের কোনো খোঁজ নেই। শফিকের ঘরে টেলিফোন করা হল কয়েক বার, কেউ ধরল না। রুনকি বলল, 'নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধা হয়েছে মা। তুমি এমন মুখ কালো করে থেক না।'

'কী আজেবাজে কথা বল রুনকি? মুখ কালো করব কেন?'

'আমি সরি মা।'

'ঠিক আছে খেতে বস।'

নিশানাথ বাবু নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছেন। আমিন সাহেব একবার বললেন, 'রান্না কেমন হয়েছে নিশানাথ বাবু?'

নিশানাথ বাবু তার জবাব দিলেন না। তিনি কখনো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের জবাব দেন না। রুনকি বলল, 'নিশা চাচার জিহ্বায় কোনো টেস্টবাড নেই। তিনি যাই খান তাই তাঁর কাছে ঘাসের মতো লাগে। তাই না চাচা?'

নিশানাথ বাবু তার উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তখন টেলিফোন বাজল। টেলিফোন ধরল রাহেলা।

'হ্যালো, আমি শফিক।'

রাহেলা শুকনো গলায় বললেন, 'আমরা সবাই খেতে বসেছি, একটু পরে ফোন করতে পার?'

রাহেলা কঠিন মুখ করে খেতে বসলেন। রুনকি মায়ের দিকে না তাকিয়ে বলল, 'মা, এটা কিন্তু তুমি ঠিক করলে না।'

রাহেলা উত্তর দিলেন না। নিশানাথ বাবু বললেন, 'প্রচুর আয়োজন করেছেন। মনেই হয় না বিদেশ।'

রুনকি বলল, 'মা ওদের হয়তো বিশেষ কোনো ঝামেলা হয়েছে। টেলিফোন নামিয়ে না রেখে তোমার উচিত ছিল.....'

'আমার কী উচিত–অনুচিত তা আমি তোমার কাছ থেকে শিখতে চাই না। তুমি ভাজা মাছ আরো নেবে?'

'না।'

'নিশানাথ বাবু, আপনি নেবেন?'

নিশানাথ বাবু অবাক হযে বললেন, 'এটা ভাজা মাছ? আমি ভাবছিলাম——'

রুনকি বলল, 'তুমি শুধু শুধু রাগ করছ মা। ওদের নিশ্চয়ই বড়ো রকমের কোনো ঝামেলা হয়েছে।'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'কাদের ঝামেলা হয়েছে?'

'যাদের আসবার কথা ছিল, তাদের।'

'কী ঝামেলা?'

'সেটা এখনো জানা যাচ্ছে না। হয়তো ভদ্রলোক বাথরুমে গিয়ে দেখেন বাথটাবে একটি ডেডবডি পড়ে আছে। ডেডবডিটির পিঠে একটি ওরিয়েন্টাল কাজ করা ছুরি।'

আমিন সাহেব হেসে ফেললেন।

'হাসির কী হল বাবা? হতেও তো পারে।'

নিশিনাথ বাবু বললেন, 'এদেশে সবই সম্ভব। খুন খারাবি এদের কাছে কিছুই না, অতি অসভ্য বর্বরের দেশ।'

ঝামেলাটা কী হয়েছে তা জানা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। গাড়ি নিয়ে হাইওয়েত আটকা পড়েছে। শফিকের প্রাচীন ফোর্ড ফিয়াসটার ট্রান্সমিশন কাজ করছে না। হাইওয়ের একটি রেস্ট হাউসে বসে আছে দু' জন। রুনকি বলল, 'রাস্তার মাঝখানে গাড়ি নিয়ে আটকা পড়া দারুণ এক্সাইটিং।'

রাহেলা ভ্রূ কোঁচকালেন। ঠাণ্ডা স্বরে বললেন, 'এর মধ্যে এক্সাইটিং কী দেখলে তুমি? সাধারণ মানুষদের মতো ভাবতে শেখ। গাড়ি নিয়ে আটকা পড়াটা হচ্ছে যন্ত্রণা। এক্সাইটমেন্ট নয়।'

'তুমি এত রেগে রেগে কথা বলছ কেন মা?'

'রুনকি, কথা বন্ধ করে গাড়ি নিয়ে ওদের খোঁজে যাও। তোমার বাবাকে পাঠাব না। সন্ধ্যা থেকে মার্টিনি খাচ্ছে, ওর হাত স্টেডি নেই।'

কথাটা ঠিক নয়। দু' পেগের মতো মার্টিনি আমিন খেয়েছেন। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। রাহেলার মেজাজ চড়ে আছে। চুপ করে থাকাই ভালো। নিশানাথ বাবু বসার ঘরের সোফায় পা গুটিয়ে আবার ধ্যানস্থ হয়েছেন। আমিন তাঁর পাশে এসে বসতেই তিনি বললেন, 'বুঝলেন, অতি অসভ্য, অতি বর্বর জাত।'

রাহেলা রুনকির সাথে গ্যারাজ পর্যন্ত গেলেন। রুনকির হাতে চাবি দিয়ে বললেন, 'নতুন ছেলেটির সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করবে।'

রুনকি অবাক হয়ে বলল, 'আমি অভদ্র মা! কী বলছ তুমি?'

'যা বলছি মন দিয়ে শোন। আমি চাই তুমি বাঙালী ছেলেদের সঙ্গে কিছুটা মেলামেশা কর।'

রুনকি চুপ করে রইল। রাহেলা বললেন, 'তোমার একটি ভালো বিয়ে হোক, সেটাই আমি চাই। আমি তোমাকে হ্যাপি দেখতে চাই।'

'বাঙালী ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলেই আম হ্যাপি হব? তোমার তো বাঙালি ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে। তুমি কি হ্যাপি?'

রাহেলা উত্তর দিলেন না।

রুনকি বলল, 'এইসব নিয়ে আমি এখন ভাবতে চাই না। আর আমি চাই না, তুমিও ভাব। ইদানীং আমাকে নিয়ে তুমি বেশি চিন্তা করছ।'

'তুমি বলতে চাও, চিন্তার কিছু নেই?'

রুনকি গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। রাহেলা বললেন, 'শাড়ি একটু উপরের দিকে টেনে নাও। এক্সিলেটরের সঙ্গে যেন না লেগে যায়।'

হাইওয়েতে নেমেই রুনকি গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে সত্তুরে নিয়ে এল। গ্র্যাণ্ড ফোকস থেকে ফার্গো ইন্টারস্টেট হাইওয়ে ফাঁকা থাকে বলেই পুলিশটুলিশ তেমন থাকে না। যত ইচ্ছা স্পীড তোলা যায় গাড়িতে। রুনকির বান্ধবী শ্যারন এক বার পঁচানব্বই পর্যন্ত তুলেছিল। কি প্রচণ্ড কাপুনি গাড়ির! রুনকির এতটা সাহস নেই। সত্তুরেই তার খানিকটা হাত কাঁপে। তা ছাড়া 'ফল সিজন' বলেই গাছের পাতা ঝরছে। শুকনো পাতার উপর দিয়ে গাড়ি গেলেই অদ্ভুত শব্দ হয়, কেমন যেন ভয়-ভয় করে।

'আপনাদের নিতে এসেছি আমি।'

আনিস মেয়েটিকে দেখে অবাক হল। হালকা-পাতলা গড়নের বাচ্চা একটি মেয়ে। শিশুদের চোখের মতো তরল চোখ। কেমন যেন অভিমানী পাতলা ঠোঁট।

'আপনি বুঝি সেই টীচার? আনিস?' আনিসের উত্তর দেওয়ার আগেই মেয়েটি বলল, 'আমি কিন্তু মাষ্টারদের একটুও পছন্দ করি না। আপনি আবার রাগ করবেন না যেন।'

আনিস হাসিমুখে বলল, 'না, আমি রাগ করব না।'

'মাষ্টাররা ক্লাসের বাইরে কিছু জানে না। জানতে চায়ও না।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ। আমি দশ ডলার বাজি রাখতে পারি, আপনি কবি কীটসের প্রণয়িনীর নাম জানেন না।'

আনিস বেশ অবাক হল। মেয়েটির মুখ হাসি-হাসি কিন্তু ঝগড়া বাধানর একটা সূক্ষ্ম চেষ্টা আছে। শফিক তার গাড়ি নিয়ে এখনো ব্যস্ত। তার ধারণা ঝামেলাটা আসলে ট্রান্সমিশনে নয় কারবুরেটরে, আর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেই সে ঠিক করে ফেলতে পারবে।

আনিস একটি সিগারেট ধরিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'কবি কীটসের প্রণয়িনীর নাম জানা অত্যাবশ্যকীয় বিষয় নয়।'

'আইনস্টাইনের কয় স্ত্রী, সেটা জানা বোধ হয় অত্যাবশ্যকীয়?'

'না, তা নয়। এইসব হচ্ছে বিলাস।'

শফিকের গাড়ি একটি ছোট গর্জন করে আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সে হাসিমুখে বলল, 'দেখলেন তো আনিস ভাই, প্রায় কায়দা করে ফেলেছি। আর দশ মিনিট।'

আনিস সে–কথার জবাব দিল না। রুনকি মাথার স্কার্ফ শক্ত করে বাঁধতে–বাঁধতে মৃদু স্বরে বলল, 'আমি তর্ক করে আপনাকে রাগিয়ে দিতে চাই না। তাহলে মা খুব রাগ করবেন। মাকে আমি রাগাতে চাই না। তাঁর কিছু দিন আগেই নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল। আরেক বার হলে খুব মুশকিল হবে।'

শফিকের গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে। বিকট শব্দ আসছে সেখান থেকে। শফিক কোমরে হাত দিয়ে গাড়িকে উদ্দেশ্য করে ছোটখাট বক্তৃতা দিয়ে ফেলল, 'শালা তুমি মানুষ চেন নাই। কত ধানে কত চাল বুঝ নাই। শালা এক চড় দিয়ে তোমার দাঁত খুলে ফেলব…'

রুনকি খিলখিল করে হেসে ফেলল।

৪

ফাইভ হানড্রেড লেভেলের একটি ক্লাস ছিল সাড়ে দশটায়। আনিস ক্লাসে ঢুকে দেখল, চেয়ারম্যান ড. হিল্ডারবেন্ট পেছনের দিকে বসে আছে। হিল্ডারবেন্ট একা নয়, অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির ড. বায়ারও কফির পেয়ালা হাতে বসে আছে। হিল্ডারবেন্ট বলল, 'আমরা তোমার ক্লাসে বসতে পারি তো?'

আনিস বলল, 'নিশ্চয়ই।'

'কোনো প্রশ্ন–টশ্ন আবার জিজ্ঞেস করো না, হা হা হা।'

আনিস অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। হঠাৎ করে তার ক্লাসে এসে বসার কারণ বোঝা যাচ্ছে না। তবে এরা তাকে পছন্দ করছে না, এটুকু পরিষ্কার বোঝা যায়। পছন্দ না হবার কারণ তার জানা নেই। কোনো কারণ থাকার কথাও নয়।

আনিস বক্তৃতা শুরু করল। ড. বায়ার কিছু শুনছে বলে মনে হল না। নিচু গলায় ফিসফিস করে কী–যেন বলছে হিল্ডারবেন্টকে। এক বার দু' জনেই সশব্দে হেসে উঠল। হিল্ডারবেন্ট আনিসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সরি আনিস, তুমি চালিয়ে যাও।' আনিস যেতে পারল না। ড. বায়ার হঠাৎ করে বললেন, 'তোমার ইংরেজি কথা আমি ঠিক ধরতে পারছি না, আনিস। তুমি কি আরেকটু স্লো যাবে?'

'তুমি তো নিজেই কথা বলছ, বায়ার। আমি স্লো বললেও কিছু যাবে–আসবে না।'

দু'–একটি ছেলে হেসে উঠল। হিল্ডারবেন্ট বলল, 'চালিয়ে যাও। তুমি চালিয়ে যাও।'

আনিস দশ মিনিট আগে ক্লাস শেষ করে দিল। হিল্ডারবেন্ট উঠতে যাচ্ছিল, আনিস বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে হিল্ডারবেন্ট।'

'বল।'

'আজকে হঠাৎ আমার ক্লাসে এসে বসলে কেন? পলিমার রিওলজিতে তোমার কোনো উৎসাহ আছে বলে তো শুনি নি।'

হিন্ডারবেন্ট খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমরা বসেছি একটা জিনিস দেখতে। তোমার সম্পর্কে ডীনের অফিসে একটা রিপোর্ট হয়েছে। বলা হয়েছে তোমার উচ্চারণ কেউ বুঝতে পারছে না।'

'রিপোর্ট কি ছাত্ররা করেছে?'

'তা জানি না। তুমি ডীনকে জিজ্ঞেস করতে পার। আমি অবশ্যি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি তোমার কথা বুঝতে না পারার কোনো কারণ নেই।'

'ধন্যবাদ।'

আনিস কফি খেতে গেল মেমোরিয়াল ইউনিয়নে। ড. এণ্ডারসন খাতাপত্র নিয়ে একটি টেবিল দখল করে বসেছিল। আনিসকে দেখেই গম্ভীর মুখে বলল, 'তোমাদের বাংলাদেশের স্টল দেখে এলাম।'

'কী দেখে এলে?'

'লাইব্রেরিতে আন্তর্জাতিক একটা মেলা হচ্ছে। সেখানে তোমাদেরও একটা স্টল দেখলাম।'

আনিসের মনে হল ড. এণ্ডারসন যেন হাসি গোপন করবার চেষ্টা করল।

'তুমি কফি শেষ করেই যাও।'

স্টলের ব্যাপারটি মিথ্যা নয়।

একটি প্রকাণ্ড টেবিল নিয়ে শফিক বসে আছে। শফিকের গায়ে একটি হাতা-কাটা স্যাণ্ডো গেঞ্জি এবং পরনে সবুজ রঙের একটি লুঙ্গি। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের পোশাক। টেবিলে একটি ময়লা পাঁচ টাকার নোট, দু'টি দশ পয়সা। আরেক পাশে একটি বড় ফুলস্কেপ কাগজে হলুদ মার্কার দিয়ে অ আ লেখা। আনিস স্তম্ভিত।

'ব্যাপার কী শফিক?'

'আরে আনিস ভাই, আজকে ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টে একটা চাকরির খোঁজে এসেছিলাম। শুনি ইন্টারন্যাশনাল উইক হচ্ছে, বাংলাদেশের একটা কিছু না থাকলে দেশের বেইজ্জতী। আমার নিজের কাছে যা ছিল নিয়ে চলে এসেছি।'

'বল কী!'

'জিনিস কম থাকায় সুবিধা হয়েছে। দেশটা কোথায়, কী এইসব সবাই জানতে চাচ্ছে। হা হা হা। নামটা তো জানল, কী বলেন?'

'খালি টেবিল নিয়ে সাত দিন বসে থাকবে বুঝি?'

'আরে না। আজ বিকালেই রুনকিদের বাড়ি থেকে একগাদা জিনিসপত্র নিয়ে আসব দেখবেন। হুলস্থূল কারবার করব। এক মালয়েশিয়ান আমার স্টলের সামনে এসে দাঁত বের করে হাসছিল। শালার অবস্থাটা কী হয় কালকে দেখবেন। রুনকিকে

নিয়ে আসব। দেশের ইজ্জতের একটা ব্যাপার।'

আনিস হাসিমুখে বলল, 'তোমার চাকরির কী ব্যবস্থা হবে? এই সাত দিন আর যাচ্ছ না সেখানে?'

'আরে ভাই, রাখেন চাকরি। মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা এখন।'

লোকজন কেউ কেউ এসে দাড়াঁচ্ছেও স্টলের সামনে। কেউ কেউ বিস্মিত হয়ে বলছে, 'কোন দেশের স্টল এটি?'

'বাংলাদেশের।'

'কোথায় সেটি? প্যাসিফিক আইল্যাণ্ড?'

'না, এশিয়া মহাদেশে।'

'কত বড়ো দেশ সেটি? কত স্কয়ার মাইল?'

'কালকে বলতে পারব। কাল আসবেন।'

'লোকসংখ্যা কত?'

'আগামীকাল জানতে পারবেন। সব লিখে টাঙিয়ে দেওয়া হবে।'

আনিস দূর থেকে দেখল, লোকজন আসছে না শফিকের স্টলে। তবে বুড়ো-বুড়িরা কিছু কিছু আসছে। তারা আবার দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শফিকের বক্তৃতা শুনছে।

'দেশটা অত্যন্ত সুন্দর। সবুজ। গাঢ় সবুজ। সমুদ্র আর নদী। বনে ঘুরে বেড়ায় ইয়া ইয়া রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আগামী কাল যদি আসেন, তবে সেই রয়েল বেঙ্গলের ছবিও দেখতে পাবেন। দয়া করে আসবেন। ভুলবেন না।'

৫

শফিকের কাণ্ডকারখানাই অন্য রকম।

পাঁচটা ডলার পকেটে নিয়ে ফার্গোতে এসে এক মাসের মধ্যে দু' শ' চল্লিশ ডলার দিয়ে গাড়ি কিনে ফেলল। আমিন সাহেব খবর পেয়ে বিরক্ত হলেন খুব, 'গাড়ি কিনলে, গাড়ির দরকারটা কী তোমার?'

শফিক মাথা চুলকে বলেছে, 'দেশের সম্মানের জন্যেই কাজটা করলাম।'

'দেশের সম্মান! দেশের সম্মান মানে?'

'গরিব দেশ গরিব দেশ করে তো, বুঝলেন না! শালাদের দেখিয়ে দিলাম আর কি।'

'তোমার দুই শ' ডলারের গাড়ি দিয়ে ওদের দেখিয়ে দিলে? চালাতে জান গাড়ি?'

'শিখব।'

এখানেই শেষ নয়, আর্টসের ছাত্র কীভাবে সায়েন্সের কম্বিনেশনে চার–পাঁচটা সাবজেক্ট নিয়ে ফেলল। আমেরিকায় এসে ইতিহাস–ভূগোল পড়ে লাভটা কী? পড়তে হলে পড়তে হয় ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কম্প্যুটার সায়েন্স।

মিডটার্মের রেজাল্ট হওয়ার পর ফরেন স্টুডেন্ট এ্যাডভাইজার টয়লা ক্লিন ডেকে পাঠালেন শফিককে। রেজাল্ট ভয়াবহ : তিনটি ডি এবং একটি সি।

'শফিক, তোমার দেশ কোথায়?'

শফিক গম্ভীর হয়ে বলল, 'ইণ্ডিয়া ম্যাডাম। ক্যালকাটা সিটি।'

টয়লা ক্লিন কাগজপত্র ঘেঁটে শফিকের চেয়েও গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিন্তু আমার কাছে যেসব কাগজপত্র আছে, সেখানে লেখা বাংলাদেশ।'

শফিক মাথা চুলকায়, জবাব দেয় না।

'তুমি কি দয়া করে ব্যাপারটা আমার কাছে এক্সপ্লেইন করবে?'

'রেজাল্ট যা হয়েছে ম্যাডাম এতে দেশের একটা বদনাম হয়ে যায়, এই জন্যেই বলি ইণ্ডিয়া।'

টয়লা ক্লিনের গাম্ভীর্য মনে হয় খসে পড়ছে। ঠোঁটের কোণায় মৃদু হাসি।

'তোমার দেশের সব ছাত্র বুঝি 'এ' পায়?'

'ম্যাডাম, আমার দেশের ছাত্ররা সব বাঘের বাচ্চা। যে–কোনো আমেরিকান স্টেইট 'এ' ছেলেমেয়েদের এরা কুৎ করে পানি দিয়ে গিলে ফেলবে।'

'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'অর্থাৎ এরা খুব মারাত্মক। একেবারে গ্রীন পিপার।'

টয়লা ক্লিন বলে দিলেন, ফাইন্যালে যে–করেই হোক এভারেজ সি থাকতেই হবে। জিপিএ ২এর কম হলে ভিসা রিনিউ হবে না, দেশে ফিরে যেতে হবে।

'বাইরে দিনে ছয়–সাত ঘন্টা কাজ করে পড়ারই সময় পাই না, ম্যাডাম।'

'কোথায় কাজ কর তুমি?'

'নিক্স প্লেসে। বিয়ার বিক্রি হয় সেখানে।'

চার দিন পর শফিকের কাছে টয়লা ক্লিনের এক চিঠি এসে হাজির।

'প্রতি ঘন্টায় মিনিমাম ওয়েজ তিন ডলার পঞ্চাশ সেন্ট করে তোমাকে লাইব্রেরিতে একটি কাজ দেয়া হল। এখন পড়াশোনার ভালো সুযোগ পাবে।'

লাভ কিছু হল না। ফাইন্যালে দেখা গেল চারটেই ডি। টয়লা ক্লিন ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'এখন কী করবে?'

'গভীর সমুদ্রে ম্যাডাম। বিষ খাওয়া ছাড়া উপায় নাই কিছু।'

'আরেকটা কোয়ার্টারের সুযোগ যাতে দেয় এই চেষ্টা করব? প্রথম দিকে কিছু সহজ কোর্স নিলে কেমন হয়?'

শফিককে দ্বিতীয় কোয়ার্টারের সুযোগ দেওয়া হল। ডীনের অফিস থেকে পার্মিশনের জন্যে টয়লা ক্লিনকে প্রচুর দৌড়াদৌড়ি করতে হল। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে

হল দু'টি ডি এবং একটি সি, ও একটি এফ। টয়লা ক্লিন গম্ভীর হয়ে বলল, 'এই ইউনিভার্সিটিতে তুমি আর পড়তে পারছ না শফিক। কী করবে এখন? দেশে ফিরে যাবে?'

'না।'

'ইল্লিগেল এ্যালিয়েন হিসাবে থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

টয়লা ক্লিন শান্ত স্বরে বলল, 'গুড লাক। আমেরিকা হচ্ছে ল্যাণ্ড অব অপারচুনিটি। কিছু একটা হয়েও যেতে পারে তোমার।'

শফিক গ্রেভার ইনের কাছে একটা ঘর ভাড়া করে নিক্স প্রেসের কাজে লেগে গেল।

নিক্স প্রেস যে-মহিলাটি চালায় তার নাম জোসেফাইন নিক্স। লম্বায় চার ফুট তিন ইঞ্চি। দৈর্ঘ্যের স্বল্পতা সে অবশ্যি পুষিয়ে নিয়েছে ওজন দিয়ে। বর্তমান ওজন ২৩০ পাউণ্ড। সে-ওজনও প্রতি সপ্তাহে বাড়ছে। গায়ের রঙ ঘন কৃষ্ণবর্ণ। গত ছয় পুরুষ ধরে আমেরিকায় বাস করেও আফ্রিকার আদিম বর্ণের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। শফিককে চাকরি দেবার সময় সে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'তোমাকে চাকরি দিচ্ছি একটি মাত্র কারণে, তোমার গায়ের রং কালো। সাদা মানুষগুলিকে ঈশ্বর বিষ্ঠা দিয়ে তৈরি করেছেন। সাদা মানুষের রক্তের মধ্যে একটা জিনিসই আছে, সেটা কী জান?'

'না।'

'বিষ। আসল হেমলক বিষ। পৃথিবীতে যত অন্যায় অবিচার হয়েছে, সব করেছে সাদা মানুষ।'

'তাই কি?'

'একদম খাঁটি কথা। আমার এখানে সাদা মানুষ ঢুকলে পাছায় লাথি দিয়ে বের করে দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তা দেওয়া যায় না। কারণ ফেডারেল আইনে সাদা এবং কালোর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই। কি কুৎসিত আইন। সাদা কখনো কালোর সমান হয়?'

জোসেফাইনের এখানে একটি সাদা ছেলেও কাজ করে। কিন্তু তাতে জোসেফাইনের কিছুই যায় আসে না। চক্ষু-লজ্জাটজ্জা বলে তার কাছে কিছু নেই। সাদা মানুষদের মুণ্ডপাত না করে সে তার দিন শুরু করে না।

'হ্যারি (জোসেফাইনের স্বামী) যে আজ জেলে খাবি খাচ্ছে, সে কিসের জন্যে? কী কারণে? একটি মাত্র কারণ, জজ সাহেব ছিল সাদা। জুরীরা ছিল সাদা। যে পুলিশ ধরেছে, সেও ছিল সাদা। এই অবস্থায় হ্যারির বিশ বছরের জেল হবে না তো কার হবে? ইলেকট্রিক চেয়ারে নিয়ে যে বসায় নি, সে আমার উপর মাদার মেরীর অসীম করুণা আছে বলেই।'

হ্যারির অভাবে জোসেফাইন যে খুব কাতর, সে-রকম মনে করারও কোনো কারণ নেই। দিনের মধ্যে দু' এক বার সে বলবেই যীশু খ্রিষ্টের দয়া, হ্যারি এখন জেলে। বাইরে থাকলে নিক্স প্লেসের অর্ধেক বিয়ার সেই খেয়ে ফেলত। এখন ভালো হয়েছে। জেলে বসে আঙুল চুষছে।

কাস্টমারদের সঙ্গে নিত্যদিন খিটিমিটি লেগে আছে। কেউ হয়তো বলল, 'ব্লাডি মেরীতে জল মনে হচ্ছে বেশি হয়ে যাচ্ছে জোসেফাইন।'

'বেশি হলে খেও না, তোমাকে পায়ে ধরে সাধছি?'

'পয়সা দিচ্ছি, ঠিক জিনিস খাব। পানি-মেশান ব্লাডি মেরী খাব কেন?'

'আলবত খাবে। তুমি একা নও, তোমার চোদ্দগুষ্টি খাবে।'

টাকা-পয়সা নিয়েও শফিকের সঙ্গে তার খিটমিটি লেগেই আছে। ঘন্টায় দু' ডলারের বেশি কিছুতেই দেবে না। পোষালে কাজ কর, না-পোষালে করবে না। দশ ঘন্টা কাজ করলে সে হিসাব করে বের করে সাত ঘন্টা কাজ হয়েছে। তার বড়ো মেয়ে এ্যালেনকে নিয়েও তার আদিখ্যেতার অন্ত নেই। সুযোগ পেলেই গলা নিচু করে বলবে, 'খবর্দার, কোনো রকম ফষ্টিনষ্টির চেষ্টা করবে না। আমার মেয়েটা খারাপ। একটু ইশারা করলেই সর্বনাশ। আমি যদি দেখি এইসব কিছু হচ্ছে, তাহলে খুন করে ফেলব, হুঁ-হুঁ।'

এ্যালেন নিজেও তার মায়ের মতো তিন-মণী বস্তা। তাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করার ইচ্ছা হবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু মেয়ের মা তা বোঝে না।

মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র অবশ্যি সত্যি সত্যি ভালো নয়। আড়ালে পেলেই শফিকের সঙ্গে কুৎসিত সব অঙ্গভঙ্গি করে। একদিন বেশ ভালোমানুষের মতো শফিককে মুভি দেখাতে নিয়ে গেল। মুভি দেখাবার এত সাধ্যসাধনার কারণ জানা গেল মুভি শুরু হবার পর। হার্ড কোর পর্ণো মুভি একটি। মেয়েটি মেঘস্বরে বল, 'সব কায়দা-কানুন যাতে শিখতে পার, সে জন্যেই নিয়ে এলাম। অনেক কিছু জানার আছে।'

৬

টুকটুক করে টোকা পড়ছে দরজায়। তার মানে যে এসেছে সে পরিচিত কেউ নয়। পরিচিতরা ডোরবেল বাজায়। ডোরবেলটি এমন জায়গায় যে অচেনা কারোর চোখে পড়ে না।

আনিসের মনে হল যে এসেছে সে এক জন মহিলা। শুধুমাত্র মেয়েরাই দরজায় দু' বার টোকা দিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তৃতীয় বার টোকা দেয়। ছেলেদের এত ধৈর্য নেই।

আনিস দরজা খুলে দিল। একটি মেয়েই দাঁড়িয়ে আছে, মালিশা। দিনের আলোয় তাকে একেবারেই চেনা যাচ্ছে না। তার উপর সে বেশ সাজগোজ করেছে। কাঁধে লাল টকটকে ভেলভেটের ব্যাগ। সোনালি চুলগুলিকে লম্বা বেণী করে কাঁধের দু' পাশে ঝুলিয়ে দিয়েছে। রাতের আলোয় যতটা অল্পবয়েসী মনে হয়েছিল, এখন অবশ্যি সে-রকম লাগছে না।

'তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ?'

'তা পারছি। তুমি মালিশা। মালিশা গিলবার্ড।'

'আমি কি ভেতরে এসে বসতে পারি?'

'হ্যাঁ, পার।'

মেয়েটি ঘরে ঢুকেই বলল, 'তুমি সন্ধ্যাবেলা ফ্রী আছ?'

'কেন বল তো?'

'আমি তোমাকে কোনো একটি ভালো রেস্টুরেন্ট নিয়ে যেতে চাই। আজ আমার জন্মদিন।'

'শুভ জন্মদিন মালিশা।'

'ধন্যবাদ। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে?'

আনিস ইতস্তত করতে লাগল।

'তোমার ইচ্ছা না হলে যেতে হবে না।'

আনিস বলল, 'কোথায় যেতে চাও?'

'আমার পকেটে চল্লিশ ডলার আছে। এর মধ্যে হয়, এরকম কোনো রেস্টুরেন্ট। মেক্সিকান খাবার তোমার পছন্দ হয়? সেগুলি বেশ সস্তা।'

'মেক্সিকান খাবার আমার খুব পছন্দ।'

'তোমাকে খুব একটা ভালো রেস্টুরেন্টে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল আমার। কিন্তু কী করব বল? রোজগারপাতি নেই। হাইস্কুল পাস করি নি। কাজেই রেস্টুরেন্টের ওয়েট্রেস আর বেবিসিটিং-এর বেশি কিছু পাই না। চল্লিশ ডলার জমাতে হলে আমাকে দু' মাস রোজ আট ঘন্টা করে কাজ করতে হয়।'

আনিস বলল, 'তুমি যদি কিছু মনে না কর, তাহলে আমি বরং ডিনারটা কিনি।'

মালিশা হেসে ফেলল।

'এখন আমার অবস্থা খুবই খারাপ। কিন্তু শিগ্‌গিরই আমি মাল্টিমিলিওনিয়ার হচ্ছি। কাজেই টাকা খরচ করতে মায়া লাগে না আমার।'

আনিস বলল, 'মিলিওনিয়ার সত্যি সত্যি হচ্ছ তুমি?'

'ইউ বেট। আমার মা ডলারের বস্তার উপর শুয়ে আছে। আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, যদি বিষটিষ খাইয়ে দিই। আমিও বুড়িকে ভজিয়ে রাখছি: প্রতি সপ্তাহে চিঠি দিই--মা, তোমার শরীর কেমন আছে? ঠিকমতো ওষুধপত্র খাচ্ছ

তো? গরমের সময় অবশ্যই হাওয়াই থেকে ঘুরে আসবে। হা হা হা।'

আনিস হেসে ফেলল। মালিশা বলল, 'বুড়ো-বুড়ি হলেই মানুষ এরকম হয়ে যায়। ডলারই তখন প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। জীবন দিয়ে ডলার আগলে রাখে। আমার মতে পঞ্চাশের ওপর বয়স হলেই তাকে ঘাড় ধরে একটা নির্জন দ্বীপে ফেলে দিয়ে আসা উচিত। না-না, আমি খুব সিরিয়াস। জান তুমি, আমার মার কত টাকা আছে? আন্দাজ করতে পার?'

'না।'

'মা দু' নম্বর বিয়ে করে এক জন পোল ব্যবসায়ীকে। তার হচ্ছে সী কার্গোর ব্যবসা। আমার স্টেপফাদার মারা যাবার পর সবকিছু আমার মা পেয়েছে। তার মধ্যে আছে রাজপ্রসাদের মতো দু'টি বাড়ি। একটি ফ্লোরিডাতে, অন্যটি বোহেমিয়া আইল্যাণ্ডে। মা সবকিছু বিক্রি করে ডলার বানিয়ে ব্যাঙ্কে জমা করেছে। নিজে গিয়ে উঠেছে ওল্ড হোমে। সস্তায় থাকা-খাওয়া যায়। বিশ্বাস করতে পার?'

'বিশ্বাস করা কঠিন।'

'আমি তারই মেয়ে। আর দেখ, চল্লিশটি ডলার খরচ করতে আমার গায়ে লাগছে।'

আনিস দেখল, মেয়েটির চোখ ছলছল করছে। আমেরিকান মেয়ে কাঁদবে না ঠিকই। এরা মচকাতে জানে না।

আনিস বলল, 'ছ'টার আগে নিশ্চয়ই তুমি খেতে যাবে না? কফি খাও একটু।'

'দাও।'

'কফিতে দুধ চিনি নাও তুমি?'

'দু' চামচ চিনি। দুধ চাই না।'

আনিস কফি বানাতে বানাতে বলল, 'মিলিওনিয়ার যখন হবে, তখন এত টাকা খরচ করবে কীভাবে?'

'প্রথমেই প্লাস্টিক সার্জারি করব। আমার বুক দু'টি বড়োই ছোট। সিলিকোন বাগ দিয়ে বড়ো করব। আমাকে দেখে অবশ্যি বোঝা যায় না, আমার বুক এত ছোট। আমি অন্য ধরনের ব্রা ব্যবহার করি। ফোম ব্রা।'

'ও আচ্ছা।'

'এই ব্রাতে ছোট বুকও খুব এ্যাটাকটিভ মনে হয়। ব্রা খুললেই তুমি হতাশ হবে। দেখতে চাও?'

'না, না ঠিক আছে, বিশ্বাস হচ্ছে তোমার কথা।'

'তাছাড়া আমার নাকটাও বেশি ভালো না। মনে হয় অনেকখানি ঝুলে আছে। তাই না?'

'আমার তো মনে হয় না।'

'তোমার সৌন্দর্যবোধ নেই, তাই বুঝতে পারছ না-- নাকটা অল্প একটু তুলে

দিলেই সব বদলে যাবে।'

'কেমন বদলাবে?'

'যেমন ধর, তখন যদি তোমাকে বলি--ব্রা খুললেই দেখবে আমার বুক দু'টি টাইনি, তুমি দেখতে চাও? তুমি বলবে--তাই নাকি? কই দেখি তো?'

আনিস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'মালিশা, তুমি বেশ বুদ্ধিমতী।'

'আমার মায়েরও তাই ধারণা। মা বলেন--বুড়ো বয়সে কোনো ধনী মহিলার উচিত নয় তার মেয়েকে কাছে রাখা, বিশেষ করে সে মেয়ে যদি আমার মতো ইন্টেলিজেন্ট হয়।'

'কফি কেমন হয়েছে মালিশা?'

'ভালো।'

'আরেক কাপ নেবে?'

'দাও। তোমার নাম কিন্তু আমি জানি না।'

'আনিস।'

'তুমি কি ইণ্ডিয়ান?'

'না, বাংলাদেশ হচ্ছে আমার দেশ।'

'সেটা আবার কোথায়?'

'ইণ্ডিয়ার পাশে ছোট একটা দেশ।'

'সেখানেও কি ইণ্ডিয়ার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ থালা হাতে খাবারের জন্যে ঘুরে বেড়ায়?'

'কোথায় শুনেছ এসব?'

'আগে বল সত্যি কিনা। ডাস্টবিনের পাশে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বসে থাকে--কখন কেউ এসে খাবার ফেলবে সেই আশায়। বল, সত্যি নয়? নাকি তোমার স্বীকার করতে লজ্জা লাগছে?'

আনিস ইতস্তত করে বলল, 'সত্যি নয়। বড়ো বড়ো অভাব হয়েছে। সে তো পৃথিবীর সব দেশেই হয়েছে। ইউরোপে হয় নি? আমেরিকাতেও তো ডিপ্রেসন হয়েছে।'

'আনিস, তুমি রেগে যাও কেন? তোমাকে রাগাবার জন্যে আমি বলি নি।'

'তোমরা যা ভাব, দেশটি মোটেই সে-রকম নয়।'

মালিশা ঠোঁট চেপে হাসল। পরমুহূর্তে ভালোমানুষের মতো বলল, 'ইলেকট্রিসিটি আছে?'

'এসব জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'কারণ, জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। বলতে ইচ্ছা না হলে বলবে না।'

আনিস গম্ভীর মুখে বলল, 'না মালিশা, ইলেকট্রিসিটি-ফিটি নেই। গাড়ি ফাড়িও নেই। শহরে বাস সার্ভিসের বদলে আছে এলিফ্যান্ট সার্ভিস। হাতির পিঠে

চড়ে যাওয়া–আসা।'

'ঠাট্টা করছ?'

'তা করছি।'

'কেউ আমার সঙ্গে ঠাট্টা করলে আমার ভালো লাগে না। প্লীজ, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবে না এবং আমি সরি।'

'সরি কী জন্যে?'

'তোমাদের দেশের কথা বলে হার্ট করেছি, সেই জন্যে। আমার যখন টাকা হবে, তখন আমি তোমার দেশ দেখতে যাব।'

'বেশ তো।'

'দেশে তোমার কি বউ আছে?'

'না।'

'কোনো সুইটহার্ট?'

'না, তাও নেই।'

'আমি মনে মনে আশা করছিলাম, তুমি বলবে "না"। বিবাহিত লোকদের আমার ভালো লাগে না।'

টুনটুন করে ঘন্টা বাজছে। যে এসেছে, সে যদিও ডোরবেল বাজাচ্ছে, তবু লোকটি অপরিচিত। এরকম করে ঘন্টা কেউ বাজায় না। ছোট বাচ্চাদের মতো অনবরত টিপেই যাচ্ছে। আনিস দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল। নিশানাথ বাবু।

নিশানাথ বাবু ঢুকেই মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'এই মেয়েটি বড়ো সুন্দর তো! দূর্গা প্রতিমার মতো চোখ।'

মালিশা বলল, 'আপনি কি আমাকে নিয়ে কিছু বলছেন? আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

নিশানাথ বাবু হাসিমুখে বললেন, 'আমি বলছি এই মেয়েটি কে? আমাদের এক গডেস–এর চোখের মতো অপূর্ব চোখ!'

মালিশা হাসিমুখে বলল, 'আমার নাম মালিশা। আজ আমার জন্মদিন। জন্মদিন উপলক্ষে আপনি কি আমার সঙ্গে দয়া করে ডিনার খাবেন?'

'খাব না কেন?'

নিশানাথা বাবুর ভাব দেখে মনে হল, তিনি খুব অবাক হয়েছেন প্রশ্ন শুনে।

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে কিন্তু মাত্র চল্লিশ ডলার আছে। মেক্সিকান রেস্টুরেন্টে গেলে মনে হয় এতেই তিন জনের হয়ে যাবে, কি বলেন?'

'টেকো খেতে আর কয় পয়সা লাগবে? হয়েও থাকবে, দেখবে।'

নিশানাথ বাবু ঠিকানা যোগাড় করে কী জন্যে হঠাৎ এসেছেন, আনিস বুঝতে পারল না। নিশানাথ বাবু ফার্গোতে এসেছিলেন বাংলাদেশের স্টল দেখতে। সেখান থেকে আনিসের কাছে এসেছেন। কারণ রেহানা বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন

আনিসের ঘর হয়ে আসতে। হঠাৎ করে আনিসের সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে কেন, নিশানাথ বাবু বুঝতে পারেন নি। অনেক কিছুই তিনি বুঝতে পারেন না। আসতে বলা হয়েছে, তিনি এসেছেন। ব্যস।

আনিস বলল, 'বাংলাদেশের স্টল কেমন দেখলেন?'

'চমৎকার। ঐ টম ছোকরা কী সব কায়দাকানুন করে দিয়েছে, আমি স্তম্ভিত। টেবিলটাতে হার্ডবোর্ড-ফোর্ড লাগিয়ে রং-টং দিয়ে এমন করেছে, দেখে মনে হয় একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ছোকরার গুণ আছে।'

মালিশা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, 'আপনার নামটা কি দয়া করে বলবেন?'

'আমার নাম নিশানাথ।'

'এই নামের মানে কি?'

'এর মানে হল গড অব দ্য ডার্কনেস।'

'বাহ্, মজার নাম তো!'

নিশানাথ বাবু সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'ঐ টম ছোকরার গুণ আছে। হুলস্থূল করছে, বুঝলেন নাকি আনিস সাহেব। পেছনে হার্ডবোর্ডের উপর বৃষ্টির ছবি এঁকেছে। ছবির দিকে তাকালেই বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনা যায়। মনে হয় ব্যাঙ ডাকছে চারদিকে।'

মালিশা বলল, 'ব্যাঙ ডাকছে মানে?'

'আমাদের দেশে বৃষ্টি হলেই ব্যাঙ ডাকে। সেই শব্দ জগতের মধুরতম ধ্বনির একটি। তুমি না শুনলে বুঝতে পারবে না।'

'ব্যাঙের ডাক তো আমি শুনেছি। ওর মধ্যে মধুরতর কী আছে? এই সব আপনি কী বলছেন?

'মালিশা, তোমাকে বোঝান যাবে না।'

নিশানাথ বাবু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। মালিশা অবাক হয়ে বলল, 'আপনি অদ্ভুত লোক। সত্যি অদ্ভুত!'

মালিশার বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হল।

মেট্রোপলিটন বাসে উঠতে গিয়ে দেখে একটার উপর বাজে। ফাঁকা বাস। সে ছাড়া অন্য কেউ নেই। একটি নব্বই বছরের বুড়ি ছিল, সে টুয়েলভ স্ট্রীটে নেমে গেল। নামবার সময় বুড়িটি বলল, 'আমাকে একটু হাত ধরে নামিয়ে দেবে?'

মালিশা এমন ভাব করল, যেন সে শুনতে পায় নি। বুড়ি দ্বিতীয় বার কিছু না বলে নিজে নিজেই নামল। এই বয়সেও রাতদুপুরে একা-একা বাসে চড়া চাই। খোঁজ নিলে দেখা যাবে পাসবই-ভর্তি ডলার। তবু পাঁচ ডলার খরচ করে ক্যাব ডাকবে না। দেশে একটা ফেডারেল আইন থাকা দরকার, যে-আইনে সত্তুরের উপর বয়স হলে সব টাকা-পয়সা সরকারের কাছে সারেণ্ডার করে নির্বাসনে যেতে হয়।

বাস ডাউনটাউনে আসতেই মালিশা নেমে গেল। এখানে বাস বদল করতে হবে। বাস থেকেই মালিশা লক্ষ করল তার হাত–পা শিরশির করছে। নির্ঘাত আবার জ্বর আসছে। এ রকম হচ্ছে কেন? বারবার শরীর খারাপ হচ্ছে। মালিশা মাথা নিচু করে দ্রুত হাঁটতে লাগল। শরীর বেশি খারাপ হবার আগেই এ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাওয়া দরকার।

বাস–স্ট্যাণ্ডটি ফার্স্ট এ্যাভিন্যুতে। মালিশার ইচ্ছে হল, বাসের জন্যে না হেঁটে একটি ক্যাব ডাকে। সে খোলা একটি ট্যাভার্ণে ঢুকে পড়ল। ক্যাব কোম্পানিকে টেলিফোন করতে হবে।

জন ট্রিভলটার রেকর্ড বাজছে উচ্চ স্বরে। কোমর জড়াজড়ি করে ডায়াসের কাছে দু'–তিনটে ছেলেমেয়ে নাচছে। সেদিকে তাকিয়ে মালিশার কেমন যেন মাথা ঘুরতে লাগল।

'হ্যালো মালিশা, গা গরম করবে নাকি? নাচবে এক পাক?'

মালিশা তাকাল, কিন্তু ছেলেটিকে চিনতে পারল না।

'মালিশা, এস।'

'নাহ্।'

'না কেন?'

'আমার শরীর ভালো লাগছে না।'

মলিশা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। চিনতে পারছে না কেন? ছেলেটি এসে পরিচিত ভঙ্গিতে হাত ধরল। গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'যাবে না কি আমার সঙ্গে?'

'কোথায়?'

'আমার এ্যাপার্টমেন্ট। দু' জনের ছোটখাটো একটা পার্টি হয়ে যাবে, কী বল?'

'না।'

'না কেন? আস। আমি তো অপরিচিত কেউ নই। আগেও তো আমাব সঙ্গে ডেটে গিয়েছ। এস এস, খুব ফান হবে।'

৷

রাহেলা দরজা খুলে দেখতে পেলেন ছ' ফুট লম্বা টম দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার সারা মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। খালি গা। পরনে জিনসের একটি হাফপ্যান্ট। পায়ে জুতোটুতো কিছুই নেই।

'আমি রুনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'কার সঙ্গে?'

'রুন, রুনকি।'

রাহেলা এক বার ভাবলেন বলেন রুনকি বাড়ি নেই। কোথায় গেছে জানি না। কিন্তু বলতে পারলেন না। টম ভারি গলায় বলল, 'তুমি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারছ না। আমার নাম টমাস গ্রে। আমি রুনের বন্ধু।'

'ভেতরে এসে বস, আমি ডেকে দিচ্ছি।'

'না, আমি ভেতরে এসে তোমার কার্পেট নোংরা করব না। পায়ে আমার প্রচুর ময়লা।'

রাহেলা রুনকির ঘরে উঁকি দিলেন। রুনকি চুল ছেড়ে চুপচাপ বসে আছে। হালকা সুরে পোলকা মিউজিক বাজছে। রুনকির সামনে গাদাখানিক বইপত্র ছড়ান। রাহেলা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে ডাকলেন, 'রুনকি?'

'ভেতরে এস, মা।'

'রুনকি, তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।'

রুনকি হাসিমুখে বলল, 'কথা বলতে চাইলে বল। এত গম্ভীর হয়ে আছ কেন?'

রাহেলা থেমে থেমে বললেন, 'আমরা তোমাকে ভালোবাসি এবং তোমার মঙ্গল চাই--এই সম্পর্কে তোমার কোনো সন্দেহ আছে?'

'আছে।'

রাহেলা মুখ কালো করে বললেন, 'আমি তা জানতাম না।'

'ঠাট্টা করছিলাম মা। তুমি ঠাট্টা বুঝতে পার না, এ তো বড়ো মুশকিল।'

রাহেলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি চাই না, তুমি টমের সঙ্গে মেলামেশা কর।'

রুনকি খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'টম কি এসেছে?'

রাহেলা উত্তর দিলেন না। রুনকি ঝড়ের বেগে নিচে নেমে গেল। রাহেলারও ইচ্ছা হল নিচে নামেন। কিন্তু নামলেন না। নামলেই হয়তো দেখবেন দু' জন জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘদিন আমেরিকায় বাস করার পরও এই দৃশ্য তাঁর ভালো লাগে না। রাহেলা মন্থর পায়ে নিজ ঘরের দিকে এগোলেন। তার কিছুক্ষণ পর রুনকি আবার উপরে উঠে এল। নিজের ঘরে বসেই রাহেলা বুঝতে পারলেন রুনকি সাজগোজ করছে। হালকা সুরে শিস দিচ্ছে। মেয়েদের শিস দেয়া একটা কুৎসিত ব্যাপার।

সেই রাত্রে রুনকি আর বাড়ি ফিরল না।

৮

ক্লাস থেকে বেরুনমাত্র এণ্ডারসনের সঙ্গে দেখা। এণ্ডারসন লোকটি ফুর্তিবাজ। দেখা

হলেই একটা মজাদার কথা বলবে কিংবা জিভ বের করে ভেংচে দেবে। কে বলবে সে হেটারোসইক্লিক কম্পাউণ্ডের এক জন বিশেষজ্ঞ--এক জন ফুল প্রফেসর।

আনিস বলল, 'হ্যালো এ্যাণ্ডারসন।'

এ্যাণ্ডারসন একটি চোখ বন্ধ করে অন্য চোখ পিটপিট করতে লাগল। আনিস হেসে ফেলতেই সে বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে আনিস। এস, কফি খেতে-খেতে বলব।'

কফি হাউসে তিলধারণের জায়গা নেই। ফাইন্যাল এগিয়ে আসছে। ছেলেমেয়েরা বইখাতা নিয়ে ভিড় জমাচ্ছে হাউসে, কেউ টেবিল ছাড়ছে না। খুপরি ঘরগুলির একটিতে জায়গা পাওয়া গেল মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থাকার পর। আনিস বলল, 'কী বলবে বল।'

'ইদানীং কি তুমি অল্পবয়সী একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছ?'

আনিস অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কি জন্যে জিজ্ঞেস করছ?

'কারণ আছে। আমেরিকা একটি ফ্রী কান্ট্রি। তুমি কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি প্রবলেম হয়েছে।'

'কী প্রবলেম?'

এ্যাণ্ডারসন গম্ভীর মুখে বলল, 'মেয়েটি একটি প্রসটিটিউট।'

আনিস চুপ করে রইল। এ্যাণ্ডারসন আবার বলল, 'তুমি প্রসটিটিউটের সঙ্গে ঘুরলেও কিছু যায় আসে না। কিন্তু মাঝেমাঝে বড়ো রকমের ঝামেলা হয়। হঠাৎ এক দিন হয়তো মেয়েটি তোমাকে এসে বলবে, আমার পেটে তোমার বাচ্চা। এবরশনের জন্যে হাজার দশেক ডলার দরকার।'

আনিস গম্ভীর মুখে বলল, 'জানলে কী করে, মেয়েটি একটি প্রসটিটিউট?'

'আমি জানি। মেয়েটির নাম নিশ্চয়ই মালিশা। ঠিক না?'

আনিস জবাব দিল না।

জোসেফাইন পঞ্চম বারের মতো শফিকের চাকরি নট করে দিল।

'তোমার মতো মিনমিনে শয়তান, ফাজিল আর অকর্মাকে ছাড়াও আমার চলবে। শুক্রবারে এসে পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবে।'

বুড়ির রেগে যাওয়ার কারণ, শফিক এক জন কাস্টমারের নাকে গদাম করে ঘুষি মেরেছে। বেচারার দোষ হচ্ছে, সে নাকি শফিকের দেশ বাংলাদেশ শুনে কোমরে হাত দিয়ে হায়নার মতো হেসেছে। জোসেফাইন চোখ লাল করে বলেছে, 'হেসেছে বলেই ঘুষি মারবে? খুশি হয়ে বেচারা হেসেছে।'

'খুশি হয়ে হেসেছে মানে? এই হাসি খুশি হওয়ার হাসি?'

'কিসের হাসি সেটা? বল তুমি কিসের হাসি?

কিসের যে হাসি তা অবশ্যি শফিকও জানে না। হয়তো বিনা কারণে হেসেছে।

কিন্তু শফিকের মেজাজ সকাল থেকেই খারাপ যাচ্ছিল। সকালবেলাতেই খবর পাওয়া গেছে জেমসটাউনের রকিবউদ্দিন একটি রেস্টুরেন্ট দিচ্ছে। মন খারাপ করার মতো খবর নয়। কিন্তু রেস্টুরেন্টের নাম দিয়েছে 'ইণ্ডিয়া হাউস'। শফিককে টেলিফোন করে বলল, 'বাংলাদেশের নাম তো কেউ জানে না। কিন্তু ইণ্ডিয়ান ফুডের নাম জগৎজোড়া, কাজেই নাম দিলাম ইণ্ডিয়া হাউস।' আপনি ভাই ফার্গোর সব বাঙালিদের খবর দেবেন। ইনশাআল্লাহ্ আগামী মাসেই খুলব।'

শফিক মেঘস্বরে বলল, 'ইণ্ডিয়া হাউস নাম দিয়েছেন?'

'এখনো ফাইন্যাল করি নি। 'ইণ্ডিয়া ফুডস'—ও দিতে পারি।'

'অর্থাৎ ইণ্ডিয়া থাকবেই?'

'হ্যাঁ, তা তো থাকতেই হবে।'

'শোনেন ভাই, আপনাকে যদি আমি ফার্গোতে দেখি, তাহলে আপনাকে আমি খুন করে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসব, বুঝেছেন?'

'আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছি না।'

'চুপ শালা।'

শফিক টেলিফোন রেখে নিক্স প্লেসে এসেই কাস্টমারের নাকে ঘুষি বসাল। জোসেফাইন এবার সত্যি সত্যি রেগেছে। এ পর্যন্ত তিন বার বলেছে।

'শফিক তোমাকে যেন আর না দেখি। যথেষ্ট হয়েছে।'

শফিক নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখে, ইমিগ্রেশন থেকে চিঠি এসেছে সে যেন চিঠি পাওয়ার সাত দিনের ভেতর ইমিগ্রেশন এ্যাণ্ড ন্যাচারলাইজেশন অফিসার টি. রবার্টসনের সঙ্গে দেখা করে।

শফিককে এ নিয়ে খুব চিন্তিত মনে হল না। তার মাথায় ঘুরছে, কী করে হারামজাদা রহমানকে একটা উচিত শিক্ষা দেওয়া যায়। একটা বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট দিয়ে ফেললে কেমন হয়? খুব কি কঠিন ব্যাপার? নাম দেওয়া যেতে পারে 'দি মেঘনা'—এ প্লেস ফর এক্সোটিক বাংলাদেশী ফুড। কিন্তু ফুড কি এক্সোটিক হবে? শব্দটা ঠিক আছে নাকি? এইসব ব্যাপারে রুনকি এক জন ছোটখাটো বিশেষজ্ঞ। শফিক টেলিফোন করল তৎক্ষণাৎ। টেলিফোন ধরলেন রাহেলা।

'আমি শফিক।'

'বুঝতে পারছি। কী ব্যাপার?'

'খালা, আমরা একটা রেস্টুরেন্ট দিচ্ছি, নাম হচ্ছে আপনার— 'দি মেঘনা।'

'কী দিচ্ছ?'

'রেস্টুরেন্ট। বাংলাদেশী সব খাবারটাবার পাওয়া যাবে। আজ সন্ধ্যায় বাসায় এসে সব আলাপ করব।' রাহেলা গম্ভীর গলায় বললেন, 'সন্ধ্যাবেলা আমরা থাকব না।'

'ও আচ্ছা, রুনকিকে একটু দিন। ওর সঙ্গে কথা বলি।'

'রুনকি তো নেই।'

'নেই মানে?'

রাহেলা থেমে থেমে বললেন, 'তুমি কি কিছু জান না?'

'না, কী জানব?'

'রুনকি এখন আর আমাদের সঙ্গে থাকে না।'

'কোথায় থাকে তাহলে?'

রাহেলা ঠাণ্ডা স্বরে বললেন, 'আমি জানি না কোথায় থাকে।'

শফিক অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, 'কই, আমাকে তো কিছু বলেন নি।'

'তোমাকে বলতে হবে কেন? তুমি কে?'

রাহেলা টেলিফোন নামিয়ে রেখে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠলেন। এই শহরে আর থাকতে পারবেন না। অনেক দূরে চলে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যেতে হবে আড়ালে, যাতে কেউ কখনো রুনকির খোঁজে টেলিফোন করতে না পারে।

৯

রুনকি গিয়ে উঠেছে টমের ওখানে।

দু'টি অবিবাহিত ছেলেমেয়ের একসঙ্গে বাস করা এমন কিছু অবাক হওয়ার মতো ঘটনা নয়। বিয়ের মতো এমন একটি প্রাচীন ব্যবস্থা কি আর এত সময় পর্যন্ত ধরে রাখা যায়? এখন হচ্ছে লিভিং টুগেদার। যত দিন ইচ্ছে একসঙ্গে থাকা, যখন আর ভালো লাগছে না, তখন দূরে সরে যাওয়া। কারো কোনো দায়িত্ব নেই। দায়িত্ব থাকলেই ভালোবাসা শিকলে আটকে যায়। শিকলে কি আর মায়াবী পাখি ধরা পড়ে?

টম যেখানে থাকে সেটি কোনো এ্যাপার্টমেন্ট নয়। চমৎকার একটি বাড়ি। সামনে লন আছে, ফুলের বাগান আছে, পেছনে চমৎকার সুইমিং পুল। বাড়ির মালিক এ ক' মাসের জন্যে যাচ্ছে সুইজারল্যাণ্ড। সে-জন্যে সে বাড়িটা চার মাসের জন্যে ভাড়া দিতে চায়। ভাড়া নামমাত্র, মাসে চার শ' ডলার। সবটা টাকা একসঙ্গে দিতে হবে।

টমের বাড়ি পছন্দ হয়ে গেল। রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি, পছন্দ না হয়ে উপায় আছে?

'আমি নেব তোমার বাড়ি।'

টমের পোশাক-আশাক দেখে বাড়ির মালিক ঠিক ভরসা পায় না। গম্ভীর

হয়ে বলে, 'ষোল শ' ডলার একসঙ্গে দিতে হবে কিন্তু।'

'বেশ তো, নিয়ে আসব বিকেলে। তুমি ঘরে থাকবে তো?'

যেহেতু বিকেলে গেলে ভদ্রলোককে ঘরে পাওয়া যাবে, সেহেতু টম আর বিকেলে গেল না। পরদিন দুপুরে গিয়ে হাজির। ভদ্রলোক ঘরে নেই, তার স্ত্রী দরজা খুলল। টম হাসিমুখে বলল, 'আমি তোমার বাড়ি ভাড়া করতে এসেছি। তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

'ও হ্যাঁ, তোমার জন্যে সে অপেক্ষা করছিল। তুমি কি ষোল শ' ডলার নিয়ে এসেছ?'

'নিয়ে এসেছি।'

টম কাঁধের ব্যাগ থেকে কাগজে মোড়া একটি পেইনটিং বের করল। গম্ভীর মুখে বলল, 'এর দাম কম করে হলেও তিন হাজার ডলার, তোমাকে জলের দামে দিচ্ছি।'

ভদ্রমহিলা স্তম্ভিত।

'ভয় নেই, পছন্দ না হলে নগদ দাম দেব। দেখ ভালো করে।'

সন্ধ্যাবেলার ছবি। পুরনো ধরনের একটি লাল রঙ ইটের বাড়ির ভাঙা জানালা দিয়ে একটি কিশোরী মেয়ে উঁকি দিচ্ছে। মেয়েটির চোখে–মুখে সূর্যের রক্তিম আলো। ছবি থেকে চোখ ফেরান মুশকিল। ভদ্রমহিলা আমতা আমতা করতে লাগলেন।

'আমার হাসবেণ্ডের সঙ্গে কথা না বলে তো রাখতে পারি না।'

'বেশ, তাহলে নগদ দাম দিচ্ছি।'

টম গম্ভীর মুখে পকেটে হাত রাখল। (পকেটে একটি মাত্র পঞ্চাশ ডলারের নোট)। ভদ্রমহিলা থেমে থেমে বলল, 'তার চেয়ে এক কাজ কর, ছবিটা রেখে যাও। আমি ওর সঙ্গে আলোচনা করে তোমাকে জানাব।'

'বেশ তো, বেশ তো।'

টম জানে এই মেয়েটির স্বামীকে ছবিটি রাখতেই হবে। অবশ্যি একটি ভালো ছবি হাতছাড়া হল। তাতে কিছুই আসে যায় না। কাউকেই ধরে রাখা যায় না। সমস্তই হাতছাড়া হয়ে যায়।

রুনকি যখন প্রথম উঠে এল টমের ঘরে, তখন টম সিরামিক্সে কিছু ফ্যান্সি পেইন্ট করছিল। দশটি টবের অর্ডার আছে, বিকেল পাঁচটার মধ্যে দিতে হবে। সময় লাগছে খুব বেশি। রুনকিকে ঢুকতে দেখে টম ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, কিছু বলল না। রুনকি বলল, 'তোমার সঙ্গে থাকতে এলাম টম।'

'বেশ তো, ভালো করেছ।'

টম ছবি আঁকায় মন দিল। নীল রঙটা ঠিক মানাচ্ছে না, কেমন যেন লেপ্টে

লেপ্টে যাচ্ছে। রুনকি গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি বাবা-মা সবাইকে ছেড়ে এসেছি। তুমি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারছ না।'

টম ডিজাইন থেকে চোখ তুলেই বলল, 'বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে থাকতে আসাটা ঠিক হ'ত না। আমি বুড়ো-বুড়ি সহ্য করতে পারি না।'

'তুমি মন দিয়ে শুনছ না টম। দয়া করে শোন আমি কী বলছি। তাকাও আমার দিকে। প্লীজ!'

টম তাকাল।

'আমি তোমার জন্যে সব ছেড়েছুড়ে এসেছি।'

'রুন, এটি তুমি ভুল বললে। তুমি আমার জন্যে আস নি। এসেছ নিজের জন্যে। আমি তোমাকে কখনো আসতে বলি নি। মনের মধ্যে এসব ভুল ধারণা থাকা ঠিক না। এতে পরে কষ্ট পাবে।'

রুনকি জবাব দিল না। টম বলল, 'চট করে কফি বানিয়ে আন তো দেখি আমার জন্যে। চিনি দু' চামচ চাই, নো ক্রীম।' বাইরে থেকে টমকে ভবঘুরে ও ছন্নছাড়া মনে হলেও আসলে সে মোটেও সে-রকম নয়। রুনকি অবাক হয়ে দেখল, টমের অত্যন্ত গোছাল স্বভাব। সিগারেট খেয়ে ঘরময় ছড়িয়ে রাখে না। হৈ-চৈ হুল্লোড় কিছুই করে না। রুনকির ঘুম ভাঙার আগেই সে ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে ছবি নিয়ে বসে। ঘন্টা তিনেক একনাগাড়ে কাজ করে। এই সময় তার মূর্তি ধ্যানী পুরুষের মূর্তি। কথা বললে জবাব দেবে না। চা খাবে না, সিগারেট খাবে। সকালের কাজ শেষ হলেই ঘন্টাখানেক শুয়ে থাকবে চুপচাপ। তার ভাষায় এটি হচ্ছে মেডিটেশন। বারোটা নাগাদ লাঞ্চ তৈরী হবে। লাঞ্চ শেষ করেই বেরুবে কাজের খোঁজে। সব দিন কাজ পাওয়া যায় না। ঘোরাঘুরিই সার। তখন সে তার আঁকা চমৎকার একটি ছবি রাস্তার মোড়ে টাঙিয়ে বসে থাকবে। ছবির নিচে বড়ো বড়ো হরফে লেখা--*'এক জন দুরারোগ্য ক্যানসারে মরণাপন্ন শিল্পীকে সাহায্যের জন্যে ছবিটি কিনুন। এই শিল্পী গোগ্যাঁর মতো ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছেন, কিন্তু হায়, ভাগ্যের কী ছলনা!'* ছবি বিক্রি হয়ে যায় চট করে। যে-কোনো ছবি বিক্রি হলেই টমের খানিক মন খারাপ হয়। বিড়বিড় করে নিজের মনে--'কিছুই ধরে রাখা যাচ্ছে না'। কোনো-কোনো দিন মনখারাপের তীব্রতা এতই বাড়ে যে, সে হুইস্কি খেতে খেতে চোখ লাল করে বাড়ি ফেরে। রুনকিকে গম্ভীর হয়ে বলে 'প্রচুর ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলাম, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। লাল হচ্ছে আমার সবচে ফেবারিট কালার, অথচ লাল রঙের ব্যবহারটা এখনো শিখতে পারলাম না। এরকম জীবনের কোনো মানে হয়?'

এই জাতীয় কথাবার্তার কোনো অর্থ হয় না, বলাই বাহুল্য। তবু রুনকির ভয় করে। বড়ো শিল্পী না হওয়াই ভালো। টম আর দশ জন মানুষের মতো সহজ স্বাভাবিক মানুষ হোক। সংসারে ভালোবাসা থাকুক, সুখ থাকুক। খ্যাতির কি

সত্যি কোনো প্রয়োজন আছে?

টম অবশ্যি রুনকিকে খুবই পছন্দ করে। তবু রুনকির ভয় কাটে না। সব সময় মনে হয়, এক দিন সে হয়তো ভালোমানুষের মতো ঘর থেকে বেরুবে, আর ফিরবে না। পৃথিবীতে এক ধরনের মানুষ আছে যাদের ভালোবাসা দিয়ে ধরে রাখা যায় না।

রুনকি নিজেকে মানিয়ে নিল খুব সহজেই। বাজার করা, রান্না করা--কোনো কিছুই আর আগের মতো জটিল মনে হল না তার কাছে। বাইরে বেরুলে একটি ক্ষীণ অস্বস্তি অবশ্যি থাকে মনের মধ্যে--যদি পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হয়? সবচে ভালো হ'ত যদি টমকে নিয়ে বহু দূরে কোথাও চলে যাওয়া যেত। প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট্ট কোনো একটা দ্বীপে। যেখানে জনমানুষ নেই। সারাক্ষণ হু-হু করে হাওয়া বইছে। সন্ধ্যাবেলা আকাশ লাল করে সূর্য ডুবে হঠাৎ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়।

টমের এই বাড়িটিও অবশ্যি দ্বীপের মতোই। শহরের বাইরে খোলামেলা একটা বাড়ি। কেউ ঠিকানা জানে না বলেই কেউ আসে না। রুনকি মাকে টেলিফোন করে ঠিকানা দিতে চেয়েছিল। রাহেলা শান্ত স্বরে বলেছেন, 'তোমার ঠিকানার আমার কোনো প্রয়োজন নেই রুনকি। তোমার ঠিকানা তোমার কাছেই থাকুক।'

'ঠিকানা না রাখলে টেলিফোন নাম্বার রাখ।'

রাহেলা উত্তর না দিয়ে টেলিফোন নামিয়ে রেখেছেন। কেউ জানে না রুনকি কোথায় আছে, তবু এক দিন শফিক তার ভাঙা ডজ গাড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত। রুনকির বিস্ময়ের সীমা রইল না। শফিক গাড়ি থেকে নেমেই বলল, 'বাংলাদেশী কায়দায় তোমাদের একটা বিয়ের ব্যবস্থা করবার জন্যে এলাম। গায়ে হলুদ-টলুদ সব হবে। বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়িতে রুই মাছ যাবে--গায়ে হলুদের তত্ত্ব। দেশের একটা পাবলিসিটি হয়ে যাবে। মেলা লোকজনকে বলা হবে, কি বল?'

রুনকি বহু কষ্টে হাসি সামলায়।

'টম বুঝি রাজি হবে! তোমার যে কি সব চিন্তাভাবনা শফিক ভাই!'

'রাজি হবে না মানে? টমের ঘাড় রাজি হবে। ব্যাটা দেশের একটা বেইজ্জতি করে ফেলেছে। বাংলাদেশী মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে এসে......।'

রুনকি গম্ভীর মুখে বলল, 'শফিক ভাই, টম কাউকে ভাগিয়েটাগিয়ে আনে নি। আমি নিজেই এসেছি। আর আমার জন্যে তোমার বাংলাদেশের কোনো বেইজ্জতী হয় নি। আমি বাংলাদেশী নই। আমি বাই বার্থ আমেরিকান। আমার বাবা-মা'র মতো নেচারালাইজড সিটিজ্‌ন না।'

শফিক সারা দিন থাকল রুনকির ওখানে। 'দি মেঘনা রেস্টুরেন্ট' খোলার ব্যাপারে তার রুনকির সাহায্য দরকার। হুলস্থূল কাণ্ড করতে হবে সেখানে। লাঞ্চ ও

ডিনারের টাইমে পল্লীগীতির সুর বাজবে। বাংলাদেশের বিখ্যাত সব শিল্পীদের তেলরঙের নিসর্গ-দৃশ্যের ছবি দিয়ে সাজান হবে লবি। খাওয়ার শেষে হাতে তুলে দেওয়া হবে এক খিলি পান এবং খাঁটি বাংলায় বলা হবে--'আবার আসবেন।'

'কিন্তু--টাকাটা তুমি পাচ্ছ কোথায়?'

'সবার কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে যোগাড় হবে। তোমাকেও দিতে হবে। ছাড়াছাড়ি নাই।'

'আমার কাছে আছেই কুল্যে এক শ' ডলার।'

'দাও, এক শ' ডলারই সই। তোমাকে দিয়েই শুরু।'

সারা দিন অপেক্ষা করেও টমের দেখা পাওয়া গেল না। সে আসবে রাত আটটায়। রুজভেল্ট স্কুলের কী-একটা ডেকোরেশনের কাজ নাকি পেয়েছে। শেষ করে ফিরবে।

১০

অক্টোবর মাস। বরফ পড়ার সময় নয়, কিন্তু আবহাওয়া অফিস বলেছে তুষারপাত হতে পারে। সম্ভাবনা শতকরা বিশ ভাগ। আকাশ অবশ্যি পরিষ্কার। ঝকঝকে রোদ। সন্ধ্যার আগে আগে দেখা গেল সব ঘোলাটে হয়ে আসছে। সাড়ে ছ'টা থেকে ঝুরঝুর করে বরফ পড়তে শুরু করল। বৎসরের প্রথম বরফ, খুশির ঢেউ খেলে গেল চারদিকে। ছেলে-বুড়ো সবাই চোখ বড়ো বড়ো করে বলছে--'আহ্ কী চমৎকার তুষার পড়ছে' হাউ লাভলি!'

রাত ন'টার খবরে বলল---কানাডা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে আর উষ্ণ হাওয়া আসছে সাউথ থেকে, কাজেই সারা রাত ধরে ব্লিজার্ড হতে পারে। ইতোমধ্যে এক ফুটের মতো বরফ পড়েছে। রাস্তা ঘাট পিছল। কেউ যেন বিনা প্রয়োজনে বাইরে না যায়। হাইওয়ে আই নাইন্টি বন্ধ। বড়োই ফুর্তির সময় এখন। শুরু হবে ব্লিজার্ড পার্টি। উপকরণ সামান্য--বিয়ার, বাদাম ভাজা এবং চড়া মিউজিক। বৎসরের প্রথম ব্লিজার্ডকে স্বাগত জানানর এই হচ্ছে ফার্গোর সনাতন পদ্ধতি।

আনিস মোটা একটি কম্বল গায়ে জড়িয়ে সোফায় আরাম করে বসল। ঘরে একটি ফায়ারপ্লেস আছে। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালানর কায়দা-কানুন তার ভালো জানা নেই। চিমনি পরিষ্কার আছে কিনা কে জানে। এর চেয়ে কম্বল জড়িয়ে থাকাই ভালো। কফি-পটে কফি গরম হচ্ছে। টিভিতে দেখাচ্ছে ডেভিড কপারফিল্ডের ম্যাজিক। হাতের কাছে দু'টি রগরগে ভূতের বই। একটি স্টিফন কিংয়ের 'সাইনিং'। নিউইয়র্ক টাইমস-এর মতে কোনো সুস্থ লোক এই বই একা-একা পড়তে পারবে না। অন্যটি ডিমস কিলেনের 'দি আদার নুন'। পিশাচ নিয়ে লেখা

রক্ত-জল-করা উপন্যাস। ব্লিজার্ডের রাতের জন্যে এর চেয়ে ভালো প্রস্তুতি কল্পনাও করা যায় না।

আনিস জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। বরফে সমস্ত ঢেকে গেছে। বাতাসের সঙ্গে উড়ছে বরফের কণা। গাছের পাতায় মাখনের মতো থরে থরে তুষার জমতে শুরু করেছে। একটি ধবধবে সাদা রঙের প্রকাণ্ড চাদর যেন ঢেকে ফেলেছে শহরটিকে। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সাদা চাদর নৌকার পালের মতো কাঁপছে তিরতির করে। অপূর্ব দৃশ্য! চোখ ফেরান যায় না। আনিস মন্ত্রমুগ্ধের মতো জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। মালিশা গিলবার্ড এসে উপস্থিত হল এই সময়।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও তার গায়ে পাতলা একটা উইণ্ড ব্রেকার ছাড়া আর কিছুই নেই। কালো একটা স্কার্ফে কান দু'টি ঢাকা। হাতে খাবারের একটি প্যাকেট। মালিশা বলল, 'আমি ভাবলাম কেউ নেই। অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছি, ঘরে তোমার বান্ধবীরা কেউ আছে বুঝি?

আনিস বলল, 'ভেতরে এস। এ রকম দিনে বেরুলে কী জন্যে?'

মালিশা বলল, 'তুমি কথার জবাব দাও নি। ঘরে কি তোমার বান্ধবীরা কেউ আছে?'

'না, তা নেই।'

'যাক, আমি শুধু দু' জনের জন্যে খাবার এনেছি।'

মালিশা খানিকটা কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে প্যাকেট খুলতে শুরু করল।

আনিস বলল, 'স্কার্ফটা খুলে মাথা মুছে নাও। এত তাড়া কিসের মালিশা?'

'তাড়া আছে। দুপুরে খাই নি কিছু। খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে আছে। গরম করতে দিয়ে তারপর হাত মুখ ধোব।'

খাবার বিশেষ কিছু নয়। বড়ো একটি প্যান পিজা, কয়েকটি মেক্সিকান টেকো এবং এক বোতল সস্তা বারগাণ্ডি।

আনিস বলল, 'কোনো বিশেষ উপলক্ষ আছে কি মালিশা?'

'আজ আমার জন্মদিন।'

আনিস হাসিমুখে বলল, 'দু' মাস আগে এক বার তুমি জন্মদিনের খাবার খাইয়েছ।'

'ঐ দিন মিথ্যা বলেছিলাম। তোমাকে কোথাও নিয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল। জন্মদিনের অজুহাত দিয়ে নিয়ে গেলাম।'

'এমনি বললে বুঝি যেতাম না?'

'না। আমি ভালো মেয়ে নই। আমার সঙ্গে বেরুতে হয়তো তোমার সংকোচ হ'ত।'

মালিশা দ্রুত হাতে খাবার ওভেনে ঢুকিয়ে মাথার চুল মুছতে শুরু করল।

'হঠাৎ করে এসেছি বলে রাগ কর নি তো? টেলিফোন করব ভেবেছিলাম।

পরে ভাবলাম টেলিফোনে তুমি বলে বসতে পার--আমি ব্যস্ত। সামনাসামনি কেউ এমন কথা বলতে পারবে না। আনিস, তুমি কি বিরক্ত হচ্ছ?'

'বিরক্ত হব কেন? কিন্তু জন্মদিনের কেক কোথায়?'

'কেক কেনা গেল না। টাকা কম পড়ে গেল, তাছাড়া কেক আমার ভালোও লাগে না।'

আনিস লক্ষ করল মালিশার চোখ ঈষৎ রক্তাভ। একটু যেন ঢুলছে।

'তুমি কি প্রচুর ড্রিংক করেছ মালিশা?'

'প্রচুর নয়, তবে করেছি। একা-একা ভালো লাগছিল না।'

টেলিফোন করলেই একটা কেকের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু আবহাওয়ার যা ধরনধারণ, কেউ কি অর্ডার নেবে? চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আনিস বসবার ঘরে চলে এল। গলা উঁচু করে বলল, 'তুমি খাবার সাজাও মালিশা। আমি একটা টেলিফোন সেরে আসছি।' অর্ডার ওরা নিল। বলল এক ঘন্টার মধ্যে দিয়ে যাবে। শুধু কেক নয়, দশটি লাল গোলাপের একটি তোড়াও আসবে সেই সঙ্গে। আনিসের মনে হল, সে নিজেও খুব নিঃসঙ্গ। মালিশা হঠাৎ করে আসায় তার খুবই ভালো লাগছে। একটা কেমন যেন অন্য ধরনের আনন্দ।

'আনিস, পিজা তোমার ভাল লাগে তো?'

'খুব লাগে।'

'সস্তার মধ্যে খুব ভালো খাবার, তাই না?'

'তা ঠিক।'

মালিশা হাসিমুখে বলল, 'আমার বয়স একুশ। একুশ বছরের একটি মেয়ের জন্মদিনে কোনো লোকজন নেই, কেউ বিশ্বাস করবে একথা? জন আসবে বলেছিল, আমি এইসব কিনেছিলাম জন এবং আমার জন্যে। তার নাকি হঠাৎ মাইগ্রেন পেইন শুরু হয়েছে।'

আনিস বলল, 'জন কে?'

'আমার এক জন বন্ধু। সিয়ার্সে কাজ করে। তোমার কি মনে হয় ওর সত্যি সত্যি মাইগ্রেন পেইন?'

আনিস উত্তর দিল না। মালিশা বলল, 'জনের এক জন নতুন বান্ধবী হয়েছে। একটি মেক্সিকান মেয়ে। ও নির্ঘাত ওর সঙ্গে ঝোলাঝুলি করছে। তোমার কী মনে হয়?'

'আমার পক্ষে বলা মুশকিল। নির্ভর করে জনের সঙ্গে তোমার পরিচয় কী রকম তার ওপর।'

'পর পর চার শনিবার ডেট করেছি। জন নিজেও ডেট চেয়েছে। দু' রাত ঘুমিয়েছি ওর সঙ্গে। ওটা ঠিক হয় নি। ওতে দাম কমে যায়। তাছাড়া ঐ মেক্সিকান মেয়েটিকে তো তুমি দেখ নি। দারুণ ফিগার। পুরুষদের কাছে ফিগারটাই আসল।'

আনিস প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল, 'তোমার মা কেমন আছে?'

'ভালোই। গত সপ্তাহে চিঠি পেয়েছি। বুড়ির শখ হয়েছে বিশ্বভ্রমণের। এক জন সঙ্গীও পেয়েছে--জিম ডগলাস। মনে হয় ঐ বুড়ো ফুসলেফাসলে নিয়ে যাচ্ছে। টাকার গন্ধ পেয়েছে, বুঝলে না? দু' জনে ফট করে বিয়েও করে বসতে পারে। তাহলে বড়োই ঝামেলা হবে। হয়তো দেখা যাবে কিছুই পেলাম না। আমার যা ভাগ্য!'

'কোথায় যাচ্ছেন তোমার মা?'

'কে জানে কোথায়? আমি লিখেছি--"যাও মা, ঘুরে আস। তোমার ভালো লাগাই আমার ভালো। এবং ডগলাস সাহেব যখন যাচ্ছেন, তখন তো তোমার খুব ফান হবে।" মনের কথা নয় বুঝতেই পারছ, সবই বানান।'

মালিশা খাবার কিছুই স্পর্শ করল না। ঢকঢক করে এক গ্লাস বারগাণ্ডি খেয়ে ফেলল। তার মনে হয় নেশা হয়েছে। চোখের কোণ লালাভ।

'শোন আনিস, আমার মনে হয় আমি তোমাকে ভালোবাসি। হাসছ কেন? তোমার কি ধারণা, আমার নেশা হয়েছে? মোটেই নয়।'

আনিস বলল, 'কফি খাবে?'

'না।'

'শোন আনিস। আমার মিলিওনিয়ার হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? ভালোই হবে তোমার।'

আনিস হাসতে-হাসতে বলল, 'টাকার জন্যে তোমাকে বিয়ে করতে হবে কেন? তোমার নিজের দাম তো কিছু কম নয়।'

'আমাকে খুশি করার জন্যে বলছ?'

'না। নিশানাথ বাবুর কথা মনে নেই, তিনি বলেছিলেন তোমাকে দেখতে ইণ্ডিয়ান গডেসের মতো লাগে।'

'আমার মনে আছে। আনিস, আমার যখন টাকা হবে, তখন আমি ঐ ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোককে একটি বুইক স্কাইলার্ক গাড়ি কিনে দেব। ওর কি বুইক স্কাইলার্ক গাড়ি আছে?'

'না, ওর সে-সবের বালাই নেই।'

'ম্যাকের স্কাইলার্ক গাড়ি ছিল। ম্যাক ছিল দারুণ বড়লোক। ওর সঙ্গে আমি অনেক বার ডেটে গিয়েছি। ও আমাকে একটা ড্রেস কিনে দিয়েছিল, যার দাম দু' শ' পঁচাত্তর ডলার। আমি তোমাকে দেখাব।'

আনিস চুপ করে রইল। মালিশা মনে হল একটু টলছে। আনিস বলল, 'আর খেও না, মালিশা।'

'কেন? খাব না কেন?'

'বেশি হয়ে যাচ্ছে। তোমার হাত কাঁপছে।'

'হাত কাঁপছে, কারণ আমার জ্বর আসছে। আমার শরীর বেশি ভালো নয়।'

'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'না। ডাক্তার দেখাবার মতো কিছু নয়, তা ছাড়া আমার হেলথ ইনস্যুরেন্স নেই। ডাক্তারের কাছে গেলেই গাদাখানিক ডলার লাগবে। সেটা কে আমাকে দেবে? তুমি নিশ্চয়ই দেবে না। হা হা হা।'

কেক চলে এল দশটার দিকে। সিলোফেন কাগজে মোড়া দশটি লাল টুকটুকে গোলাপ। মালিশা অনেকক্ষণ অবাক হয়ে দেখল ফুলগুলি। আনিস হাসিমুখে বলল, 'শুভ জন্মদিন, মালিশা।'

মালিশা জবাব দিল না। তার চোখে জল আসছে। সে তা গোপন করবার জন্যে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

১১

এ বৎসর প্রচণ্ড শীত পড়েছে।

ফার্গোতে যারা বসবাস করে তারা পর্যন্ত বলছে--ন্যাস্টি ওয়েদার। ফেব্রুয়ারি মাসেই চার ফুটের মতো বরফ জমে গেল শহরে। সন্ধ্যার পর লোকজন আর ঘর ছেড়ে বের হয় না। কেউ যে শপিং-এ গিয়ে ঘুরেফিরে মন তাজা করবে, সে উপায় নেই। ঘন্টাখানিক গাড়ি ঠাণ্ডায় পড়ে থাকলেই আর স্টার্ট নেবে না। বড়ো বড়ো উইন্টার সেল হচ্ছে, সেখানে পর্যন্ত লোকজন নেই।

টমের দিনকাল বেশ খারাপ হয়ে গেল। কাজ নেই। গোটা ফেব্রুয়ারি মাসে বাচ্চাদের বইয়ের একটি ইলাস্ট্রেশন ছাড়া আর কোনো কাজ জুটল না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছবি বিক্রিও বন্ধ। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পায়ে হেঁটে কেউ চলাফেরা করে না। সবাই বের হয় গাড়ি নিয়ে। কার দায় পড়েছে গাড়ি থামিয়ে ছবি কিনবে? সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে, বাড়িটি ছেড়ে শহরতলির একটা এ্যাপার্টমেন্ট নিতে হয়েছে। সেখানে রান্নাঘর এবং বাথরুম শেয়ার করতে হয়। টম বেশ কয়েক বার বলেছে, এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে, কিন্তু বলা পর্যন্তই। সে নাকি বরফে-ঢাকা শহরের কয়েকটি ছবি এঁকেই বিদায় হবে। ছবি এঁকে ফেললেই হয়, কিন্তু এখনো তার মনমতো বরফ জমা হয় নি।

'প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত একটি শহরের ছবি আঁকব, তারপর বিদায়। বুঝলে রুনকি, এখনো সময় হয় নি।'

'পরাজিত হবার আর বাকি কোথায়?'

'অনেক বাকি। এখনো বাকি আছে।'

এই এ্যাপার্টমেন্টটিতে রুনকির গা ঘিনঘিন করে। যে-মেয়েটির সঙ্গে রান্নাঘর

ও বাথরুম শেয়ার করতে হয়, সে সবকিছু বড়ো ময়লা করে রাখে। গভীর াত পর্যন্ত হাই ভল্যুমে গান শোনে। সময়ে-অসময়ে টমের কাছে সিগারেট চায়। ভ লো লাগে না রুনকির। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। প্রায়ই এ্যাপার্টমেন্টের সিঁড়িতে মদ খেয়ে লোকজন গলা ফাটিয়ে চেঁচায়। কিছুদিন আগেই পুলিশ এসে ছ' নম্বর ঘর থেকে একটি লোককে ধরে নিয়ে গেল। এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যেতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায়। কিন্তু যাবার উপায় নেই, এর চেয়ে সস্তায় ফার্গোতে এ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া যাবে না। টম নিজেও অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। কিন্তু ওর হাত একেবারেই খালি। অবস্থা এরকম চললে আন-এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিটের জন্যে হাত পাততে হবে। টমের তাতে খুবই আপত্তি।

'আমি কি ভিখিরি, যে আন-এমপ্লয়মেন্ট নেব?'

'যখন কিছুই থাকবে না, তখন কী করবে?'

'তখন অন্য কোথাও যাব। এই নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

কোনো কাজ-টাজ করে টমকে সাহায্য করার ইচ্ছা হয় রুনকির, কিন্তু শীতের সময়টায় কাজ পাওয়া খুব মুশকিল। একটি কাজ পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ ফার্গোতে। গাড়ি ছাড়া অত দূর যাওয়ার কোনোই উপায় নেই। বাস ঐ লাইনে যায় না। টমের গাড়িও নেই। দিন-রাত ঘরেই বসে থাকতে হয় রুনকির। ইউনিভার্সিটির ক্লাস বাদ দিতে হয়েছে। উইন্টার কোয়ার্টারে নাম রেজিস্ট্রি করা হয় নি। ধারে সাত শ' ডলার যোগাড় করা গেল না।

টম কাজের খোঁজে সারা দিন ঘোরাঘুরি করে। রুনকি ঘরেই থাকে। ভালো লাগে না। টম সেদিন বলল, 'তুমি বাবা-মার কাছে ফিরে যাও, রুনকি।'

'কেন?'

'তোমার এখানে আর মন লাগছে না।'

'আমি কি বলেছি, মন লাগছে না?'

'বলতে লজ্জা লাগছে বলে বলছ না। বাবা-মার কাছে ফিরে যেতেও তোমার লজ্জা লাগছে। লজ্জার কিছু নেই, রুনকি।'

'তুমি বড্ড বাজে কথা বল, টম।'

টম হেসে বলেছে, 'এইটি তুমি ভুল বললে রুনকি। বাজে কথা আমি কখনো বলি না। তোমার মধ্যে দ্বিধা দেখতে পাচ্ছি বলেই বলছি।'

'তোমার কি ধারণা, আমি আর তোমাকে ভালোবাসি না?'

'সে কথা আমি বলি নি, রুন।'

'তুমি কি আমাকে ভালোবাস?'

'তুমি খুব চমৎকার একটি মেয়ে। তোমাকে যে কেউ ভালোবাসবে।'

'তুমি কিন্তু আমার কথার জবাব দাও নি।'

'আমি তোমাকে খুবই ভালোবাসি রুনকি।'

'যদি সত্যি ভালোবাস, তাহলে,--প্লীজ, চল, অন্য কোথাও যাই।'

'আর কয়েকটা দিন, প্রকৃতির কাছে শহরের পরাজয়ের ছবিটা শেষ করেই রওনা হব।'

রুনকির এখন মাঝেমাঝে ইচ্ছা করে মার সঙ্গে গিয়ে কথা বলে, কিন্তু সাহস হয় না। তার দিকে তাকিয়েই মা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলবেন ব্যাপারটা। মায়েরা অনেক কিছু বুঝতে পারে।

শফিক এসেছিল সেদিন। সে শুধু বলল, 'বাহ্, স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে তোমার রুনকি।'

রুনকি একবার ভাবল, শফিককে বলবে ব্যাপারটা। কিন্তু বলতে–বলতেও সামলে গেল। টমকে আগে জানান উচিত। টমের আগে অন্য কারোর জানা ঠিক নয়।

শফিক এলেই অনেক খবর পাওয়া যায়। সমস্তই বাংলাদেশের খবর।

'বুঝলে রুনকি, জিয়াউর রহমান সাহেবের নাম হয়েছে এখন "জিয়াউর রহমান খাল কাটি"। শুধুই খাল কাটছে।'

'জিয়াউর রহমান কে?'

'মাই গড! আমাদের প্রেসিডেন্ট। ফেরেশতা আদমি।'

'তাই নাকি?'

'বেচারার একটা হাফ শার্ট আর দুটো ট্রাউজার, আর কিছুই নেই।'

'কী যে তুমি বল শফিক ভাই!'

'এই তো, বিশ্বাস হল না। মিথ্যা বলব কেন খামাখা? একটা পয়সা বেতন নেয় না গভমেন্টের কাছ থেকে।'

'বেতন না নিলে চলে কী করে?'

'চলে আর কোথায়? কিছুই চলে না। দেশের জন্য লোকটার জান কবুল। নিজের দিকে তাকাবার সময় আছে?'

শফিক এলে রুনকি কিছুতেই যেতে দেয় না। বাংলাদেশী রান্না রাঁধুতে চেষ্টা করে। ভাত রান্না হয় সেদিন।

'রান্না কেমন হয়েছে শফিক ভাই? মার মতো হয়েছে?'

'চমৎকার! ফাস ক্লাস।'

'ভাতটা বেশি নরম হয়ে গেছে, না?'

'নরমই আমার কাছে ভালো লাগে। চাবানর দরকার হয় না। মুখে ফেললেই হড়হড় করে নেমে যায়।'

'চাকরি পেয়েছ, শফিক ভাই?'

'না।, জোসেফাইনকে খুব তেলাচ্ছি, কাজ হচ্ছে না।'

'অন্য কোথাও চেষ্টা কর।'

'গ্রীন কার্ড নেই, কাজ দেবে কে আমাকে? গভীর সমুদ্র।'

'সেবার যে বলেছিলে ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টে একটা কাজ পাবে?'

'সম্ভাবনা চল্লিশ পার্সেন্ট। বাঁদরের দেখাশোনা। খাঁচা পরিষ্কার রাখা। ওদের ব্যালেন্সড ডায়েট দেওয়া। ড. লুইসের হাতেই সব, দেখি ব্যাটাকে ভজান যায় কিনা। শালার দয়া-মায়া কিছুই নেই শরীরে। দুঃখের কথা বলেও লাভ হয় না।'

পরাজিত শহরের ছবি টমের আঁকা হল না। মন্টানার ছোট্ট একটি শহরে কাজ পাওয়া গেল। এক ভদ্রলোক পাহাড়ের ওপর চমৎকার একটি শীতাবাস বানিয়েছেন, তার লবির ডেকোরেশন। কাজটি লোভনীয়। কারণ, যত দিন কাজ শেষ না হচ্ছে, তত দিন শীতাবাসে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। পাশেই স্কী করবার স্পট। জমে-যাওয়া একটি হ্রদ আছে। সেখানে উইন্টার ফিশিং-এর ব্যবস্থা আছে। বরফ খুঁড়ে ছিপ ফেললেই প্রকাণ্ড সব কার্প ধরা পড়ে। টম রাজি হয়ে গেল। পরাজিত শহরের ছবি পরেও আঁকা যাবে। রুনকিকে অবাক করে দিয়ে এক সন্ধ্যায় শ্যাম্পেনেরর একটি বোতল নিয়ে এল।

'এস রুনকি, সেলিব্রেট করা যাক।'

'কিসের সেলিব্রেশন?'

'তোমার বাচ্চা আসছে, সেই সেলিব্রেশন।'

রুনকি দীর্ঘ সময় কোনো কথা বলতে পারল না।

'তুমি কখন জানলে?'

'সেটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট?'

শ্যাম্পেনের মুখ খোলামাত্রই কর্কটি বহু দূর ছুটে গেল। টম হেসে বলল, 'আমার বাচ্চা খুব ভাগ্যবান হবে। আর শোন রুনকি, আমার মনে হয় আমাদের বিয়ে করা উচিত। ম্যারেজ লাইসেন্স এখান থেকেই নিয়ে যাব। হানিমুন হবে মন্টানায়, ঠিক আছে? না কি তুমি আনমেরিড মাদার হতে চাও?'

রুনকি জবাব দিল না। টম বলল, 'তোমাকে বিয়ের পর আমার বাবা-মা'র কাছে নিয়ে যাব। সিয়াটলে থাকেন তাঁরা। তাঁদের ছোট্ট একটা ফার্ম আছে, তোমার ভালো লাগবে। তবে যেতে হবে গরমের সময়। তখন ওয়েদার ভালো থাকে। ওকি রুনকি, কাঁদছ কেন?'

মন্টানায় যাবার আগে রুনকি দেখা করতে গেল মা'র সঙ্গে। রাহেলা দরজা খুলে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

'কী মা, ঘরে ঢুকতে দেবে না?'

রাহেলা কথা বললেন না, দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন।

'বাবা কোথায়?'

'মেনিয়াপলিস গিয়েছে।'

'কবে ফিরবে?'

'সোমবার।'

'ও, তাহলে আর দেখা হচ্ছে না। আমরা মন্টানা চলে যাচ্ছি, মা।'

রাহেলা চুপ করে রইলেন। রুনকি ওভারকোট খুলতেই শান্ত স্বরে বললেন, 'যা হচ্ছ তাহলে?'

'হ্যাঁ হচ্ছি। তোমার এমন মুখ কালো করবার দরকার নেই মা। আমরা বিয়ে করছি। ম্যারেজ লাইসেন্স যোগাড় হয়েছে। বিয়েতে আসবে না জানি, তবু কার্ড পাঠাব।'

রুনকি টাওয়াল দিয়ে মাথার চুল মুছল। হালকা গলায় বলল, 'কফি খাওয়াবে? যা ঠাণ্ডা বাইরে।'

রাহেলা কফির পট বসালেন। রান্নাঘর থেকেই থেমে থেমে বললেন, 'তোমার পড়াশোনার পাট তাহলে চুকেছে।'

'আবার শুরু করব। তাছাড়া---'

'তাছাড়া কি?'

'পুঁথিগত পড়াশোনার তেমন দাম নেই মা। পৃথিবীতে যত টেলেন্টেড লোক জন্মেছে, তাদের কারোর ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি ছিল না।'

'তা ছিল না, কিন্তু ওদের টেলেন্ট ছিল। তোমার তা নেই।'

রুনকি হাসল। কথার উত্তর না দিয়ে কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে চলে গেল দোতলায় তার নিজের ঘরে। ঘরটি রাহেলা চমৎকার করে সাজিয়ে রেখেছেন। দেখেই মনে হবে, এই বাড়ির মেয়েটি হয়তো কলেজে গিয়েছে, ফিরে আসবে এক্ষুণি।

রুনকি দেখল, তার ব্যবহৃত কাপড়গুলি পর্যন্ত ইস্ত্রি করে রাখা হয়েছে। বার্বি ডল দু'টি মা নিচ থেকে নিয়ে এসে তার ঘরে রেখেছেন। দেয়ালে রুনকির ছোটবেলার একটি ছবি--বাবল্ গাম দিয়ে বল বানানর চেষ্টা করছে রুনকি।

রাহেলা শুনলেন উপরে গান বাজছে। কিং স্টোন ট্রায়োর বিখ্যাত গান,

We had joy we had fun
We had seasons in the sun
But the hills we will climb
Where the seasons out of time

তিনি নিঃশব্দে উপরে উঠে এলেন। রুনকি কার্পেটে পা ছড়িয়ে চুপচাপ বসে আছে। ক্লান্ত বিষণ্ন একটি ভঙ্গি। কাঁদছে নাকি? রাহেলা বললেন, 'রুনকি, তুমি কি দুপুরে খাবে এখানে?'

রুনকি চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, 'না মা, দুপুরে আমরা রওয়ানা হব। টম এসে এখান থেকে তুলে নেবে আমাকে।'

'তুমি যদি তোমার কোনো জিনিসপত্র নিতে চাও, নিতে পার।'

'মা, আমি কিছুই নিতে চাই না।'

রুনকি চোখ মুছে বলল, 'তুমি কি আমার বাচ্চাটির জন্যে দু'টি নাম দেবে? একটি ছেলের নাম, একটি মেয়ের নাম।'

রাহেলা থেমে থেমে বললেন, 'আমার নাম তোমাদের পছন্দ হবে না রুনকি। তোমরা নিজেরা নাম বেছে নাও।'

'কেন তুমি এত রেগে আছ মা? তুমি কি বুঝতে পারছ না, আমি অনেক দূরে চলে যাচ্ছি?'

'দূরে গেছ অনেক আগেই। নতুন করে বোঝাবুঝির কিছু নেই।'

রুনকি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'যাবার আগে পুরনো দিনের মতো তুমি কি আমাকে একটি চুমু খাবে, মা? প্লীজ।'

১২

নিশানাথ বাবু খুব সকালে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন।

উদ্দেশ্য আশেপাশের গ্যারাজ-সেলগুলি খুঁজে দেখা। প্রি-উইন্টার গ্যারাজ-সেল শুরু হয়েছে। বুড়ো-বুড়ির দল অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গাড়ির গ্যারাজে সাজিয়ে বসে আছে। মূল্য নামমাত্র। নিশানাথ বাবু সকাল থেকেই এ সব দেখে বেড়াচ্ছেন। গ্যারাজ-সেলে ঘুরে বেড়ান তাঁর বাতিকের মতো। যে-সব জিনিস তিনি গত চৌদ্দ বছরে কিনেছেন, তার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পিয়ানো পর্যন্ত আছে। এম স্ট্রীটের দু'তলা বাড়ি গ্যারাজ-সেলে কেনা জঞ্জাল দিয়ে তিনি ভর্তি করে ফেলেছেন। নতুন কিছু কিনে রাখবার জায়গা নেই, তবু কিনছেন।

আজ তাঁর একটি ফুলদানি পছন্দ হল। জার্মান সিলভারের ফুলদানি। খুব সুন্দর কাজ। দাম লেখা আছে। এক ডলার।

'এরচে' কমে দিতে পার? এক ডলার বড্ড বেশি মনে হচ্ছে।'

যে-বুড়ো জিনিসপত্র সাজিয়ে বসে আছে, সে অবাক হয়ে বলল, 'এক ডলার কি যথেষ্ট কম নয় ড. নিশানাথ?'

নিশানাথ বাবু দেখলেন বুড়ো হচ্ছে স্টাটিসটিকসের স্ট্যানলি। মাংকি ক্যাপে সমস্ত মুখ ঢেকে রেখেছে বলে চেনা যাচ্ছে না।

'গুড মর্নিং স্ট্যানলি।'

'গুড মর্নিং। কফি খাবে? গ্যারাজ-সেল উপলক্ষে কফি পাওয়া যাচ্ছে। পঞ্চাশ সেন্ট চার্জ, ফ্রী রিফিল।'

নিশানাথ বাবু পঞ্চাশ সেন্ট দিয়ে এক পেয়ালা কফি নিলেন।

'বিক্রিটিক্রি কেমন?'

'মন্দ নয়, সাড়ে ন' ডলার বিক্রি করেছি। বস তুমি, ঐ চেয়ারটাতে বস।'

নিশানাথ বাবু অবাক হয়ে স্ট্যানলির দিকে তাকালেন। এই লোকটি মাসে চার হাজার ডলারের মতো পায়। দুপুরের একটা সাদাসিধা লাঞ্চের জন্যেই খরচ করে ত্রিশ–চল্লিশ ডলার। অথচ সে বাড়ির যত সব জঞ্জাল সাজিয়ে সাড়ে ন' ডলার বিক্রি করে কী খুশি।

স্ট্যানলি ভারি স্বরে বলল, 'ওল্ড হোমে যাবার প্রস্তুতি, বুঝলে। জিনিসপত্র সব বিক্রিটিক্রি করে হাত খালি করছি।'

'প্রস্তুতি কি একটু সকাল–সকাল নিয়ে ফেলছ না?'

উঁহু, রিটায়ার করবার টাইম হয়ে আসছে। বছর দুই আছে মাত্র।'

নিশানাথ বাবু জার্মান সিলভারের ফুলদানি ছাড়াও একটা বড়ো আয়না কিনে ফেললেন। আয়নাটির দাম পড়ল তিন ডলার। স্ট্যানলি বারবার বলল, 'আয়নাটায় খুব জিতে গেলে। আমার স্ত্রী ইটালি থেকে ছ' শ' লীরা দিয়ে কিনেছিল।'

তিনি বাড়ি ফিরলেন এগারটার দিকে। কী আশ্চর্য, রুনকি বসে আছে বারান্দার ইজিচেয়ারে! রুনকি হাসিমুখে বলল, 'গ্যারাজ–সেলে গিয়েছিলেন চাচা?'

'হুঁ।'

'ইশ, কী যে এক রোগ বাধিয়েছেন!'

'ভেতরে আয়, রুনকি।'

'আজ কী কিনলেন?'

'জার্মান সিলভারের একটা ফুলদানি, আর একটা আয়না। তুই নিবি?'

'না।'

'আয়নাটা নিয়ে যা। ভালো জিনিস, ছ' শ' লীরা দাম পড়েছে ইটালিতে।'

'পড়ুক। চাচা, আপনার কাছে বিদায় নিতে এলাম।'

নিশানাথ বাবু কিছু বললেন না। চায়ের পানি চড়ালেন। রুনকি সোফায় বসতে-বসতে বলল, 'আমরা মন্টানায় চলে যাচ্ছি।'

'মন্টানা খুব সুন্দর জায়গা।'

'আপনার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না।'

নিশানাথ বাবু দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বললেন, 'অল্পবয়েসী মেয়ে নিরাশ ভঙ্গিতে কথা বললে ভালো লাগে না। তাদের বলা উচিত, আবার হয়তো দেখা হবে। অর্থ একই--আনসার্টিনিটি। কিন্তু বলার ভঙ্গিটা অপটিমিস্টিক। চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবি?'

'না চাচা। আপনাকে একটা খবর দিই, আমরা বিয়ে করছি।'

'জানি। শফিক বলেছে। বাঙালী কায়দায় নাকি বিয়ে হবে?'

'না, সে–রকম কিছু না।'

নিশানাথ বাবু চা বানিয়ে এনে দেখেন রুনকি কাঁদছে। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, 'কাঁদছিস কেন মা?'

'চাচা, আমি কি ভুল করছি?'

'কোনটা ভুল আর কোনটা নয়, তা বোঝা মানুষের সাধ্যের বাইরে। ও নিয়ে চিন্তা করিস না। চা খা।'

রুনকি চায়ে চুমুক দিল। নিশানাথ বাবু গাঢ় স্বরে বললেন, 'খিদিরপুরের এক কলেজে অঙ্ক পড়াতাম, বুঝলি রুনকি। কী নিদারুণ অভাব গেছে আমার! আর এখন পাসবই দেখলে তুই চমকে উঠবি। আমি যদি খিদিরপুরে পড়ে থাকতাম, সেটা ভুল হ'ত। আবার আমেরিকা আসাটাও ভুল হয়েছে। তাহলে ঠিক কোনটা?'

রুনকি চুপ করে রইল। নিশানাথ বাবু বললেন, 'বেঁচে থাকার আনন্দটাই একমাত্র সত্যি। ঐটি থাকলেই হল। আয়নাটা একটা কাগজ দিয়ে বেঁধে দিই মা?'

'দিন।'

নিশানাথ বাবু আয়নাটি গিফট র‍্যাপ করবার জন্যে পাশের ঘরে চলে গেলেন। রুনকি একটু হাসল। সে জানে, নিশানাথ বাবু শুধু আয়না কাগজ দিয়ে বাঁধবেন না। সেইসঙ্গে একটা খামের মধ্যে মোটা অঙ্কের একটা চেক থাকবে। এটি নিশানাথ বাবুর একটি পুরনো অভ্যাস। রুনকির সব জন্মদিনে তিনি রুনকিকে গল্পের বই দেন। সেই বইয়ের ভেতর একটা খাম থাকবেই। যা দেওয়ার তা সরাসরি দিয়ে দিলেই হয়, কিন্তু তা তিনি দেবেন না। কত রকম অদ্ভুত মানুষ দুনিয়াতে আছে!

১৩

জোসেফাইনের মন ভেজানর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বুড়ি পরিষ্কার বলে দিয়েছে, 'কাজ তোমাকে দেব না। মাথা-বেঠিক লোক আমি রাখি না। লুনাটিকদের বিষয়ে আমার এলার্জি আছে।'

'আমাকে তো তাহলে না খেয়ে থাকতে হয় জোসেফাইন। তুমি ছাড়া কে আমাকে কাজ দেবে? উপোস দিতে হবে আমাকে।'

'একেবারে কিছুই না জুটলে এখানে এসে হামবার্গার খেয়ে যাবে, চার্জ লাগবে না। কিন্তু চাকরি তোমাকে দিচ্ছি না।'

ফার্গোতে বিদেশীদের কাজ পাওয়া ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। এ্যাড দেখে টেলিফোন করলেই জিজ্ঞেস করে--গ্রীন কার্ড আছে? নেই শুনলেই খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখে। যারা কিছুটা ভদ্র, তারা মিষ্টি সুরে বলে, 'এখানে ওপেনিং নেই। তুমি ঠিকানা রেখে যাও, আমরা ওপেনিং হলে খবর দেব।'

'ওপেনিং নেই তো, এ্যাড দিলে কেন?'

'কয়েকটি ওপেনিং ছিল, সেগুলি ফিল্ড আপ।'

"দি মেঘনা রেস্টুরেন্টে"র জন্যে যে-টাকাপয়সা উঠেছে (সর্ব মোট সাত শ' এগার ডলার), সেখানে হাত পড়েছে। রেস্টুরেন্টের চিন্তা এখন আর তেমন নেই। কারণ রহমান তার 'ইণ্ডিয়া হাইস' নিয়ে পিছিয়ে পড়েছে। তার ধারণা, এত ছোট শহরে বিদেশী রেস্তোরাঁ চলবে ন সে খোঁজ নিয়ে দেখেছে এখানে যে ক'টি চীনা রেস্তোরাঁ আছে, সেখানে শুক্র-শনি এই দু' দিনই যা লোকজন হয়, অন্য দিন রেস্তোরাঁ খাঁ-খাঁ করে। তাছাড়া এই প্রচণ্ড শীতে কার এমন মাথাব্যথা যে, কাঁপতে কাঁপতে বাইরে খেতে আসবে?

এদিকে ইমিগ্রেশনের লোকজনও বেশ ঝামেলা করছে। তিন-চারটে চিঠি এসেছে, কোন দিন হুট করে হয়তো পুলিশ এসে হাজির হবে। ঠিকানা বদলাতে হল সেই কারণেই। নিক্স প্লেসের উল্টোদিকে ছোট একটা ঘর। শুধু শোয়ার ব্যবস্থা। খাওয়াদাওয়া নিক্স প্লেসে। বুড়ি তার কথা রেখেছে। খাওয়ার পর বিল দিতে গেলে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করে, 'কাজ পেয়েছ?'

'না।'

'নো চার্জ।'

'বেশ, খাতায় লিখে রাখ, চাকরি পেলে সব একসঙ্গে দেব।'

'বাকির কারবার আমি করি না, ভাগো।'

কাজ শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল।

ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টের সেই চাকরি। গোটা দশেক বাঁদর, কয়েকটি কুকুর আর প্রায় শ' দুয়েক গিনিপিগের দেখাশোনা। সময়মতো খাবারদাবার দেওয়া। খাঁচা পরিষ্কার করা। পশুগুলিকে পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত রাখা। কাজ অনেক, সেই তুলনায় বেতন অল্প। নব্বই ডলার প্রতি হপ্তায়। নব্বই ডলারই সই। মহা উৎসাহে কাজে লেগে গেল শফিক।

কাজটা যত খারাপ মনে হয়েছিল তত নয়। বাঁদরের খাঁচায় একটিকে পাওয়া গেল একেবারে শিশু। শফিককে দেখেই সে দাঁত বের করে ভেংচে দিল। শফিক অবাক।

'আরে, তুই এইসব ফাজলামি কোত্থেকে শিখলি?'

বানরের বাচ্চাটি কথা শুনে উৎসাহিত হয়েই বোধহয় থু করে এক দলা থুথু ছিটিয়ে দিল শফিকের দিকে।

'মহা মুসিবত হল তো শালাকে নিয়ে। মারব থাপ্পড়।'
বাচ্চাটা গালি শুনে উৎসাহিত হয়ে খুব লাফালাফি শুরু করল । তার আনন্দের সীমা নেই।

সন্ধ্যা সাতটা বাজে।

আনিস সবেমাত্র ফিরেছে ইউনিভার্সিটি থেকে। হাতমুখও ধোওয়া হয় নি, শফিক এসে হাজির। এক্ষুণি যেতে হবে তার সঙ্গে।

'কী ব্যাপার আগে বল।'

'আগে বললে আপনি আর যাবেন না।'

'যাব। ঘরে তেমন কিছু নেই। এখন বল ব্যাপারটা কী?'

'জং বাহাদুরের শয়তানিটা দেখাব আপনাকে। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না, শালা ওয়ান নাম্বার হারামী।'

'জং বাহাদুরটা কে?'

'ও, আপনাকে তো বলা হয় নি। বাচ্চা একটা বাঁদর। বাচ্চা হলে কী হবে, শয়তানের হাড্ডি। দেখবেন নিজের চোখে।'

নিজের চোখে কিছু দেখা গেল না। জং বাহাদুর ঘুমিয়ে পড়েছে। শফিক খুব মনমরা হয়ে পড়ল। আনিস হাসিমুখে বলল, 'কালকে এসে দেখব।'

'সকাল-সকাল আসবেন। খাবার দেওয়ার সময় হলে কী করে দেখবেন। বিকালবেলা একটা কলা, একটা আপেল আর একটা ডিম সেদ্ধ দেওয়া হয়েছে। শালা কলা ডিমটা খেয়ে আপেলটা আমাকে সাধছে। দেখেন কাণ্ড!'

'তুমি না বললে শয়তানের হাড্ডি? আমার কাছে তো বেশ ভালোমানুষই মনে হচ্ছে।'

'আরে না-না, তার বজ্জাতির কথা তো কিছুই বললাম না।'

আনিস হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বলল, 'তোমার কি কোনো কাজ আছে শফিক? তোমার গাড়িতে আমাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে?'

'কোথায়?'

আনিস খানিক ইতস্তত করে বলল, 'একটি মেয়ের সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় হয়েছে। অনেক দিন তার খোঁজ নেই। ভাবছিলাম একটু খোঁজ নেব।'

শফিক বেশ অবাক হল। আনিস থেমে বলল, 'আমি দেশে ফিরে যাব শফিক। আমার ভালো লাগছে না। আমি ঐ মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।'

'সে কোথায় থাকে?'

'সাউথ ফার্গো।'

'চলুন যাই। ফুলের দোকান হয়ে যাবেন? ফুল নেবেন?'

'ফুল কেন?'

শফিক হাসিমুখে বলল, 'আমেরিকান মেয়েকে বিয়ের কথা কি ফুল ছাড়া বলা যায়? একগাদা গোলাপ নিয়ে যান। ডাউনটাউনে ফুলের দোকান সারা রাত খোলা থাকে।'

আনিস দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ফুল তো কিনতেই

হবে।'

মালিশাকে পাওয়া গেল না। বাড়িওয়ালী সরু গলায় বলল, 'ওর মা মারা গেছে। ও গেছে টাকাপয়সা কিছু দিয়ে গেছে কিনা দেখতে।'

'কবে গিয়েছে?'

'এক সপ্তাহ হল।'

আনিস বলল, 'ও কি টাকা পয়সা কিছু পেয়েছে?'

'আমি কী করে জানব? এক শ' ডলার রেন্ট বাকি রেখে গেছে সে। আমি চিন্তায় অস্থির, টাকাটা মার গেল কি না।'

'আমি কি এই গোলাপগুলি তার ঘরে রেখে যেতে পারি?'

'পারবে না কেন? রেখে যাও। তুমি কি ওর বন্ধু?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো। আমার ধারণা ছিল, ওর কোনো বন্ধু নেই। আমার দু' জন ভাড়াটে আছে, যাদের কোনো ছেলে বন্ধু নেই। এক জন হচ্ছে মালিশা, অন্য জন এমিলি জোহান।'

'এমিলি জোহান?'

'হ্যাঁ, কবি এমিলি জোহান, নাম শুনেছ? খুব বড়ো কবি। রাইটার্স গিল্ড এওয়র্ড পাওয়া।'

'আমি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'না, পার না। সে এখন মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে।'

ফেরার পথে আনিস একটি কথাও বলল না।

১৪

সকালবেলা একটি পার্কা গায়ে দিয়ে আমিন সাহেব শোভেল নিয়ে বেরুলেন। বরফে ড্রাইভওয়ে ঢাকা পড়েছে। পরিষ্কার না করলে গাড়ি বের করা যাবে না। অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়েছে। চোখ জ্বালা করছে। কনকনে হাওয়া। নাক-মুখ সমস্তই ঢাকা, তবু সেই হাওয়া কী করে যেন শরীরের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। অল্পক্ষণ শোভেল চালাবার পর তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বয়স হয়েছে। এখন আর আগের মতো পরিশ্রম করতে পারেন না। দিন ফুরিয়ে আসছে। ঘন্টা বাজতে শুরু করেছে। চলে যাবার সময় হয়ে এল। এবারের যাত্রা অনেক দূরে। গন্তব্যও জানা নেই। আমিন সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। রুনকি থাকলে এতটা পরিশ্রম হ'ত না। নিমেষের মধ্যে বরফ কেটে গাড়ি বের করে ফেলত। তারপর ছোটাছুটি শুরু করত বরফের উপর। তুষার বল বানিয়ে চেঁচাত--'মারব তোমার গায়ে বাবা? দেখবে আমার হাতের টিপ?'

মেয়েটা একেবারে ছেলেমানুষ রয়ে গেল।

না, কথাটা ঠিক হল না। রুনকি এখন আর ছেলেমানুষ নয়। আমিন সাহেব বিশ্রাম নেবার জন্যে গ্যারাজের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। তখনই চোখে পড়ল, রাহেলা দোতলার বারান্দায় একটা সাদা চাদর গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডায় এমন পাতলা একটা চাদর গায়ে দিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে? নিউমোনিয়া বাধাবে নাকি? রাহেলা উপর থেকে ডাকলেন, 'চা খেয়ে যাও।'

চা খেয়ে আমিন সাহেবের মনে হল তাঁর শরীর ভালো লাগছে না। নিঃশ্বাস নিতে একটু যেন কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। রাহেলা বললেন, 'আজকের এই দিনটি একটি বিশেষ দিন। তোমার মনে আছে?'

'না।'

'আজ রুনকির জন্মদিন।'

আমিন সাহেব বড়োই অবাক হলেন। এত বড়ো একটা ব্যাপার তিনি ভুলেই বসে আছেন। উফ, কী ঝামেলাই না হয়েছিল। বরফে চারদিক ঢাকা। বেশির ভাগ রাস্তাঘাটই বন্ধ। এর মধ্যে রাহেলার ব্যথা শুরু হল। এ্যাম্বুলেন্সে খবর দিলেই হ'ত, তা না, তিনি গাড়ি নিয়ে বের হলেন। ফিফটিন্থ স্ট্রীট থেকে উঠিয়ে নিলেন নিশানাথ বাবুকে। কী দুরবস্থা ভদ্রলোকের। ব্যাপার-ট্যাপার দেখে আনিস বলল সেই ঠাণ্ডাতেও তাঁর কপাল দিয়ে টপ-টপ করে ঘাম পড়ছে। রাহেলা এক বার বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে গাড়িতেই কিছু একটা হয়ে যাবে।' নিশানাথ বাবু বললেন, 'মা কালীর নাম নেন, চেঁচামেচি করবেন না।' রাহেলা ধমকে উঠলেন, 'মা কালীর নাম নেব কেন, মা কালী আমার কে?' এই সময় গাড়ি স্কিড করে খাদে পড়ে গেল। উহ্, কী ভয়াবহ সময়ই না গিয়েছে!

আমিন সাহেব বললেন, 'আমাকে আরেক কাপ চা দাও।'

'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? তুমি ঘামছ।'

'না, শরীর ঠিক আছে।'

রাহেলা বললেন, 'আমি রুনকির জন্মদিন উপলক্ষে ছোট্ট একটা কেকের অর্ডার দিতে চাই।'

আমিন সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন। রাহেলা চোখ নিচু করে বললেন, 'আমি, তুমি আর নিশানাথ বাবু।'

'বেশ তো।'

রাহেলা মৃদু স্বরে বললেন, 'রুনকির প্রতি আমি অবিচার করেছি।'

আমিন সাহেব জবাব দিলেন না। রাহেলা বললেন, 'নিজেদের মতো ওকে আমরা বড়ো করেছি। ক্যাম্পিং-এ যেতে দিই নি। ডেট করতে দিই নি।'

'বাদ দাও ওসব।'

'আমেরিকায় থাকব, অথচ বাংলাদেশী সাজব--সেটা হয় নাকি বল?'

আমিন সাহেব জবাব দিলেন না। রাহেলা বললেন, 'কাল রাত্রে আমি রুনকিকে স্বপ্নে দেখেছি। যেন ছোটখালার বাসায় ওকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছি। ছোটখালা বলছেন–রাহেলা তোর মেয়ে তো পরিষ্কার বাংলা বলছে। আর তুই বললি--ও বাংলা জানে না। ছোটখালাকে মনে আছে তোমার?'

'না।'

'আমাদের বিয়েতে তোমাকে মুক্তা বসান আংটি দিয়েছিলেন। সেই আংটি তোমার হাতে বড়ো হয়েছে শুনে ছোটখালা দুঃখে কেঁদে ফেলেছিলেন।'

'মনে পড়েছে। খুব মোটাসোটা মহিলা, তাই না?'

"হ্যাঁ। কী যে ভালোবাসতেন আমাকে! এখন তাঁর শুনেছি খুব দুঃসময়। ছেলেদের সংসারে থাকেন। ছেলেরা দু' চক্ষে দেখতে পারে না। অসুখবিসুখে চিকিৎসা করায় না। আমি ছোটখালার নামে কিছু টাকা পাঠাতে চাই।'

'বেশ তো।'

'ভালো এ্যামাউন্টের টাকা। ছোটখালা নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন।'

'তা হবেন।'

'আমি পাঁচ শ' ডলার পাঠাতে চাই।'

আমিন সাহেব বললেন, 'আমি একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট করে আনব।'

রাহেলার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল।

'কাঁদছ কেন?'

'কই, কাঁদছি না তো।' রাহেলা মৃদু স্বরে বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলি নি। গত মাসে রুনকি এসেছিল।'

আমিন সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। রাহেলা বলল, 'রুনকির বাচ্চা হবে।'

'ও বলেছে তোমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'টম কি আছে এখনো তার সঙ্গে?'

'আছে।'

'রুনকি কী জন্যে এসেছিল?'

'ওর বাচ্চার জন্যে দু'টি নাম চায়। একটি ছেলের নাম, অন্যটি মেয়ের।'

আমিন সাহেব দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বললেন, 'মেয়ে হলে ওর নাম রাখব বিপাশা।'

'বিপাশা?'

'হ্যাঁ, পাঞ্জাবের একটা নদীর নাম। পাঞ্জাবে ওরা বলে বিয়াস।'

'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে, তুমি খুব ঘামছ।'

আমিন সাহেব ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'আমার শরীরটা খারাপ লাগছে।'

'গাড়ি বের করার দরকার নেই। তুমি শুয়ে থাক। আর নিশানাথ বাবুকে

টেলিফোন করে দাও, সন্ধ্যাবেলা যেন আসেন আমাদের এখানে, খাবেন।'

আমিন সাহেব নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। তাঁর শরীর বেশ খারাপ লাগছে। এই বয়সে বরফ না কাটাই ভালো। বড়ো বেশি চাপ পড়ে। শরীর দুর্বল হয়েছে, এখন আর আগের মতো চাপ সহ্য করতে পারেন না। পরীক্ষা করলে হয়তো দেখা যাবে সুগার আছে।

নিশানাথ বাবুকে টেলিফোন করবার আগে কী মনে করে যেন দরজা বন্ধ করে দিলেন। নিশানাথ বাবু ঘরেই ছিলেন।

'নিশানাথ বাবু, আমি আমিন।'

'বুঝতে পারছি। আপনার কি শরীর খারাপ? এভাবে কথা বলছেন কেন?'

'আমার শরীর ভালো না। আপনাকে একটি জরুরী ব্যাপারে টেলিফোন করছি।'

'বলুন।'

'আপনি তো জানেন, আমার এই বাড়ি এবং টাকা-পয়সা সব আমি আমার মেয়ের নামে উইল করে রেখেছি। আপনি এক জন উইটনেস।'

'আমি জানি।'

'নিশানাথ বাবু, নানান কারণে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার মনের মিল হয় নি।'

'এই বয়সে সেটা তোলার কোনো যুক্তি নেই, আমিন সাহেব।'

আমিন সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে থেমে থেমে বললেন, 'আমি আমার স্ত্রীর উপর একটা বড়ো অন্যায় করেছি নিশানাথ বাবু। আজ আমি যদি মারা যাই, সে পথের ভিখিরি হবে।'

'আমিন সাহেব, আপনার শরীর কি বেশি খারাপ?'

'হ্যাঁ। আপনি কি একটু আসবেন, আমি নতুন করে উইল করতে চাই।'

'আমি এক্ষুণি আসছি। সব কাগজপত্র নিয়ে আসব।'

'নিশানাথ বাবু।'

'বলুন।'

'আজ রুনকির জন্মদিন।'

'আমি জানি। সকালেই মনে হয়েছে।'

আমিন সাহেব শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আরেকটি কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে, আনিস ছেলেটিকে কেমন মনে হয় আপনার?'

'খুব ভালো ছেলে। অত্যন্ত রিলায়েবল।'

আমিন সাহেব টেলিফোন করলেন আনিসকে। আনিস বেশ অবাক হল। আমিন সাহেব তাকে কখনো টেলিফোন করেন নি আগে।

'আনিস, তুমি আমাকে চিনতে পারছ? আমি আমিন।'

'চিনতে পারছি। কী ব্যাপার বলুন তো?'

'আমার মেয়েটির দিকে তুমি লক্ষ রাখবে।'

আনিস অবাক হয়ে বলল, 'আপনার কি শরীর খারাপ?'

'হ্যাঁ।'

'কী হয়েছে?'

'আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু মনে হচ্ছে সময় শেষ হয়ে আসছে। তুমি আমার মেয়েটির খোঁজ-খবর রাখবে। প্লীজ।'

'আমি আসছি এক্ষুণি।'

আমিন সাহেব দরজা খুলতেই দেখলেন রাহেলা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। রাহেলার চোখে-মুখে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ। রাহেলা বললেন, 'তোমার কী হয়েছে?'

আমিন সাহেব বললেন, 'রাহেলা, আমি মারা যাচ্ছি।'

রাহেলা আমিন সাহেবের হাত ধরে ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিলেন।

'তোমার উপর খুব অবিচার করেছি রাহেলা।'

রাহেলা দ্রুত আমিন সাহেবের শার্টের বোতাম খুলে ফেললেন। তাঁর হাত কাঁপছে। কী করবেন বুঝতে পারছেন না। আমিন সাহেব প্রচণ্ড ঘামছেন।

'রাহেলা, তুমি রাগ করো না। একটা বড়ো অন্যায় করা হয়েছে।'

রাহেলা দীর্ঘ দিন আগে মারা যাওয়া তাঁর মা-কে ডাক ছেড়ে ডাকতে লাগলেন-আম্মা, ও আম্মা।

১৫

মালিশা গিলবার্ট তার মায়ের টাকা পেয়েছে। টাকার পরিমাণ মালিশার ধারণাকেও ছাড়িয়ে গেছে। সলিসিটর যখন টেলিফোন করে বলল, 'তোমার জন্যে দু'টি খবর আছে, একটি ভালো একটি মন্দ। কোনটি আগে শুনতে চাও?'

তখনো মালিশা কিচ্ছু বুঝতে পারে নি। সে বলেছে, 'ভালোটি আগে শুনতে চাই।'

'তোমার হার্টের অবস্থা ভালো তো? খবর শুনে ফেইন্ট হতে পার।'

খবর শুনে তার অবশ্যি তেমন কোনো ভাবান্তর হয় নি। বাড়িওয়ালীকে গিয়ে বলেছে, 'আমার মা মারা গেছেন, আমি ফ্লোরিডা যাচ্ছি। তোমার রেন্ট আমি ফিরে এসে দেব।'

প্লেনে যাওয়ার মতো টাকা নেই, গ্রে হাউণ্ডের টিকিট কাটতে হল। পৌছতে লাগবে তেত্রিশ ঘন্টা। গ্রে হাউণ্ডের বাস ছাড়বে রাত চারটায়। এমন লম্বা সময় কাটানও এক সমস্যা। মালিশার বারবার মনে হচ্ছিল এ্যাটর্নি ভদ্রলোক হয়তো ভুল করেছে। মা হয়তো নাম কামাবার জন্যে টাকা-পয়সা সব দিয়ে গেছে ক্যানসার ইন্সটিটিউটে কিংবা কোনো এতিমখানায়। সেইসব কাগজপত্র হয়তো এ্যাটর্নি

ব্যাটা এখনো দেখে নি। না দেখেই টেলিফোন করেছে।

ফার্গো ফোরামেইতে এক বার এ-রকম একটি খবর উঠল। কোটিপতি বাবা মারা গেছে। খবর পেয়ে ছেলেরা মহানন্দে বাড়িঘর দখল করে বসেছে। কারখানায় গিয়ে কর্মচারীদের ছাঁটাই করা শুরু করেছে--এমন সময় এ্যাটর্নি-অফিস থেকে চিঠি এসে হাজির--'এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে জনাব সোরেনসেন জুনিয়ার তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি ইথিওপিয়ার ক্ষুধার্ত শিশুদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য দান করিয়াছেন। অতএব......'

মালিশার মা'র ব্যাপারেও সে-রকম কিছু হয়েছে কিনা কে জানে? যদি সে-রকম হয়, তাহলে ফার্গো ফিরে আসার ভাড়াটাও থাকবে না। অবশ্যি ফিরে আসা এমন কিছু জরুরী নয়। তার জন্যে সব শহরই সমান।

বাসে বসতে গিয়ে মালিশা দেখল তার সীট নাম্বার তের। এটি একটি অলক্ষণ। আগে জানলে টিকিট বদলে নিত। নিশ্চয়ই মা তার জন্যে কিছুই রেখে যায় নি। আর কেনই-বা রাখবে, এক বারও কি মালিশা তার মায়ের কথা ভেবেছে? মৃত্যুর খবর পেয়ে তার তো সামান্য মন খারাপও হয় নি। ঈশ্বর এ জন্যে তাকে ঠিক শাস্তিই দেবেন। ফ্লোরিডা পৌছানমাত্র এ্যাটর্নি বলবে, 'মিস, আমাদের একটি বড়ো ভুল হয়ে গেছে। আপনার মা তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি আমেরিকান বন্য পশু সংস্থাকে দিয়ে গেছেন।'

সে রকম কিছু হল না।

ডরোথি গিলবার্টের হাতে লেখা উইল পাওয়া গেল। এ্যাটর্নি ভদ্রলোক মিষ্টি হেসে বলল, 'মিস মালিশা, তুমি নিশ্চয়ই এখনো আন্দাজ করতে পারছ না যে তুমি কত টাকার মালিক?'

মালিশা বলল, 'না, আমি পারছি না।'

'সব হিসাব আমাদের হাতে আসে নি। তবে যা এসেছে, তাতেই আমাদের মাথা ঘুরছে।'

এ্যাটর্নিটির বয়স খুব অল্প। সে মালিশাকে দুপুরে লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে গেল। হাসতে-হাসতেই বলল, 'তুমি আবার মনে করে বসবে না যে তোমার সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করছি। আমি বিবাহিত, এবং স্ত্রীকে দারুণ ভালবাসি। একা-একা যাতে তোমাকে লাঞ্চ খেতে না হয়, সে জন্যেই আমি সঙ্গে এলাম।'

'তোমাকে ধন্যবাদ।'

'কী করবে তুমি এত টাকা দিয়ে?'

'এখনো ভেবে ঠিক করি নি। তবে এক জনকে আমি একটি বুইক স্কাইলার্ক গাড়ি উপহার দিতে চাই।'

'কী রঙ?'

'নীল, আসমানী নীল।'

'কাকে দিতে চাও, জানতে পারি?'

'এক জন ইণ্ডিয়ানকে। তাঁর নামটি অদ্ভুত, অন্ধকারের দেবতা। সে আমার চোখের খুব প্রশংসা করেছিল।'

'সে ছাড়াও নিশ্চয়ই অনেকেই তোমার রূপের প্রশংসা করেছে। সবাইকেই কি তুমি বুইক স্কাইলার্ক গাড়ি দিতে চাও?'

'কেউ সত্যিকারভাবে আমার রূপের প্রশংসা করে নি--ঐ ভদ্রলোক করেছিল।'

'মিস মালিশা, এখন অনেকেই তোমার রূপের প্রশংসা করবে।'

'হ্যাঁ, তা করবে।'

মালিশার থাকবার জায়গা করা হয়েছে হিলটনে। কাগজপত্রের ঝামেলা মিটলেই স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা করা হবে। রাতে বিদায় নেবার আগে অল্পবয়েসী এ্যাটর্নিটি হাসিমুখে বলেছে, 'তোমার টাকাপয়সার বিলি ব্যবস্থা করবার জন্যে এক জন দক্ষ আইনজ্ঞ দরকার।'

'তুমি কি এক জন দক্ষ আইনজ্ঞ?'

'না। তবে বিশ্বাসী।'

'তুমি আমার হয়ে কাজ করলে আমি খুশিই হব।'

'ধন্যবাদ। প্রথমেই আমি তোমার জন্যে দু' জন সিকিউরিটি গার্ড রাখতে চাই। আমি কাল সকালেই ব্যবস্থা করব।'

'তার প্রয়োজন আছে কি?'

'আছে। ধনী মহিলার জন্যে অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। আমেরিকা বাস করবার জন্যে ভালো জায়গা নয় মিস মালিশা।'

সারা রাত মলিশার ঘুম হল না। অনেক বার মনে হল সমস্ত ব্যাপারটাই একটা স্বপ্ন নয় তো? একটি নিখুঁত সুখের স্বপ্ন? এক্ষুণি হয়তো ঘুম ভাঙবে। বাড়িওয়ালী এসে বলবে, 'এ মাসের হাউস রেন্ট এক শ' ডলার তুমি এখনো দাও নি। আজকে কি তুমি একটি চেক লিখতে পারবে?' কিন্তু স্বপ্নটা আর ভালো লাগছে না। বড়ো খারাপ লাগছে। যেন সামনে দীর্ঘ একটা অন্ধকার পথ। হোটেল হিলটনের আরামদায়ক উষ্ণতায়ও মালিশার ভীষণ শীত করতে লাগল। সে বেল টিপে বেয়ারাকে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমার ঘুম আসছে না। বড়ো খারাপ লাগছে।'

১৬

মেমেরিয়াল লাউঞ্জে তুমুল উত্তেজনা।

অসহায় সামুদ্রিক তিমি মাছের কল্যাণে টাকা তোলা হচ্ছে। চারদিকে বড়ো

বড়ো পোস্টার—'তিমি মাছদের বাঁচার অধিকার আছে। নোংরা রাশিয়ান, তিমি শিকার বন্ধ কর।' পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে কত তিমি মারা পড়ছে, তার পরিংখ্যানও ঝুলছে জায়গায়-জায়গায়।

মেমোরিয়াল লাউঞ্জে দু'টি মেয়ে সেজেগুজে চুমু খাওয়ার স্টল (কিসিং বুথ) খুলে বসেছে। এদের চুমু খেলে দু' ডলার করে দিতে হবে। সেই ডলারটি চলে যাবে তিমি রক্ষার ফাণ্ডে। প্রচুর ডলার উঠছে। মেয়ে দু'টি চুমু খেয়ে কূল পাচ্ছে না। আনিস অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুমু খাওয়া দেখল। দীর্ঘদিন আমেরিকায় থেকেও কিছু কিছু জিনিসে এখনো সে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। কিসিং বুথ তার একটি।

'হ্যালো আনিস।'

আনিস তাকিয়ে দেখল, ড. বায়ার। হাতে সাবমেরিন স্যাণ্ডউইচ। গালভর্তি হাসি।

'তিমি ফাণ্ডে কিছু দিয়েছ?'

'এখনো না।'

'একটা এডভাইস দিচ্ছি, ঐ নীল-স্কার্ট-পরা মেয়েটিকে চুমু খেতে যেও না। সে নিশ্চয়ই দাঁত ব্রাশ করে না।' ড. বায়ার ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন।

'আনিস, তুমি কি লাঞ্চ খেতে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি জয়েন করতে পারি তোমার সঙ্গে?'

'তা পার।'

আনিস তার প্রিয় জায়গাটিতেই গিয়ে বসল। ভিড় নেই, সবাই জড়ো হয়েছে তিমি মাছদের সাহায্যের ব্যাপার দেখতে। ড. বায়ার অনবরত কথা বলে যেতে লাগলেন, 'আমেরিকানদের কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু ওদের না হলেও আবার কারোর চলে না।'

'আমেরিকানরা যদি এক বৎসর কোনো ফসল না করে, তাহলে থার্ড ওয়ার্লডের চার ভাগের এক ভাগ লোক মরে ভূত হয়ে যাবে।'

'মুখে সবাই বলে আগলি আমেরিকান, কিন্তু হাত পাততে হয় আগলি আমেরিকানদের কাছেই, হা হা হা।'

'রাশিয়ানরা এ বৎসর কত লক্ষ মেট্রিক টন গম কিনছে জান? জান না? আন্দাজ কর তো।'

আনিস হুঁ-হাঁ করে যাচ্ছিল। ড. বায়ার তাতেই খুশি। একটির পর একটি প্রসঙ্গ টেনে আনতে লাগলেন। এক সময় আনিস বলল, 'আমাকে এখন উঠতে হয়।'

'ক্লাস আছে কোনো?'

'না। লাইব্রেরিতে যাব।'

'পাঁচ মিনিট বস। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

আনিস তাকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

ড. বায়ার বললেন, 'শুনলাম তুমি দেশে ফিরে যাচ্ছ। কেমিস্ট্রির চেয়ারম্যানের কাছে এই রকম একটা চিঠি দিয়েছ।'

'হ্যাঁ।'

'অবশ্যই এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবু--কারণ জানতে পারি কি? তুমি এক জন ভালো টীচার। এবং হাইলি কোয়ালিফাইড। খুব শিগ্‌গিরই টেনিউর পাবে। তারপর গ্রীন কার্ডের জন্যে দরখাস্ত করতে পারবে।'

'ড. বায়ার, এখানে আমার ভালো লাগছে না।'

'তোমাকে দোষ দেয়া যাচ্ছে না, এ জায়গার ওয়েদার অত্যন্ত খারাপ। তুমি বরং কালিফোর্নিয়ার দিকে চলে যাও।'

'ওয়েদার নয়।'

ড. বায়ার তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললেন, 'দেশটাই তোমার ভালো লাগছে না?'

'না।'

'এখানে যে-ফ্রীডম আছে, সে-ফ্রীডম তোমার নিজের দেশে আছে?'

'না।'

'এখানকার মতো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা তোমার দেশে আছে?'

'না, তাও নেই।'

'দেখ আনিস, আমি অনেক বিদেশীকে দেখেছি, পড়াশোনা শেষ করে দেশে চলে যাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। চলেও যায়, কিন্তু মাস ছয়েক পর আবার ছুটে আসে। স্বপ্নভঙ্গ বলতে পার।'

আনিস কিছু বলল না। ড. বায়ার কফিতে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, 'তোমরা বিদেশীরা থাক শামুকের মতো। বাইরের কারো সঙ্গে মিশতে পার না। এটা ঠিক নয়। আন্তর্জাতিক হতে চেষ্টা করা উচিত। পৃথিবীটাই হচ্ছে তোমার দেশ। এভাবে ভাবলে আর খারাপ লাগবে না।'

আনিস কোনো উত্তর দিল না। ড. বায়ার হড়বড় করে বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই কিসিং বুথের মেয়ে দু'টিকে চুমু খাও নি। খেয়েছ?'

'না।'

'এস আমার সঙ্গে, চুমু খাবে। আমাদের কালচারকে দূরে ঠেলে রাখলে তো চলবে না। এস তো দেখি। তবে নীল-স্কার্ট-পরা মেয়েটির থেকে দূরে থাকবে। আমি ঠিক করেছি, ঐ মেয়েটিকে একটি জাম্বো সাইজের এ্যাকোয়া ফ্রুশ টুথপেস্ট উপহার দেব, হা হা হা।'

আনিসকে ড. বায়ারের সঙ্গে দোতলায় উঠে আসতে হল। কিসিং বুথের নীল-স্কার্ট-পরা মেয়েটি নেই। অন্য মেয়েটির গলায় উজ্জ্বল রঙের একটি রুমাল। শঙ্খের

মতো সাদা মুখ। শান্ত নীল চোখ। আনিসের মনে হল যেন মালিশা দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দিন মালিশাকে দেখা হয় না। কিসিং বুথের মেয়েটি আনিসের দিকে তাকিয়ে হাসল। হাসিটি পর্যন্ত মালিশার মতো। ড. বায়ার বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন, এগিয়ে যাও।'

আনিস মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগোল। কাছাকাছি আসতেই চিনতে পারল মেয়েটিকে। তার ছাত্রী। কোর্স নাম্বার পাঁচ শ' দুই–তে আছে। মেয়েটি হাত বাড়িয়ে রিণরিণে কণ্ঠে বলল, 'হ্যালো ডক।'

আনিস ঠিক করে ফেলল, একগাদা ফুল নিয়ে আজ সন্ধ্যাতেই আবার যাবে মালিশার খোঁজে। কী ফুল নেওয়া যায়? ডাউনটাউনে ফুলের দোকান ক'টা পর্যন্ত খোলা থাকে?

১৭

নিশানাথ বাবু সাত সকালে টেলিফোন করেছেন, 'হ্যালো শফিক, এক কাণ্ড হয়েছে! হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি। কী হয়েছে?'

'কে যেন একটা গাড়ি কিনে পাঠিয়েছে। নীল রঙের একটা বুইক।'

'কে পাঠিয়েছে?'

'কিছুই লেখা নেই।'

'পরিচিত যারা আছে, তাদের জিজ্ঞেস করেছেন?'

'পরিচিতরা আমাকে গাড়ি দেবে কেন?'

'ভুলটুল হয় নি তো? অন্যের গাড়ি ভুলে হয়তো দিয়ে গেছে।'

'উঁহু। আমার নাম লেখা আছে।'

'বলেন কি!'

'তুমি একবার আসবে শফিক? আমি মহা চিন্তায় পড়েছি।'

'এক ঘন্টার মধ্যে আসছি। জং বাহাদুরের কাণ্ডকারখানাও বলব।'

'নতুন কিছু করেছে নাকি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—না শুনলে আপনার বিশ্বাস হবে না। শালা বজ্জাতের হাড্ডি।'

'তাই নাকি?'

'গতকালকে ফস করে আমার পকেট থেকে নোটবইটা নিয়ে গেছে। আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে এই রকম ভাব করছে, যেন সে নোট বইটা খেয়ে ফেলবে। বুঝুন অবস্থা। বাসায় থাকবেন, আমি আসছি।'

'তুমি কি এক্ষুণি আসছ?'

'একটু দেরি হবে। ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ওদের সকালের খাবার দিয়েই আসব। বাসায় থাকবেন আপনি।'

ভোর ন'টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে ড. লুইস শফিককে বললেন জং বাহাদুরকে নিয়ে ল্যাবরেটরি ওয়ানে যেতে। খাঁচা খুলতেই শান্ত ভঙ্গিতে জং বেরিয়ে এল। গুটিসুটি হয়ে বসে রইল শফিকের কোলে। ড. লুইস হেসে বললেন, 'এটি দেখছি খুব শান্ত স্বভাবের। খাঁচা থেকে বের করলে এরা খুব চিৎকার করে। ওদের একটা সিক্সথ সেন্স আছে--বুঝতে পারে কিছু একটা হবে।'

ড. লুইস জং বাহাদুরের গায়ে দু'টি ইনজেকশন করলেন এবং শফিককে বললেন, 'একে এখন চব্বিশ ঘন্টা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। তিন নম্বর খাঁচায় রেখে দাও।'

শফিক দেখল জং বাহাদুর ঝিম মেরে গেছে, নড়াচড়া করছে না। খাঁচায় নামিয়ে রাখতেই সে শান্ত ভঙ্গিতে মাঝখানে গিয়ে বসে রইল। শফিক বলল, 'এই ব্যাটা, কী হয়েছে তোর?'

জং বাহাদুর দাঁত বের করল না। জিভ বের করে ভেংচে দিল না। শুধু চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইল।

'ড. লুইস, কী দিয়েছেন ওকে?'

'হেভি মেটাল পয়জনিং করা হয়েছে। রক্তের মধ্যে মারকারির একটা সল্ট ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। ও মারা যাবে ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যে। আমরা মেটাল পয়জনিং-এর এফেক্ট লক্ষ করব। ব্লাড-প্রেশার কী করে ফল করে, সেটা মনিটার করা হবে।'

শফিকের গা কাঁপতে লাগল। তিন নম্বর খাঁচার সামনে গিয়ে ভাঙা গলায় ডাকল, 'জং বাহাদুর, জং বাহাদুর।'

জং বাহাদুর ঘাড় ঘুরিয়ে থাকল। কী শান্ত দৃষ্টি!

দু' নম্বর খাঁচার সব ক'টি বানর ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জং বাহাদুরের দিকে। ওরা কি কিছু বুঝতে পারছে? ড. লুইস এসে দেখলেন, পিপুল ডাইলেটেড হতে শুরু করেছে, মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। লোহিত রক্ত-কণিকা ফুসফুস থেকে আর রক্ত নিয়ে যেতে পারছে না।

শফিক ক্লান্ত স্বরে বলল, 'ড. লুইস, বড্ড খারাপ লাগছে আমার।'

শফিকের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। জং বাহাদুর তাকাচ্ছে শফিকের দিকে। শফিক মৃদু স্বরে বলল, "লাইলাহা ইল্লা আনতা সোবহানাকা ইন্নি কন্তু মিনায-যোয়ালেমিন।'

ড. লুইস অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সেন্টিমেন্টাল ইণ্ডিয়ানস। সিলি সেন্টিমেন্টের জন্যেই ওদের কিছু হয় না। চাইনীজ পোস্ট ডকটিও চোখ বড়ো

বড়ো করে তাকিয়ে আছে শফিকের দিকে। সে অস্পষ্ট স্বরে চাইনীজ ভাষায় কী-যেন বলল--নিশ্চয়ই কোনো ইস্টার্ন ফিলোসফি! রাবিশ, এসব সেন্টিমেন্টাল ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে মুশকিল। এরা বড়ো ঝামেলা করে।

শফিক জং বাহাদুরের খাঁচার শিক দু' হাতে ধরে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। জং বাহাদুর মনে হল এগিয়ে আসছে তার দিকে। শফিক চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

১৮

'মিস মালিশা, তোমার কি রাতে ঘুম হয় নি?'

'নাহ্।'

'স্নায়ু ইত্তেজিত হয়েছিল, সে-জন্যে এই হয়েছে। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে কোনো একটা সিডেটিভের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। ভুলটা আমার।'

মালিশা চোখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল এ্যাটর্নির দিকে। অল্পবয়েসী এই ছোকরাকে বেশ লাগছে তার। সে বলল, 'আমি তোমার নাম ভুলে গেছি। আই এ্যাম সরি।'

'আমার নাম ডেনিস বেয়ার। তুমি আমাকে বিল ডাকতে পার।'

'বিল, একটি বুইক গাড়ি পাঠাবার কথা বলেছিলাম।'

'পাঠান হয়েছে।'

'কে পাঠিয়েছে, কি, কিছুই লেখা নেই তো?'

' না। কিন্তু মিস মালিশা, কাউকে গিফ্‌ট দেওয়ার প্রধান আনন্দই তো হচ্ছে গিফ্‌ট পেয়ে সে কেমন খুশি হল তা জানা, ঠিক নয় কি?'

মালিশা জবাব দিল না। ডেনিস বেয়ার মিটমিট করে হাসতে লাগল।

মালিশা বলল, 'হাসছ কেন?'

'আজকের ন্যাশনাল ইনকোয়ারারে তোমার ছবি ছাপা হয়েছে। তুমি বিখ্যাত হতে শুরু করেছ।'

মালিশা ক্লান্ত স্বরে বলল, 'আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। আজ আমি কোথাও যেতে চাই না।'

'মিস মালিশা, ডিসট্রিক্ট এ্যাটর্নি অফিসে আজকে এক বার যেতেই হবে। ঘন্টাখানিকের বেশি লাগবে না, অনেস্ট!'

মালিশা জবাব দিল না। ডেনিস বেয়ার একটি সিগারেট ধরিয়ে হাসিমুখে বলল, 'সেখান থেকে যাব চেস ম্যানহাটনে, কথা দিচ্ছি ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সব ঝামেলা চুকিয়ে ফেলব।'

'আজকে না গেলে হয় না?'

'না, আজকেই যেতে হবে। ডলার একটি চমৎকার জিনিস। পৃথিবীর মধুরতম শব্দের একটি। কিন্তু শব্দটি মধুময় রাখার যন্ত্রণাও কম নয়।'

প্রকাণ্ড একটি ফোর-ডোর শেভ্রোলে গাড়ি হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির পেছনের সিটে মধ্যবয়েসী এক জন ভদ্রলোক একটি সামার কোট পরে বসে আছেন। ডেনিস বেয়ার মৃদু স্বরে বলল, 'ওর নাম জিম। তুমি যখনি বাইরে যাবে, ও ছায়ার মতো থাকবে তোমার সঙ্গে। ও তোমার বডিগার্ড। খুব এফিশিয়েন্ট লোক।'

মালিশা ক্লান্ত স্বরে বলল, 'আমার এসব দরকার ছিল না।'

'দরকার আছে।'

গাড়িতে উঠেই মালিশা বলল, 'আমার কেন যেন ভালো লাগছে না, কিছুতেই মন বসছে না।'

'সন্ধ্যাবেলা অপেরা দেখতে চাও?'

'টিকিট পাওয়া যাবে?'

'ডলার দিয়ে পৃথিবীর যে-কোনো জিনিস পাওয়া যায়।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ। তুমি কী চাও বলবে, আমি ব্যবস্থা করব। ডলারের মতো চমৎকার জিনিস পৃথিবীতে কী আছে?'

'ডলারের মতো চমৎকার জিনিস পৃথিবীতে নেই, না?'

'না।'

মালিশার মনে হল তার জ্বর আসছে। কিছুই ভালো লাগছে না। গায়ের সঙ্গে গা ঘেঁষে জিম বসে আছে। লোকটি মূর্তির মতো, সমস্ত রাস্তায় এক বার শুধু বলল, 'চমৎকার ওয়েদার, মিস মালিশা।'

ডিসট্রিক্ট এ্যাটর্নি অফিসে দু' ঘন্টার মতো লাগল। মালিশাকে তেমন কিছু করতে হল না। শুধু চুপচাপ বসে থাকা। মাঝে মাঝে দু'-একটা ফর্মে সই করা। এ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গেও মিনিট দশেকের কথাবার্তা বলতে হ'ল। দু' ঘন্টা বসে মালিশার প্রচণ্ড মাথা ধরে গেল।

চেস ম্যানহাটনে যাবার পথে ডেনিস বেয়ার শান্ত স্বরে বলল, 'মিস মালিশা, আমি বুঝতে পারছি তোমার খুব বিরক্তি লাগছে। কিন্তু উপায় নেই।'

'চেস ম্যানহাটনে আজ না গেলে হয় না?'

'না। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

মালিশা চুপ করে গেল। জিম বলল, 'চমৎকার ওয়েদার, তাই না মিস্টার বেয়ার?'

ডেনিস বেয়ার সে-কথার জবাব না দিয়ে মালিশার দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলল, ' আমার মনে হয়, আই বি এম-এ তোমার যে শেয়ার আছে সেগুলি বিক্রি করে ফেলা উচিত। আই বি এম ফল করতে শুরু করেছে। তুমি কি ওয়াল স্ট্রীট

জার্নাল পড়?

'না।'

'এখন থেকে নিয়মিত পড়বে। আমি এক জন এ্যানালিস্টও ঠিক করে রেখেছি। সে সপ্তাহে এক দিন এসে তোমাকে ওয়াল স্ট্রীটের ব্যাপারগুলি এক্সপ্লেইন করবে।'

মালিশা শুকনো গলায় বলল, 'গাড়িটা একটু রাখতে বল, আমার বমি আসছে।'

গাড়ি থামাবার আগেই মুখ ভর্তি করে বমি করল মালিশা।

'আই এ্যাম সরি।'

'সরি হবার কিছুই নেই।'

'এখন কি ভালো লাগছে?'

'নাহ্, বড্ড খারাপ লাগছে। প্লীজ, আমাকে হোটেলে নিয়ে চল।'

১৯

ইন্টারস্টেটে আসামাত্র হাইওয়ে পেট্রল পুলিশ গাড়ি থামাল। ফার্গো মুরহেড এলাকায় তুষারঝড় হবার সম্ভাবনা--প্রচুর বরফ পড়ছে। হাইওয়ে ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে। টম নেমে এল গাড়ি থেকে।

'অফিসার, আমাকে যেতেই হবে। এই মেয়েটির বাবা মারা যাচ্ছে--এই সময় মেয়েটির তার বাবার কাছে থাকা দরকার।'

'রাস্তা অত্যান্ত খারাপ। অনেক গাড়ি স্কিড করে পথের পাশে পড়ে আছে।'

'আমি খুব কেয়ারফুল ড্রাইভার। বিশ মাইলের উপর স্পীড তুলব না। প্লীজ, অফিসার, প্লীজ!'

'তুমি বুঝতে পারছ না, দারুণ রিস্কি ব্যাপার।'

'অফিসার, প্লীজ! এই মেয়েটিকে আমি যে-করেই হোক তার বাবার কাছে নিয়ে যেতে চাই।'

গাড়ি চলছে খুব ধীর গতিতে। টম সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে স্টিয়ারিং-হুইলের উপর ঝুঁকে আছে। সে এক সময় শান্ত স্বরে বলল, 'ভালোমতো কম্বল জড়িয়ে নাও রুন। হিটিং কাজ করছে না।'

রুনকি পায়ের উপর কম্বল টেনে দিল, কোনো কথা বলল না। টম নিচু ভল্যুমে একটি ক্যাসেট চালু করেছে। রাতের বেলা গাড়ি চালাতে হলে ঘুম তাড়াবার জন্যে এটা করতে হয়। মিষ্টি সুরে পোলকা বাজছে। রুনকি জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। মাইলের পর মাইল ফাঁকা মাঠ। বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে সব। কী

ভয়ংকর সুন্দর।

২০

আনিস এসেছে একা একা।

তুষারপাত হচ্ছে। রাস্তা জনমানবশূন্য। থার্মোমিটারের পারদ নিচে নামতে শুরু করেছে। স্ট্রীট লাইটের আলো অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কে জানে তুষারঝড় হবে কিনা। উত্তর দিক থেকে বাতাস দিচ্ছে। লক্ষণ মোটেই ভালো নয়। আনিস এমিলি জোহানের ঘরের কড়া নাড়ল।

'এমিলি জোহান, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ? মেমোরিয়াল ইউনিয়নে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, চিনতে পারছি। খুব কম মানুষের সঙ্গে আজকাল আমার দেখা হয়। আমি সবাইকে মনে রাখি।'

'আমি একটা মেয়ের খোঁজ করছিলাম, মালিশা গিলবার্ট। ওকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।'

এমিলি জোহান শান্ত স্বরে বললেন, 'তুমি কি ওর জন্যে গোলাপ ফুল এনেছিলে? ল্যাণ্ডলেডি আমাকে বলেছিল।'

আনিস জবাব দিল না। এমিলি জোহান থেমে থেমে বললেন, 'আমরা আমেরিকানরা খুব অদ্ভুত জাত। যখন কোনো কিছু চাই, মন প্রাণ দিয়ে চাই। যখন সেই জিনিসটি পাওয়া যায় তখন জীবন অর্থহীন হয়ে যায়।'

আনিস কিছু বুঝতে পারল না। এমিলি জোহান থেমে থেমে বললেন, 'মালিশা গিলবার্ট ঘুমের অষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছে। দীর্ঘ বিরতিহীন ঘুম আনিস, তুমি কি আমার ঘরে এসে বসবে? নক্ষত্র নিয়ে আমি একটি চমৎকার কবিতা লিখেছি।'

আনিস বেরিয়ে এল। বরফে--বরফে চারদিক ঢাকা পড়ে গেছে। একটি পরাজিত শহর।

তুষারঝড় হবে। নিশ্চয়ই তুষারঝড় হবে।

আনিস পায়ে হেঁটে বাড়ির পথ ধরল। ভূতে-পাওয়া শহরের জনশূন্য পথঘাট। কী অদ্ভুত লাগে হাঁটতে। ব্রডওয়ের কাছে ছাতা মাথায় একটি রোগা মেয়েকে দেখা গেল। সিগারেটের আলোয় তার ক্লান্ত মুখ চোখে ভাসল ক্ষণিকের জন্যে। মেয়েটি ক্ষীণ স্বরে বললো, 'হ্যালো মিস্টার, কী ন্যাস্টি ওয়েদার।

আনিস জবাব দিল না। মেয়েটি থেমে থেমে বলল, 'আজ রাতের জন্যে তোমার কোনো ডেট লাগবে?'

'নাহ্, ধন্যবাদ।'

মেয়েটি এগিয়ে এল তবু। মুখের সিগারেট দূরে ছুঁড়ে ফেলে সরু গলায় বলল, 'তুমি কি আমার জন্যে এক মগ বিয়ার কিনবে? কী দুঃসহ শীত।'

এক দিন এই দুঃসহ শীত শেষ হবে। আসবে রোদ-উজ্জ্বল সামার। ছুটি কাটানর জন্য আমেরিকানরা গাড়ি নিয়ে আসবে হাইওয়েতে। মন্টানা, সল্ট লেক, ইয়েলো স্টোন পার্ক। কত কিছু আছে দেখবার। সামারের রাতগুলি এরা বনের ধারে তাঁবু খাটিয়ে কাটাবে। প্রচণ্ড জ্যোৎস্না হবে রাতে। যুবকযুবতীদের বড্ড বনে যেতে ইচ্ছা করবে।

*'সবাই গেছে বনে'র সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক। পাত্র-পাত্রীদের কাউকেই আমি কোনো দিন দেখি নি।

একা একা

রাত দুপুরে দুমদুম করে দরজায় কিল পড়তে লাগল। সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। আগুনটাগুন লেগেছে কিংবা চোর এসেছে। চোর হবার সম্ভাবনাই বেশি। খুব চুরি হচ্ছে চারদিকে।

আমরা দু' জনের কেউই ঘুমাই নি। ঘর অন্ধকার করে বসে আছি। বাবুভাই তার শেষ সিগারেটটি ধরিয়েছে। সিগারেট হাতে থাকলে সে কোনো কথাবার্তা বলে না। কাজেই আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'কে?'

'দরজা খোল।'

বড়োচাচার গলা। ধরা যেতে পারে সাংঘাতিক কিছু হয় নি। এ বাড়িতে বড়োচাচার কোনো অস্তিত্ব নেই। কাজকর্ম কিছু করেন না। সে জন্যই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ করে বাড়ি মাথায় তোলেন। এক বার রাত তিনটায় এমন চেঁচামেচি শুরু করলেন যে পাহারাদার পুলিশ আমাদের গেটের কাছে বাঁশি বাজাতে লাগল। আমি এবং বাবুভাই দু' জনে ছুটে গিয়ে দেখি ছোটচাচীর পোষা বেড়াল তাঁর ঘরে ঢুকে বিছানার উপর বমি করেছে। বড়োচাচার সে কী চিৎকার! যেন ভয়ংকর একটা কিছু হয়েছে।

আজ রাতেও নিশ্চয়ই সে রকম কিছু হবে। হয়তো চাচীর বেড়াল তাঁর ঘরে গিয়ে কুকীর্তি করে এসেছে। আর এই নিয়ে ঘুমুবার সময়টায় তিনি লাফঝাঁপ শুরু করেছেন।

আমি বিরক্ত স্বরে বললাম, 'কী হয়েছে চাচা?'

'দরজা খুলতে বললাম, কানে যায় না?'

'ব্যাপারটা কী?'

'চড় দিয়ে দাঁত খুলে ফেলব লাটসাহেব কোথাকার। দরজা খোল।'

বাবুভাই সিগারেট ফেলে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, 'রাত দুপুরে কী শুরু

করেছেন?'

'কি শুরু করেছি মানে? একটা মানুষ মারা যাচ্ছে!'

'কে মারা যাচ্ছে?'

বড়োচাচা তার উত্তর না দিয়ে প্রচণ্ড একটা লাথি কষালেন দরজায়।

বাবুভাই উঠে দরজা খুলল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'কে মারা যাচ্ছে?'

বড়োচাচা হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'সংয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকিস না, নিচে যা।'

'হয়েছেটা কি বলবেন তো?'

'বাবার অবস্থা বেশি ভালো না।'

'স্ট্রোক হয়েছে নাকি?'

'হতে পারে। অবস্থা খুব সিরিয়াস। খুবই সিরিয়াস।'

বড়োচাচাকে দেখে মনে হল না তিনি খুব বিচলিত। বরঞ্চ এই উপলক্ষে হৈ-চৈ করার সুযোগ পাওয়ায় তাঁকে বেশ খুশিখুশিই মনে হল। অনেক দিন পর একটা দায়িত্ব পেয়েছেন।

'সবাইকে খবর দেওয়া দরকার। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নাই এখন। উফ্, কী ঝামেলা!'

তিনি ঝড়ের মতো নিচে নেমে গেলেন। তাঁর গলা অবশ্যি শোনা যেতে লাগল, 'ড্রাইভার কোথায়? ড্রাইভার? কাজের সময় সব কোথায় যায়? পেয়েছে কী?'

বারান্দার লাইট জ্বলল। চটি ফট্‌ফট্ করে কে যেন নামল। ছোটচাচা? এ বাড়িতে ছোটচাচাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি চটি পরেন এবং শব্দ করে হাঁটেন। নিশ্চয়ই তিনি।

বাবুভাই আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল। চিন্তিত স্বরে বলল, 'তুই চট করে দেখে আয় সত্যি সত্যি অবস্থা খারাপ কি না। আমার মনে হয় বাবা খামাখা চেঁচাচ্ছে।'

নিচে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যি খারাপ। দাদার ঘরে অনেক লোকজন। ছোটচাচা, বড়োচাচা, শাহানা, আমাদের ভাড়াটে রমিজ সাহেব। কম পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলছে। তাঁর খাটটি সরিয়ে সিলিং ফ্যানের ঠিক নিচে নিয়ে আসা হয়েছে। রাখা হয়েছে আধশোওয়া করে। তিনি হাত দু'টি ছাড়িয়ে নিঃশ্বাস নেবার জন্য ছটফট করছেন। পৃথিবীতে এত অক্সিজেন, কিন্তু তাঁর বৃদ্ধ ফুসফুসটাকে তিনি আর ভরাতে পারছেন না। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

শাহানা একটি হাতপাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, তবু সে ক্রমাগত পাখা নেড়ে যাচ্ছে। তার মুখ হয়েছে পাংশুবর্ণ। লম্বাটে মুখ আরো লম্বা দেখাচ্ছে।

দাদা কি একটা বলতে চেষ্টা করলেন। শ্লেষ্মা-জড়িত স্বর, কিছুই বোঝা গেল না। বড়োচাচী চেয়ারে বসে ছিলেন। তিনি চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, 'কী

বলছেন রে?'

'কি জানি কী?'

'শাহানা, তুই কিছু বুঝতে পারলি?'

'জ্বি–না মামী।'

দাদা এবার স্পষ্ট বলে উঠলেন, 'মিনু, ও মিনু।'

মিনু আমাদের সবচেয়ে বড়ো ফুফু। ন' বছর বয়সে গলায় কি একটা ঘা (খুব সম্ভব ক্যানসার) হয়ে মারা গিয়েছিল। অল্পবয়সে মৃত্যু হবে বলেই হয়তো রাজকন্যার মতো রূপ নিয়ে এসেছিল। আমাদের বসার ঘরে এই ফুফুর একটি বাঁধান ছবি আছে।

দাদা আবার বিড়বিড় করে কী বললেন। তাঁর বুক হাঁপরের মতো ওঠানামা করতে লাগল। শাহানা আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, 'বড়ো ভয় লাগছে।'

'ভয়ের কী আছে?'

'একটা মানুষ মরে যাচ্ছে, এটা ভয়ের না, কী বলছিস তুই?'

দাদা ছটফট করতে লাগলেন। এক জন মানুষ শ্বাস নেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, আর আমরা এত সহজে নিঃশাস নিচ্ছি। আমার দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জাই লাগল।

দাদা তাহলে সত্যি সত্যি মারা যাচ্ছেন। ইদানীং তাঁর সাথে আমার খুব একটা দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত না। ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি ডাকতেন, 'কে যায়, বাবু? বাবু না? তাহলে কে, টগর? এ্যাই টগর এ্যাই।' আমি না শোনার ভান করে দ্রুত বেরিয়ে যেতাম। কী কথা বলব তাঁর সাথে? দাদার নিজের কোনো কথা নেই বলার। আমারও নেই। এক জন বুড়ো মানুষ, যার স্মৃতিশক্তি নেই, গুছিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে, তাঁর কাছে দীর্ঘ সময় বসে থাকা যায় না।

কিন্তু মানুষ শুধু কথা বলতে চায়। সর্বক্ষণ চায় কেউ না কেউ থাকুক তার পাশে। কে থাকবে এত সময় তাঁর কাছে? দাদা তা বোঝেন না। তাঁর ধারণা পৃথিবীর সবারই তাঁর মতো অখণ্ড অবসর। কাজেই তিনি কান খাড়া করে দরজার পাশে সারা দিন এবং প্রায় সারা রাত বসে থাকেন। কারো পায়ের শব্দ পাওয়া গেলেই ডাকেন, 'কে যায়? কে এটা, কথা বলে না যে, কে?'

বাধ্য হয়ে কোনো কোনো দিন যেতে হয় তাঁর ঘরে। তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন, 'কে তুই, বাবু?'

'জ্বি–না, আমি টগর।'

'তোর পরীক্ষা কেমন হয়েছে?'

কখন পরীক্ষা, কী পরীক্ষা, কিছুই তিনি জানেন না। কিন্তু সমস্ত কথাবার্তা

তাঁর পরীক্ষা দিয়েই শুরু হয়। আমি ঝামেলা কমাবার জন্যে বলি, 'ভালোই।'

'ডিভিসন থাকবে।'

'জ্বি থাকবে?'

'অঙ্ক ভালো হয়েছে? অঙ্কটাই আসল। ডিভিসন হয় অঙ্ক আর ইংরেজিতে। ইংরেজি কেমন হয়েছে?'

'ভালোই হয়েছে।'

'আমি আসিতে আসিতে ট্রেন ছাড়িয়া দিল,--এর ইংরেজি বল দেখি?'

দাদার সঙ্গে কথা বলার এই যন্ত্রণা। আমি এম-এস সি করছি বোটানিতে, কিন্তু তাঁর কাছে বসলেই একটা ইংরেজি ট্রানস্লেশান করতে হবে। মাসখানেক আগে এক বার বাবুভাইকে ডেকে এনে পাটিগণিতের অঙ্ক কষতে দিলেন। সে অঙ্ক আবার পদ্যে লেখা--'অর্ধেক পঙ্কে তার, তেহাই সলিলে। নবম ভাগের ভাগ শৈবালের জলে--' ইত্যাদি। বাবু ভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দাদা, আমি পাশটাশ করে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অফিস খুলেছি, এখন বসে বসে পাটিগণিত করব নাকি?'

'তুই আবার পাশ করলি কবে?'

'এম. এ. পাশ করলাম দুই বছর আগে।'

'বলিস কি! কোন ক্লাস পেয়েছিস?'

'আপনাকে নিয়ে তো মহা মুসিবত দেখি।'

দাদাকে নিয়ে মুসিবত শুরু হয়েছে বেশ অনেক দিন থেকেই। বছর তিন ধরে হঠাৎ করে তাঁর মাথায় গণ্ডগোল হতে শুরু করে। ব্যাপারটা সাময়িক। দিন দশেক থাকে। আবার সেরে যায়, আবার হয়! মস্তিষ্কবিকৃতির সময়টা বাড়িসুদ্ধ লোককে তিনি অস্থির করে রাখেন। এই সময় তিনি কিছুই খান না। ভাত মাখাবার সময় তিনি নাকি দেখতে পান একটা কালো রঙের বেড়াল থাবা দিয়ে তাঁর সঙ্গে ভাত মাখছে। কাজেই তিনি ভাত খেতে পারেন না। এক জনকে তখন প্লেট উঁচু করে রাখতে হয় (যাতে বেড়ালে ভাত ছুঁতে না পারে)। অন্য এক জনকে ভাত মাখিয়ে মুখে তুলে দিতে হয়। তুলে দেওয়া ভাতও বেশিক্ষণ খেতে পারেন না। দু'-এক দলা মুখে তুলেই চেঁচাতে থাকেন, "বেড়াল গা বেয়ে উঠছে। গা বেয়ে উঠছে।" চেঁচাতে চেঁচাতে এক সময় বমি করে ফেলেন। কী কষ্ট, কী কষ্ট!

অসুখের আগেও যে তাঁর সময় খুব ভালো যাচ্ছিল তা নয়। দিনের বেশির ভাগ সময় বসে থাকতেন বারান্দায়। ইজিচেয়ারে আধশোওয়া হয়ে সমস্ত দিন একা একা পড়ে থাকা নিশ্চয়ই কষ্টকর ব্যাপার। ঠিক এই বয়সে, এই অবস্থায় এক জন মানুষ কী ভাবে--কে জানে? বসার ভঙ্গিটা অবশ্য অপেক্ষা করার ভঙ্গি। যেন কোনো-একটি বড়ো কিছুর জন্যে অপেক্ষা। সেটা নিশ্চয়ই মৃত্যু। বারান্দার অন্ধকার কোণায় এক কালের এক জন প্রবল প্রতাপের মানুষ আধোজাগ্রত অবস্থায় মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। চিত্রটি অস্বস্তিকর।

এখন রাত এগারটা পঁচিশ। দাদার যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে এ জগতের জ্বালা–যন্ত্রণার অবসান হতে বেশি দেরি নেই। তাঁর বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। জীবনের সর্বশেষ যাত্রাটি সুসহ্ করা হল না কেন কে জানে?

আকবরের মা প্রকাণ্ড একটা গামলাভর্তি ফুটন্ত পানি এনে হাজির করল। বড়োচাচী অবাক হয়ে বললেন, 'গরম পানি কি জন্যে?'

'আমি কি জানি? আমারে আনতে কইছে আনছি।'

'শাহানা, গরম পানির কথা কে বলেছে?'

'আমি জানি না, মামী।'

'কি যে এদের কাণ্ড! এই আকবরের মা, পানি নিয়ে যাও তো। কে বলেছে তোমাকে পানির কথা?'

'বড়ো মিয়া কইছেন।'

'যাও, নিয়ে যাও।'

আকবরের মা পানি নিয়ে যেতে গিয়ে ইচ্ছে করেই অর্ধেক পানি ফেলে ঘর ভাসিয়ে দিল। আমি দাদার ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। বারান্দার এক প্রান্তে উগ্র মূর্তিতে বড়োচাচাকে দেখা গেল। তাঁর সামনে কালাম। কালামের মুখ পাংশুবর্ণ।

'আজকে তোর চামড়া খুলে ফেলব। মানুষ মারা যাচ্ছে বাড়িতে, আর তোর আজকে না ঘুমালে শরীর খারাপ করবে? লাটসাহেব আর কি।'

আমাকে দেখে বড়োচাচার কাজের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। কালামের গালে প্রকান্ড একটা চড় কষিয়ে দিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে মেঘস্বরে বললেন, 'তোকে যে বললাম সবাইকে খবর দিতে, দিয়েছিস?'

'জ্বি–না, দিই নি। দেব।'

'একটা কথা কত বার বলা লাগে?'

'যাচ্ছি।'

'যাচ্ছিটা কখন? নিজের চোখে অবস্থাটা দেখছিস না?'

'চাচা, ডাক্তার আনতে কেউ গিয়েছে?'

'রমিজ সাহেব গিয়েছেন। রমিজ এলে তুই গাড়ি নিয়ে যাবি। বাবুকে সঙ্গে নিস। সেই মাতবরটা কোথায়?'

'উপরে আছে।'

'যা, ডেকে নিয়ে আয়। অন্য বাড়ির লোকজন ছোটাছুটি করছে, আর নিজেদের কারোর খোঁজ নেই। আফসোস।'

অন্য বাড়ির লোক––অর্থাৎ রমিজ সাহেব। লম্বা কালো মোটাসোটা একটা মানুষ, যাদের দেখলেই মনে হয় এদের জন্ম হয়েছে অভাব অনটনে থাকবার জন্যে। তিনি আমাদের ভাড়াটে। একতলার চারটা কামরা নিয়ে আজ সাত বছর ধরে আছেন। এই সাত বছর কোনো ভাড়া বাড়ান হয় নি। কিন্তু তবু রমিজ সাহেব তাঁর

নামমাত্র ভাড়াও নিয়মিত দিতে পারেন না। হাত কচলে চোখেমুখে দীন একটা ভাব ফুটিয়ে আমার বাবাকে গিয়ে বলেন, 'রহমান সাহেব, একটা বড়ো বিপদে পড়েছি--আমার ছোট শালীর এক ছেলে.....'

রমিজ সাহেবের বাড়িভাড়া না-দেওয়ার কারণগুলি সাধারণত বিচিত্র হয়ে থাকে, এবং তা শেষ পর্যন্ত শোনার ধৈর্য কারো থাকে না। বাবাকে এক সময় বিরক্ত হয়ে বলতে হয়, 'থাক, থাক। একটু রেগুলার হবার চেষ্টা করবেন, বুঝলেন?'

'জ্বি স্যার। আর দেরি হবে না।'

রেগুলার হবার কোনো রকম চেষ্টা অবশ্যি দেখা যায় না। তিনি নিজের অংশের একটা ঘর সাবলেট দিয়ে ফেলেন গোঁফওয়ালা বেঁটে একটা ভদ্রলোককে। আমাদের অবশ্য বলেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, বিপদে পড়েছে, তাই দিন দশেক থাকবে। সেই লোক মাস দুয়েক থাকার পর আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। বড়োচাচা খুব রাগলেন। গলার রগ ফুলিয়ে বললেন, 'সব ক'টাকে ঘাড় ধরে বের করে দাও। ফাজলামি পেয়েছে?' বেঁটে লোকটা খুব হম্বি-তম্বি শুরু করল, 'বললেই হয়, দেশে আইন-আদালত নাই? এভিকশন কি মুখের কথা?' এতে বড়োচাচা আরো বেশি রেগে গেলেন এবং হুকুম দিলেন বাড়ির সব জিনিসপত্র বাইরে বের করে দিতে। আমাদের বাড়ির চাকর-বাকররা অনেক দিন পর একটা উত্তেজনার ব্যাপার ঘটবার উপক্রম দেখে উৎসাহে সঙ্গে সঙ্গে আলনা, ট্রাঙ্ক, চেয়ার, টেবিল বাইরে এনে ফেলতে লাগল। আমি হৈ-চৈ শুনে বারান্দায় এসে দেখি রমিজ সাহেবের স্ত্রী রক্তশূন্য মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার। এই সময় বাবুভাই এল কোত্থেকে এবং সে খুব অবাক হয়ে গেল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এইসব কি?'

আকবরের মা একগাল হেসে বলল, 'বড়ো ভাই, এরারে বাড়ি থাইক্যা বাইর কইরা দিতেছি।'

রমিজ সাহেবের বড়ো মেয়েটা শব্দ করে ফুঁপিয়ে উঠল। বাবুভাই গম্ভীর মুখে বললেন, 'জিনিসপত্র সব ঘরে নিয়ে ঢোকাও, এইসব কি?'

বড়োচাচা কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন। বাবুভাই তার আগেই এগিয়ে এসে কালামের গালে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিলেন। কালাম হৃষ্টচিত্তে একটা মিটসেফ ঠেলাঠেলি করে আনছিল। সে কিছুই বুঝতে না পেরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। বাবুভাই যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে নিজের ঘরে চলে এলেন।

সে-দিন আমি বেশ কিছু জিনিস প্রথম বারের মতন লক্ষ করলাম। যেমন--রমিজ সাহেবের চার মেয়ে। কোনো ছেলে নেই। রমিজ সাহেব এবং তাঁর স্ত্রীর চেহারা মোটামুটি ধরনের, কিন্তু তাঁদের চারটি মেয়েই দেখতে চমৎকার। সবচেয়ে বড়োটির (যার নাম নীলু) এমন মায়াকাড়া চেহারা। সব ক'টি বোনের মধ্যে একটা অন্য রকম স্নিগ্ধ ভাব আছে। তা ছাড়া বাচ্চাগুলি এম্নিতেও শান্ত।

চিৎকার চেঁচামেচি কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ল না।

এর কিছু দিন পরই রমিজ সাহেব হাসিমুখে এক প্যাকেট লাড্ডু হাতে দোতলায় এলেন। বড়ো মেয়েটি তাঁর পেছনে। ব্যাপার কী? বড়ো মেয়ে, যার নাম নীলু, সে ক্লাস এইটে বৃত্তি পেয়েছে। রমিজ সাহেব সব ক'টি দাঁত বের করে হাসতে-হাসতে বললেন, 'ঘরের কাজকর্ম করে সময়ই পায় না। সময় পেলে স্যার আরো ভালো হ'ত।'

বাবা অবাক হয়েই বললেন, 'কত টাকার বৃত্তি?'

'মাসে চল্লিশ টাকা স্যার। আর বই কেনা বাবদ বৎসরে দুই শ' টাকা।'

'বাহ্, বেশ তো!'

'মেয়েটার জন্য দোয়া করবেন স্যার'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

দোতলা থেকে তারা রওনা হল তিন তলায়। এই সময় দেখা হল আমার সঙ্গে।

'এই যে ভাই সাহেব, আমার এই মেয়েটা........'

'শুনেছি, বাবাকে বলছিলেন। আমি বারান্দায় ছিলাম। খুব ভালো খবর।'

'নীলু, কদমবুসি কর টগর সাহেবকে।'

আমি আঁৎকে উঠলাম, 'আরে না-না।'

'না-না কি? মুরুব্বির দোয়া ছাড়া কিছু হয় নাকি? এ্যাঁ?'

রমিজ সাহেব ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। আজ আর তিনি দীন ভাড়াটে নন। আজ এক জন অহংকারী বাবা।

আমি বললাম, 'তোমার নাম কী?'

'নীলু।'

রমিজ সাহেব গর্জে উঠলেন, 'ভালো নাম বল।'

'নীলাঞ্জনা।'

"বাহ্, সুন্দর নাম!'

রমিজ সাহেব হৃষ্টচিত্তে বললেন, 'ওর মা-র রাখা নাম। আমি নাম দিয়েছিলাম জোবেদা খানম। সেটা তার মায়ের পছন্দ হল না। নামটা নাকি পুরানা। আরে ভাই আমি নিজেও তো পুরানা। হা-হা-হা।'

বাবা মেয়েটির জন্য একটা পার্কার কলম কিনে পাঠিয়ে দিলেন। সেই কলমের প্রসঙ্গ রমিজ সাহেব সময়ে-অসময়ে কত বার যে তোলেন তার ঠিক নেই। যেমন দিন সাতেক পর রমিজ সাহেবের সঙ্গে নিউমার্কেটে দেখা হল। তিনি একগাল হেসে বললেন, 'কাণ্ড শুনেছেন নাকি ভাই?'

'কী কাণ্ড?'

'পার্কার কলমটা যে দিয়েছেন আপনারা--নিলু স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল। ক্লাস ছুটি

হওয়ার পর আর পায় না। মেয়ে তো কাঁদতে কাঁদতে বাসায় আসছে। আমি দিলাম এক চড়। মেজাজ কি ঠিক থাকে, বলেন আপনি? শেষে তার ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেল। দেখেন অবস্থা। হা-হা-হা।'

নীলুর সঙ্গে আমার খানিকটা খাতিরও হল অন্য একটি কারণে। এক দিন দেখলাম দুপুরের কড়া রোদে সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। একা নয়, সঙ্গে আরো কয়েকটি মেয়ে। স্কুল-ড্রেস পরা থাকলে যা হয়--সব ক'টাকে অবিকল এক রকম লাগে। তবুও এর মধ্যে নীলুকে চিনতে পারলাম, 'এ্যাই নীলু।'

নীলু হকচকিয়ে এগিয়ে এল।

'যাচ্ছ কোথায়? এ লাইনে তো মিরপুরের বাস যায়।'

'কল্যাণপুর যাচ্ছি। আমাদের এক বন্ধুর আজ গায়ে হলুদ, আমাদের যেতে বলেছে।'

'ঐ ওরাও যাচ্ছে তোমার সাথে?'

'জ্বি।'

'উঠে পড় গাড়িতে। পৌঁছে দিই। যে ভিড়, এখন আর বাসে উঠতে পারবে না।'

নীলু ইতস্তত করতে লাগল। যেন আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ায় মস্ত অপরাধ হয়েছে। অন্য মেয়েগুলি অবশ্যি খুব হৈ-চৈ করে গাড়িতে উঠে পড়ল। তারা খুব খুশি।

'সারা দিন থাকবে তোমরা?'

নীলু জবাব দিল না। কালোমতো একটি মেয়ে হাসিমুখে বলল, 'আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকব। সবাই বাসায় বলে এসেছি। শুধু নীলু বলে আসে নি।'

'কেন, নীলু বলে আস নি কেন?'

নীলু তারও জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। কালো মেয়েটা বললো, 'নীলু তার মার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। দু' দিন ধরে ওদের মধ্যে কথা বন্ধ।'

'তাই বুঝি?'

'জ্বি। ও যখন আজ সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরবে, তখন মজাটা টের পাবে।'

সব ক'টি মেয়ে খিলখিল করে হেসে ফেলল। ব্যাক ভিউ মিররে দেখলাম নীলুর চোখে জল এসে যাচ্ছে।

সন্ধ্যার পর নীলুদের বাসায় সত্যি সত্যি দারুণ অবস্থা। রমিজ সাহেব কাঁদো কাঁদো হয়ে বাবুভাইকে গিয়ে বললেন, 'ভাইসাব শুনেছেন, আমার মেয়েটা কিডন্যাপ হয়েছে।'

'কী বলছেন এইসব?'

'জ্বি ভাইসাব, সত্যি কথাই বলছি।'

রমিজ সাহেব ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন। আমি বললাম, 'এসে পড়বে,

হয়তো বন্ধুর বাড়িটাড়ি গিয়েছে।'

'আমার মেয়ে না বলে কোথাও যাবে না টগর সাহেব।'

নীলু সে রাতে বাড়ি এসে পৌঁছে রাত পৌণে আটটায়। ওর বন্ধুর বাড়ি থেকে মুরুব্বি কিসিমের এক ভদ্রলোক এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে আমাদের নিচতলায় প্রলয়ের মতো হয়ে গেল। রমিজ সাহেব কেঁদে গিয়ে পড়লেন আমার বড়োচাচার কাছে। বড়োচাচা একটা কাজ পেয়ে লাফ-ঝাঁপ দিতে শুরু করলেন--এই থানায় টেলিফোন করছেন, ঐ করছেন হাসপাতালে, এক বার শুনলাম অত্যন্ত গম্ভীর ভঙ্গিতে কাকে যেন বলছেন, 'আরে ভাই, বলতে গেলে বাসার সামনে থেকে মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেছে। এই দেশে বাস করা অসম্ভব।'

আমি সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখলাম গাড়ি এসে ঢুকেছে। ডাক্তার চলে এসেছে। কোন জন এসেছে কে জানে? বড়ো রাস্তার মোড়ে এক জন ডাক্তার থাকেন, যাকে দেখেই যক্ষ্মারোগী বলে ভ্রম হয়। দাদার জন্যে তিনি হচ্ছেন ফুল-টাইম ডাক্তার। তাঁর নাম প্রদ্যোত বাবু বা এই ধরনের কিছু। এঁর বিশেষত্ব হচ্ছে, তিনি এ্যালোপ্যাথির পাশাপাশি টোটকা অষুধ দেন। বাবুভাইয়ের এক বার টনসিল ফুলে বিশ্রী অবস্থা হল। কিছুই গিলতে পারেন না। এক শ' দুই জ্বর গায়ে। প্রদ্যোত বাবু এসেই গম্ভীর মুখে বললেন বানরলাঠি গাছের ফল পিষে গলায় প্রলেপ দিতে। এটাই নাকি মহৌষধ।

বাবুভাই দারুণ রেগে গেল। চিঁ চিঁ করে বলল, 'শালা মালাউন কবিরাজী শুরু করেছে।'

প্রদ্যোত বাবু (কিংবা পীযূষ বাবু) কিন্তু সত্যি সত্যি বানরলাঠি গাছের ফল যোগাড় করে পুলটিশ লাগিয়ে ছাড়লেন। অসুখ আরাম হল। যদিও বাবুভাইয়ের ধারণা, এম্নিতেই সারত। শরীরের নিজস্ব রোগপ্রতিরোধের মেকানিজমেই সেরেছে।

যাই হোক, প্রদ্যোত বাবুর আমাদের বাড়িতে মোটামুটি একটা সম্মানের আসন আছে। তিনি বাড়ি এলেই তাঁর জন্য দুধ-ছাড়া চা হয়, সন্দেশ আনান হয় এবং বাবা নিজে নেমে এসে কথাবার্তা। বলেন।

'এই যে ডাক্তার, যাওয়ার আগে আমার প্রেশারটা দেখে যাবে।'

'বিনা ফী-তে প্রেশার দেখা ছেড়ে দিয়েছি রহমান সাহেব। মেডিকেল এথিক্সের ব্যাপার আছে--হা-হা-হা।

আজ দেখলাম আমাদের প্রদ্যোত বাবু ছাড়াও অন্য এক জন ডাক্তার নামলেন। সেই ভদ্রলোকের চোখেমুখে সীমাহীন বিরক্তি, যার মানে তিনি এক জন বড়ো ডাক্তার। পিজির কিংবা মেডিক্যালের প্রফেসর বা এসোসিয়েট প্রফেসর। ভদ্রলোকের বিরক্তি দেখি ক্রমেই বাড়ছে। গাড়ি থেকে নেমেই হাতঘড়ি দেখলেন। আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল দেখি ভদ্রলোক যে কতক্ষণ থাকেন তার মাঝে মোট ক'বার হাতঘড়ি

দেখেন। কিন্তু এখন এসব এক্সপেরিমেন্টের ভালো সময় নয়। গাড়ি নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আত্মীয়–স্বজনের খোঁজে যেতে হবে। যে দুই ফুফু ঢাকায় আছেন তাঁদেরকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হবে।

সিঁড়িতে পা দেওয়ামাত্র নীলু ডাকল, 'টগর ভাই।' এই মেয়েটি নিঃশব্দে চলাফেরা করে। আচমকা কথা বলে চমকে দেয়।

'দাদার অবস্থা কি বেশি খারাপ?'

'মনে হয়। রাতের মধ্যেই কাম সাফ হবার সম্ভাবনা।'

'টগর ভাই, আপনি সব সময় এইভাবে কথা বলেন কেন?'

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি নীল হলুদ রঙের শাড়ি পরেছে। মেয়েটা চোখের সামনে বড়ো হয়ে যাচ্ছে। বড়ো হচ্ছে এবং সুন্দর হচ্ছে। মেয়েরা লতান লাউগাছের চারার মতো। এই দেখা যাচ্ছে ছোট্ট এক রত্তি একটা চারা, কয়েকটা দিন অন্যমনস্ক থাকার পর হঠাৎ চোখে পড়লেই দেখা যাবে নিজেকে সে ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে। সতেজ বলবান একটি জীবন।

'আচ্ছা, তুই এখন কি পড়িস যেন?' (নীলুকে আমি 'তুই' বলি। ওর সঙ্গে প্রায়ই আমার কথাবার্তা হয়। আমার সঙ্গে কথা বলার একটা গোপন আগ্রহ ওর আছে।)

'সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। বখশিবাজার কলেজে।'

'সেকেণ্ড ইয়ারে আবার কবে উঠলি?'

নীলু সে–কথার জবাব না দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আমাকে তুই–তুই করে বলেন কেন?'

'সেদিনকার পুঁচকে মেয়ে, তোকে আবার আপনি–আপনি বলতে হবে নাকি?'

আমি দোতলায় চলে গেলাম। বাবুভাইয়ের ঘরের দরজা হাট করে খোলা। বারান্দায় আলো নেই। তার ঘরও অন্ধকার। আমি ঘরে ঢুকে সুইচ টিপলাম, আলো জ্বলল না। বাবুভাইয়ের গলা শোনা গেল, 'লম্বা হয়ে শুয়ে পড়, টগর।'

'কী ব্যাপার? লাইট ফিউজ নাকি?'

'উঁহু, বাল্ব খুলে ফেলেছি। ঘর অন্ধকার দেখলে কেউ আর খোঁজ করবে না। মনে করবে কাজেকর্মেই আছি।'

'বারান্দাটারও খুলে ফেলেছ নাকি?'

'হুঁ। ঝামেলা ভালো লাগে না। রাতদুপুরে এর বাড়ি যাও, ওর বাড়ি যাও––বাল্ব খুলে জমাট অন্ধকার করে দিলাম।'

বাবুভাই সিগারেট ধরাল। লম্বা টান দিয়ে বলল, 'মরবার সময় হয়েছে মরবে, এত হৈ–চৈ কী জন্যে?'

আমি চুপ করে রইলাম। বাবুভাই বলল, 'শুয়ে শুয়ে এইসব কথাই ভাবছিলাম।'

'কী–সব কথা?'

'যেমন ধর মানুষ হচ্ছে একমাত্র প্রাণী, যে জানে এক দিন তাকে মরতে হবে। অন্য কোনো প্রাণী তা জানে না।'

'বুঝলে কী করে, অন্য প্রাণীরা জানে না? কথা বলেছ তাদের সাথে?'

'কথা না বলেও বোঝা যায়। অন্য কোনো প্রাণী মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয় না। মানুষ নেয়।'

আমিও সিগারেট ধরালাম। বাবুভাই বলল, 'বুড়োর অবস্থা কী?'

'ভালো না।'

'মৃত্যু ব্যাপারটা কুৎসিত। একসেপ্ট করা যায় না।'

'যাবে না কী জন্যে? কুৎসিত জিনিস কি আমরা একসেপ্ট করি না? সব সময় করি।'

'মৃত্যু স্বীকার করে নিই, কিন্তু একসেপ্ট করি না।'

আমার ক্ষীণ সন্দেহ হল বাবুভাই এক ফাঁকে তার ট্রাঙ্ক খুলে ঐটি বের করে দু–এক ঢোক খেয়েছে। বাবুভাইয়ের এই অভ্যেসটি নতুন। যে ভাবে তা প্রথম শুরু হয়েছিল, তাতে আমার ধারণা হয়েছিল অভ্যেসটি স্থায়ী হবে না। কিন্তু মনে হচ্ছে স্থায়ী হয়েছে। আমি মৃদু স্বরে বললাম, 'তুমি কিছু খেয়েছ নাকি?'

'হুঁ। বেশি না। আধা গ্লাসও হবে না। মৃত্যুর মতো একটি কুৎসিত ব্যাপার একসেপ্ট করতে হলে নার্ভগুলিকে আংশিক অকেজো করে দিতে হয়। তুই এক ঢোক খাবি নাকি? ভালো জিনিস। ব্ল্যাক টাওয়ার। খাস জার্মান জিনিস। চমৎকার!'

'এখন না।'

বাবুভাই বিছানা থেকে নেমে ট্রাঙ্ক খুলল। আমি বললাম, 'আরো খাচ্ছ নাকি?'

'জাস্ট এ লিটল।'

'একটা কেলেঙ্কারি করবে শেষে।'

'তুই পাগল হয়েছিস? কেউ টের পাবে না।'

বড়োচাচার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। এ বাড়ির কারো পায়ের শব্দ আমি চিনি না, কিন্তু বড়োচাচার পায়ের শব্দ চিনি। তিনি কেমন যেন লাফিয়ে–লাফিয়ে চলেন বলে মনে হয়। থপথপ করে বানর হাঁটার মতো শব্দ হয়।

বড়োচাচা বারান্দার মাঝামাঝি গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'লাইট কোথায় গেল? আর বাল্বটা ফিউজ হল কখন? এই এই। টগর টগর।'

বড়োচাচা আমাদের ঘরেও এক বার উঁকি দিলেন। তারপর আবার বানরের মতো থপথপ শব্দ করে তেতলায় উঠে গেলেন। নেমে এলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। বাল্ব নিয়ে এসেছেন বোধ হয়। কিছুক্ষণ পরই বারান্দায় এক শ' পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলে উঠল। বড়োচাচা আবার থপথপ শব্দ করে নিচে নেমে যেতেই বাবু ভাই বাল্বটা খুলে নিয়ে এল। ব্ল্যাক টাওয়ার আমিও খানিকটা চেখে দেখলাম। জিনিসটা মন্দ নয়।

কেমন যেন পচা নারকেলের পানির মতো। রাত বাজে দু'টা দশ। বাবুভাই মৃদু স্বরে বলল, 'বুড়ো তাহলে মরেই যাচ্ছে?'

'তা বোধহয় যাচ্ছে।'

'দুঃখের ব্যাপার। বুড়োর সাথে আমার খাতির ছিল।'

'তোমার একার না, সবারই খাতির ছিল।'

'হুঁ। খুব মাই-ডিয়ার টাইপ ছিলেন।'

কথাটা ঠিক নয়। দাদা মাই-ডিয়ার টাইপ নন। তিনি এক জন কঠিন প্রকৃতির মানুষ। তবে বাবুভাইয়ের সঙ্গে তাঁর খাতির ছিল। সুস্থ থাকাকালীন রোজ এক বার করে খোঁজ করতেন--বাবু আছে? বাবুভাই বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'বুড়োর যন্ত্রণায় শান্তিতে থাকা মুশকিল। তা সম্রাট শাহজাহান আমার কাছে চায় কী?'

দাদাকে আড়ালে আমরা সম্রাট শাহজাহন এবং শাহানাকে জাহানারা ডাকি। দাদাও প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতির ভগ্ন ছবি হয়ে সারা দুপুর জাহানারার সঙ্গে গুজগুজ করেন। অনেক বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকাটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার।

বাবুভাই বোতলের আরো খানিকটা গলায় ঢালল। আমি মৃদু স্বরে ডাকলাম, 'বাবুভাই!'

'হুঁ।'

'তোমার কি মনে হয়, মৃত্যুর পর কিছু আছে?'

'খুব সম্ভব আছে। থাকারই কথা।'

বাবুভাই ঢকঢক করে গ্লাসে আরো খানিকটা ঢালল।

'বাবু ভাই, আর খেয়ো না। তুমি বেশি খাচ্ছ।'

'বেশি কোথায় দেখলি?'

'শেষে একটা কেলেঙ্কারি করবে।'

'কিছুই করব না।'

বড়োচাচার গলার শব্দ শোনা গেল, 'আরে, এই বাল্বটা কোথায় গেল? ব্যাপার কি?' বাবুভাই খিকখিক করে হাসতে লাগল।

'কে হাসে, এই কে হাসে? বাবু, বাবু। এই টগর।'

আমার মনে হল, বড়োচাচা খানিকটা ভয় পেয়েছেন। গলার স্বর কেমন কাঁপা কাঁপা।

'কে হাসছিল? এই এই। কালাম। এই কালাম!'

বড়োচাচা দ্রুত নিচে নেমে গেলেন। তিনি সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছেন।

মগবাজারের ফুফু এলেন সবার আগে। নিজের গাড়ি আনলেন না। তাঁকে গিয়ে নিয়ে আসতে হল। তাঁর গাড়ির কার্বুরেটরে নাকি কি একটা প্রবলেম হয়েছে। আমাদের বাড়িতে আসতে হলেই তাঁর গাড়ির কার্বুরেটরে প্রবলেম হয় কিংবা ব্রেক শু লুজ

থাকে। বাবুভাইয়ের ধারণা, সমস্ত ঢাকা শহরে মগবাজারের ফুফুর চেয়ে কৃপণ এবং ধূর্ত মহিলা এখনো জন্মায় নি এবং ভবিষ্যতেও জন্মানর সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাঁর বাড়িতে বেড়াতে গেলে তিনি চমৎকার জাপানী কফি–কাপে চা দেন। উদ্দেশ্য একটিই--কাপগুলি ছোট। চায়ের সঙ্গে কখনো কিছু থাকে না। আমরা কেউ দুপুরের দিকে তাঁর বাসায় গেলে তিনি বিরক্ত স্বরে বলেন, 'খবর দিয়ে আসতে পারিস না? ভাত চড়িয়ে ফেলেছে।'

'ভাত খাব না।'

'দুপুরে আবার ভাত খাবি না কি? বস খানিকক্ষণ, আবার ভাত চড়াবে। কতক্ষণ আর লাগবে। রাইস কুকার আছে।'

'না ফুফু, বসতে পারব না।'

'শুধুমুখে যাবি? সময় হাতে নিয়ে আসতে পারিস না? সব সময় তাড়া, সব সময় তাড়া। কী এমন রাজকার্য তোদের?'

মগবাজারের ফুফুকে আমরা কেউ সহ্য করতে পারি না। বাবুভাই প্রায় খোলাখুলি এমন সব অপমানজনক কথাবার্তা বলে যে অন্য কেউ হলে বড়ো রকমের ঝামেলা বেধে যেত। মগবাজারের ফুফু অসম্ভব ধূর্ত বলেই কোনো কথা গায়ে মাখেন না এবং এমন ভাব করেন যে কিছু বুঝতে পারেন নি।

গত বছর শীতের সময় তিনি হঠাৎ এসে বললেন, ফরিদের (তাঁর ছেলে) গ্রাজুয়েশন হবে সামারে, তাঁকে গ্রাজুয়েশন সেরিমনি এ্যাটেণ্ড করতে যেতে হবে। বাবুভাই গম্ভীর হয়ে বলল, 'বলেন কি ফুফু, ফরিদ ভাই তো দেশে তিন ধাক্কায়ও আই এ পাস করতে পারল না। ঐখানে গিয়ে একেবারে এম এ পাস করে ফেলল!'

'দেশে কি পড়াশোনা হয়? বিদেশে পড়াশোনার একটা এ্যাটমোসফিয়ার আছে। টিচাররা যত্ন নেয়।'

'এখানের ছেলেমেয়ে যেগুলি পাস করে, সেগুলি কীভাবে করে?'

'কি জানি কীভাবে করে? নকল ছাড়া তো আমি কিছু জানি না।'

ফুফু হাই তোলেন। কথা বন্ধ করতে চান। বাবুভাই ছাড়বার পাত্র না। সে প্যাঁচাবেই।

'ফরিদ ভাই তো মন্দ দেখায় নি। এইখানে ছিল আই এ ফেল, বিলেতে গিয়ে দুই বছরে একেবারে এম এ!'

ফুফু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ও দেশে তো আর আমাদের মতো নিয়ম না--যে দুই বছর পড়তে হবে আই এ, দুই বছর পড়তে হবে বি এ, ওদের দেশে অন্য ব্যবস্থা।'

'ফরিদ ভাই দেশে আসবে?'

'আসবে। একটা মেয়েটেয়ে দেখ দেখি। ইউনিভার্সিটির ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে নাকি সুন্দর–সুন্দর মেয়ে আছে?'

মগবাজারের ফুফুর সঙ্গে কথা শুরু হলে তা এক সময় না এক সময় সুন্দর-সুন্দর মেয়েতে এসে থেমে যাবে। গত চার বছর ধরে তিনি সুন্দর মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কোনোটাই তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। হয় নাকটা প্রয়োজনের তুলনায় ছোট, কিংবা ঠোঁট একটু মোটা। সব কিছুই যখন ঠিক থাকে, তখন দেখা যায় মেয়েটা বেঁটে। বাংলাদেশের সুন্দরী মেয়ে প্রসঙ্গে ফুফুর সার্ভে হচ্ছে--এদেশে সুন্দরী মেয়ে নেই। যে ক'টি আছে তারা হয় বেঁটে, নয় শ্বেতী রোগগ্রস্তা।

আমার মনে হচ্ছে বাবুভাইয়ের অল্প মাত্রায় নেশা হয়েছে। সে গুনগুন করে গাইছে--

Pretty girls are everywhere
and if you call me I will be there

কিংস্টোন ট্রায়োর বিখ্যাত গান। যে-বাড়িতে এক জন বৃদ্ধ মানুষ মারা যাচ্ছে সে-বাড়ির ছেলে ঘর অন্ধকার করে চুকচুক করে ব্লাক টাওয়ার খাচ্ছে এবং কিংস্টোন ট্রায়োর প্রেমের গান গাইছে--ব্যাপারটা দারুণ রিপালসিভ। তার চেয়ে বড়ো কথা, বড়ো ফুফু এসে পৌঁছেছেন। তিনি ব্যাপারটা ধরতে পারলে কেলেঙ্কারি হবে। মানুষকে অপদস্থ করার মধ্যে তিনি এক ধরনের আনন্দ পান।

ক্লাস সেভেনে আমি যখন ফেল করলাম, তখনকার কথা বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আমার আশপাশে যখনই অপরিচিত কেউ থাকত, বড়ো ফুফু কথাবার্তা পড়াশোনার দিকে টেনে এনে এক সময় বলতেন, 'এই দেখেন না--টগরটা ক্লাশ' সেভেন পাস করতে পারল না। অঙ্কে পেয়েছে বারো। চিন্তা করেন অবস্থাটা। ক্লাস সেভেনের অঙ্কে যোগ-বিয়োগ ছাড়া কিছু আছে?'

আমি ফুফুকে সামলাবার জন্যে, যাতে হুট করে বাবুভাইয়ের সামনে না পড়ে যান--নিচে চলে গেলাম। ফুফু আমাকে বারান্দার অন্ধকার কোণের দিকে নিয়ে গেলেন।

'বাবার শরীর হঠাৎ করে এত খারাপ হল কী জন্যে? পরশু দেখে গেলাম ভালো মানুষ!'

'বয়স হয়েছে।'

'বয়সটয়স কিছু না। এ বাড়িতে বাবার যত্ন হয় না। এই বাড়িতে চাকরবাকরের যে যত্ন হয়, বাবার সে-যত্নটাও হয় না।'

'হবে না কেন?'

'কেন--সেটা আমি বলব কী করে? তোরা থাকিস, তোরা বুঝবি।'

'ফুফু, যত্ন ঠিকই হয়। শাহানা নিজে ভাত খাইয়ে দেয়।'

'কেন, শাহানা খাওয়াবে কেন? শাহানা কে? মেয়ের ঘরের নাতনী। লতায়পাতায় সম্পর্ক। ভাবীরা কেন খাওয়ায় না? আমি সবই বুঝি। কিছু বলি না।

যখন বলব, ঠিকই বলব। কাউকে ছাড়ব না। তোরা আমাকে ভেবেছিস কি?'

'ফুফু, আপনি দাদাকে নিজের কাছে নিয়ে রাখেন না কেন? মেয়ের কাছে যত্ন ভালো হবে।'

'তাই রাখব। এই যাত্রা রক্ষা হলে নিজের কাছে নিয়ে যাব।'

'সেটাই ভালো হবে।'

'ভালো হোক মন্দ হোক তা-ই করব। এই বাড়িতে বাবার কোনো যত্ন হয়? বড়োভাবীকে দেখলাম চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আশ্চর্য! একটা মানুষ মারা যাচ্ছে, এর মধ্যে মানুষ ঘুমায় কী করে!'

'ফুফু, আপনি গিয়ে দাদার পাশে বসেন।'

'এখন আর বসাবসি!--রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। আর ছোটভাবীই-বা কোথায়? নাক ডাকাচ্ছে বোধ হয়।'

'ছোটচাচী তো চিটাগাং গেছেন।'

'কবে গেল?'

'গতকাল। টেলিফোন করা হয়েছে, এসে পড়বেন।'

'দেখ কাণ্ড, এত বড়ো এক জন রোগী, আর বাড়ীর বউ ফট করে চিটাগাং চলে গেল!'

'কাল দাদার শরীর ভালোই ছিল। হাঁটাহাঁটিও করেছেন।'

'চিটাগাং কী জন্য গিয়েছে জানিস কিছু?'

'ওনার ভাইয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে, মেয়ে দেখতে গিয়েছেন।'

ফুফু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ফরিদের জন্য একটা মেয়ে দেখলাম আজ সকালে। হাইকোর্টের জাস্টিসের মেয়ে।'

'কেমন দেখলেন?'

'মন্দ না।'

'নওয়াব ফ্যামিলির একটা দেখেছিলেন, সেটার কী হল? খাজা ওয়াসিউদ্দিন না গিয়াসউদ্দিনের নাতনী।'

ফুফু তার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ বললেন, 'এইখানে একটা মেয়ে দেখলাম হলুদ রঙের শাড়ি পরা। দাদার ঘরে বসে আছে। মেয়েটা কে?'

'নীলু।'

'নীলু কে?'

'আমাদের ভাড়াটের মেয়ে, আগেও তো দেখেছেন।'

'কই, মনে পড়ছে না তো। মেয়েটা দেখতে মন্দ না।'

'হুঁ।'

'পড়াশোনা কী করে?'

'খুব ভালো ছাত্রী। চারটা লেটার পেয়েছে ম্যাট্রিকে।'

'তাই নাকি? কোন কলেজে পড়ে।'

'বখশিবাজার কলেজে পড়ে।'

'ডাক তো দেখি মেয়েটাকে--কথা বলি।'

'কী কথা বলবে? তুমি বরং দাদার ঘরে গিয়ে বস।'

'তুই গিয়ে বল না ফুফু ডাকছে।'

'এখানে আসতে বলব?'

'হুঁ। চেয়ার দিয়ে যা, বসি এখানে। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছে।'

চেয়ারে বসতে বসতে ফুফু ফিসফিস করে বললেন, 'প্রেম-ফ্রেম করে না তো আবার?'

'জানি না করে কিনা।'

'করে নির্ঘাত, গরিবের মেয়েগুলি হাড়-বজ্জাত হয়।'

ফুফুকে দেখে মনে হল বাবার প্রসঙ্গ আর কিছুই তাঁর মনে নেই।'

নীলুকে পাওয়া গেল না। রমিজ সাহেব শুধু বসে আছেন। সারা রাতই সম্ভবত বসে থাকবেন। আমাকে বললেন, 'একটু মনে হচ্ছে বেটার।'

আমার চোখে 'বেটার' মনে হল না। দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত। বেশ বোঝা যাচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

প্রদ্যোত বাবু বললেন, 'অক্সিজেন দিতে হবে। একটা অক্সিজেন ইউনিটের ব্যবস্থা করা দরকার। নাকি হাসপাতালে নিতে চান?'

বড়োচাচা আমার দিকে তাকালেন। অর্থাৎ উত্তরটা শুনতে চান আমার মুখ থেকে। তাঁর নিজের কোনো রকম সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নেই। আমি চুপ করে রইলাম। বড়োচাচা বললেন, 'তোর বাবাকে বরং জিজ্ঞেস করে আসি, কি বলিস?'

'জিজ্ঞেস করে আসেন। ছোটচাচা কোথায়?'

'এইখানেই তো ছিল।'

বড়োচাচা উঠে গেলেন। আমি দেখলাম শাহানা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শাহানার এটা অভ্যেস, সে পুরুষদের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে পারে। আমি তার কাছে গিয়ে মৃদু স্বরে বললাম, 'নীলু কোথায়?'

'চা আনতে গেছে।'

'চা হচ্ছে নাকি?'

'হুঁ। সবাই রাত জাগবে, চা ছাড়া হবে কীভাবে?'

'চা হলে ভালোই হয়।'

শাহানা শুকনো গলায় বলল, 'নীলুকে খোঁজ করছিস কেন?'

'আমি খোঁজ করছি না। ফুফু ডাকছেন।'

'কেন?'

'আমি কী করে বলব?'

আমি ঘর ছেড়ে বের হয়ে এলাম। শাহানা এল আমার পিছু পিছু। সিঁড়ি পর্যন্ত আসতেই শাহানা বলল, 'আস্তে হাঁট, আমি দোতলায় যাব। একা একা ভয় লাগে।'

'তোমার তো ভয়টয় নেই বলেই জানতাম।'

শাহানা মৃদু স্বরে বলল, 'ছোটমামা বলছিলেন, বারান্দার বাতি নাকি বারবার নিভে যাচ্ছে।'

'তাই কি?'

'হুঁ। তাছাড়া ছোটমামা সিঁড়ির কাছে কালোমতো কী একটা দেখেছেন।'

'কী? ভূত?'

'হতে পারে। মানুষের মৃত্যুর সময় অনেক অশরীরী জিনিস ভিড় করে।'

আমি শব্দ করে হাসলাম। বারান্দা অন্ধকার। আলো থেকে আসবার জন্যেই হয়তো কিছুই চোখে পড়ছে না। শাহানা বলল, 'বড়ো ভয় লাগছে।' তার কথা শেষ হবার আগেই কাছেই কোথাও একটা শব্দ হল। শাহানা ঝাপটে ধরল আমাকে। তার গায়ে একটি হালকা মিষ্টি গন্ধ, যা শুধু মেয়েদের গায়েই থাকে। আমি চাপা গলায় বললাম, 'বাতাসে দরজা নড়ছে, ভূতটুত কিছু না।' শাহানা সম্বিৎ পেয়ে ঝট করে সরে গেল। হুড়মুড় করে ছুটে গেল রান্নাঘরের দিকে। রান্নাঘরের চৌকাঠ উঁচু, প্রচণ্ড একটি হোঁচট খেল সেখানে। আকবরের মা ছুটে এল রান্নাঘর থেকে, 'কী হইছে? কী হইছে গো?'

শাহানা এরকম করল কেন কে জানে? আমি অচেনা-অজানা কেউ না। ভয় পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলে কিছুই যায় আসে না। মেয়েরা প্রায় সময়ই মনগড়া অনেক ব্যাপারে কষ্ট পেয়ে অদ্ভুত আচরণ করে। শাহানা সেরকম মেয়ে নয়। সে খুব শক্ত ধরনের মেয়ে।

আমার ফুফু (মেজো) যখন মারা যান, তখন শাহানার বয়স মাত্র সাত। মেজো ফুফা সে বছরই আবার বিয়ে করেন। বাবার বিয়ে মেয়েদের দেখতে নেই, কাজেই শাহানা সাময়িকভাবে মামাবাড়ি থাকতে এসে স্থায়ী হয়ে যায়। মা-মরা একটি মেয়েকে আদর-সোহাগ দেখাবার জন্যে এ বাড়ির সবাই ব্যস্ত ছিল। ছোটবেলায় শাহানার যত্ন দেখে আমি এবং বাবুভাই দারুণ ঈর্ষাবোধ করতাম।

পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ সম্ভবত কষ্ট পাবার জন্যেই জন্মায়। টাকা-পয়সার কষ্ট নয়, মানসিক কষ্ট। শাহানা সেই রকম একটি মেয়ে। তার বিয়ে হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়। ছেলে মেডিক্যাল কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। জামিল হাসান। দারুণ ফুর্তিবাজ ছেলে। রাত দিন কোনো-না-কোনো বদ মতলব মাথায় ঘুরছে। এক বার মানুষের খুলি কালো সুতায় ফ্যানের হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল। বড়োচাচা কি একটা কাজে ঘরে ঢুকে ভিরমি খেলেন, মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙতে লাগল।

মুক্তিযুদ্ধের সেই মাসগুলি জামিল ভাইকে নিয়ে চমৎকার কাটছিল, কিন্তু এক

দিন জামিল ভাই আর আসে না। কি একটা বই আনতে টিকাটুলি গিয়েছিল, দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাবে এরকম কথা--কিন্তু তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না। একটি লোক দিনে–দুপুরে হারিয়ে গেল।

জামিল ভাইয়ের জন্যে দীর্ঘ ন' বছর অপেক্ষা করলাম আমরা। ন' বছর পর আবার শাহানার বিয়ে দেওয়া হল। এবারের ছেলেটি গম্ভীর প্রকৃতির। নিচু স্বরে কথা বলে। বইপত্রের পোকা। দাদার ছেলেটিকে অত্যন্ত পছন্দ হল। কিন্তু ছেলেটির হয়তো পছন্দ হল না শাহানাকে, কিংবা অন্য কিছু। সে চলে গেল সুইডেনে, সেখান থেকে নেদারল্যাণ্ডে। মাঝে–মধ্যে হঠাৎ চিঠি আসত তার। যোগাযোগ বলতে এই পর্যন্ত। সেও আজ প্রায় চার বছর হতে চলল। শাহানা অত্যন্ত শক্ত ধাঁচের মেয়ে। সে কেঁদে বুক ভাসাল না, কিছুই করল না। এমনভাবে থাকতে লাগল, যেন এটাই স্বাভাবিক। আজ এরকম করল কেন? ভয় পেয়ে যদি আমাকে জাপটে ধরে তাতে এতটা বিচলিত হবার কী আছে? আমি বারান্দার অন্ধকারে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাবুভাইয়ের ঘরে ঢুকে পড়লাম। বাবুভাই ঠিক আগের জায়গাতেই বসে আছে। ঘরে মিষ্টি গন্ধ। অন্ধকারে মানুষ ফিসফিস করে কথা বলে। আমি গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে ডাকলাম, 'বাবুভাই।'

'হুঁ।'

'সবটা শেষ করে ফেলেছ নাকি?'

'হুঁ।'

'কী সর্বনাশ!'

'সর্বনাশের কী আছে?'

'তুমি আজ একটা কেলেঙ্কারি করবে বাবুভাই।'

'কেলেঙ্কারির কিছু নেই। তুই বস, তোর সাথে কথা আছে।'

আমি বসলাম। বাবুভাই শান্তস্বরে বলল, 'একটা ব্যাপার হয়েছে।'

'কী ব্যাপার?'

'মিনিট দশেক আগে এই ঘরে এক জন কেউ এসেছিল। সামনের চেয়ারটায় বসেছিল।'

'কে সে?'

'চিনি না। বুড়ো মতো লোক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি।'

'অন্ধকারে তুমি খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখলে কীভাবে?'

'কীভাবে দেখলাম জানি না, তবে দেখলাম।'

'কতক্ষণ ছিল সে লোক?'

'খুব অল্প সময়।'

আমি সিগারেট ধরিয়ে হালকা স্বরে বললাম, 'তোমার নেশা হয়েছে। আর খেয়ো না।'

'নেশা–টেশা হয় নি। এ লোকটাকে দেখার পরই বোতল শেষ করেছি। এর আগে যা খেয়েছি, তাতে একটা চড়ুই পাখিরও কিছু হয় না।'

'মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছ?'

'না, ভয় পাই নি।'

'লোকটা কি চোখের সামনে মিলিয়ে গেল?'

বাবুভাই কোনো জবাব দিল না। আমি বললাম, 'চা খাবে নাকি?' চা হচ্ছে।'

'খেতে পারি।'

'বাল্বটা লাগিয়ে ফেলব বাবুভাই?'

'বাল্ব লাগাবি কেন?'

'তুমি যেমন ভূতটুত দেখা শুরু করেছ!'

বাবুভাই হেসে উঠল। অন্ধকারে পা টিপে টিপে যেতে আমার নিজের একটু গা ছমছম করতে লাগল। মানুষের আদিমতম সঙ্গী ভয়, সুযোগ পেলেই কোন এক অন্ধকার গুহা থেকে উঠে আসে। আমাদের সমস্ত বোধ আচ্ছন্ন করে দেয়। বারান্দায় পা রাখতেই বড়োচাচা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে, কে?'

'চাচা আমি।'

'বারান্দার বাতি গেল কোথায়? একটু আগে বাল্ব দিয়েছি।'

আমি চুপ করে রইলাম।

'একটা বাল্ব এনে লাগা তো।'

'লাগাচ্ছি।'

বড়োচাচা সিঁড়ি দিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ততার সঙ্গে নেমে গেলেন। বড়োচাচা ভয় পাচ্ছেন। কিসের ভয়?

রান্নাঘরে নীলুকে পাওয়া গেল। বিরাট এক কেতলি চা বানিয়ে চিনি ঢালছে।

'নীলু।'

'জ্বি।'

'মগবাজারের ফুফু তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। একতলার বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন, মোটামতো।'

'জ্বি, আমি চিনি।'

সে চায়ের কেতলি হাতে উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, 'আকবরের মার কাছে দাও না, নিযে যাবে।'

'আকবরের মা নিচে গেছে। আমি নিতে পারব।'

'বারান্দা খুব অন্ধকার, তাছাড়া ভূত দেখা গেছে। বাবুভাই একটা ভূত দেখেছে––বুড়োমতো একটা লোক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি।'

নীলু কিছু বলল না। হঠাৎ আমি লক্ষ করলাম তার চোখ ভেজা।

'কী হয়েছে রে?'

'কিছু হয় নি।'

'চোখে পানি। কেউ কিছু বলেছে নাকি?'

'জ্বি না। কে আবার কি বলবে?'

হঠাৎ আমার মনে হল মগবাজারের ফুফুর যাদি নীলুকে পছন্দ হয়, তাহলে মন্দ হয় না। ফরিদ ভাই ছেলেটি ভালো। নীলু সুখীই হবে। তাছাড়া সুখী হবার প্রধান কারণ হচ্ছে টাকাপয়সা, যা ফুফুদের প্রচুর আছে।

নীলু বললো, 'ফুফু আমাকে কী জন্যে ডাকছেন জানেন?'

'জানি। তাঁর ছেলের জন্যে মেয়ে দেখছেন। সুন্দরী মেয়ে হলেই তিনি কথাবার্তা বলে দেখেন চলবে কিনা।'

নীলু শান্তস্বরে বলল, 'আমার মতো গরিব মেয়েদের আপনার ফুফু দেখবেন ঠিকই কিন্তু বিয়ে দেবার সময় বিয়ে দেবেন তাদের মতো একটা বড়োলোকের মেয়ের সঙ্গে।'

আমি বেশ অবাক হলাম। কলেজে উঠে মেয়েটি কথা বলতে শিখেছে। নীলু চায়ের কেতলি হাতে নিচে নেমে গেল।

দাদার ঘরে ঢুকেই একটা হালকা অথচ তীক্ষ্ণ গন্ধ পাওয়া গেল। মৃত্যুর গন্ধ। আমার ভুল হবার কথা নয়। মা যে-রাতে মারা যান, সে-রাতে আমি মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছিলাম। তিনি তখন দিব্যি ভালো মানুষ। অসুখ সেরে গেছে। দুপুরবেলা বারান্দায় খানিকক্ষণ বসেও ছিলেন। সন্ধ্যাবেলা খবরের কাগজ পড়তে চাইলেন। খুঁজেপেতে ভেতরের দু'টি পাতা পাওয়া গেল। আমি দেখলাম তিনি মন দিয়ে সিনেমার পাতা দেখছেন। যে-রোগী সিনেমার পাতা পড়ে তার রোগ সেরে গেছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি বিচলিত বোধ করতে লাগলাম। কেমন যেন অন্য রকম একটা গন্ধ ঘরে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু তীক্ষ্ণ। মা বললেন, 'পাবদা মাছ খেতে ইচ্ছে করছে। টগর, তুই দেখিস তো পাবদা মাছ পাওয়া যায় কিনা।'

আমি তার জবাব না দিয়ে বললাম, 'একটা গন্ধ পাচ্ছ মা?'

'কি রকম গন্ধ?'

'অন্য রকম, অচেনা।'

'অডিকোলন দিয়েছি কপালে, তার গন্ধ বোধহয়।'

অডিকোলনের মিষ্টি গন্ধের সাথে তার মিল আছে, কিন্তু অডিকোলন নয়। এ অন্য জিনিস। একটা অচেনা গন্ধ।

দাদাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। কেমন যেন কুৎসিত। যেন কিছু একটা তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছে। কী সেটা--আত্মা? তিনি আবার আগের মতো টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছেন।

চোখ ঘুরিয়ে তাকাচ্ছেন। তাঁর তাকাবার ভঙ্গি দেখে মনে হল কোনো কিছু চিনতে পারছেন না। যেন নিতান্ত অপরিচিত একটি জায়গায় হঠাৎ গিয়ে পড়েছেন। তাঁর চোখে গভীর আতঙ্কের ছাপ। নিদারুণ একটি ভয়। কিসের জন্যে এই ভয়? কাকে ভয়?

ডাক্তার প্রদ্যোত বাবু চেয়ারের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমের ভঙ্গিটা কুৎসিত। ছোট শিশুদের মতো হাঁ করে ঘুম। জিভটা আবার ক্ষণে ক্ষণে নড়ছে। রমিজ সাহেবকে দেখলাম না। তিনি সম্ভবত অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে গিয়েছেন। বাবা নেমে এসেছেন। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের প্রতীক হিসেবে হাতে একটা পত্রিকা ধরে রেখেছেন। রোগীর কারণে নয়, বাবার উপস্থিতির জন্যেই সবাই কথা বলছে নিচু গলায়। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বাবা বললেন, 'তোমার ছোট ফুফু এখনো আসছেন না কেন খোঁজ নাও।' (বাবা কখনো কাউকে তুই বলেন না। এবং যে-কোনো কথা এমনভাবে বলেন, যেন মনে হয় এটিই তাঁর শেষ কথা।)

আমি বললাম, 'আমাদের টেলিফোন ঠিক নেই।'

'আমি নিচে নামার আগেই ডাঃ ওয়াদুদকে টেলিফোন করে এসেছি। টেলিফোন ঠিক নেই কথাটা ভুল। না জেনে কিছু বলবে না।'

বাবা গম্ভীর মুখে খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন, যেন কিছুই হয় নি। আমি পা টিপে টিপে চলে গেলাম তেতলায়। টেলিফোন বাবার শোবার ঘরে থাকে।

'হ্যালো--ছোট ফুফু।'

'কে, টগর?'

'জ্বি।'

'বাবার অবস্থা এখন কেমন?'

'ভালো না। তুমি আসছ না কেন?'

'আমি তো সেই কখন থেকে কাপড়টাপড় পরে বসে আছি। দু' বার টেলিফোন করলাম। রিং হয়, কিন্তু কেউ ধরে না।'

'আমরা সবাই নিচে, সেজন্যেই কেউ ধরে না। কাপড় পরে বসে আছ, আসছ না কেন?'

'তোমার ফুফার জন্যে অপেক্ষা করছি। সে এক জন কোরানে হাফেজকে আনতে গেছে। বাবাকে তওবা করাবে, দোয়াটোয়া পড়বে।'

'তওবা কী জন্যে?'

'মরবার আগে তওবা করতে হয় না?'

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। মরবার আগে যদি তওবা করতে হয়, তাহলে সেটা মৃত্যুর কাছে পরাজয় স্বীকার করার মতো। মৃত্যুপথযাত্রীর জন্যে সেটা নিশ্চয়ই একটা ভয়াবহ ব্যাপার। জেনে ফেলা যে, আর কোনো আশা নেই। এবার

যাত্রা শুরু করতে হবে সীমাহীন অন্ধকারের দিকে। যে মারা যাচ্ছে, তার কাছ থেকে শেষ আশার মিটিমিটি প্রদীপটি কেড়ে নেয়া খুব অমানবিক কাজ। তাকে দেখাতে হবে যে, আমরা যুদ্ধ করে যাচ্ছি। মৃত্যু নামক হিংস্র পশুর সঙ্গে পশুর মতোই লড়ছি। বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী। কে যেন সিঁড়ি বেয়ে আসছে।

বড়োফুফু এসে ঢুকলেন। তাঁর মুখ বিরক্তিতে কোঁচকান। গাল ঘামে চকচক করছে--'একটা মাত্র ফোন, সেটা আবার তেতলায়। এই বাড়ির লোকদের বুদ্ধিসুদ্ধি আর কোনো কালেই হবে না।'

'কাকে ফোন করবেন?'

বড়োফুফু তার জবাব না দিয়ে ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন। কেউ সম্ভবত ধরছে না। তাঁর মুখ আরো কোঁচকাতে লাগল--'এত বড়ো বাড়ি, টেলিফোন দুটো রাখা উচিত।'

'কেউ ধরছে না ফুফু?'

'নাহ্।'

'মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, রাত একটা বাজে।'

'আমি বলে এসেছি জেগে বসে থাকতে। নবাবজাদা গিয়ে শুয়ে পড়েছেন।'

ফুফু আবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি যাবার জন্যে পা বাড়াতেই ইশারায় বললেন অপেক্ষা করতে। আমি চেয়ার টেনে বসলাম। লাইন পাওয়া গেল না। ফুফুর মুখ পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল। মৃদুস্বরে বললাম, 'আমাকে কিছু বলবেন?'

'হুঁ। ঐ মেয়েটির সঙ্গে কথা বললাম।'

'কোন মেয়ে?'

'নীলু। মেয়েটাকে তো ভালোই মনে হল।'

'আপনার পছন্দ হয়েছে? পাশ করেছে পরীক্ষায়?'

'হাইট অবশ্যি কম, পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চির মতো হবে। কী বলিস?'

'হতে পারে। মেপে দেখি নি কখনো।'

'দুই ইঞ্চি হিল পরলে ধরা যাবে না।'

হুঁ।'

'অবশ্যি মেয়েটার আঙুলগুলি একটু মোটা। ওয়ার্কিং ক্লাসের মেয়েদের মতো।'

'তাই নাকি, আমি লক্ষ করি নি।'

বড়োফুফু বললেন, 'সব মিলিয়ে তো পাওয়া যায় না। এই মেয়েটির একটা অবশ্যই ভালো দিক আছে, ছোট ফ্যামিলির মেয়ে, মাথা নিচু করে থাকবে সব সময়। শব্দটাও করবে না। কী বলিস, ঠিক না?'

'অন্য রকমও হতে পারে। হয়তো ফোঁস করে উঠবে।'

'হুঁ।'

'গরিব আত্মীয়--স্বজনরা রাতদিন ভিড় করবে। স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে

পাকা কাঁঠাল হাতে আপনার ড্রইংরুমে এসে বসে থাকবে। পান খেয়ে এ্যাশট্রেতে পিক ফেলবে। নাক ঝাড়বে।'

বড়োফুফু দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন, 'মেয়েটির বাবা কী করে?'

'জানি না কী করে।'

'সে কি! তোদের ভাড়াটে, আর তোরা জানিস না কী করে?'

'ভাড়াটে–ফাড়াটে বোধ হয় না। দাদা থাকতে দিয়েছিলেন, চক্ষুলজ্জায় পড়ে মাসে মাসে কিছু দিত।'

'বাড়ি কোথায়?'

'কে জানে কোথায়?'

'বাড়ি কোথায় সেটাও জানিস না?'

'উঁহু।'

'আমি মেয়েটিকে আমার মগবাজারের বাসায় যেতে বলেছি। বেড়াবার জন্যে।'

'আপনার তাহলে ভালোই পছন্দ হয়েছে।'

'বাড়ি কোথায়, সেটা না জেনে বেড়াতে যাবার কথা বলা ঠিক হয় নি।'

'একটি মেয়ে ভালো কি মন্দ, তার সাথে তার বাড়ির কোনো সম্পর্ক নেই।'

'আমার সাথে বাজে তর্ক করিস না। বাজে তর্ক জীবনে অনেক শুনেছি। তোর কাছ থেকে না শুনলেও চলবে।'

বড়োফুফু টেলিফোন নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এবার বোধহয় লাইন পাওয়া গেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি শুনলাম, বড়োফুফু চেঁচাচ্ছেন, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলি? ফাজলামির জায়গা পাস না। ছোটলোক কোথাকার। এক চড় দিয়ে.........'

'চা আনতে গিয়ে কোথায় উধাও হলি?'

চায়ের কথা আমার মনেই ছিল না। রাত জেগে শরীর খারাপ লাগছে। এসেছিলাম অন্ধকারে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব ভেবে। বাবুভাই নিজেও দেখলাম শুয়ে আছে। গায়ে পাতলা একটা চাদর। বাবুভাই ক্লান্ত স্বরে বলল, 'একটু যেন জ্বর জ্বর লাগছে রে।'

'বাবুভাই, তুমি উঠে হাতমুখ ধুয়ে নিচে যাও।'

'নাহ্।'

'না কেন?'

'কেউ মারা যাচ্ছে, এটা দেখতে ভালো লাগে না। অনেক বার দেখেছি।'

আমি চুপ করে রইলাম। বাবুভাই নিচু গলায় বলল, 'মুখে আমরা অসংখ্য বার বলি মরতে তো হবেই, কিন্তু সত্যি সত্যি মৃত্যু যখন আসে তখন মনটন ভেঙে যায়।'

বাবুভাই চাদর গায়ে উঠে বসল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমাদের হাতে এক বার বেলুচ রেজিমেন্টের এক নন-কমিশণ্ড অফিসার ধরা পড়ে গেল। হাবিলদার মেজর। ব্যাটাকে আমরা এগার মাইল হাঁটিয়ে মেথিকান্দা নিয়ে এলাম। ব্যাটার মনে কোনো ভয়ডর নেই। সিগারেট দিই। ভুসভুস করে টানে। চা দিয়েছি, শেষ করে আরেক কাপ চাইল। ব্যাটার সাহসের তারিফ করি মনে মনে।'

'নাম কী ছিল?'

'নাম মনে নেই। নাম দিয়ে দরকার কি?'

'এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

'নাম বাহাদুর খাঁ। ঝিলামের এক গাঁয়ে বাড়ি। দুই ছেলে ছিল--এক জন মটর মেকানিক, অন্য জন নেভিতে।'

'ও।'

'এইসব আমি মনে করতে চাই না। নামধাম দিয়ে কী হয়?'

আমি সিগারেট ধরালাম। ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। ক্ষুধার সময় সিগারেট ভালো লাগে না। বমি-বমি লাগে। বাবুভাই বলল, 'মেথিকান্দা পৌঁছেই শুনি নতুন করে মিলিটারি রিইনফোর্সমেন্ট আসছে। আমাদের এক্ষুণি পালাতে হবে। ঠিক করা হল, বাহাদুর খাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে না।'

'মেরে ফেলা হবে?'

'হুঁ।'

'তারপর?'

ব্যাপারটা বুঝতে পারার পর এত বড়ো একটা সাহসী মানুষ ছরছর করে পেচ্ছাপ করে ফেলল, কথা জড়িয়ে গেল। উল্টা-পাল্টা কথা বলতে লাগল।'

'তারপর?'

এর আবার তারপর কি?'

বাবুভাই হঠাৎ রেগে গেল। তার সম্ভবত নেশা হয়েছে।

'আমাদের অভ্যেসই হচ্ছে একটা তারপর খোঁজা। মৃত্যুর আবার তারপর কি?'

আমি জবাব দিলাম না। বাবুভাই সিগারেটে টান দিয়ে খক্‌খক্‌ করে খুব কাশতে লাগল। কাশি থামলে কড়া গলায় বলল, 'আমি মরবার সময় এক জন সাহসী মানুষের মতো মরব।'

'লাভ কি তাতে?'

'লাভ-লোকসান জানি না। সব কিছুতে লাভ-লোকসান খোঁজা মানুষের আরেকটি অভ্যাস। বাজে অভ্যাস।'

'তুমি শুধু শুধু রাগছ, বাবুভাই।'

'শুধু শুধু রাগছি?'

'হুঁ।'

'টগর দেখ, তোকে আমি একটি কথা বলে রাখি--মরবার সময় আমি এক জন সত্যিকার সাহসী মানুষের মতো মরব। আরো এক জন বড়ো ডাক্তার আন, এই বলে হৈ-চৈ শুরু করব না।'

'ভালো কথা। শুনে খুশি হলাম।'

দরজার পাশে খুট করে শব্দ হল। বাবুভাই অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'কে? কে?'

'আমি, আমি শাহানা। অন্ধকারে কী করছ?'

'কিছু করছি না। তুমি কী চাও?'

ভেতরে আসব?'

'না।'

শাহনা চাপা স্বরে বলল, 'ঘর অন্ধকার করে বসে আছ কেন?'

'তাতে কারো তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।'

শাহানা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'নানার জ্ঞান হয়েছে, তোমাকে খুঁজছে।'

'ঠিক আছে, যাব।'

শাহানা কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, 'ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে গেলে ভালো হয়।'

শাহানা নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। বাবুভাই অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'বেশ তেজী মেয়ে। ঠিক না?'

'হুঁ।'

'এক জন মেয়ে-মানুষের মধ্যে এরকম তেজ দেখা যায় না।'

'হুঁ।'

বাবুভাই বিছানা থেকে নামল। ক্লান্তস্বরে বলল, 'শরীর খারাপ লাগছে। গলায় আঙুল দিয়ে বমি করব।'

'যা করবার তাড়াতাড়ি কর, দাদা তোমাকে ডাকছে।'

'তোকে আরেকটা কথা বলতে চাই। বেশ জরুরী।'

'পরে বলবে।'

'কথাটা শাহানা প্রসঙ্গে।'

দাঁড়িয়ে থাকলেই বাবুভাই কথা বলবে। আমি নিঃশব্দে বের হয়ে এলাম। শাহানা প্রসঙ্গে বাবুভাইয়ের কী বলার থাকতে পারে, তা ঠিক বোঝা গেল না। শাহানা সেই জাতীয় মেয়ে, যাদের প্রসঙ্গে কারো কিছু বলার থাকে না। এদের চোখের দৃষ্টি হয় শীতল, হৃদয়ও থাকে শীতল। এরা শান্ত ভঙ্গিতে সংসারের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে। আমাদের বুড়ো সম্রাট শাহজাহানের কাছে সারা দুপুর বসে থাকে জাহানারা সেজে। যখনই প্রয়োজন মনে করে, তখনি গলার স্বর

অস্বাভাবিক শীতল করে আমাকে উপদেশ দিতে আসে। যেমন দিন সাতেক আগে হঠাৎ আমাকে এসে বলল, 'গতকাল নীলুর সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল তোমার?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কেন?'

'দেখলাম নীলু খুব হাসছে।'

'জোক বলছিলাম একটা। মজার গল্প।'

'কি জোক?'

'তার দরকারটা কী?'

'দরকার আছে। একটা কাঁচা বয়সের মেয়ে। ওর সঙ্গে তোমার এত মাখামাখি করা ঠিক না।'

'অসুবিধাটা কোথায়?'

'অল্পবয়েসী মেয়েরা অতি সহজেই উইকনেস গ্রো করিয়ে ফেলে এবং পরে কষ্ট পায়। গরিব–দুঃখী মানুষের মেয়ে, এদের নিয়ে ছেলেখেলা করা ঠিক না।'

'তাই বুঝি?'

'হুঁ।'

শাহানা আমাকে দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ না দিয়ে উঠে চলে গেল।

রাগে গা জ্বলতে লাগলো আমার।

ছোটফুফু চলে এসেছেন। সঙ্গে অল্পবয়স্ক মৌলবী এক জন। লোকটির মাথায় বেতের একটা টুপি। অত্যন্ত ফর্সা একটা পাঞ্জাবি আছে গায়ে। (এই জাতীয় লোকদের গায়ে সাধারণত এত ফর্সা জামাকাপড় থাকে না।) পায়ে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেলের বদলে পরিষ্কার একজোড়া চটি জুতো। লোকটি বারান্দায় একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে দেখে বোঝা যায়, কিছু একটা পড়ছে মনে মনে। আমাকে দেখে অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গীতে বলল, 'আসসালামু আলায়কুম। ভালো আছেন?'

আমি জবাব না দিয়ে দাদার ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঘরভর্তি মানুষ। দাদা আমাকে ঢুকতে দেখেই বললেন, 'কে? বাবু?'

'জ্বি–না, আমি টগর।'

'ও তুই। বাবু কই?'

'আসছে।'

বড়োচাচা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'লাটসাহেবের হয়েছেটা কি? এতক্ষণ লাগে?'

দাদা শান্ত স্বরে বললেন, 'চিৎকার করিস না। আসুক ধীরেসুস্থে। তাড়া নেই কোনো।'

ছোটচাচা বললেন, 'সন্ধ্যা থেকে তাকে দেখি না, সে আছে কোথায়?'

দাদা ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'আমার শখ ছিল বাবুর একটা বিয়ে দিয়ে যাই।'

বড়োফুফু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'বাবু এখন বিয়ে করবে কি? রোজগারপাতি কোথায়?'

দাদা বিরক্ত চোখে তাকালেন। বড়োফুফু বললেন, 'ফরিদের বিয়ে দেওয়া দরকার। ওর বিয়েটা নিজে দাঁড়িয়ে দিয়ে যান। আপনার শরীরটা একটু সুস্থ হলেই কথাবার্তা ফাইনাল করব। জাস্টিস বি. করিম সাহেবের ছোট মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে........।'

দাদা ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাবু কোথায়?' তাঁর ফর্সা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে, নিঃশ্বাস নিতে বোধহয় কষ্ট হওয়া শুরু হয়েছে আবার।

দাদা বললেন, 'তোমরা কেউ একটা গামছা দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দাও।'

ছোটফুফু দৌড়ে রুমাল ভিজিয়ে আনলেন। প্রদ্যোত বাবু বললেন, 'শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে?'

'হুঁ।'

'অক্সিজেনের ব্যবস্থা হচ্ছে। অক্সিজেন দেওয়া শুরু হলেই আরাম হবে।'

'ডাক্তার, শান্তিতে মরতে দাও। ঝামেলা করবে না।'

ছোটফুফু বললেন, 'এইসব কথা কেন বলছেন বাবা?'

'মা, সময় শেষ হয়ে এসেছে।'

ছোটফুফু চোখ মুছতে লাগলেন। বাবুভাই এলেন সেই সময়। দাদা হাত ইশারা করলেন। বসতে বললেন তাঁর কাছে। ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'সবাই আছে এইখানে?' বড়োচাচী বললেন, 'জ্বি আছে।' দাদা মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন, 'ছোটন কোথায়?'

ছোটন হচ্ছে আমার ছোটচাচী, দাদার খুব প্রিয়পাত্রী। বড়োফুফু বললেন, 'ছোটন গেছে চিটাগাং। কী যে এদের কাণ্ড! এমন অসুখবিসুখের মধ্যে কেউ বাইরে যায়?' ছোটচাচা বললেন, 'সে কাল আসবে।' দাদা বললেন, 'কাল পর্যন্ত আমার সময় নেই। তোমরা কেউ গিয়ে আলমারি খোল।'

বড়োফুফু বললেন, 'বাইরের লোকজন না থাকাই ভালো। এই মেয়ে, নীলু না তোমার নাম? তুমি বাইরে যাও।'

দাদার ভ্রূ কুঞ্চিত হল। তিনি কিছুই বললেন না। প্রদ্যোত বাবুও উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি বারান্দায় গিয়ে বসছি।'

আলমারি খোলা গেল না। বড়োচাচা এদিক–সেদিক নানাভাবে চাবি ঘোরালেন। দরজা ঝাঁকালেন। কিছুতেই কিছু হল না। দাদা ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'তুই কোনোদিনই কিছু পারলি না। চাবিটা রহমানের কাছে দে।'

বড়োচাচা চাবি দিলেন না। আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন আলমারির দরজার গায়ে, যেন এটা খোলার উপর তাঁর বাঁচা–মরা নির্ভর করছে। দেখতে–দেখতে তাঁর কপাল বেয়ে টপটপ করে ঘাম পড়তে লাগল। তিনি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

বড়োফুফু অধৈর্য হয়ে বললেন, 'দেখি, চাবিটা দাও আমার কাছে।' বড়োচাচা দিলেন না। চোখ ছোট করে তাকালেন। যেন কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারছেন না। বাবুভাই বললেন, 'ফুফু, বাবাকে খুলতে দিন। বড়োফুফু ফোঁস করে উঠলেন, 'সে এটা খুলবে কীভাবে? তার সে-বুদ্ধি থাকলে তো কাজই হ'ত।'

একটা সামান্য ব্যাপারে আবহাওয়া বদলে গেল। বড়োচাচা এমন করতে লাগলেন, যেন স্টীলের আলমারি খুলতেই হবে। আমি লক্ষ করলাম, তাঁর হাত কাঁপছে। ফুফু বিরক্তির একটা শব্দ করলেন। বড়োচাচার চোখের দৃষ্টি অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো হয়ে গেল। জীবনে তিনি অসংখ্য বার পরাজিত হয়েছেন, কখনো কিছুমাত্র বিচলিত হন নি। আজ তাঁর এরকম হচ্ছে কেন কে জানে?

তুলনামূলকভাবে দাদা অনেক স্বাভাবিক। তিনি যেন কৌতূহলী হয়ে বড়োচাচার কাণ্ড লক্ষ করছেন। বড়োচাচা এক সময় ছুটে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। দাদা লম্বা একটি নিঃশ্বাস ফেলে মিনুকে ডাকতে লাগলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি বদলে গেল। মনে হল তিনি যেন স্পষ্ট দেখছেন মিনু ছোট ছোট পা ফেলে ঘরময় হেঁটে বেড়াচ্ছে। দাদা অবাক বিস্ময়ে তাঁর হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে দেখছেন। তিনি এক বার বললেন, 'কেমন আছ আম্মা বেটি?'

বলার পরপরই দাদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন মেয়েটি চমৎকার কোনো উত্তর দিয়েছে। আমার একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। বাবুভাই বললেন, 'ডাক্তার সাহেবকে ডাকা দরকার।' তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দাদা হাঁপাতে শুরু করলেন। অদ্ভুত একটা শিস দেবার মতো শব্দ হতে লাগল। প্রদ্যোত বাবু দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। বাইরে গাড়ির শব্দ হল। অক্সিজেন ইউনিট নিয়ে ওরা বোধহয় এসে পড়েছে। আমি বাবুভাইয়ের পেছন-পেছন ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এলাম। মৌলবী লোকটি তখনো চেয়ারে ঠিক আগের মতো বসে আছে। দোয়াটোয়া পড়ছে হয়তো। তার ঠোঁট কাঁপছে দ্রুত ভঙ্গিতে। বাবুভাই কড়া গলায় বলল, 'কে আপনি?'

লোকটি হকচকিয়ে গেল। বাবু ভাই দ্বিতীয় বার বলল, 'কে আপনি?'

প্রশ্নের উগ্র ধরন দেখেই হয়তো লোকটি অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল।

আমি বললাম, 'উনি এক জন কোরানে হাফেজ।'

'কোরানে হাফেজ? গোটা কোরান শরিফটা মুখস্থ করেছেন?'

'জ্বি জনাব।'

'কী উদ্দেশ্যে করেছেন?'

'বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে করি নাই।'

বাবুভাই বিরক্তির স্বরে বলল, 'এক সময় এটার দরকার ছিল। মুখস্থ করে মনে রাখতে হ'ত, কিন্তু এখন আর দরকার নেই। কোরান শরিফ পাওয়া যায়। বুঝলেন?'

'জ্বি, বুঝলাম। তবে জনাব, শখ করে অনেকে অনেক কিছু করে। আমি এক

জনকে চিনতাম, সে একটা গোটা কবিতার বই মুখস্থ করেছিল।'

বাবুভাই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। লোকটি মৃদু স্বরে বলল, 'শখ করে অনেকে অনেক কিছু করে।'

'আপনি ঠিক বলেছেন। কিছু মনে করবেন না।'

'জ্বি না, কিছু মনে করি নাই।'

'আপনার নাম কি?'

'মোহাম্মদ ইসমাইল।'

'ইসমাইল সাহেব, আপনাকে চা দিয়েছে?'

'আমি চা খাই না।'

'আপনি কি আমার দাদার জন্য দোয়া করছেন?'

'জ্বি জনাব, করছি। আপনারাও করেন।'

ইসমাইল সাহেব বসে পড়ল। অপূর্ব সুরেলা গলায় কোরান পড়তে শুরু করল। যার এত সুন্দর গলা, সে কেন এতক্ষণ মনে মনে পড়ছিল? বাবুভাই অনেকক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। শাহানাও ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল। সে মাথায় কাপড় দিয়েছে। সে দেখলাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বাবুভাইয়ের দিকে। যেন কিছু বুঝতে চেষ্টা করছে। ঘরের ভেতর থেকে দাদার গলা শোনা গেল। অন্য রকম আওয়াজ। শুনলেই মনে হয় তাঁর বুকের উপর পাথরের মতো ভারি কিছু একটা চেপে বসেছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেটা সরান যাচ্ছে না। ছোটফুফু কাঁদতে শুরু করেছেন। এই প্রথম বোধ হয় এ বাড়ির কেউ কাঁদল। কান্না খুব ছোঁয়াচে, এক্ষুণি অন্য সবাই কাঁদতে শুরু করবে। আমাদের এ বাড়িতে কোনো শিশু নেই। কেউ এখানে কাঁদে না। দীর্ঘ দিন পর এ বাড়ির মানুষেরা চোখ মুছবে।

ছোটফুফু পাংশু মুখে বাইরে এসে বললেন, 'টগর, একটা জায়নামাজ দে তো, নিরিবিলিতে একটা খতম পড়ব।'

আমি বললাম, 'ফুফা আসবেন না?'

'আসবে হয়তো। খবর পেয়েছে।'

'কোথায় বসে দোয়া পড়তে চান? তিনতলায় যাবেন? কেউ নেই কিন্তু তিনতলায়।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'ভয়টয় পেতে পারেন।'

'ভয় পাব কী জন্যে? কী সব কথাবার্তা বলিস!'

ছোটফুফু অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। আমাদের এই বংশের সবাই অল্পতেই বিরক্ত হয়। অল্পতে রেগে ওঠে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে ছোটফুপু বললেন, 'বাবা আজ রাত্রেই মারা যাবেন।'

'কেমন করে বলছেন?'

'ঘরে ঢুকেই আমার মনে হল। ঘরে মৃত্যু বসে আছে।'

আমি চুপ করে রইলাম। ছোটফুফু বললেন, 'কবিরের এই দোঁহাটা পড়েছিস।'

'কোনটা?'

'জন্মের সময় শিশুটি কাঁদে, তার আশেপাশের সবাই আনন্দে হাসে। আর মৃত্যুর সময় যে মারা যাচ্ছে সে হাসে, অন্য সবাই কাঁদে।'

'কথাটা ঠিক নয় ফুফু।'

'ঠিক না? ঠিক না কেন?'

'যে মারা যাচ্ছে সে আরো বেশি কাঁদে। কেউ মরতে চায় না।'

ছোটফুফু উত্তর দিলেন না। তবে তিনি বিরক্ত হয়েছেন বোঝা যাচ্ছে--তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত। চোখ তীক্ষ্ণ।

তেতলায় গিয়ে ফুফুর ভাবান্তর হল। আমার মনে হল তিনি একটুখানি ভয় পেলেন। আমাকে বললেন, 'উপরটা দেখি খুব চুপচাপ। কেউ নেই মনে হচ্ছে।'

'জ্বি, সবাই নিচে।'

'তুই বারান্দায় একটু বসে থাক, দোয়াটা পড়তে আমার বেশি সময় লাগবে না।'

'ঠিক আছে, বসছি।'

বারান্দায় এসে বসামাত্র ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। আকাশে যে মেঘ করেছে লক্ষই করি নি। দমকা বাতাস দিতে লাগল। পাঁচটা কাঠি নষ্ট করবার পর সিগারেট ধরান গেল। বসে থেকে শুনলাম, ছোটফুফু উঁচু গলায় কী-একটা দোয়া পড়ছেন। বেশ কিছু দিন ধরেই ছোটফুফু ধর্ম-টর্মের দিকে অস্বাভাবিক ঝুঁকেছেন। দু' বার গিয়েছেন আজমীর শরিফ। মগবাজারের কোন এক পীর সাহেবের কাছে মুরিদ হয়েছেন। ঘোমটা ছাড়া কোথাও বের হন না। ধর্মে এই অস্বাভাবিক মতির পেছনের কারণ হচ্ছে আমাদের ছোটফুফা।

এক দিন খবরের কাগজে একটা বেশ রগরগে খবর ছাপা হল। তের বৎসরের বালিকা পরিচারিকা ধর্ষণের দায়ে গৃহস্বামী গ্রেফতার। প্রথম পৃষ্ঠায় পুরো দুই কলাম জুড়ে খবর। অর্ধেক পড়বার পর আঁৎকে উঠতে হল--গৃহস্বামী আমাদের ছোটফুফা। কোনো পরিচিত ব্যক্তির সম্পর্কে এই ধরনের খবর ছাপা হতে পারে, তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। কী সর্বনাশ!

ছোটফুফু দশটার দিকে এসে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, ব্যাপারটা একটা ষড়যন্ত্র। ফুফা নাকি সে-রাতে সন্ধ্যা থেকেই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ছোটফুফু এত চোখের জল ফেলতে লাগলেন যে আমরা প্রায় বিশ্বাস করে ফেললাম ব্যাপারটা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু দাদা গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এ হারামজাদাটা যেন আমি জীবিত থাকা অবস্থায় এ বাড়ি না আসে।' ছোটফুফু কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?'

দাদা বললেন, 'তুইও আসবি না এ বাড়িতে।'

ফুফার কিছুই হল না। হবার কথাও নয়। ফুফাদের এত টাকাপয়সা যে, এইসব ছোটখাট জিনিস তাদের স্পর্শ করতে পারে না। ঝামেলা হয় গরিবদের। বড়োলোকদের ঝামেলা কী?

ফুফার সঙ্গে দেখা হলে দারুণ একটা অস্বস্তির ব্যাপার হবে, এই ভেবে আমি এবং বাবুভাই ধানমণ্ডি এলাকা দিয়ে যাওয়া-আসাই বন্ধ করে দিলাম। এর পরপরই খবর পেলাম, ছোটফুফা নাকি মগবাজারের কোন এক পীরের কাছে যাওয়া-আসা করছেন।

তেতলা থেকে নিচে নেমেই বাবুভাইয়ের দেখা পেলাম। তিনি ইসমাইল সাহেবের সঙ্গে নিচু স্বরে কী-যেন বলছেন। ইসমাইল সাহেবের মুখটি হাসিহাসি। কোনো রসিকতা হচ্ছে কি? আমি কৌতূহলী হয়ে বাবুভাইয়ের পাশে দাঁড়াতেই ছোটচাচা পাংশু মুখে বাইরে এসে বললেন, 'ডাঃ ওয়াদুদকে এক বার নিয়ে আসা দরকার। বাবু, তুই গাড়ি নিয়ে যা। উনি বলেছেন অবস্থা খারাপ হলে ডাকতে। বাসা চিনিস তো?'

'চিনি।'

'ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। ডেকে তোল। ঘুমের কারোর আর মা-বাপ নাই দেখি। টগরকে সঙ্গে নিয়ে যা।'

বাবুভাই ড্রাইভারকে ডাকল না। নিজেই গাড়ি বের করল। ভারি গলায় বলল, 'কটা বাজে দেখ তো?'

'একটা পঁয়ত্রিশ।'

বাবুভাই সাধারণত অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গাড়ি চালায়, কিন্তু জনশূন্য রাস্তাতেও তাঁর গাড়ি চলেছে খুব ধীর গতিতে। যেন কোনো তাড়া নেই। একসময় পৌছলেই হল। বাবু ভাই অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, 'তোকে একটা কথা বলছি। শাহানা প্রসঙ্গে।'

'পরেও বলতে পার।'

'না, আজই বলা দরকার। আজকের রাতটা একটা বিশেষ রাত। সবার মন দুর্বল। আমার নিজেরও দুর্বল। আজ রাতে বলা না হলে কোনো দিনই বলা হবে না।'

'ঠিক আছে, বল।'

বাবুভাই গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করাল। সিগারেট ধরাল। দু' টান দিয়ে সেটি জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিচু গলায় বলল, 'বছর দুই আগে এক দিন দুপুরবেলা শাহানা আমার ঘরে এসেছিল। তুই তখন ময়মনসিং। শাহানা এসেছিল ইংলিশ-বেঙ্গলি ডিকশনারি নিতে।'

'তারপর?'

'আমি শাহানাকে বললাম দরজাটা বন্ধ করে আমার পাশে এসে বসতে। সে

একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।'

বাবুভাই চুপ করে গেল। আমি বললাম, 'এই পর্যন্তই?'

'না, এই পর্যন্তই না। আমি উঠে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিলাম। শাহানা চিৎকার করল না, হুটোপুটি করল না, কিছুই করল না। তার চোখ দিয়ে শুধু পানি পড়তে লাগল।'

আমি বললাম, 'আর কিছু না, এ পর্যন্ত?'

'আর কিছু নেই, এই পর্যন্তই।'

বাবুভাই গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, 'শাহানাকে আমি বিয়ে করতে চাই। আমি ঠিক করেছি, শাহানাকে এই কথাটি বলব।'

'আজই বলবে?'

'হুঁ। আজই বলব।'

'আজ না বলে দিন দশেক পর বল।'

'দিন দশেক পরে বললে কী হবে?'

'শাহানার হাসবেণ্ড লোকটি আগামী সপ্তাহে ফিরে আসছে।'

'কে বলেছে?'

'আমি নীলুর কাছে শুনেছি। শাহানা নীলুর সঙ্গে অনেক গোপন কথাটথা বলে।'

বাবুভাই দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, 'এ লোকটি আসুক বা না-আসুক আমার কিছুই যায় আসে না, আমি আজ রাতেই বলব।'

'ঠিক আছে, বলবে। রেগে যাচ্ছ কেন?'

বাবুভাই অকারণে হর্ণ টিপতে লাগল। আমি বললাম, 'তোমার এই ঘটনার কথা আর কেউ জানে?'

'জানি না। সম্ভবত দাদা জানে। শাহানা হয়তো তাঁকে বলেছে।'

'সেকি!'

'হ্যাঁ। সে দাদাকে বলেছে।'

'তুমি বুঝলে কী করে?'

'আমি কচি খোকা না।'

বাবুভাই হু হু করে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল।

ডাঃ ওয়াদুদকে নিয়ে ফিরলাম রাত আড়াইটার দিকে। এসে দেখি দাদাকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। তাঁর মুখের শিরাগুলি নীল হয়ে ফুলে উঠেছে। রমিজ সাহেব দাদার বিছানার পাশে তসবি হাতে বসে আছেন। এই ভড়ং-এর কী মানে? দোয়া-দরুদ যদি পড়তেই হয়, তাহলে মনে মনে পড়লেই হয়। লোকদেখান একটা তসবির দরকার কি? আমি তাকিয়ে দেখলাম রমিজ সাহেব তাঁর মুখ দারুণ চিন্তাক্লিষ্ট করে রেখেছেন। দাদা মারা গেলে সবচেয়ে উঁচু গলায় যে তিনি কাঁদবেন

তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লোকটি নির্বোধ। এ–রকম একটি নির্বোধ লোকের বাচ্চাগুলি এ–রকম বুদ্ধিমান হয়েছে কীভাবে কে জানে? সব ক'টি বাচ্চার এমন বুদ্ধি! বিশেষ করে ক্লাস সেভেনে পড়ে যে–মেয়েটি––বিলু। সব সময় একটা না একটা মজার কথা বলে। হাসি চেপে রাখা মুশকিল। মেয়েরা সাধারণত রসিকতা করা দূরে থাকুক, রসিকতা বুঝতে পর্যন্ত পারে না। কিন্তু বিলু খুব রসিক।

কয়েক দিন আগে সে বারান্দায় বসে কী–যেন বানাচ্ছিল। আমাকে দেখেই বলল, 'বলুন তো পাঁচ থেকে এক বাদ গেলে কখন ছয় হয়?' আমি উত্তরের জন্যে আকাশপাতাল হাতড়াচ্ছি–সে গম্ভীর হয়ে বলল, 'পারলেন না তো? যখন ভুল হয়, তখন হয় ছয়।'

আমার প্রায়ই মনে হয়, একটা নির্বোধ অপদার্থ বাবার জন্যে সব ক'টি মেয়ে এখন কষ্ট পাচ্ছে, ভবিষ্যতেও পাবে।

রমিজ সাহেব আমাকে দেখে হাসিমুখে (তাঁর মুখ সব সময়ই হাসি–হাসি। নির্বোধ লোকদের মুখ সব সময় হাসি–হাসি থাকে।) এগিয়ে এল।

'ভাই সাহেব, আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা ছিল।'

'বলুন, শুনি।'

'চলেন, একটু বাইরে যাই।'

'বাইরে যাবার দরকার কি? এখানেই বলুন।'

রমিজ সাহেব ইতস্তত করতে লাগলেন। তাঁর এই ভঙ্গিটা আমার চেনা। ধার চাইবার ভঙ্গি। কিন্তু রমিজ সাহেব আমাকে অবাক করে দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ আনলেন।

'কথাটা নীলুর প্রসঙ্গে।'

'নীলুর প্রসঙ্গে কী কথা?'

'নীলুর একটা ভালো বিয়ের প্রস্তাব আসছে, ছেলে টাক্সেশান অফিসার। ময়মনসিংহে নিজেদের বাড়ি আছে।'

'ভালোই তো, বিয়ে দিন।'

'দিতেই চাই। কিন্তু নীলু রাজি না। এখন যদি ভাই আপনি একটু বুঝিয়ে বলেন......।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আমি বলব কী জন্যে? আমি কে?'

রমিজ সাহেব আমতা–আমতা করতে লাগলেন, 'না, ইয়ে মানে–––'

'আশ্চর্য, মেয়ে রাজি হচ্ছে না সেটা আমাকে বলছেন কী জন্যে?'

রমিজ সাহেবের মুখ অনেকখানি লম্বা হয়ে গেল। তবু তিনি দেঁতো হাসি হাসতে লাগলেন। গা জ্বলে যাবার মতো অবস্থা। আমি গলার স্বর আর এক ধাপ উঁচু করে বললাম, 'শোনেন রমিজ সাহেব, সব কিছুর একটা সময়–অসময় আছে। একটা মানুষ মারা যাচ্ছে, এই সময় আপনি আজগুবি কথাবার্তা শুরু করলেন।

আশ্চর্য!'

রমিজ সাহেবের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি কাঁপতে শুরু করলেন। দুর্বল লোকের উপর কঠিন হতে ভালো লাগে। তার উপর এই লোকটিকে আমি পছন্দ করি না। কড়া-কড়া ধরনের কথা বলার সুযোগ পেয়ে অঘুমজনিত ক্লান্তি আমার অনেকখানি কমে গেল। রমিজ সাহেব অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'আচ্ছা ভাইসাব, যাই তাহলে।'

'যান।'

রমিজ সাহেব গেটের কাছে চলে গেলেন। সেখানে আগুনের একটা ফুলকি জ্বলে উঠতে দেখা গেল। বিড়ি বা সিগারেট কিছু একটা ধরিয়েছেন। এতটা কড়া না হলেও চলত বোধ হয়। কিন্তু লোকটিকে আমি সহ্য করতে পারি না। এক দিন দুপুরে তাকে দেখলাম মীরপুর রোডের কাছে এক রেষ্টুরেন্টে বসে খুব তরিবত করে মোরগপোলাও খাচ্ছে। ছুটির দিন। সকালেও তাকে বাসায় দেখে এসেছি। আমি এগিয়ে গেলাম।

'কি ব্যাপার রমিজ সাহেব, বাইরে খাচ্ছেন যে?'

রমিজ সাহেব আমতা-আমতা করে যা বললেন, তার সারমর্ম হচ্ছে--তাঁর গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম আছে। খিদে লাগলে সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা খেতে হয়। বাসায় ফিরতে একটু দেরি হবে তাই......।

'গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেমে পোলাও-টোলাও চালাচ্ছেন?'

রমিজ সাহেব তার উত্তর দিলেন না। আরো এক দিন তাঁর সঙ্গে এরকম দেখা। রিকশা করে যাচ্ছি, দেখি এলিফ্যান্ট রোডের এক কাবাব-ঘরের সামনে খোলা জায়গায় চেয়ারে পা তুলে বসা। তাঁর সামনে দু'-তিন ধরনের কাবাব। আমি রিকশা থেকেই চেঁচালাম, 'এই যে রমিজ সাহেব।' তিনি আমার কথা শুনতে পেলেন না। তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার, পরদিনই নীলু এল টাকার জন্যে। এটা তার প্রথম আসা নয়, আগেও অনেক বার এসেছে। ধার চাইতে আসার লজ্জায় তাঁর ফর্সা মুখ লালাভ। চোখ দেখেই মনে হয় আসার আগে ঘরে বসে খানিকক্ষণ কান্নাকাটি করেছে। চোখ ফোলা-ফোলা। আমি লজ্জা কমাবার জন্যেই বললাম (এই সময় আমি তুই করেই বলি), 'তোর যন্ত্রণায় তো সঙ্গে টাকাপয়সা রাখাই মুসিবত। কত টাকা দরকার?'

'দুই শ'। যদি না থাকে-এক শ।'

'দেখি পারা যায় কিনা। পড়াশোনা হচ্ছে ঠিকমতো?'

'জ্বি।'

'গুড। এখন যা, রান্নাঘর থেকে দুধ-ছাড়া হালকা লিকারে এক কাপ চা বানিয়ে নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণে ভেবে দেখি টাকা দেওয়া যায় কি না।'

নীলু যেন পালিয়ে বাঁচে। চা নিয়ে এসে অনেকখানি সহজ হয়। এবং চায়ে চুমুক

দিয়ে আমি প্রতিবারের মতোই গম্ভীর হয়ে ভাবি, রমিজ সাহেব কি ইচ্ছা করেই মেয়েকে আমার কাছে পাঠান? তাঁর কি এক বারও মনে হয় না যে, আমি নীলুকে অনায়াসেই বলতে পারি, 'টাকা দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে দরজাটা একটু ভেজিয়ে দে তো নীলু।' আমি কোনো মহাপুরুষ নই। পৃথিবীর কোনো পুরুষই নয়। মহাপুরুষদের পাওয়া যায় ধর্মগ্রন্থে।

যে-লোক ভোর হতেই মেয়েকে টাকার জন্যে পাঠায়, সে কী করে আগের রাতে পায়ের উপর পা তুলে চপ-কাটলেট খায়! আমি নীলুকে বললাম, 'তোর বাবাকে প্রায়ই দেখি বাইরে হেভি খানাপিনা করে।' নীলু নরম গলায় বলল, 'প্রায়ই না, মাঝে মাঝে।'

'ঘরের খাওয়া রোচে না বুঝি?'

নীলু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'বাবার ভালো খাওয়া খুব পছন্দ। ঘরে তো আর এইসব করা সম্ভব না। তাই কখনো কখনো.......'

'তাই বলে বক রাক্ষসের মতো একা-একা খাবে?'

নীলু চোখ নামিয়ে মৃদু স্বরে বলল, আমাদের এইসব খেতে ইচ্ছেও করে না। এক বার বটি-কাবাব না কী যেন এনেছিলেন, একগাদা লবণ। মুখে দেওয়া যায় না।'

আমি গম্ভীর মুখে বললাম, 'তোদের চার কন্যাকে আমি এক দিন ভালো একটা রেষ্টুরেন্টে নিয়ে যাব।'

'সত্যি?'

'হুঁ।'

'কবে নেবেন?'

'আগে থেকে দিন-তারিখ বলতে হবে নাকি? ভাগ।'

'আমাদের যেতে দেবে না।'

'সেটা দেখা যাবে।'

সবাইকে নিয়ে অবশ্য যাওয়া হল না। নীলুকে নিয়ে গেলাম। সেটাও হঠাৎ করে। হাতির পুলের কাছে নীলুর সঙ্গে দেখা। সে একগাদা বই বুকের কাছে ধরে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে হাঁটছে। আমি রিকশা থামিয়ে গলা বের করলাম, 'এই নীলু, যাস কই?'

'বাসায় যাই, আর কোথায় যাব? এই দিক দিয়ে একটা শর্টকাট রাস্তা আছে।'

'উঠে আয়।'

'আপনি বাসায় যাচ্ছেন?'

'সেটা দেখা যাবে, তুই ওঠ তো।'

নীলু উঠে এল।

'রোজ এই রোদের মধ্যে হেঁটে-হেঁটে বাড়ি যাস?'

'রোজ না। যেদিন আমাদের গাড়িটা নষ্ট থাকে কিংবা ড্রাইভার আসে না সেদিন যাই।'

নীলু শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছল।

'কলেজে গিয়ে খুব কথা শিখেছিস দেখি! আয়, তোকে একটা ক্লাশ ওয়ান রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাই।'

'এখন?'

'হুঁ।'

'আজ তো যাওয়া যাবে না।'

'আজ কী অসুবিধা?'

'আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখেন। আম্মার স্যাণ্ডেল নিয়ে এসেছি। এইগুলি পরে কেউ কোথাও যায়? আমাকে মনে করবে আপনার কোনো চাকরানী।'

'ঠিক আছে, আয় স্যাণ্ডেল কিনে দিই।'

নীলু শাড়ির আঁচল দিয়ে আবার কপালের ঘাম মুছল। ক্লান্ত স্বরে বলল, 'আপনাদের খুব মজা, না? যখন যা ইচ্ছা হয় কিনতে পারেন।'

'তা পারি।'

'টাকা খরচ করতেও আপনি ওস্তাদ।'

'তাও ঠিক।'

'হঠাৎ এই নতুন স্যাণ্ডেল নিয়ে গিয়ে বাসায় কী বলব? আপনি দিয়েছেন, এই কথা বলব?'

'বলতে অসুবিধা কী?'

'অসুবিধা আছে, আপনি বুঝবেন না।'

নীলু আবার কপালের ঘাম মুছল।

'স্যাণ্ডেল কিনতে হবে না, যেটা আছে সেটা পরেই যাব।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'তোদের মেয়েদের মধ্যে শুধু প্যাঁচ।'

'মেয়েদের মনের সব কথা আপনি জানেন, তাই না?'

'তা জানি।'

'জানাই তো উচিত, এত মেয়ে বন্ধু আপনার। সেদিন দেখলাম রিকশা করে একটি মেয়ের সঙ্গে যাচ্ছেন।'

নীলু ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

দূর থেকে দেখলাম, ছোটচাচার সঙ্গে মগবাজারের ফুফুর কী নিয়ে যেন লেগে গেছে। বড়োফুফু উত্তেজিত হয়ে কী সব বলছেন। ছোটচাচা তেমন সাড়াশব্দ করছেন না।

ছোটচাচার স্বভাব মিনমিনে। আড়ালে–আড়ালে থাকাই তাঁর স্বভাব। গলার স্বর

উঁচু করে কিছু বলতে পারেন না। সব সময় ভীত–সন্ত্রস্তভাব। যেন মহা কোনো অপরাধ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমাদের গেঞ্জির মিলের দায়িত্ব কিছু দিন ছিল তাঁর উপর। লোকসান–টোকসান দিয়ে এমন অবস্থা করলেন যে শেষ পর্যন্ত মিল বিক্রি করে দিতে হল। এখন কী–যেন একটা ব্যাবসা করেন। এবং মনে হয় ভালোই টাকাপয়সা আয় করেন। ছোটচাচার বিয়ে হয়েছে আজ দশ বৎসর। কোনো ছেলেপুলে হয় নি। ছোটচাচী যথেষ্ট সুন্দরী, তবু সারাক্ষণ সাজসজ্জা করেন। তাঁকে যখনই দেখা যাবে তখনি মনে হবে এই বুঝি কোনো পার্টিতে যাচ্ছেন। কিংবা কোনো বৌভাতের অনুষ্ঠান থেকে এলেন। বাবুভাইয়ের ধারণা ছোটচাচীর জন্যেই চাচা এতটা মিনমিনে হয়েছেন। কথাটা পুরোপুরি অসত্য নয়।

চাচা এ বাড়িতে থাকেন ছায়ার মতো। ছোটচাচী থাকেন হৈ–চৈ করে। সর্বক্ষণই তাঁর কাছে গেস্ট আসছে। এক বার শোনা গেল, কোন এক গ্রুপ থিয়েটারের হয়ে তিনি নাকি নাটক করবেন। তাঁর ভূমিকা হচ্ছে মোড়লের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর। ছোটচাচী নাটকের স্ক্রিপ্ট নিয়ে এনে মুখস্থ করলেন। নাটক অবশ্যি হল না। দাদা ভেটো দিয়ে সব ভেঙে দিলেন।

মগবাজারের ফুফু ছোটচাচার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনো গোপন আলাপ করছিলেন, কারণ আমাকে দেখেই কথাবার্তা থেমে গেল। আমি বললাম, 'কী নিয়ে আলাপ করছিলেন আপনারা?'

ছোটচাচা মিহি স্বরে বললেন, 'তেমন কিছু না।'

বড়ফুফু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'মা–র গয়না নিয়ে আলাপ করছিলাম, এমন গোপন কিছু না।'

'কী গয়না?'

'মা–র প্রায় দেড় শ' ভরি গয়না আছে। সব বাবা স্টীলের আলমারিতে তুলে রেখেছেন।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'গয়নাগুলি সব আছে কিনা আলমারি খুলে দেখা দরকার। গয়নাগুলিতে আমাদের দাবি আছে। স্মৃতিচিহ্ন।'

আমি চুপ করে রইলাম। বড়োফুফু থেমে থেমে বললেন, 'গয়নার পুরো হিসাব থাকা দরকার।' ছোটচাচা বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, 'আমি একটু বাবার ওখানে গিয়ে বসি।'––বলেই প্রায় পালিয়ে গেলেন।

বড়োফুফু থমথমে স্বরে বললেন, 'এটা এমন মেনা বিড়াল যে, এর মাথায় কাঁঠাল ভাঙলেও বুঝতে পারবে না।'

'কে ভাঙবে কাঁঠাল?'

'তোর বাবা, আর কে? আমি কি কিছু বুঝতে পারি না? ঠিকই পারি।'

আমি চুপ করে গেলাম। বড়োফুফু বললেন, 'খোঁজ নিয়েছিলি?'

'কি খোঁজ নেব?'

'মেয়েটার বাড়ি কোথায়। বাবা কী করে।'

'ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেই পারেন।

'আমি পারলে আর তোকে জিজ্ঞেস করি কেন?'

'মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছে?'

'হুঁ। শাহানা বলল খুব নাকি লক্ষ্মী মেয়ে।'

'তা লক্ষ্মী বলতে পারেন।'

'আর শোন, ওদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন দরকার।'

'আজ রাতেই দরকার?'

'অসুবিধা কি?'

'শাহানাকে জিজ্ঞেস করলেই হয়।'

'না, ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই না। মেয়েকে দিয়ে কোনো মেয়ের সম্পর্কে খোঁজখবর করতে নেই। ঠিক খবর পাওয়া যায় না।'

'ঠিক আছে।'

'আর মেয়েটির একটা ছবি দরকার। ফরিদকে পাঠাব।'

'এই সব আমাকে বলছেন কেন?'

'কাকে বলব তাহলে?'

'শাহানাকে বলেন, কিংবা বড়োচাচীকে বলেন।'

'বিয়ে—শাদির ব্যাপারে শাহানাকে জড়াতে চাই না। মেয়েটা অলক্ষুণে। আর তোর বড়োচাচীর কথা আমাকে কিছু বলিস না। ওর মাথায় কিছু আছে নাকি? মেয়েমানুষের এত কম বুদ্ধি থাকে, তা বড়োভাবীকে দেখেই প্রথমে জেনেছি, বুঝলি?'

গেট খোলার শব্দে তাকিয়ে দেখি, ছোটফুফা এসে ঢুকছেন। গাড়ি গেটের বাইরে রাখা। ছোটফুফা কখনো গাড়ি ভেতরে ঢোকান না। ঢোকালে নাকি বের করতে সময় লাগে। ছোটফুফা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'বাবার অবস্থা কি?'

'বেশি ভালো না।'

'ক্লিনিকে ট্রান্সফার করা দরকার। পিজির ডাক্তার আমিনের সঙ্গে কথা বলেছি। কেবিনের অসুবিধা হবে না। ফাইন্যান্স মিনিস্টার জামাল সাহেবের কথা বলতেই মন্ত্রের মতো কাজ হল। দেশের যে কী অবস্থা! রেফারেন্স ছাড়া কাজ হয় না। আপা, আপনি কেমন আছেন?'

'ভালো। তুমি কেমন?'

'আর আমি! আমার কথা কে জিজ্ঞেস করে বলেন? একটা পার্টির সঙ্গে কথা বলার জন্য কোরিয়া গিয়েছিলাম। খাওয়াদাওয়ার কি যে কষ্ট আপা!'

'তাই বুঝি?'

'আর বলেন কেন! খাওয়াদাওয়ার দিক দিয়ে জাপান ভালো। রাইস এবং চিকেনকারী পাওয়া যায়। এক্সেলেন্ট টেস্ট।

ছোটফুফার কথাবার্তায় আমার গা জ্বালা করতে লাগল। এই লোকটি একটি মরণাপন্ন রুগী দেখতে এসে কোরিয়া–জাপান করছে। আমি বললাম, 'ছোটফুফা, আমি দোতলায় আছি। দরকার হলে ডাকবেন।'

'এই দাঁড়াও, আমিও যাব।'

'আপনি দাদাকে দেখে আসেন।'

'চট করে দেখেই আসছি। তুমি দাঁড়াও।'

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। ছোটফুফা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন। চোখ কপালে তুলে বললেন, 'অবস্থা তো বেশ খারাপ!'

'খারাপ তো বটেই।'

'রাত কাটবে না। কি বল?'

'না কাটারই কথা।'

'হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। ডাক্তারদের সার্কেলে আমার ভালো যোগাযোগ আছে। একটা মেডিকেল বোর্ড তৈরি করা দরকার।'

আমি ঠাণ্ডা মাথায় বললাম, 'বাবাকে বলেন। বলে নিয়ে যান।'

ছোটফুফা চুপ করে গেলেন। সিঁড়ির মাথায় বাবুভাই দাঁড়িয়ে ছিল। বারান্দা অন্ধকার বলে তার মুখের ভাব বোঝা যাচ্ছে না। ছোটফুফা বললেন, 'বাবু নাকি? সব অন্ধকার করে রেখেছ কেন?'

বাবুভাই জবাব দিল না। ফুফা বললেন, 'চল, তোমাদের ঘরে গিয়ে বসি।'

'আমাদের ঘরে বাতি নেই।'

'বাতি লাগবে না, তোমরা আছ তো?'

বাবুভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি থাকব না। টগরকে বলে দেখেন।'

'আরে, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

ঘরে ঢুকেই ফুফা চাপা গলায় বললেন, 'কিসের গন্ধ? গন্ধ পাচ্ছ না?' আমরা জবাব দিলাম না। বাবুভাই বললেন, 'কি বলতে চাচ্ছিলেন যেন?'

'আমার শ্বশুর সাহেব সম্পর্কে। শুনলাম তাঁর গ্রামের বাড়ি এবং বিশ বিঘা জমি নাকি স্কুল আর কলেজ ফাণ্ডে দিয়ে যাচ্ছেন?'

'জানি না, দিতে পারেন।'

'কি আশ্চর্য, তাঁকে গ্রামের লোকে দালাল বলে, আর তাদের জন্যে এটা করার মানে?'

'দালালী করেছিলেন, কাজেই দালাল বলে। সেই জন্যে দান–খয়রাত করবেন না?'

'আরে--তুমি বুঝতে পারছ না, দানটা অপাত্রে হচ্ছে না?'

'অপাত্রে হবে কেন? গ্রামের গরিব মানুষেরা পাবে।'

'দান-খয়রাত যোগ্য পাত্রে হওয়া উচিত। ওরা কী বলবে জান? ওরা বলবে, নাম কামাবার জন্যে করেছে। বলবে এবং 'শালা দালাল' বলে গালি দেবে।'

'দিক না। দাদা তো আর শুনবে না। সে তো ভেগেই যাচ্ছে।'

ফুফা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বললেন, 'এক জন মানুষ মারা যাচ্ছে, তাঁর সম্পর্কে এ রকম অশ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বল তোমরা! আশ্চর্য!'

'শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার না। যেটা সত্যি সেটা বললাম।'

'মদের গন্ধ পাচ্ছি, মদ খাচ্ছিলে নাকি?'

'জ্বি, তা খাচ্ছিলাম।'

আমি তাদের দু' জনকে সেখানে রেখে নিঃশব্দে বের হয়ে এলাম। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, দু' জনে এবার লেগে যাবে। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। খোলা ছাদে বসে একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে। কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

আমাদের এ বাড়ির ছাদটি শুধু যে সুন্দর তাই নয়, অপূর্ব! এর পেছনের সমস্ত কৃতিত্বই শাহানার। ফুলের টব এনে ফুল ফুটিয়ে এমন করেছে যে ছাদে না-ওঠা পর্যন্ত কেউ ভাবতে পারবে না কত বড়ো বিস্ময় অপেক্ষা করছে তার জন্যে। সমস্ত ছাদকে চারটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ভাগের নাম 'গোলাপকুঞ্জ'। গোলাপকুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে বসার জন্যে গদিওয়ালা মোড়া। বৃষ্টির আগে তা ভেতরে নিয়ে আসা হয়। চমৎকার ব্যবস্থা।

আমি ছাদে পা দিয়েই দেখলাম গোলাপকুঞ্জের একটি মোড়াতে বাবা বসে আছেন। তাঁকে দেখেই চট করে নিচে নেমে যাওয়া যায় না। আবার ছাদে ঘোরাঘুরিও করা যায় না। আমি হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবাকে আমরা সবাই ভীষণ ভয় করি। বাবা বললেন, 'টগর, নিচের কোনো খবর আছে?'

'জ্বি-না।'

'আস এদিকে।'

বাবা পাইপ ধরালেন। আমি যেখানে ছিলাম, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

'এখানে এসে বস, তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই।'

আমি এগিয়ে গেলাম। বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোমার মা মারা যাবার পর আমি খানিকটা লোনলি হয়ে পড়েছি। এই বয়সে মানুষের সবচে বেশি কম্প্যানি প্রয়োজন।'

'জ্বি, তা ঠিক।'

'বস তুমি এখানে।'

আমি আড়ষ্ট হয়ে বসলাম।

'তোমার রেজাল্ট হচ্ছে কবে?'

'ঠিক জানি না।'

বাবা গম্ভীর হয়ে পাইপ টানতে লাগলেন। দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থা। বাবাকে আমরা সবাই ভীষণ ভয় পাই। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা মুশকিল। বাবা হঠাৎ নরম স্বরে বললেন, 'তোমরা আমাকে এড়িয়ে চল। কী কারণ বল তো?'

আমি কুলকুল করে ঘামতে লাগলাম।

'তোমার দাদারও এই অবস্থা ছিল। এ সংসারে কিছু মানুষকে একা একা থাকতে হয়--এটা ঠিক না।'

আমি সাড়াশব্দ করলাম না।

'তোমার দাদার অবস্থা কেমন দেখলে?'

'বেশি ভালো না।'

'তাঁর কাছে কে আছেন?'

'বড়োচাচা আর ছোটচাচা এই দু' জনকে দেখে এসেছি।'

বাবা ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'গতকাল খবর পেয়েছি, তোমার ছোটচাচা চিটাগাং-এ একটা বাড়ি করেছেন। আমি কিছুই জানতাম না। লুকানর কোনো প্রয়োজন ছিল না।'

আমি কথা বললাম না। বাবা যখন কারো সঙ্গে কথা বলেন তখন কথা বলার ব্যাপারটা তিনিই সারেন, অন্যদের শুধু শোনার দায়িত্ব।

'তোমাদের দাদা মারা যাবার পর বড়ো ধরনের ঝামেলা শুরু হবে। তোমার ফুফুরা খুব হৈ-চৈ করবে। বাবা ওদের সম্পত্তি বা টাকাপয়সা কিছুই দিয়ে যান নি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। মাস তিনেক আগে উইল করা হয়েছে। তোমার দাদার এ বিষয়ে লজিক খুব পরিষ্কার। তোমার ফুফুদের বিয়ের সময় বাড়ি দেওয়া হয়েছে। ক্যাশ টাকাও দেওয়া হয়েছে। জান নিশ্চয়ই?'

'জ্বি, জানি।'

'অবশ্যি এসব কিছুই তাদের মনে থাকবে না। দু' জনেই হৈ-চৈ করবে। দু' জনেই বলবে ইচ্ছে করে তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। কেইস-টেইস হওয়াও বিচিত্র নয়।'

আমি উসখুস করতে লাগলাম। চট করে উঠে যাওয়া যাচ্ছে না। আবার বসেও থাকা যাচ্ছে না। এসব শুনতে ভালো লাগছে না।

'আপনি কি চা-টা কিছু খাবেন?'

'নাহ্।'

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। শীত-শীত লাগছে। আমি বললাম, 'নিচে যাই, দেখি কী হচ্ছে।'

'বস একটু।'

আমি বসে রইলাম। বসেই রইলাম। বাবা ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'কয়েক দিন আগে তোমার মাকে স্বপ্ন দেখলাম। খুব কান্নাকাটি করছিল। তুমি তাকে স্বপ্নে দেখ?'

'জ্বি-না।'

'স্বপ্নটা কেন যে দেখলাম! স্বপ্নের কোনো মানে থাকে কিনা কে জানে?'

'স্বপ্নের কোনো অর্থ নেই। স্বপ্ন স্বপ্নই।'

'বোধ হয় তাই। আজকাল আমি তোমার মায়ের কথা প্রায়ই ভাবি।'

আমি চুপ করে রইলাম। একবার ভাবলাম বলি--ভাবেন নাকি? বললাম না। অনেক কিছু, যা বাবাকে বলতে ইচ্ছে করে, তা শেষ পর্যন্ত বলা হয় না। বাবাও বোধ করি অনেক কিছু বলতে চান, শেষ পর্যন্ত কিন্তু বলেন না।

'তোমার দাদা তোমার মাকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন।'

'জানি।'

'সবটা জান না। তোমার যখন জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে, তখন তোমার দাদা অন্য মানুষ।'

'ও।'

'তোমার মার বিয়ে হয় তের বছর বয়সে। আমার সঙ্গে নানা কারণে তাঁর সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না। সে ছিল ঘরোয়া ধরনের মেয়ে। মেয়েলিপনা ছাড়া তার মধ্যে কিছু ছিল না।'

বাবা কথা বন্ধ করে খুকখুক করে খানিকক্ষণ কাশলেন।

'তোমার মাকে আমি পছন্দ করি নি। সে রাত-দিন কাঁদত। তোমার দাদা তাকে আদর দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলেন। সে যে কী অসম্ভব আদর, চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না। তোমার মা এক বার কমলা খেতে চেয়েছিল। বাবা এক গরুর গাড়ি বোঝাই করে কমলা এনেছিলেন। সেই থেকে তোমার মার নাম হয়ে গেল 'কমলা বৌ।'

বাবার গলা কি কিঞ্চিৎ ভারি হয়েছে? খুব সম্ভব না। বাবা ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না।

'তোমার মাকে আমি ভালবাসতে শুরু করেছি তার মৃত্যুর পর। এটা খুব কষ্টের ব্যাপার।'

আমি উসখুস করতে লাগলাম। আমার চলে যেতে ইচ্ছে করছে। বাবার সামনে দীর্ঘ সময় বসে থাকার অভ্যেস আমার নেই। আমাদের কারোরই নেই। আবার উঠে

যাবার সাহসও হয় না। বিশ্রী অবস্থা।

'এখন মাঝে মাঝে মনে হয় নতুন করে জীবন শুরু করার একটা সুযোগ থাকা উচিত। এমন একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে সবাই একটা করে সুযোগ পাবে।'

'তাহলেও দেখবেন সবাই আবার ভুল করবে।'

'আমি করব না।'

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। কেউ হয়তো আসছে, এত রাতে ছাদে আসবে কে? শাহানা নাকি? শাহানা মাঝে-মাঝে অসময়ে ছাদে এসে তার ফুলগাছের সঙ্গে কথা বলে। এই মেয়েটির মনে ভয়টয় কিছু নেই।

শাহানা এসে ঢুকল চায়ের পেয়ালা নিয়ে।

'মামা, আপনার জন্যে একটু কফি এনেছি।'

'বুঝলি কী করে, আমি এখানে।'

'খুঁজে-খুঁজে এসেছি।'

বাবা হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে কফি নিলেন। এই বাড়ির একটিমাত্র মেয়ের সঙ্গে বাবার সহজ সম্পর্ক আছে।

একমাত্র শাহানার সঙ্গে কথা বলার সময় বাবার মুখের কঠিন দাগগুলি কোমল হয়ে আসে। শাহানা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিচে আস টগর, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।' আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

'মামা, আপনার চিনি লাগবে না তো?'

'নাহ্।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শাহানা বলল, 'খুব একটা বাজে ব্যাপার হয়েছে।'

'কী?'

'নীলুদের বাসায় আজ রান্না হয় নি।'

'রান্না হয় নি মানে?'

'হয় নি মানে, হয় নি। রান্না করার মতো কিছু ছিল না। ঘরে টাকাপয়সাও ছিল না।'

'বল কি!'

'নীলুর বাবার আজ মাসখানেক ধরে চাকরি নেই।'

'শুনলে কার কাছ থেকে?'

'নীলুর কাছ থেকেই শুনলাম। নীলু খুব কান্নাকাটি করছে।'

সিঁড়ির উপর আমরা বেশ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। শাহানা মৃদু স্বরে বলল, 'পৃথিবীতে অনেক রকম কষ্টের ব্যাপার হয়। আমার নিজেরো অনেক দুঃখ-কষ্ট আছে, কিন্তু---।'

'সারা দিন কিছু খায় নি?'

'তা জানি না, তবে ভাত সম্ভবত খায় নি।'

সারা দিন ভাত খায় নি, এরকম লোকের সংখ্যা এদেশে অনেক। কিন্তু পরিচিত কেউ না-খেয়ে আছে, এটা গ্রহণ করা যায় না। প্রচণ্ড রাগ লাগে। বিকাল-বেলায় দেখছি বাচ্চাগুলি বাগানে ছোটাছুটি করছে। সবচেয়ে ছোটটি আমাকে দেখে ডাকল, 'এ্যাই এ্যাই।' আমি ফিরে তাকাতেই কদমগাছের আড়ালে গিয়ে লুকাল। এ'টি তার মজার খেলা। আমি গম্ভীর স্বরে বললাম, 'ধরে ফেলব।' বাচ্চা দু'টি দৌড়ে পালাতে গিয়ে জড়াজড়ি করে পড়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে দেখি এক জনের হাঁটুর কাছটায় ছিলে গেছে। কিন্তু কাঁদল না, আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে উৎসাহী গলায় বলল, 'বাঘ-বাঘ-খেলবে?' আর এই বাচ্চারা ভাত খায় নি? আমি দীর্ঘ সময় চুপচাপ শাহানার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। শাহানা বলল, 'আমার যা খারাপ লাগছে। আজ নিশ্চয় প্রথম নয়, আগেও হয়তো হয়েছে।'

আমি বললাম, 'রমিজ সাহেব লোকটির প্রকাশ্যে শাস্তি হওয়া দরকার।'

'রমিজ সাহেব কি করল?'

আমি তার জবাব দিলাম না। শাহানা মৃদু স্বরে বলল, 'তোমার সঙ্গে আরেকটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চাই!'

'বল।'

'নীলুর বিয়ের কথা হচ্ছে। তুমি বুঝিয়েসুঝিয়ে নীলুকে রাজি করাও। ওর জন্যে ভালোই হবে। ছেলে খারাপ না।'

'আমি রাজি করাবার কে?'

'তুমি ভালো করেই জান তুমি কে।'

শাহানা গা-জ্বালা ধরান শীতল হাসি হাসল। আমি বললাম, 'ঠিক আছে আমি বলব। নীলু কোথায়?'

'এখনই বলতে হবে তেমন কোনো কথা নেই।'

'ঝামেলা চুকিয়ে ফেলি।'

'আর যদি সাহস থাকে তাহলে.......'

'তাহলে কি?'

'ওকে ডেকে এমন একটা কথা বল, যা শোনার জন্যে মেয়েদের মন তৃষিত থাকে।'

'তৃষিত হয়ে থাকে?'

'হুঁ, বাংলাটা অবশ্যি একটু কঠিন বলে ফেললাম।'

শাহানা হাসল। আমি নিচে এলাম। বাবু ভাই সিঁড়ির কাছে উগ্র মূর্তিতে দাঁড়িয়ে। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সিগারেট হাতে সে কখনো প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করে না।

'ব্যাপার কি বাবুভাই?'

'কিছু না।'

'ছোটফুফা কোথায়?'

'জানি না।'

'তার সঙ্গে সিরিয়াস একটা ফাইট দিলে মনে হয়।'

বাবুভাই জবাব দিল না। আমি বললাম, 'চল, দাদার অবস্থাটা দেখে আসি।'

'দেখার কী আছে?'

'দেখার কিছু নেই?'

বাবুভাই উত্তর না দিয়ে হনহন করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। সে মনে হচ্ছে অত্যন্ত বিরক্ত। তার বিরক্তির আসল কারণ টের পাওয়া গেল কিছুক্ষণ পর, যখন দেখলাম বড়োচাচাকে। বড়োচাচার চেহারা ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো। দিশাহারা চাউনি। ঠিক মতো কথাও বলতে পারছেন না, জড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি আমার হাত ধরে একটা অন্ধকার কোণার দিকে নিয়ে গেলেন। কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, 'টগর, বাবু নাকি উপরে বসে মদ খাচ্ছে?'

'বলেছে কে আপনাকে?'

'তোর ছোটফুফা বললেন। মদ খেয়ে নাকি মাতলামি করছে?'

বড়োচাচা সত্যি সত্যি কেঁদে ফেললেন। আমি নিজেকে সামলে সহজভাবে বললাম, 'ছোটফুফা কি সবাইকে এই সব বলে বেড়াচ্ছে?'

'তুই আগে বল, এটা সত্যি কি না।'

'সত্যি না, চাচা।'

'তুই আমার গা ছুঁয়ে বল।'

'গা ছুঁয়ে বলার কী আছে, যত সব মেয়েলী ব্যাপার!'

'হোক মেয়েলী ব্যাপার, তুই আমার হাত ধরে বল।

আমি বড়োচাচার হাত ধরে শান্ত স্বরে বললাম, 'বিশ্বাস করুন চাচা, কথাটা ঠিক না। মিথ্যা বলব কেন?'

বড়োচাচা চোখ লাল করে বললেন, 'তুই নিজে মিথ্যা বলছিস।'

'কি যে বলেন। মিথ্যা বলব কেন?'

বড়োচাচা গম্ভীর স্বরে বললেন, 'বাবা ওকে যতটা ভালবাসেন, কাউকে তার সিকি ভাগও বাসেন না। সে কিনা এ-রকম একটা সময়ে মদ খাচ্ছে? হারামজাদা কোথাকার!'

'কথাটা সত্যি না।'

'টগর, তুই বাবুকে গিয়ে বল, সে যেন এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।'

'কি যে আপনি বলেন চাচা!'

'যা তুই, এক্ষুণি গিয়ে বল।'

'এক্ষুণি বলতে হবে কেন? ঝামেলার মধ্যে নতুন ঝামেলা।'

'সে যদি বাড়ি ছেড়ে না যায়, আমি যাব।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। আমি বলছি।'

'বলবি, সে যেন এককাপড়ে বাড়ি ছেড়ে যায়।'

'ঠিক আছে।'

'এবং কোনোদিন যেন এ বাড়িতে তার ছায়া না-দেখি।'

'বলব।'

মদ খাওয়ার ব্যাপারটা দেখলাম বেশ একটা আলোড়ন তৈরি করেছে। মোটামুটি সবাই জানে। চাচা বিদেয় হবার সঙ্গে সঙ্গে বড়োফুফুর সঙ্গে দেখা। তিনি তাঁর ভারি শরীর নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে কোথাও যাচ্ছিলেন, আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বাবু নাকি মাতলামি করছে?'

'মাতলামি করবে কেন?'

'বেহেড মদ খেয়েছে, তাই মাতলামি করছে।

'বলেছে কে আপনাকে?'

'তুই এত জেরা করার বদভ্যাস কোত্থেকে পেলি?'

আমি চুপ করে গেলাম। বড়োফুফু আঁৎকে ওঠার ভান করে বললেন, 'বংশের সম্মানটার কথা কেউ ভাবল না, আশ্চর্য! এত বড়ো পীরবংশ। এত নাম-ডাক।' দারুণ একটা মিথ্য কথা এটা। ইদানীং লক্ষ করছি বড়োফুফু বংশ-মর্যাদা বাড়াবার চেষ্টায় নেমেছেন। অপরিচিত লোকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলতে শুরু করেছেন--পীরবংশ। খুব খানদানি ফ্যামিলি।

আমাদের গোষ্ঠীতে পীর-ফকির কেউ নেই। দাদার বাবা ছিলেন চাষা। জমিজমা তেমন ছিল না। কাজেই শেষের দিকে পানের ব্যবসা শুরু করেন। সেতাবগঞ্জ থেকে পানের ঝাঁকা মাথায় করে এনে নীলগঞ্জ বাজারে বিক্রি করতেন। এতে তেমন কিছু ভালোমন্দ না হওয়ায় ডিমের কারবার করতে চেষ্টা করেন। চাষা সমাজ থেকে নির্বাসিত হন ডিম বেচার কারণে। তাঁর দু'টি মেয়ের বিয়ে আটকে যায়। ডিম বেচা ব্যাপারীর সঙ্গে সম্বন্ধ করা যায় না। খুবই দুর্দিন গেছে বেচারার।

এই সব তথ্য দাদার কাছ থেকে পাওয়া। হতদরিদ্র মানুষ যখন দারুণ বড়লোক হয়ে যায়, তখন তার অভাবের গল্প করতে ভালোবাসে। দাদা যখন সুস্থ থাকেন এবং কথা বলার মতো কাউকে পান, তখন শুরু করেন পুরনো দিনের গল্প। কবে পরপর দু' দিন পেয়ারা খেয়ে ছিলেন। কবে বেতন না-দেওয়ার জন্যে স্কুল থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হল এবং তাঁর বাবা গিয়ে হেডমাস্টার সাহেবের পা ধরে বসেছিলেন একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে। হেডমাস্টার সাহেব উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেছিলেন, 'ম্যাট্রিক পাশ করে হবেটা কি? ছেলেকে কাজে লাগান, সংসারে সাহায্য হোক।' দাদার ম্যাট্রিক পাশ করা হল না। তিনিও ডিমের

ব্যবসা শুরু করলেন। তার চল্লিশ বছর পর নীলগঞ্জে একটি হাইস্কুল এবং একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ দিলেন। দু'টিই অবৈতনিক। স্কুলের সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করতেন। এখনো করেন।

অভাব এবং অহংকারের গল্প শুনতে আমার ভালো লাগে না। শুধু আমার একার নয়, কারোই ভালো লাগে না। কাজেই বেশির ভাগ গল্প শুনতে হয় শাহানাকে। এবং সে মেয়েলি ভঙ্গিতে আহা-উহু করে, 'বলেন কি নানাভাই, এ রকম অবস্থা ছিল? কী সর্বনাশ! থাক থাক আর বলবেন না, কষ্ট লাগে।' দাদা তাতে উৎসাহ পেয়ে আরো সব ভয়াবহ কষ্টের বর্ণনা শুরু করেন। খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার।

পৃথিবীতে বৃদ্ধদের মতো বিরক্তির আর কিছুই নেই। বৃদ্ধরা অসুন্দর বুদ্ধিহীন নারীদের চেয়েও বিরক্তিকর। বাবুভাইয়ের মতে পঞ্চাশের পর এদের সবাইকে কোনো একটি দ্বীপে চালান করে দেওয়ার ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে করা উচিত। যেখানে সব বুড়ো-বুড়ি মিলে এক সঙ্গে বকবক করবে। ছ' মাসে এক বার জাহাজ গিয়ে তাদের খাবারদাবার দিয়ে আসবে।

আমাদের বংশ দীর্ঘজীবী বংশ। দাদার ডিম-বেচা বাবা মারা গিয়েছিলেন প্রায় এক শ' বছর বয়সে। শেষ সময়ে চোখে দেখতেন না, কানে শুনতেন না, চলচ্ছক্তি ছিল না। দিনরাত নিজের মলমূত্রের মধ্যে বসে থেকে পশুর মতো গোঁ-গোঁ করতেন। সবই শোনা কথা। মায়ের কাছ থেকে শুনেছি। দাদার এই অতিবৃদ্ধ বাবাকে দেখবার কেউ ছিল না। তিনি গ্রামের বাড়িতে পড়ে থাকতেন। সেখানে তখনো সেই প্রকাণ্ড দালান (যা পরে 'নীলমহল' নামে খ্যাত হয়) তৈরী হয় নি। দাদা সবে টাকাপয়সার মুখ দেখতে শুরু করেছেন। বন্যার মতো সম্পদ আসা শুরু হয় নি।

মানুষের মল এবং মূত্রের মধ্যে জীবনদায়িনী কিছু হয়তো আছে। দাদার বাবা মলমূত্র মেখে প্রায়-অমর হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু বার্ধক্যজনিত কারণে হয় নি। হয়েছিল ইঁদুরের কামড়ে। শোনা যায় ইঁদুর কামড়ে তাঁর নাভির কাছ থেকে মাংস তুলে নিয়েছিল। সেই কামড় বিষিয়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ছেলের সীমাহীন ক্ষমতার কিছুই তিনি চোখে দেখে যেতে পারেন নি।

তাঁর মৃত্যুর দু' বছরের মধ্যেই 'নীলমহল' তৈরির কাজ শুরু হয়। সে নাকি এক রাজকীয় ব্যাপার! গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল, ডিম-বেচা খবির মিয়ার ছেলে সোনার মাইট পেয়েছে। রাজা-বাদশাদের সঞ্চিত গোপন স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ সাতটা ঘড়া। সবাই বলত--এই সব পাপের অর্থ কি আর ভোগে লাগবে? লাগবে না। তাদের কথা আংশিক ফলে গেল। দাদা বা তাঁর বংশধররা কেউ সেই প্রকাণ্ড বাড়িতে থাকল না। দাদার দশা হল বাবুই পাখির মতো। বাবুই পাখি বহু কষ্টে বহু মমতায় চমৎকার একটি বাসা বানায়, সে নিজে বাসাটিতে বাস করতে পারে না। রোদ বৃষ্টি

বাদলে বসে থাকে বাইরে, বাসায় নয়। তার চোখের সামনে ভালোবাসায় তৈরি বাসাটি হাওয়ায় দোল খায়।

দাদারও তাই হল। নীলমহলে তিনি গিয়ে উঠতে পারলেন না। কারণটি বিচিত্র। রাতদুপুরে সে-বাড়ির ছাদে অশরীরী শব্দটব্দ হতে লাগল। কোথায়ও হাওয়া নেই, নীলমহলের জানালা আপনাআপনি খুলে যাচ্ছে। রাতের বেলা খড়ম পায়ে বারান্দার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত কে যেন হাঁটে। নীলমহলের ছাদে নাকি আগুনের কুণ্ড হঠাৎ-হঠাৎ ঝলসে ওঠে। আজগুবি সব ব্যাপার। নিশ্চয়ই এ সবের কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, কিংবা সবটাই মনগড়া। কিন্তু মানুষমাত্রই কিছু-না-কিছুতে বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। দাদা নীলমহল ছেড়ে তাঁর ছেলেদের সঙ্গে এলেন বাস করতে।

সেই চমৎকার বাড়িটির জন্যে তাঁর কি মন কাঁদে? তাঁর ভালোবাসার নীলমহল। মৃত্যুর আগে আগে সমস্ত অতীত নাকি ছবির মতো ভেসে ওঠে। নীলমহলের অতীত কি ভাসছে তাঁর সামনে? আজ কি তাঁর মনে হচ্ছে, সমস্তই অর্থহীন? নীলমহল-লালমহল কোনো মহলই কাজে আসে না। আজ তাঁর যাত্রা অজানা এক মহলের দিকে, যার রঙ তাঁর জানা নেই।

ছোটফুফা কাগজ-কলম নিয়ে বসেছেন। দাদার কিছু একটা হয়ে গেলে গণ্যমান্য যাদেরকে খবর দেওয়া হবে তাদের নাম-ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার লেখা হচ্ছে। দেখতে-দেখতে তিনি ফুলস্কেপ কাগজ তিন-চারটা ভরিয়ে ফেললেন। বাবুভাইকে বললেন, 'দেখ তো, কেউ বাকি আছে কিনা?'

বাবুভাই না তাকিয়েই বললেন, 'না, সবাই আছে।'

'না দেখেই কী করে বললি?'

'দেখতে হবে না। যা লিখেছেন ঠিকই লিখেছেন। সবাই আছে।'

'কেউ বাদ গেলে কেলেঙ্কারি হবে।'

'কেলেঙ্কারি হবে কেন?'

ফুফা বহু কষ্টে রাগ সামলালেন। বরফশীতল স্বরে বললেন, 'সামাজিকতার একটা ব্যাপার আছে।'

'মানুষ মারা যাচ্ছে, এর মধ্যে আবার সামাজিকতা কী?'

'মানুষের মৃত্যুর মধ্যে সামাজিকতা নেই?'

'না। এটার মধ্যে এসব কিছু নেই।

বাবু ভাই হাই তুললেন। তিনি ফুফাকে রাগাতে চাইছেন। ফুফা গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এটা একটা খান্দানী ফ্যামিলি। জলে-ভাসা ফ্যামিলি না। খান্দানী ফ্যামিলিতে অনেক রকম সামাজিকতা আছে।'

'খান্দানী! আমরা খান্দানী হলাম কবে? আমি যতদূর জানি, আমাদের পূর্বপুরুষ

চাষা ছিলেন। কেউ কেউ হাটে গিয়ে ডিম বেচতেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এক জন সিঁধেল চোর ছিল। কালুচোরা নাম।'

'এ রকম কোনো কিছু তো জানি না।'

'আমি জানি।'

ছোটফুফা মুখ অন্ধকার করে ফেললেন। বাবুভাই বললেন, 'একটা লোক মারা যাচ্ছে, তাকে মরতে দিন।'

'কিসের সঙ্গে কী বলছ? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার।'

'মাথা ঠিকই আছে। ঠিক আছে বলেই বলছি, আমরা খান্দানীফান্দানী না।'

ছোটফুফা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তর্ক করা তোমার একটা বদ অভ্যাস। এটা ছাড়া উচিত।'

বাবুভাই ঘাড় মোটা করে বললেন, 'আমাদের খান্দানী কি জন্যে]লছেন সেটা আগে বলুন।'

'তোমরা খান্দানী না?'

'না।'

'বেশ তো ভালো কথা। তোমার ইচ্ছাটা কি? কাউকে কোনো খবর দেওয়া হবে না?'

'খবর দেওয়ার কোনো দরকার নেই।'

'তুমি ঠিক সোবার অবস্থায় নেই। তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে চাই না।'

'কথা বলতে না—চাইলে বলবেন না।'

ছোটফুফা মুখ কালো করে উঠে গেলেন। আমি খানিকক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়ালাম। মাথা ব্যথা করছে। আমার টেবিলের ড্রয়ারে 'এনাসিন' আছে। কিন্তু বাবুভাই ঘর বন্ধ করে বসে আছেন। দরজায় ধাক্কা ;তেই তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, 'কে?'

'আমি।'

'যা এখন।'

'ঘুমাচ্ছ নাকি?'

'না, ঘুমাচ্ছি—টুমাচ্ছি না। তুই যা, বিরক্ত করিস না।'

'দরজাটা একটু খোল।'

বাবুভাই জবাব দিলেন না।

রান্নাঘরে আকবরের মাকে দেখা গেল কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে। এদিকে গ্যাসের চুলায় একটা মাঝারি আকারের ডেকচিতে পানি ফুটছে। নির্ঘাত আকবরের মা'র কাণ্ড। পানি ফোটাতে দিয়ে ঘুমুতে শুরু করেছে। কাউকে ঘুমুতে দেখলেই ঘুম

পায়। আমি হাই তুললাম। তারপর এক সময় আবার নেমে এলাম নিচে। নিচের বারান্দা জনশূন্য। মৌলানা সাহেব পর্যন্ত নেই। মনে হচ্ছে বসার ঘরে তাঁর ঘুমাবার ব্যবস্থা হয়েছে। মৃত্যুর অপেক্ষা করতে গিয়ে সবাই বোধ করি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

দাদার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি--সিরিয়াস ব্যাপার। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। স্যালাইনের ব্যাগ ঝুলছে হ্যাঙ্গার জাতীয় জিনিসে। মোটামুটি একটা হাসপাতাল। হাসপাতাল-হাসপাতাল গন্ধ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। রুগীর মনে হয় অক্সিজেন দেওয়ায় কিছুটা আরাম হয়েছে। ছটফটানি নেই। নিঃসাড়ে ঘুমাচ্ছেন। এদিকে বড়োচাচীর ঘুম ভেঙেছে। তিনি একটি মোটামতো নার্সের সঙ্গে আলাপ করছেন। বড়োচাচীর মুখ গম্ভীর। নার্সটির মুখ হাসি-হাসি। নার্স কখন এসেছে কে জানে। ছোটফুফুর কাণ্ড নিশ্চয়ই।

এক বার দাদার শরীর খারাপ হল। ব্লাডপ্রেশার বা এই জাতীয় কিছু--মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। খবর পাওয়ামাত্র ছোটফুফা এক জন নার্স নিয়ে উপস্থিত। দিন-রাত এখানে থাকবে। নার্সটির নাম ছিল--সুশী। খ্রিশ্চিয়ান। বয়স কম। খুব মিষ্টি চেহারা নার্সটির। এমন সব সুন্দরী নার্স থাকে, আমার জানা ছিল না। সুশী সেই জাতীয় নার্স, যাদের সঙ্গে হাসপাতালের ইন্টার্নী ডাক্তারদের প্রেম হয়। রুগীরা যাদের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল থাকে।

সুশী অল্প সময়ের মধ্যে দাদাকে সারিয়ে তুলল। দু' দিনের মধ্যে দেখা গেল দাদা বারান্দায় ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। সুশী তার পাশে অন্য একটি চেয়ারে বসে গম্ভীর মুখে ফুশ্‌ফুশ্‌ করে সিগারেট টানছে। মাঝে মাঝে দাদা কীসব বলছেন, সুশী সে-সব শুনে খুব হাসছে। আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। দাদা কি ওর সঙ্গে রসিকতা করছেন? সেবার সুশীকে উপহার হিসেবে একটি রাজশাহী সিল্কের শাড়ি এবং কাশ্মীরী শাল দিলেন। উপহার পেয়ে তার কোনো ভাবান্তর হল না। যেন এ রকম উপহার সে সব সময়ই পেয়ে আসছে। রেগে গেলেন বড়োফুফু। খুব হৈ-চৈ করতে লাগলেন। একটা নার্সকে দু' হাজার টাকার শাল? বাবার না হয় মাথা খারাপ, তাই বলে কি অন্য সবারও মাথা খারাপ, কেউ একটা কথা বলবে না? আমি ফুফুকে বললাম, 'আপনি যখন এসেছেন, আপনিই বলুন।'

'বলবই তো, এক শ' বার বলব। একটা রাস্তার মেয়েকে দু' হাজার টাকার শাল দেবে কেন?'

'রাস্তার মেয়ে হবে কেন? নার্স এক জন। ভালো নার্স। দাদাকে সারিয়ে তুলেছে।'

'বাজে বকবক করিস না তো। এক্ষুণি যাচ্ছি আমি বাবার কাছে।'

ফুফু ফুটে গেলেন দাদার ঘরে, ফিরে এলেন মুখ অন্ধকার করে। কী কথাবার্তা হল জানা গেল না।

অবশ্যি আজকের এই নার্সটির চেহারা বাজে। মুখে বসন্তের দাগ। বিরাট স্বাস্থ্য।

মাংসের চাপে চোখ ছোট হয়ে গেছে। আমাকে উঁকি দিতে দেখেই নার্সটি চট করে রুগীর কাছে গেল। অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে স্যালাইনের বোতলটি নেড়েচেড়ে দিল। এ সুশীর মতো নয়। সুশী এখানে থাকলে দাদার শরীর হয়তো অনেকখানি সেরে যেত! আমার ধারণা চোখ মেলে এই নার্সটিকে দেখামাত্র আবার দাদার হাঁপানির টান উঠবে।

বড়োচাচী চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন আমার কাছে, গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'নার্সকে আনাল কে?'

'জানি না।'

বড়োচাচী আমার সঙ্গে বের হয়ে এলেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। আমি বললাম, 'শুধু আপনারা দু' জন? আর মানুষজন কোথায়?'

'জানি না কোথায়।'

আমি লক্ষ করলাম বড়োচাচী কথা বলছেন খুব নিচু গলায়। কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকলে তাঁর এ-রকম হয়। কথাই শুনতে পাওয়া যায় না।

'শুনেছিস নাকি, তোর বড়োচাচা বাবুকে ত্যাজ্যপুত্র করেছে?'

'কি যে বলেন!'

'হ্যাঁ করেছে। আমাকে বলল।'

'এই সব কিছু না চাচী। মুসলিম আইনে ত্যাজ্যপুত্র হয় না।'

'তোকে কে বলল?'

'আমি জানি। হিন্দু আইনে হয়, মুসলিম আইনে হয় না। আর খামাকা ত্যাজ্যপুত্র করবে কেন?'

'মদ খেয়ে মাতলামি করছিল, এই জন্যে করেছে।'

'না চাচী, এই সব কিছু না।'

বড়োচাচীর মুখ সঙ্গে সঙ্গে আলো হয়ে উঠল। ইনি যে-কোনো কথা বিশ্বাস করেন। তাঁকে কেউ যদি এসে বলে--'দেখে এলাম বুড়িগঙ্গায় একটা মৎস কন্যা ধরা পড়েছে।' তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, 'সত্যি? কথা বলতে পারে? চুল কত বড়ো?' মানুষের বুদ্ধি যে ঠিক কতটা কম হতে পারে তা চাচীকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

'বুঝলি টগর, আমি তো শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। ভদ্রলোকের ছেলে, মদ খাবে কি?'

আমি বললাম, 'কেউ যদি খায়ও সেটা কোনো সিরিয়াস ব্যাপার না। ওষুধের সঙ্গে তো সবাই খাচ্ছে।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ। হোমিওপ্যাথি অষুধর সবটাই তো মদ।'

'তুই জানলি কোথেকে?'

'এটা নতুন কথা নাকি? সবাই জানে।'

'আগে আমাকে বলিস নি কেন?'

'আগে বললে আপনি কি করতেন?'

'তাও ঠিক, কি করতাম।'

বড়োচাচী নিশ্চিত ভঙ্গিতে হাসলেন--তাঁর বুক থেকে পাষাণ-ভার নেমে গেছে। আমাকে বললেন, 'তোর চাচা এমনভাবে বলল কথাটা যে আমি বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম।'

'সব কথা এরকম চট করে বিশ্বাস করবেন না চাচী।'

'না, এখন থেকে আর করব না।'

এই সময় বড়োফুফুকে উত্তেজিত ভঙ্গিতে নিচে নামতে দেখা গেল। আমাদের দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। যেন আমাদেরকেই খুঁজছিলেন। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'নীলু নামের ঐ মেয়েটির ঘরে নাকি আজ রান্না হয় নি?'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এরকম চেঁচানর কি মানে? বড়োচাচী কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকালেন।

'কার ঘরে রান্না হয় নি?'

'ঐ যে তোমাদের ভাড়াটে। নীলু নাম যে মেয়েটির।'

আমি বললাম, 'যা বলার আস্তে বলুন ফুফু।'

'আস্তে বলব কেন?'

'ওরা শুনবে।'

'শুনলে শুনবে। তোর আক্কেল দেখে আমি অবাক হয়েছি। এই রকম একটা ভিখিরি শ্রেণীর মেয়ে, আর তুই ওর সঙ্গে দিব্যি বিয়ের কথাবার্তা চালালি?'

বড়োচাচী স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'কার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে? কই, আমি তো কিছু জানি না।'

'তুমি চুপ কর ভাবী। তোমার কিছু জানতে হবে না। টগর, তোদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। তোদের উপর নির্ভর করে আমি অনেক বার বেইজ্জত হয়েছি। মেয়েটাকে আমি বাসায় পর্যন্ত যেতে বলেছি।'

'বলে দিলেই হয়, যেন না যায়।'

'হ্যাঁ বলব। একদম রাস্তার ভিখিরি, ঘরে হাঁড়ি চড়ে না।'

'আস্তে বলুন ফুফু। চিৎকার করছেন কেন?'

'চিৎকার করব না? তোদের কোনো মান-অপমান নেই বলে কি আমারো নেই? যত ছোটলোকের আড্ডা হয়েছে! সমস্ত ছোটলোকদের ঝেঁটিয়ে আমি বিদায় করব। পেয়েছে কি?'

দারুণ একটা হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। বড়োচাচা এলেন। বাবা নেমে এলেন তিনতলা থেকে। নীলু এসে দাঁড়াল সিঁড়ির মাথায়। রমিজ সাহেব এলেন আমাদের বসার ঘর থেকে। সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে বললেন, 'কী হয়েছে?'

'কিছু হয় নি।'

নীলু কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'উনি এসব কথা বলছেন কেন?'

আমি বললাম, 'তুমি দাদার ঘরের দিকে একটু যাও তো নীলু। দেখে এস কিছু লাগবে কিনা।' নীলু নড়ল না। আমি লক্ষ করলাম সে থরথর করে কাঁপছে। তার মুখ রক্তশূন্য। বড়োফুফু সমানে চেঁচাচ্ছেন, 'যত রাস্তার ছোটলোক দিয়ে বাড়ি ভর্তি করা হচ্ছে। এদের ঘাড় ধরে ধরে আমি বিদেয় করব। আমার ছেলের সঙ্গে একটা ভিখিরির মেয়ের বিয়ের কথা বলছে। এত বড়ো সাহস!'

নীলু বলল, 'আপনি চুপ করুন।'

বড়োফুফু চুপ করে গেলেন। সিঁড়ির মাথা থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নীলু বলল, 'বাবা তুমি যাও এখান থেকে।' রমিজ সাহেব কিছুই বুঝতে পারলেন না। ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন। এই অবস্থা স্থায়ী হল না। বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, 'কিসের জটলা হচ্ছে?' এতেই ভিড় পাতলা হল। বড়োফুফু এবং চাচী দাদার ঘরের দিকে এগোলেন, আমি উঠে এলাম সিঁড়ি বেয়ে। নীলুর দিকে তাকিয়ে হাসির ভঙ্গি করলাম। নীলুকে তা স্পর্শ করল না। হালকা স্বরে বললাম, 'শাহানা কোথায়, নীলু?' নীলু তার জবাব না দিয়ে তরতর করে নিচে নেমে গেল।

শাহানাকে পাওয়া গেল তেতলার বারান্দায়। সেখানে একটা ইজিচেয়ারে সে আধশোওয়া হয়ে বসেছিল। আমাকে দেখেই সোজা হয়ে বসল। তার বসার ভঙ্গিটা ছিল অদ্ভুত একটা ক্লান্তির ভঙ্গি। বাবুভাই কি তাকে কিছু বলেছে? বিশেষ কোনো কথা--যার জন্যে একটি মেয়ের হৃদয় তৃষিত হয়ে থাকে?

আমি খুব নরম স্বরে বললাম, 'বাবুভাই কি তোমাকে কিছু বলেছে?'

শাহানা জবাব না দিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। বারান্দার আলো কম বলেই এতক্ষণ চোখে পড়ে নি, এখন দেখলাম শাহানার গাল ভেজা। সে তার ভেজা গাল গোপন করার জন্যেই অন্য দিকে তাকিয়ে আছে? কারো গোপন কষ্টে উপস্থিত থাকতে নেই। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। শাহানা বলল, 'নিচে হৈ-চৈ হচ্ছিল কিসের?

'বড়োফুফু একটা ঝামেলা বাধিয়েছেন। নীলুকে আজেবাজে সব কথা বললেন।'

শাহানা কোনো রকম আগ্রহ দেখাল না। আমি বললাম, 'তুমি একটু নীলুকে খুঁজে বের করবে? কথা বলবে ওর সঙ্গে?'

শাহানা উত্তর দিল না।

এই সময় নিচ থেকে সাড়াশব্দ হতে লাগল। দাদা কি মারা গিয়েছেন? আমরা ছুটে নিচে এলাম। দাদার কিছু হয় নি। তিনি তখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। হৈ-চৈ হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিচিত্র কারণে। রমিজ সাহেব অন্ধকার বাগানে একা একা ছোটাছুটি করছেন যেন অদৃশ্য কিছু তাঁকে তাড়া করছে। সবাই এসে ভিড় করেছে বারান্দায়। আমাদের ড্রাইভার টর্চলাইটের আলো তাঁর গায়ে ফেলতে চেষ্টা করছে।

বড়োফুফু চাপা স্বরে বললেন, 'পাগল–ছাগল আর কি। দিব্যি ভালোমানুষের মতো বসেছিল। হঠাৎ ছুটে চলে গেল।'

কদমগাছের কাছ থেকে তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ ভেসে এল। এ হাসি পৃথিবীর হাসি নয়। এ হাসি অচেনা কোনো ভুবনের। যারা বারান্দায় জটলা পাকাচ্ছিল, সবাই একসঙ্গে চুপ করে গেল। বাবুভাই বাগানে নেমে গেল। এগিয়ে গেল কদমগাছের দিকে। নীলুকে দেখা গেল না। শুধু দেখলাম বিলু তাদের দরজার পাশে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর একসময় ছোট মেয়েটি বাগানে নেমে গেল। চারিদিক চুপচাপ, শুধু বাগানের শুকনো পাতায় তার হেঁটে যাবার মচমচ শব্দ হতে লাগল।

বাবুভাই রমিজ সাহেবের হাত ধরে তাঁকে এনে বারান্দায় বসাল। রমিজ সাহেবের চোখের দৃষ্টি অস্বচ্ছ। সমস্ত মুখমণ্ডল ঘামে ভেজা। বাবুভাই বলল, 'রমিজ সাহেব, এখন কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

'আমাকে চিনতে পারছেন?'

'জ্বি।'

'কী নাম আমার, বলুন দেখি?'

রমিজ সাহেব নিঃশব্দে হাসলেন। বিলু তার বাবার শার্ট শক্ত করে ধরে রেখেছে। ভয়ানক অবাক হয়েছে সে।

'বাবার কী হয়েছে?'

'কিছু হয় নি।'

'এ রকম করছে কেন?'

'ঠিক হয়ে যাবে। মাথায় পানি ঢাললেই ঠিক হয়ে যাবে।'

বাবুভাই রমিজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন কি একটু ভালো লাগছে?'

'জ্বি হ্যাঁ। লাগছে।'

'আমি কে বলুন?'

রমিজ সাহেব আবার হাসলেন। নীলু এগিয়ে আসছে। রমিজ সাহেব তাকালেন নীলুর দিকে। তাঁকে দেখে মনে হল না, তিনি নীলুকে চিনতে পারছেন। নীলু ভয়–পাওয়া গলায় বলল, 'বাবার কী হয়েছে?'

দাদা মারা গেলেন ভোর পাঁচটা দশ মিনিটে। নব্বই বৎসর আগে দরিদ্র কৃষক পরিবাবে তাঁর জন্ম হয়েছিল। নব্বই বছর তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের অসম্ভব বিত্তশালী করে দিয়ে নিঃশব্দে মারা গেলেন।

সকাল হচ্ছে। পুবের আকাশ অল্প অল্প ফর্সা হতে শুরু করেছে। অনেক দিন সূর্যোদয় দেখা হয় নি। আমি ছাদের আলিশায় হেলান দিয়ে সূর্যের জন্যে অপেক্ষা

করতে লাগলাম। ছাদ থেকে দেখতে পাচ্ছি লোকজন ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। শুধু বাবুভাই রমিজ সাহেবের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বসে আছে। আরো অনেক দূরে টিউবওয়েলের পাশে, পাথরের মূর্তির মতো নীলু বসে আছে একা একা। আমার খুব ইচ্ছা হল চেঁচিয়ে বলি, 'নীলু, ভয়ের কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু কিছুই তো ঠিক হয় না। সকালের পবিত্র আলোয় কাউকে মিথ্যা আশ্বাস দিতে নেই।

তবু আমাদের সবার মিথ্যা আশ্বাস দিতে ইচ্ছে করে। ঠিক এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছা করছে নীলুর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। ভোরের আলো এসে পড়ছে নীলুর চোখে-মুখে। কী সুন্দর লাগছে নীলুকে।

সৌরভ

১

আমাদের বাড়িতে ইদানীং ভূতের উপদ্রব হয়েছে।

নিচতলার ভাড়াটে নেজাম সাহেবের মতে একটি অল্পবয়েসী মেয়ের ছায়া নাকি ঘুরে বেড়ায়। গভীর রাতে উঁ উঁ করে কাঁদে। রাতবিরাতে সাদা কাপড় পরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

নেজাম সাহেব লোকটি মহা চালবাজ। ছোট ছোট ধূর্ত চোখ। মাথা নিচু করে এমনভাবে হাঁটেন যে দেখলেই মনে হয় কিছু একটা মতলব আছে। এই লোকের কথা বিশ্বাস করার কোনোই কারণ নেই, তবু আমি তাঁকে ডেকে পাঠালাম। গলার স্বর যতদুর সম্ভব গম্ভীর করে বললাম, 'কী সব আজেবাজে কথা ছড়াচ্ছেন?'

নেজাম সাহেব এমন ভাব করলেন, যেন আমি একটি দারুণ অন্যায় কথা বলে ফেলেছি। মুখ কালো করে বললেন, 'আজেবাজে কথা ছড়াচ্ছি? আমি? বলেন কি ভাই সাহেব?'

'ভূত-প্রেতের কথা বলে বেড়াচ্ছেন লোকজনদের, বলছেন না?'

'ভূত-প্রেতের কথা তো বলি নাই। বলেছি একটি মেয়ের ছায়া আছে এই বাড়িতে।'

'ছায়া আছে মানে?'

'বাড়ির মধ্যে আপনার, ভাই, দোষ আছে।'

বলতে বলতে নেজাম সাহেব এমন একটি ভঙ্গি করলেন, যেন চোখের সামনে ছায়াময়ী মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছেন।

'বাড়ি-বন্ধনের ব্যবস্থা করা দরকার। বুঝলেন ভাই!

আমি কঠিন স্বরে বললাম, 'যা বলেছেন, বলেছেন। আর বলবেন না।'

নেজাম সাহেবকে বিদায় করে ঘরে এসে বসতেই আমার নিজের খানিকটা ভয়-ভয় করতে লাগল। রান্নাঘরে কিসের যেন খটখট শব্দ হচ্ছে। বাথরুমের কলটি কি খোলা ছিল? সরসর করে পানি পড়ছে। রান্নাঘরে কেউ যেন হাঁটছে। কাদের কি ফিরে এসেছে নাকি? আমি উঁচু গলায় ডাকলাম, 'এই কাদের। এই কাদের মিয়া।'

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সাড়া পাওয়ার কথাও নয়। কাদের গিয়েছে সিগারেট আনতে। রাস্তার ওপাশেই পান-বিড়ির দোকান, তবু তার ঘন্টাখানিক লাগবে ফিরতে।

রান্নাঘরে আবার কী যেন একটি শব্দ হল। তার পরপরই কারেন্ট চলে গিয়ে চারদিক হঠাৎ করে অন্ধকার হয়ে গেল। আমি বারান্দায় এসে দেখি ফকফকা জোৎস্না উঠেছে। নিচতলার নীলু বিলু দু'বোন ঘরের বাইরে মোড়া পেতে বসে আছে। নেজাম সাহেব উঠোনে দাঁড়িয়ে গুজগুজ করে কী যেন বলছেন তাদের। আমাকে দেখে কথাবার্তা থেমে গেল। নেজাম সাহেব তরল গলায় বললেন, 'কেমন চাঁদনি দেখছেন ভাই? এর নাম সর্বনাশা চাঁদনি।'

আমি জবাব দিলাম না। এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। নেজাম সাহেব গুনগুন করে বিলুকে কী যেন বললেন। বিলু হেসে উঠল খিলখিল করে। এ রকম জ্যোৎস্নায় ভরা-বয়সের মেয়েদের খিলখিল হাসি শুনলে গা ঝিমঝিম করে। আমি নিজের ঘরে ফিরে কাদেরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রান্নাঘর থেকে আবার খটখট শব্দ উঠল। বিলু নীলু দু' জনেই আবার শব্দ করে হেসে উঠল। আমি ধরা গলায় ডাকলাম, 'কাদের, কাদের মিয়া।'

কাদের ফিরল রাত দশটায়, এবং এমন ভাব করতে লাগল যেন এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে দু' ঘন্টা লাগাটা তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। সে গম্ভীর হয়ে হারিকেন ধরাল। তার চেয়েও গম্ভীর হয়ে বলল, 'অবস্থাডা খুব খারাপ ছোড ভাই।'

আমি চুপ করে রইলাম। কথাবার্তা শুরু করলেই আমার রাগ পড়ে যাবে। সেটা হতে দেওয়া যায় না।

'ছোড ভাই, দিন খারাপ।'

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'ভাত দে, কাদের।'

'আর ভাত! ভাত খাওনের দিন শেষ ছোড ভাই। মিত্যু সন্নিকট।' যে-কোনো গুরুগম্ভীর আলোচনায় কাদের মিয়া সাধু ভাষা ব্যবহার করে। এই অভ্যাস আগে ছিল না। নতুন হয়েছে।

'সব্বমোট তের লাখ ছয়চল্লিশ হাজার পাঁচ শ' পাঞ্জাবী এখন ঢাকা শহরে বর্তমান। আরো আসতাছে।'

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। মনে মনে ঠিক করে রাখলাম, খাওয়াদাওয়ার পর কাদেরকে খুব ঠাণ্ডা গলায় বলব, ভবিষ্যতে সে যদি ফিরতে পাঁচ মিনিটের জায়গায় দু' ঘন্টা দেরি করে, তাহলে তার আর ঘরে ফেরার প্রয়োজন নেই।

বিসমিল্লাহ্ বিদায়।

ভাত খাওয়ার সময় কাদের মিয়া আবার তার পাঞ্জাবী মিলিটারির গল্প ফাঁদতে চেষ্টা করল।

'বাচ্চু ভাই দরবেশ কইছে এই দফায় বাঙ্গালির কাম শেষ।'

আমি জবাব দিলাম না। কাদেরের অভ্যাস হচ্ছে, যে-সব বিষয় আমি পছন্দ করি না, খাওয়ার সময় সেইসব বিষয়ের অবতারণা করা। গতরাত্রে খাওয়ার সময় সে তার মামাত ভাইয়ের গল্প শুরু করল। সেই মামাত ভাইটিকে কে যেন খুন করে একটা গাবগাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল। পনের দিন পর সেই লাশ আবিষ্কার হল। আমি যখন ভাতের সঙ্গে ডাল মাখছি, তখন কাদের মিয়া সেই পচাগলা লাশের একটি বীভৎস প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা দিয়ে ফেলল। খাওয়া বন্ধ করে বাথরুমে গিয়ে বমি করতে হল আমাকে। আজকেও যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হয়, সে-জন্যে আমি কথা বলার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বললাম, 'বাচ্চু ভাই দরবেশটা কে?'

'চায়ের দোকান আছে একটা। সুফি মানুষ। তাঁর এক চাচা হইলেন হয়রত ফজলুল করিম নকশবন্দি।'

'নকশবন্দি জিনিসটা কি?'

'পীর ফকিরের নামের মইধ্যে থাকে ছোড ভাই।'

'নকশবন্দির ভাতিজার কাছে ভবিষ্যতে আর যেন না যাওয়া হয়।' কাদের মিয়া উত্তর দিল না। আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'এই সব লোকজন আমি মোটেই পছন্দ করি না'

'দরবেশ বাচ্চু ভাই এক জন বিশিষ্ট পীর।'

'পীর মানুষ চায়ের দোকান দিয়ে বসে আছে, এটা কেমন কথা?'

'আমাদের নবী-এ করিম রসুলাল্লাহ্ নিজেও তো ব্যবসাপাতি করতেন ছোড ভাই।'

আমি সরু চোখে তাকালাম কাদেরের দিকে। মুখে মুখে কথা বলার এই অভ্যাসও কাদেরের নতুন হয়েছে। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে কাদের।'

কাদের সঙ্গে আমি তুই-তুই করে বলি। কোনো কারণে বিশেষ রেগে গেলেই শুধু তুমি সম্বোধন করি। কাদের তখন দারুণ নার্ভাস বোধ করে।

'কী কথা ছোড ভাই?'

কী কথা বলবার আগেই নিচতলার তিন নম্বর ঘর থেকে কান্নার শব্দ শোনা যেতে লাগল। আজ এক মাস ধরে এই বাড়ির মেয়েটি কাঁদছে। এপ্রিল মাসের তিন তারিখ জলিল সাহেব বাড়ি ফেরেন নি। তাঁর স্ত্রী হয়তো রোজ আশা করে থাকে আজ ফিরবে। রাত এগারটা থেকে কার্ফিউ। এগারটা বেজে গেলে আর ফেরবার আশা থাকে না। মেয়েটি তখন কাঁদতে শুরু করে। মানুষের শোকের প্রকাশ এত

শব্দময় কেন? যে-মেয়েটির কোনো কথা কোনো দিন শুনি নি, গভীর রাতে তার কান্না শুনতে এমন অদ্ভুত লাগে।

'ছোড ভাই, জলিল সাবের এক ভাই আসছে আইজ।'

'তবে যে শুনলাম জলিল সাহেবের কোনো ভাই নেই।'

'চাচাত ভাই। মৌলানা মানুষ। বউ আর পুলাপানটিরে নিতে আইছে।'

'কবে নেবে?'

'বউটা যাইতে চায় না।'

কেন যেতে চায় না?'

'কি জানি। মাইয়া মাইনসের কি বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু আছে?

আমি চুপ করে রইলাম। কাদের মিয়া বলল, 'সময়ডা খুব খারাপ। কেয়ামত নজদিক।'

ঘুমুতে গেলাম অনেক রাতে। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূরে কোথায়ও গুলীর শব্দ শোনা গেল। গুলীর শব্দ দিয়ে এখন আর ভয় দেখানর প্রয়োজন নেই। তবু ওরা কেন রোজ গুলী ছোঁড়ে কে জানে।

কাদের আমার পাশের ঘরে শোয়। তার খুব সজাগ নিদ্রা। সামান্য খটখট শব্দেও জেগে উঠে বিকট হাঁক দেয়--'কেডা, কেডা শব্দ করে?'

আজকেও গুলীর শব্দে জেগে উঠল। ভীত স্বরে বলল, 'শুনতাছেন ছোড ভাই? কাম সাফ।'

আমি জবাব দিলাম না। আমার সাড়া পেলেই ব্যাটা উঠে এসে এমন সব গল্প ফাঁদবে যে ঘুমের দফা সারা।

'ছোড ভাই ঘুমাইছেন?'

আমি গাঢ় ঘুমের ভান করলাম। লম্বা নিঃশ্বাস ফেললাম।

'ছোড ভাই, ও ছোড ভাই।'

'কি?'

'মিত্যু সন্নিকট ছোড ভাই।'

'ঘুমা কাদের। বকবক করিস না।'

'আর ঘুম! বাঁচলে তো ঘুম। জীবনই নাই।'

'ঝামেলা করিস না কাদের, ঘুমা।'

কাদের ঘুমায় না। বিড়ি ধরায়। বিড়ির কড়া গন্ধে বমি আসার যোগাড় হয়। চারদিক নীরব হয়ে যায়। জলিল সাহেবের স্ত্রীর কান্নাও আর শোনা যায় না। কিছুতেই ঘুম আসে না আমার। বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করি। এক বার বাথরুমে গিয়ে মাথা ধুয়ে এলাম। মাথার নিচে তিনটি বালিশ দিয়ে উঁচু করলাম। আবার বালিশ ছাড়া ঘুমুতে চেষ্টা করলাম। কিছুতেই কিছু হয় না। এক সময় কাদের মিয়া বলল, 'ঘুম আসে না ছোড ভাই?'

'না।'

'আমারো না। বড়ো ভয় লাগে।'

'ভয়ের কিছু নাই কাদের।'

'তা ঠিক। মৃত্যু হইল গিয়া কপালের লিখন। না যায় খণ্ডন।'

কাদেরের সঙ্গে আমার কিছু কিছু মিল আছে। সে আমার মতোই ভীরু এবং আমার মতো তারও কঠিন অনিদ্রা রোগ।

সাড়ে তিনটার দিকে ঘুমের আশা বাদ দিয়ে বারান্দায় এসে বসলাম। কাদের মিয়া চায়ের জন্য কেরোসিনের চুলা ধরাল। চুলাটাও সে নিয়ে এসেছে বারান্দায়। আমার দিকে পিঠ দিয়ে আবার বিড়ি ধরিয়েছে।

নিচতলায়ও কে এক জন যেন সিগারেট ধরিয়েছে, বসে আছে জামগাছের নিচে--অন্ধকারে।

'গাছ তলায় ওটা কে বসে আছে, কাদের?'

কাদের কিছু না দেখেই বলল, 'নেজাম সাহেব।'

'বুঝলে কী করে নেজাম সাহেব?'

'নেজাম সাহেবেরও রাইতে ঘুম হয় না।'

বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি ধরে গেল। ঝিমুনির মধ্যে মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, ভোরবেলা এক জন ডাক্তারের কাছে যাব। রাতের পর রাত না ঘুমানটা ভালো কথা নয়। বড়ো আপার বাসায়ও যেতে হবে। বড়ো আপা এর মধ্যে তিন বার খবর পাঠিয়েছে। জলিল সাহেবের ভাইয়ের সঙ্গেও কথা বলা দরকার। তারাও যদি সত্যি সত্যি চলে যায়, তাহলে ভাড়াটে দেখা দরকার। ভাড়াটে পাওয়া যাবে না, বলাই বাহুল্য। শহর ছেড়ে সবাই এখন যাচ্ছে গ্রামে। কিন্তু বড়ো আপা এই সব শুনবে না। তাঁর ধারণা--ঢাকা শহরের চার ভাগের এক ভাগ লোক থাকার জায়গা পাচ্ছে না। রাত দিন 'টু লেট' খুঁজে বেড়াচ্ছে।

চা হয়েছে চমৎকার। চুমুক দিয়ে বেশ লাগল। চারদিকে সুনসান নীরবতা। চাঁদের ম্লান আলো। শীত শীত হিমেল হাওয়া দিচ্ছে। হয়তো বৃষ্টি হচ্ছে দূরে কোথায়। মনটা হঠাৎ দারুণ খারাপ হয়ে গেল।

২

সকালবেলা নিচে নামতেই আজিজ সাহেবের সঙ্গে দেখা।

আজিজ সাহেব বিলু নীলুর বাবা। দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী। চেখেও দেখতে পান না। পায়ের শব্দে মানুষ চিনতে পারেন। আমি পা ঘষটে ঘষটে বাড়ি ঢুকলেও তিনি চিকন সুরে ডাকবেন--'কে যায়? শফিক না?'

আজিজ সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়া একট দুর্ঘটনা বিশেষ। দেখা হওয়ামাত্র তিনি বাড়ির কোনো একটি সমস্যার কথা তুলবেন--

'কল দিয়ে পানি লিক করছে।'

'বসার ঘরে সুইচটা নষ্ট, হাত দিলেই শক করে।'

'শোবার ঘরের একট জানালার পুডিং উঠে গেছে, যে-কোনো সময় কাঁচ খুলে পড়বে।'

যে-লোক চোখে দেখে না এবং সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকে, সে এত সব লক্ষ করে কী করে, সে এক রহস্য। বাড়ির প্রসঙ্গ শেষ হওয়ামাত্র তিনি রাজনীতি নিয়ে আসেন। তাঁর রাজনীতিরও কোনো আগামাথা নেই। একেক দিন একেক কথা বলেন। রাজনীতির পরে আসে স্বাস্থ্যবিধি। পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাধির কোনো-না-কোনো টোটকা তাঁর জানা আছে। জলাতঙ্ক রোগের একমাত্র অষুধ যে রসুনের খোসা, সেটি তাঁর কাছ থেকেই আমার শোনা।

সকালবেলা তাঁকে ধরাধরি করে বারান্দার ইজিচেয়ারে শুইয়ে দেওয়া হয়। দুপুর পর্যন্ত অনবরত ভ্যাজর ভ্যাজর করতে থাকেন। তিনি বারান্দায় থাকলে আমি পারতপক্ষে নিচে নামি না। আজকেও তিনি বারান্দায় ছিলেন না। পায়ের শব্দ শুনে শোবার ঘর থেকে ডাক দিয়েছেন 'কে, শফিক না? আস তো দেখি এদিকে। বাথরুমের ফ্লাশটা থেকে ঘসর ঘসর শব্দ হয়। পানির কোনো ফ্লো নাই।'

'আমি কাদেরকে বলব আজিজ সাহেব। সে মিস্ত্রী নিয়ে আসবে।'

'আস তো ভেতরে, কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'আমার একটা জরুরী কাজ আছে, আজিজ সাহেব।'

'এক মিনিট বসে যাও। ও নীলু, চা দে তো।'

'আজিজ সাহেব, আমার এখন না গেলেই না।'

'চা খেতে আর কয় মিনিট লাগে? নীলু, তাড়াতাড়ি চা দে।'

বাধ্য হয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। আজিজ সাহেব ঘরে ঢোকামাত্র গলার স্বর নামিয়ে বললেন, 'কালকে রাতে কিছু শুনলে?'

'গুলীর কথা বলছেন?'

'আহ্, আস্তে বল। চারদিকে স্পাই। ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছ?'

'কিসের কথা বলছেন?'

'আরে মিলিটারি তো সব কচুকাটা হয়ে গেল। আছ কোথায় তুমি?'

'তাই নাকি?'

'ভিক্ষা চাই না, মা, কুত্তা সামলা অবস্থা এখন। হা হা হা। মিলিটারিরা আর বড়ো জোর এক মাস আছে। বিশ্বেস না হয় লিখে রাখ। গুণে-গেঁথে ত্রিশ দিন।'

গণ্ডগোলের দিন থেকেই তিনি মিলিটারিকে হয় এক মাস নয় পনের দিন সময় দিচ্ছেন। তাঁর হিসাবে রোজ দু' থেকে তিন হাজার মিলিটারি খতম হয়ে

যাচ্ছে। চিটাগাং এবং কুমিল্লা---এই দুই জায়গা থেকে টাইট দেওয়া হচ্ছে।

'জিয়া সাহেব কি সহজ লোক? বাঘের মামা টাগ। পাঞ্জাবী সব কাঁচা খেয়ে ফেলবে না? তুমি ভাবছ কী?'

আজিজ সাহেব এমন মুখভঙ্গি করলেন, যেন পাঞ্জাবী মিলিটারিদের আমি লেলিয়ে দিয়েছি। আমি বিরস মুখে বললাম, 'আজিজ সাহেব, আজ উঠতে হয়। চা আজকে আর খাব না।'

'আহ্, বস দেখি। এই নীলু, চা হয়েছে?'

নীলু সাড়াশব্দও করল না, চা নিয়েও এল না। আজিজ সাহেব শুরু করলেন যুক্তফ্রন্টের রাজনীতি। ওদের ভুল থেকে আমাদের কী কী শেখা উচিত ছিল, এবং না শেখাতে আমাদের কী হয়েছে এই সব। আমার বিরক্তির সীমা রইল না। প্রায় আধ ঘন্টা পর নীলু এসে বলল, 'চা দেরি হবে। চিনি নেই। আনতে গেছে।' তাকিয়ে দেখি, নীলু মুখ টিপে হাসছে। চোখে চোখ পড়ামাত্র অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে বলল, 'সত্যি চিনি নেই। বিশ্বেস করুন।'

ছাড়া পেলাম এগারটায়। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে তখন। এই সময় মগবাজারে বড়ো আপার বাসায় যাবার কোনো অর্থ হয় না। প্রথমত, দুলাভাই বাসায় থাকবেন না। দ্বিতীয়ত, বৃষ্টিতে ভিজলে আমার টনসিল ফুলে ওঠে। সবচেয়ে ভালো হয় রফিকের বাসায় গিয়ে টেলিফোন করলে। কিন্তু তারও সমস্যা আছে। টেলিফোন রফিকদের শোবার ঘরে। টেলিফোন করতে গেলেই বাড়ির মেয়েরা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। শুনতে চেষ্টা করে, কী কথাবার্তা হচ্ছে। এবং টেলিফোনের শেষে রফিকের মা প্রচুর চিনি দিয়ে হিমশীতল এক কাপ চা খেতে দেন। সেই চায়ে দুধের সর এবং কালো রঙের পিঁপড়ে ভাসতে থাকে।

'শফিক সাহেব, আপনার সঙ্গে একটা কথা।'

লোকটিকে চিনতে পারলাম না। লম্বা দাড়ি। হালকা নীল রঙের একটা লম্বা পাঞ্জাবি--ঝুল নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত। গা থেকে আতরের গন্ধ আসছে।

'আমি আব্দুল জলিলের বড়ো ভাই।'

'ও আচ্ছা। কেমন আছেন?'

'আলহামদুলিল্লাহ্, ভালো আছি। জলিলের বৌ আর বাচ্চাটারে নিতে আসছি। আমি থাকি চাঁনপুরে। মাষ্টারী করি।'

'কিছু বলতে চান আমাকে?'

'জ্বি।'

'বলুন।'

'জনাব, আমি শুনলাম আপনি জলিলের খোঁজখবর করতেছেন।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। বলে কি এই লোক। আমি খোঁজ করব কি? আর খুঁজবই-বা কোথায়?

'আপনার অনেক জানাশোনা আছে। একটু যদি দয়া করেন।'

ভদ্রলোক চোখ মুছতে লাগলেন। এক জন বয়স্ক লোকের কান্নার মতো কুৎসিত আর কিছুই নেই। আমি ধমক দিয়ে কান্না থামাতে চাইলাম, 'কাঁদবেন না।'

'ঢাকা শহরে আমার চেনা-জানা কেউ নাই শফিক সাব।'

'দিন কাল খুব খারাপ এখন। চেনাজানাতে কাজ হয় না।'

'তা ঠিক ভাই। খুব ঠিক। কী করব বলেন, মনটা পেরেশান।'

'মন পেরেশান করে তো লাভ নেই। মন শক্ত করেন।'

'চেষ্টা করি, খুব চেষ্টা করি। বিনা দোষে জেলখানাতে আছে মনে হইলেই মন কান্দে।'

'জেলখানাতে আছে, বলল কে?'

'আপনার সাথে যে ছেলেটা থাকে, কাদের মিয়া--সে বলল। অতি ভালো ছেলে। বিশিষ্ট ভদ্রঘরের সন্তান। দুই-তিন বার খোঁজখবর নেয়। গতকাল এক দরবেশ সাহেবের তাবিজ এনে দিয়েছে। দরবেশ বাচ্চু ভাই। খুব বড়ো আলেম। নাম শুনেছেন বোধ হয়।

'আমি সাধ্যমত খোঁজখবর নেব। তবে সময়টা খারাপ, ইচ্ছা থাকলেও কিছু করা যায় না। ও কি, আবার কাঁদেন কেন?'

'আল্লাহ্ পাক আপনার ভালো করবেন, শফিক ভাই।'

আমার মন খারাপ হয়ে গেল। রাস্তায় নেমে দু'টি জিনিস ঠিক করে ফেললাম। রফিকের বাসায় গিয়েই টেলিফোন করব, আর রফিককে জিজ্ঞেস করব লোকজন হারিয়ে গেলে কোথায় খোঁজ করতে হয়। রফিক অনেক খবরাখবর রাখে। সে কিছু একটা করবেই।

রফিক বাসায় ছিল না। তার ছোট ভাই গম্ভীর হয়ে বলল, 'টেলিফোন করতে এসেছেন? আমাদের টেলিফোন নষ্ট।'

রফিকের এই ভাইটিকে আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। সব সময় চালিয়াতি ধরনের কথাবার্তা বলে।

'আপনি কি বসবেন? দাদা ঘন্টাখানিকের মধ্যে ফিরবে।'

'তাহলে বসব। ওর সঙ্গে দরকার আছে আমার।'

বসার ঘরের দরজা খুলে সে আমাকে নিয়ে বসাল। 'কালকে রাত্রে আপনি কি গুলীর শব্দ শুনেছেন?' আমি অম্লান বদনে মিথ্যা বললাম, 'না। কাল খুব ভালো ঘুম হয়েছে, কিছু টের পাই নি।'

'কালকে ভীষণ গুলী হয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। কী জন্যে হয়েছে জানেন?'

'না, আমি কী করে জানব?'

সে এমন ভাবে তাকাল, যেন আমি একটি গরুবিশেষ।

'আপনার কি কোনো কিছুই জানতে ইচ্ছা করে না?'

'না, তেমন করে না।'

'ও আচ্ছা।'

ঘন্টাখানিক বসে থেকেও রফিকের খোঁজ পাওয়া গেল না। সরভাসা চা খেলাম পরপর দু' কাপ। রফিকের মা–ও যথারীতি এক ফাঁকে এসে আহাজারি করে গেলেন।

'রফিকটার পড়াশোনা হয় নাই কুসঙ্গে থাকার জন্য। যত ছোটলোকের সাথে তার খাতির। তুমি আবার কিছু মনে করো না বাবা। তোমাকে কিছু বলছি না।'

'না খালা, মনে করার কী আছে।'

'আমি আবার মনের মধ্যে যা আসে বলে ফেলি।'

'এইটাই ভালো। বলে ফেলাই ভালো।'

ঘর থেকে বের হয়ে বড়ো রাস্তা পর্যন্ত এসে দেখি রফিক আসছে হনহন করে। তার দু' হাতে দু'টি প্রকাণ্ড বাজারের ব্যাগ। নিখোঁজ লোকদের কোথায় খুঁজতে হবে জিজ্ঞেস করা মাত্রই সে বলল, 'লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে থাক। আমি ব্যাগ দু'টি রেখে আসছি।'

আমরা গেলাম জনাব ইজাবুদ্দিন সাহেবের বাড়ি। ইজাবুদ্দিন সাহেব শান্তি কমিটির এক জন মেম্বার। হলুদ রঙের একটা দোতলা বাড়িতে থাকেন। বাড়ির নাম ভাই ভাই কুটির। নেমপ্লেটে লেখা এম. এ. (গোল্ড মেডালিস্ট) এল–এল. বি.। রফিক বলল, 'লোকটার সবচেয়ে বড়ো গুণ হল––বিরক্ত হয় না। সব সময় হাসিমুখ।'

কথা খুবই ঠিক। ইজাবুদ্দিন সাহেব মন দিয়ে আমার কথা শুনলেন। খাতা বের করে নাম–ধাম লিখে রাখলেন এবং বললেন, মিলিটারি জেলে আছে কিনা সে–খবর তিনি দু' দিনের মধ্যে এনে দেবেন। যখন বেরিয়ে আসছি, তখন ইজাবুদ্দিন সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'আপনার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন তিনি। তাঁর বড়ো মেয়ের বিয়েতে আমি উপস্থিত ছিলাম। খাওয়াদাওয়া নিয়ে দারুন ঝামেলা হয়েছিল।'

আমি বললাম, 'আমি এসে খোঁজ নিয়ে যাব।'

'না না, আপনার আসতে হবে না, আমি খবর দেব। বাড়ি আমি চিনি, কত বার গিয়েছি। শরিফ আদমী ছিলেন আপনার বাবা।'

রফিককে ছেড়ে দিয়ে নিউমার্কেট পর্যন্ত চলে এলাম। হাঁটা আমার পক্ষে বেশ কষ্টকর। কিন্তু কোনো একটি বিচিত্র কারণে রিকশায় উঠলেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। নিঃশ্বাস নিতে পারি না।

নিউ মার্কেটের সামনে একটি প্রকাণ্ড মিলিটারি ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। তিন–চার জন কালো পোশাক পরা মিলিটারি (নাকি মিলিশিয়া? কে যেন বলেছিল কালো পোশাকেরগুলি মিলিশিয়া--আরো ভয়ঙ্কর) জটলা পাকাচ্ছিল। সবার চেহারা দেখতে এক রকম। এক জন একটু দূরে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা চুরুট টানছে। এর চেহারা অদ্ভুত সুন্দর। পাতলা পাতলা ঠোঁট, টানা চোখ, রাজপুত্রের মতো চেহারা।

এরা দাঁড়িয়ে থাকার জন্যেই এই দিক দিয়ে লোক চলাচল একেবারেই নেই। এক জন বুড়ো মতো মানুষ শুধু একটি ওজনের যন্ত্র নিয়ে শুকনো মুখে বসেছিল। দু'টি মিলিটারি ওকে কী সব জিজ্ঞেস করে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। এক জন আবার দেখি, ওজনের যন্ত্রটায় উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি বিনা দ্বিধায় ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। মিলিটারি আমাকে কখনো কিছু জিজ্ঞেস করে না। আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চায় না। ছাত্র না চাকরি করি, তাও জানতে চায় না। কারণ আমার ডান পাটি বাঁকা। আমি ডান দিকে ঝুঁকে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাঁটি। লাঠি দিয়ে শরীরের ভার অনেকটা সামলাতে হয়। আমার দিকে ওদের কোনো আগ্রহ নেই।

শারীরিক অক্ষমতা যে এমন একটি সুখকর ব্যাপার হতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। আমাকে দেখে রাজপুত্রের মতো সেই মিলিটারিটি পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'ভালো আছেন?'

ওজন–মাপা লোকটি অবাক হয়ে তাকাচ্ছে আমার দিকে। আমি হাসিমুখে রাজপুত্রটিকে বললাম, 'আমি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন তো ভাই?'

৩

বড়ো আপা আমাকে দেখেই বলল, 'তোর কথাই ভাবছিলাম।'

কথাটা পুরোপুরি মিথ্যা। কারো সঙ্গে দেখা হলেই সে এ–রকম বলে। তার ধারণা, এ ধরনের কথাবার্তায় খুব আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। তার আন্তরিকতা প্রকাশের আরেকটি কায়দা হচ্ছে ভাত খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করা। বিকাল চারটার সময় গেলেও সে গলা সরু করে বলবে, 'আজরফ মিয়া, টেবিলে ভাত দাও তো। তরকারি গরম কর। লেবু কাট। আর দেখ কাঁচামরিচ আছে কিনা।'

আজকে অবশ্যি সে–রকম হল না। সে দেখলাম গম্ভীর হয়ে আছে। চোখ–মুখ ফোলা–ফোলা। বলাই বাহুল্য, দুলাভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। আমি সহজ ভাবে বললাম, 'ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার–ট্যাপার কিছু না।'

'ঝগড়া হয়েছে নাকি?'

'নাহ্।'

'তুমি গম্ভীর হয়ে আছ।'

'শীলার জ্বর। তোর দুলাভাইকে বললাম ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। সে নেবে না। তার ধারণা, একটু গা গরম হলেই ডাক্তারের কাছে দৌড় দেওয়ার কোনো দরকার নেই।'

'জ্বর কি খুব বেশি?'

'সকালবেলা ১০২ পয়েন্ট পাঁচ ছিল। এখন ৯৯।'

'ডাক্তারের কাছে যাওয়া নিয়েই কি ঝগড়া?'

'বললাম তো ঝগড়া কিছুই হয় নি। এক কথা বারবার জিজ্ঞেস করিস।'

বড়ো আপা কাঁদতে শুরু করল। কান্না তার একটি রোগবিশেষ। যে-কোনো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সে কেঁদে বুক ভাসাতে পারে। আমরা তার কান্নায় কখনো কোনো গুরুত্ব দিই না।

'আপা কাঁদছ কেন?'

'তোর দুলাভাই আমাদের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। শহরের অবস্থা নাকি খুব খারাপ।'

'তোমার কাছে খারাপ মনে হচ্ছে না?'

'মনে হবে না কেন? তবে তোর আমার জন্যে তো কিছু না। আমরা হিন্দুও না, আমরা আওয়ামী লীগও করি না। আমাদের আবার কিসের অসুবিধা?'

আমি চুপ করে রইলাম। বড়ো আপা থেমে থেমে বলতে লাগল, 'অবস্থা তো অনেক ভালো হয়েছে এখন। পরশু দিন আমি একা একা নিউমার্কেট থেকে বাজার করে আনলাম। আগে কার্ফু ছিল নয়টা থেকে, এখন দশটা থেকে। ঠিক না? তুই বল?'

'তা ঠিক।'

'তোর দুলাভাইয়ের ধারণা, গ্রামে গেলে আর কোনো ভয় নেই। এইখানে ভয়টা কিসের? পত্রিকায় দিয়েছে, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অনার্স পরীক্ষার ডেট দিয়েছে। অবস্থা খারাপ হলে দিত?'

'পরীক্ষার ডেট দিয়েছে নাকি?'

'হুঁ, দৈনিক পাকিস্তানে আছে। দাঁড়া, নিয়ে আসছি, নিজের চোখে দেখ'

'থাক আপা, আনতে হবে না।'

'না, তুই দেখে যা।'

সারাটা দিন বড়ো আপার বাসায় কাটাতে হল। দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা না করে আসা ভালো দেখায় না। তিনি ফিরবেন ছ'টার দিকে। এত দীর্ঘ সময় বড়ো আপার সঙ্গে কাটান একটি ক্লান্তিকর ব্যাপার। এক গল্পই তার কাছে অনেক বার শুনতে হয়। আজরফ কী করে কাপড়-ধোওয়া সাবান দিয়ে ধুয়ে তার একটি বেনারসী শাড়ি নষ্ট করেছে, সে-গল্প আমাকে চতুর্থ বারের মতো শুনতে হল।

তারপর শুরু করল দুলাভাইয়ের এক বোনের গল্প। সেই বোনটি বিয়ের পর তার স্বামীর এক বন্ধুর সঙ্গে কী সব নটঘট করতে শুরু করেছে। এই গল্পটিও আগে শোনা

আমি হাই তুলে বললাম, 'শীলা কোথায় আপা?'

'ওর বান্ধবী এসেছে।'

'যাই, দেখা দিয়ে আসি।'

'দরজা বন্ধ করে রেখেছে ওরা।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ।'

দরজা বন্ধ করার ব্যাপার নিয়েও বড়ো আপা গজগজ করতে লাগলেন।

'দরজা বন্ধ করে কথা বলার দরকারটা কী? এই সব আমি পছন্দ করি না। মেয়েরা দরজা বন্ধ করলেই তাদের মাথায় আজেবাজে সব খেয়াল আসে।'

শীলার বয়স এমন কিছু নয়। তের হয়েছে। বড়ো আপা বলেন সাড়ে এগার। অবশ্যি শীলাকে বেশ বড়োসড়ো দেখায়। এই তের বছর বয়সেই সে গোটা চারেক প্রেমপত্র পেয়েছে। এর মধ্যে একটি সে আমাকে দেখিয়েছে (আমার সঙ্গে তার বেশ ভাব আছে)। সেই চিঠিটি এতই কুৎসিত যে পড়া শেষ করে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। আমি যখন বললাম, 'এই চিঠি তুই জমা করে রেখেছিস? ছিঁড়ে ফেলে দিস না কেন?'

শীলা অবাক হয়ে বলেছে, 'আমার কাছে লেখা চিঠি আমি ফেলব কেন? জানো, লুনা একুশটা চিঠি পেয়েছে? এর মধ্যে একটা আছে ষোল পাতার।'

'কী আছে সেই ষোল পাতার চিঠিতে?'

'তোমাকে বলা যাবে না।'

লুনা মেয়েটিই আজকে এসেছে। বড়ো আপা একে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। প্রধান কারণ হচ্ছে, মেয়েটি অসামান্য রূপসী। আমার ধারণা, এই মেয়েটির দিকে তাকালে যে-কোনো পুরুষের মনে তীব্র ব্যথাবোধ হয়। বড়ো আপা মুখ লম্বা করে বললেন, 'লুনার সঙ্গে অল্পবয়েসী মেয়েদের মিশতে দেয়া উচিত না।'

আমি বলব না বলব না করেও বললাম, 'লুনাও তো অল্পবয়েসী।'

বড়ো আপা আকাশ থেকে পড়ল, 'অল্প বয়েস কোথায় দেখলি তুই! দুই বছর আগে থেকে ব্রা পরে এই মেয়ে।'

বিকালে চা দিতে এসে আজরফ গম্ভীর মুখে বলল, 'বড়ো রাস্তার মোড়ে একটা মিলিটারি জীপ।'

আপা এটা শুনেই রেগে গেল। 'মিলিটারি জীপ হয়েছে তো কী হয়েছে? মিলিটারি তোকে খেয়ে ফেলেছে? গরু কোথাকার! যা আমার সামনে থেকে।'

আজরফ সামনে থেকে নড়ল না। মুখ আগের চেয়েও গম্ভীর করে চা ঢালতে

লাগল। আপা থমথমে গলায় বলল, 'মিলিটারি জীপ দেখেছিস, দেখেছিস। এর মধ্যে গল্প করার কী আছে? খবরদার, এই সব নিয়ে গল্পগুজব করবি না। আমি পছন্দ করি না।'

'আম্মা জীপটার লক্ষণ বালা না। এক জায়গার মধ্যে ঘুরাঘুরি করতাছে।'

'করুক। তারা তাদের কাজ করবে, তুই করবি তোর।'

'আইচ্ছা।'

'খবরদার, মিলিটারি নিয়ে আর কোনো কথা বলবি না।'

'আইচ্ছা।'

আপার বক্তৃতা আজরফের মনে তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। কারণ খানিকক্ষণ পর শীলা এসে বলল, 'আজরফ ভাই বলল রাস্তার মোড়ে একটা জীপ ঘোরাঘুরি করছে।'

'করুক, তাতে তোমার কী?'

'ওরা অল্পবয়সী মেয়েদের ধরে নিয়ে নেংটা করে একটা ঘরের মধ্যে রেখে দেয়।'

বড়ো আপা স্তম্ভিত হয়ে বলল, 'কে বলেছে এই সব?'

'লুনা। লুনা বলল।'

'যাও, নিজের ঘরে যাও। যত আজগুবী কথাবার্তা। বলতে লজ্জাও করে না!'

'লজ্জা করবে কী জন্যে? আমাকে তো আর নেংটো করে রাখে নি।' শীলা ফিক করে হেসে ফেলল।

'যাও, ঘরে যাও। তোমার বন্ধু যাবে কখন?'

'ও আজ থাকবে আমার সঙ্গে। বাসায় টেলিফোন করে দিয়েছি। মা, তুমি কিন্তু খিচুড়ি করবে রাত্রে। আমর এখন জ্বর নেই।।

'ঠিক আছে, তুমি যাও। আজরফকে পাঠিয়ে দিও।'

আপা দীর্ঘ সময় কোনো কথা বলতে পারল না। আজরফ যখন দ্বিতীয় বার চা দিতে এল তখন শুধু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আজরফ, তোমার চাকরি শেষ। কাল সকাল ন'টায় বেতনটেতন বুঝে নিয়ে বাড়ি যাবে।'

'জ্বি আচ্ছা, আম্মা।'

আজরফকে মোটেই বিচলিত মনে হল না। দিনের মধ্যে কয়েক বার যার চাকরি চলে যায়, তাকে চাকরি নিয়ে বিচলিত হলে চলে না।

দুলাভাই ঠিক ছ'টার সময় এলেন।

'তাঁর সব কাজ ঘড়ি ধরা, সময় নিয়ে খানিকটা বাতিকের মতো আছে। পাঁচটায় কোথায়ও যাওয়ার কথা থাকলে চারটা পঞ্চাশে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং ঠিক পাঁচটায় ঢুকবেন। অফিসের লোকরা তাঁকে ঘড়িবাবু বলে।

দুলাভাই আমাকে দেখেই বললেন, 'তিন ঠ্যাং–এর শালা বাবু যে? কী হেতু আগমন?'

পা নিয়ে ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না। কিন্তু দুলাভাইয়ের উপর আমি কখনো রাগ করতে পারি না। এই লোকটিকে আমি খুবই পছন্দ করি।

'আছ কেমন শালা বাবু?'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'ভালো আছি দুলাভাই।'

'তোমার তিন নম্বর ঠ্যাংটা সাবধানে রাখছ তো? খানায় পড়ার সম্ভাবনা। হা–হা–হা।'

'সাবধানেই রাখছি।' আমাকেও হাসির ভান করতে হয়।

'শুনেছ নাকি, ওদের নীলগঞ্জে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'শুনেছি।'

'তোমার আপার ধারণা, সে বনবাসে যাচ্ছে। তবে যে–পরিমাণ কান্নাকাটি করছে, সীতাও তার বনবাসে এত কাঁদে নি।'

'সীতার সঙ্গে তো রাম ছিল। কিন্তু আপনি তো যাচ্ছেন না।'

'আমিও যাব। ব্যাক টু দা ফরেস্ট। তবে কিছুদিন পর। তুমিও চল।'

'না দুলাভাই। এখানে আমার কোনো অসুবিধা নেই।'

'তা ঠিক। ঢাকা শহরে কানা–খোঁড়া–অন্ধ এরা বর্তমানে খুব নিরাপদ। হা–হা–হা।'

আমি চুপ করে রইলাম।

'রাগ করলে নাকি শফিক?'

'জ্বি–না।'

'ঠাট্টা করে বলি।'

'ঠিক আছে।'

বড়ো আপা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবি আরেক বার?'

দুলাভাই বললেন, 'আমি খাব। আমাকে এক কাপ লেবু চা দাও।'

বড়ো আপা কথা না বলে চলে গেলেন। দুলাভাই ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'তোমার এক জন ভাড়াটে যে নিখোঁজ হয়েছিল, কী নাম যেন তার?'

'আব্দুল জলিল।'

'ও হ্যাঁ, জলিল। কোনো খোঁজ হয়েছে?'

'এখনো হয় নি। রফিককে নিয়ে চেষ্টা করছি।'

'তুমি খোঁজাখুঁজির মধ্যে যাবে না। কোনো ক্রমেই না। সময় ভালো না এখন। প্রায়ই লোকজন ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

'করছে কী ওদের?'

'কিছু দিন রেখে ছেড়ে দিচ্ছে সম্ভবত। মানুষ মারা তো খুব কঠিন ব্যাপার।'

'ধরাধরিটাই–বা করছে কি জন্যে?

'মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেবার জন্যে। ভয় ধরানর এটা খুব ইফেকটিভ ব্যবস্থা। এক জন নিখোঁজ হলে পাঁচ হাজার লোক সেটা জানে। সবাই খোঁজাখুঁজি করে।'

বড়ো আপা থমথমে মুখে চা নিয়ে ঢুকল। ওর বুদ্ধিসুদ্ধি সত্যি কম। চা এনেছে শুধু আমার জন্যে, দুলাভাইয়ের জন্যে নয়। তিনি একটু হাসলেন এবং হাসিমুখেই বললেন, 'শীলার জ্বর কমেছে? লুনাকে দেখলাম ওর ঘরে।'

আপা জবাব দিল না।

'ও কি আজকে থাকবে? এই সময় কেউ মেয়েদের বাইরে পাঠায়? কী আশ্চর্য!'

আপা তারও জবাব দিল না।

আমি বললাম, 'মেয়েটি আজকে থাকবে দুলাভাই। শীলা ওর বাসায় টেলিফোন করে দিয়েছে।'

'মেয়েটিকে তুমি দেখেছ শফিক?'

'দেখেছি।'

'ওর চেয়ে সুন্দর মেয়ে তুমি দেখেছ?'

আমি ইতস্তত করে বললাম, 'না।'

আমি কিন্তু দেখেছি। ঢাকা কলেজে তখন পড়ি। বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেসে করে যাচ্ছি দিনাজপুরে। ময়মনসিংহ স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ জানালা দিয়ে দেখি, একটি ষোল–সতের বছরের মেয়ে প্লাটফরমে টিনের একটা ট্রাঙ্কে বসে আছে। খুবই গরিব ঘরের মেয়ে। পায়ে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল।'

আপা রাগী গলায় বলে উঠলেন, 'লুনার মধ্যে তুমি সুন্দরের কী দেখলে? সমস্ত মুখ ভর্তি নাক।'

'লুনার কথা তো আমি বলছি না। যার কথা আমি বলছি, তার নামধাম কিছুই জানি না।'

আপা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। দুলাভাই হাসতে লাগলেন ঘর ফাটিয়ে।

আমি বললাম, 'ওদের কবে পাঠাচ্ছেন?'

'এই মাসেই পাঠাব। আমি নিজেও চলে যেতে পারি। রাত্রে আমার ভালো ঘুম হয় না। আরাম করে ঘুমুতে ইচ্ছা করে।'

দুলাভাই গাড়ি করে আমাকে পৌঁছে দিতে রওনা হলেন। সাতটা মাত্র বাজে, এর মধ্যেই দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে লোক–চলাচল নেই। কেমন খাঁ–খাঁ করছে চারদিক। এত বড়ো একটা শহর ঝিম মেরে গিয়েছে।

দুলাভাই বললেন, 'সন্ধ্যার পর চলাফেরা করা ঠিক না।'

'দুলাভাই, আপনার কি ভয় লাগছে?'

'না, ভয় লাগে না। অন্য রকম লাগে। আমার কাছে টিক্কা খানের সই করা পাশ আছে, আমাকে কেউ ধরবে না।'

গাড়ি সায়েন্স ল্যাবরেটরির কাছাকাছি আসতেই দেখি রোড ব্লক দিয়ে তিন-চার জন সেপাই দাঁড়িয়ে। ওরা গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে কী-সব দেখছে। একটি কালো ভকস ওয়াগনকে দেখলাম রাস্তার পাশে। রোগামতো একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির পাশে। একজন সেপাই কী-সব যেন জিজ্ঞেস করছে। দুলাভাই শুকনো গলায় বললেন, 'তুমি চুপচাপ থাকবে। কথাবার্তা যা বলবার আমি বলব।'

ওরা আমাদের গাড়ি থামাল না। হাত ইশারা করে চলে যেতে বলল। তাকিয়ে দেখি দুলাভাইয়ের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

গেটের সামনে গাড়ি থামতেই জলিল সাহেবের স্ত্রীর কান্না শোনা গেল। আজ সকাল-সকাল কান্না শুরু হয়েছে। দুলাভাই ভীত স্বরে বললেন, 'কাঁদে কে?'

'জলিল সাহেবের বউ।'

'রোজ এ রকম কাঁদে?'

'হ্যাঁ।'

'শফিক--'

'জ্বি।'

'তুমি খোঁজখবরের মধ্যে যাবে না। সময়টা খারাপ--' দুলাভাই কুলকুল করে ঘামতে লাগলেন।

'আসেন, উপরে যাই। চা খেয়ে যান।'

'না থাক। দেরি হয়ে যাবে।'

'দেরি হবে না।'

'না থাক।'

দুলাভাই "না" বলেও গাড়ি থেকে নেমে আমার সঙ্গে উপরে উঠতে লাগলেন।

'শফিক, আমিও নীলগঞ্জে চলে যাব।'

'ভালোই হবে।'

'আমার ভালো লাগছে না। বড়োই দুঃসময়।'

৪

বিকালবেলা চুপচাপ ঘরে বসে আছি, কিছুই ভালো লাগছে না। সম্ভবত জ্বর আসছে। নিঃসন্দেহ হবার উপায় হচ্ছে সিগারেট ধরান। দু'টি টান দিয়ে যদি ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা হয়, তাহলে নির্ঘাত জ্বর আসছে। পরীক্ষাটা করবার উপায় নেই। সিগারেট ফুরিয়েছে। কাদের মিয়া আনতে গিয়েছে। কখন ফিরবে কে জানে।

আমি একটি চাদর গায়ে দিয়ে বারান্দায় বসলাম। বিলু এল সেই সময়। এই মেয়েটি নিঃশব্দে চলাফেরা করে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসার কোনো শব্দ আমি শুনি নি।

'কী ব্যাপার বিলু?'

'আপনাকে বাবা ডাকছেন।'

'আমি তো যেতে পারব না, আমার জ্বর।'

আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বিলু বলল, 'কই দেখি?' বলেই সে হাত রাখল আমার কপালে। আমি কাঠ হয়ে বসে রইলাম।

'জ্বর কোথায়! আপনার শরীর নদীর মতো ঠাণ্ডা।'

নিজেকে সামলে নিয়ে সহজভাবে বলতে চেষ্টা করলাম, 'কি জন্যে ডাকছেন আমাকে?'

'কি জন্যে তা আমি কী করে বলব?'

বিলু রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। এই মেয়েটি খুব অদ্ভুত। এমনি আমার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে হুঁ-হাঁ করে জবাব দেয়। আবার কখনো আপনা থেকেই অনেক কথা বলে।

'আজকে আমাদের ক্লাসে কী হয়েছে জানেন? নাজমা নামের একটা মেয়ে ফ্লাস্কে করে দুধ নিয়ে এসেছে, টিফিনের সময় খাবে। সেই দুধ আমরা ক্লাসের মধ্যে ঢেলে ফেললাম। তারপর কী হয়েছে জানেন?'

'না।'

'আমাদের কেমিস্ট্রির স্যার এসে বললেন--এই……'

বিলুর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, সে কোনো কথা শেষ করবে না। হঠাৎ কথা থামিয়ে বলবে, 'সর্বনাশ, চুলায় গরম পানি দিয়ে এসেছি, মনেই ছিল না। আমি যাই।'

'তোমাদের সেই কেমিস্ট্রি স্যার দুধ দেখে কী বললেন?'

সে চোখ কপালে তুলে বলবে, 'দূর, এই সব শুনে কী করবেন?'

বেশ লাগে আমার বিলুকে।

একটি গরম সুয়েটার গায়ে দিয়ে নামছি, হঠাৎ বিলু নিচু গলায় বলল, 'আমাদের বাসায় দেখবেন একটি লোক বসে আছে। ওর সঙ্গে নীলু আপার বিয়ে হবে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তাই নাকি?'

'হুঁ।'

'কবে হচ্ছে বিয়েটা?'

'খুব শিগগির।'

বিলু দেখলাম বেশ গম্ভীর। যেন এই বিয়ের ব্যাপারটি তার ভালো লাগছে না। আমি বললাম, 'তোমার মনে হচ্ছে মন খারাপ?'

'না, মন খারাপ হবে কেন? আপনি কী-যে পাগলের মতো কথা বলেন! খুব রাগ লাগে।'

আমি ঘরে ঢুকে দেখি আজিজ সাহেবের সামনে এক জন মোটাসোটা ভদ্রলোক বসে আছেন। ভদ্রলোকের মাথাভর্তি টাক। একটা রুমাল দিয়ে তিনি ক্রমাগত মাথার টাক মুছছেন।

আজিজ সাহেব বললেন, 'এই যে শফিক, আস আস। তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, এ হচ্ছে মতিনউদ্দিন। আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। আমেরিকার নর্থ ডাকোটাতে ছিল অনেক দিন। গত সপ্তাহে হঠাৎ এসে হাজির। দেখ না কাণ্ড! মতিনউদ্দিন--এ হচ্ছে আমাদের বাড়িওয়ালা, তবে আত্মীয়ের চেয়েও বেশি।'

ভদ্রলোক মিহি সুরে বললেন, 'আপনার কথা অনেক শুনেছি।'

আমি বড়োই অবাক হলাম। আমার কথা অনেক শোনার কোনো কারণ নেই। ভদ্রলোক বিদেশ থেকে ফিরে আজই হয়তো প্রথম এখানে এসেছেন। এই সময়ের মধ্যে আমার কথা শুনে ফেলবেন, সেটা ঠিক বিশ্বাস্য নয়।

আমি হাসিমুখে বললাম, 'কার কাছ থেকে শুনলেন?'

'নীলু বলল।'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম নীলুর দিকে। নীলুর এমন এক জন বয়স্ক মোটাসোটা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকবে, তা ঠিক কল্পনা করা যায় না। নীলু রূপসী এবং অহংকারী। এই জাতীয় মেয়েরা মোটাসোটা টাকওয়ালা লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে না। ভদ্রলোক কৌতূহলী হয়ে বললেন, 'আপনি নাকি এক বার একটা কাক পুষেছিলেন? কাকটার নাম ছিল সম্রাট কনিষ্ক।'

আমাকে মানতেই হল ভদ্রলোক আমার কথা আগেই শুনেছেন। প্রথম দিনই কেউ আমার কাক পোষার কথা জানবে, তা বিশ্বাস করা কষ্টকর।

'নীলু আমাকে সব কিছু লিখত চিঠিতে।'

আমি ভালোভাবে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। তাঁর চোখে-মুখে এমন একটি ছেলেমানুষী ভাব আছে, যা ছেলেমানুষদের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না। ভদ্রলোক চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, 'কাকটা নাকি রাত-দিন আপনার পেছনে পেছনে ঘুরঘুর করত। সত্যি?'

আমার কাক পোষার ব্যাপারটির মধ্যে এতটা অতিরঞ্জন আছে, তা জানা ছিল না। ঘটনাটি খুলে বলা যাক।

কাকটির সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই আকস্মিক। এক দিন সকালে নাশতা খাবার সময় সে রেলিংয়ের উপর এসে বসল। আমি যথারীতি একটি রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিলাম। সে রুটির টুকরোটি স্পর্শও করল না। ঘাড় বাঁকিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর গলায় ডাকল কা-কা। খাবার স্পর্শ করে না, এই জাতীয় কাক আমি আগে দেখি

নি---কাজেই অবাক হয়ে আরো কয়েক টুকরো রুটি ছুঁড়ে দিলাম। সে যেন আমাকে খুশি করবার জন্যেই একটি টুকরো উঠিয়ে আবার সন্ন্যাসীর মতো বসে থাকল বারান্দায়। সেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। শেষের দিকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকত রেলিংএ। আমাকে দেখতে পেলেই গম্ভীর গলায় ডাকত কা-কা। আমাদের মধ্যে কথাবার্তাও হ'ত। যেমন আমি যদি বলতাম, 'কি হে কনিষ্ক, শরীর ভালো তো?

'কা-কা।'

'তাঁর মানে ভালো নেই। হুঁ। হয়েছেটা কী?'

'কা কা কা' (গম্ভীর আওয়াজ)।

কাদের মিয়ার এই কাক নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তার ধারণা, এটা একটা অলক্ষণ। সে ঝাঁটা নিয়ে অনেক বার তাড়াতে চেষ্টা করেছে। লাভ হয় নি। ছাব্বিশে মার্চের পর এই কাকটিকে আর দেখা যায় নি। কোথায় গিয়েছে কে জানে?

মতিনউদ্দিন সাহেব বললেন, 'কাকটির নাম কনিষ্ক রাখলেন কেন? কনিষ্ক মানে কী?'

'কনিষ্ক হচ্ছে কুষাণ বংশের এক জন সম্রাট। ভারতে রাজত্ব করে গেছেন আনুমানিক ১০০ খ্রিষ্টাব্দে।'

মতিনউদ্দিন সাহেব থেমে থেমে বললেন, 'নীলু ঠিকই বলেছে, আপনি ভাই অদ্ভুত লোক।' নীলু রেগে গিয়ে বলল, 'আমি আবার কখন এই সব বললাম?'

মতিনউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দুপুরে আমাকে ভাত খেতে হল। অন্যের বাড়িতে ভাত খেতে ভালো লাগে না। বড়োই অস্বস্তি বোধ হয়। সেখানে ভাত মাখাতে হয় ভদ্রভাবে। লক্ষ রাখতে হয় ঠোঁটে ভাত লেগে আছে কিনা। হাত দিয়ে লবণ না নিয়ে চামচ দিয়ে নিতে হয়। সেই চামচটি আবার ধরতে হয় বাঁ হাতে। আমি নিতান্ত প্রয়োজন না হলে অন্যের বাড়িতে খেতে বসি না। এখানেও নিতান্ত বাধ্য হয়ে বসতেই হল। যখন নীলুর মতো একটা মেয়ে নরম স্বরে বলে, 'আপনি না খেলে আমার খুব খারাপ লাগবে। আমি রান্না করেছি আপনার জন্যেই।' তখন অবাক হয়ে খেতে বসতেই হয়।

নীলু আমার সঙ্গে কথাটথা বিশেষ বলে না। মাসের প্রথম দিকে বাড়িভাড়ার টাকাটা খামে ভরে দিতে এসে টেনে টেনে বলে, 'টাকাটা গুনে নিন।'

আমি সব সময়ই বলি, 'গুনতে হবে না, ঠিক আছে।'

সে ঠাণ্ডা স্বরে বলে, 'না, গুনে নিন।'

আমাকে চোখ-মুখ লাল করে টাকা গুনতে হয়। রূপসী একটা মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে টাকা গোনা বিড়ম্বনা বিশেষ। এক সময় সে বলে, 'ঠিক আছে তো?'

'ঠিক আছে।'

মতিনউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে ভাত খেতে খেতে মনে পড়ল--এবার নীলু ভাড়া দিতে এসে টাকা গুনে নেবার কথা বলে নি। আমি যখন নিজ থেকে গুনতে যচ্ছি, তখন বলেছে, 'শফিক সাহেব, আপনার যদি অস্বস্তি লাগে, তাহলে থাক--গুনতে হবে না। আমি গুনে এনেছি।'

অন্য বারের মতো টাকাটা দিয়েই নিচে নেমে যায় নি, হঠাৎ করে বলেছে, 'আপনার বন্ধু কনিষ্কের কোনো খোঁজ পেলেন?'

'না, এখনো পাই নি।'

'আমার মনে হয়, সে মনের দুঃখে বিবাগী হয়েছে।'

নীলু খিলখিল করে হেসে উঠেই গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনি খুব সুখে আছেন শফিক সাহেব। কাজটাজ কিছু করতে হয় না। বাড়িভাড়া নেন, আর ঘুরে বেড়ান।'

আমি উত্তর দিলাম না। সে দেখলাম খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'বাবা আপনাকে খুব পছন্দ করেন।'

'তাই নাকি?'

'তাঁর ধারণা, আপনার মতো ভালো ছেলে খুব কম জন্মায়।'

আমি হঠাৎ বলে বসলাম, 'উনি আমার পা দেখতে পান না তো, তাই বলেন।'

এরপর কথা আর এগোয় নি। নীলু মুখ কালো করে নিচে নেমে গেছে। আমি নিজেও ভেবে পাই নি, হঠাৎ এই প্রসঙ্গ কেন তুললাম। না ভেবেচিন্তে মানুষ অনেক কিছুই বলে। আর বলে বলেই আমরা ভালো মানুষ আর মন্দ মানুষকে আলাদা করতে পারি। এই যেমন আজ মতিনউদ্দিন সাহেব ভাত মাখতে মাখতে বললেন,'মিলিটারিগুলি দেখতে বেশ লাগে। কেমন স্মার্ট।'

ভদ্রলোকের এই কথা থেকেই বোঝা যায়, এর মনে কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। এখনো মিলিটারি দেখে যে মুগ্ধ হয় সে কিছু পরিমাণে ছেলেমানুষ। স্বামী হিসেবে এ ধরনের মানুষ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

খাওয়া শেষ করে হাত ধুতে যাচ্ছি, তখন কাদের এসে উপস্থিত। সে আমাকে এক কোণায় নিয়ে চোখ ছোট করে বলল, 'ছোড ভাই, রোজ কেয়ামত।'

'কী হয়েছে?'

'রফিক সাহেবের ছোড ভাইয়ের খেল খতম।'

'কী বলিস!'

'কোনো খোঁজ নাই। তার মা ফিট হয় আর উঠে, আবার ফিট হয়।'

আমি ভালোমতো বিদায় না নিয়েই গেলাম রফিকের বাসায়। বাসায় দেখি অনেক লোকজনের ভিড়। একটি ছোটমতো নীল রঙের গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে ঢুকে দেখি রফিকের ছোট ভাই বসার ঘরে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। তাকে ঘিরে বহু লোকজন।

রফিক আমাকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এল, 'খবর পেলি কার কাছে?'

'হয়েছেটা কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'শুনিস নি কিছু?'

'না।'

'কাল বিকালে বাইরে গিয়েছিল। সারা রাত আর ফেরে নি। আমাদের অবস্থাটা তো বুঝতেই পারছিস। মা রাতে তিন বার ফিট হয়েছে।'

'গিয়েছিল কোথায়?'

'ওর এক বন্ধুর বাড়ি। দেরি হয়েছিল বলে ওরা আর আসতে দেয় নি। বুঝে দেখ আমাদের অবস্থা।'

রফিকের বাড়ি থেকে বেরুবার সময় দেখি আরো লোকজন আসছে। ঢাকা শহরের সব লোকজন কি জেনে গেছে নাকি--রফিকের ছোট ভাই কাল রাতে বাড়ি ফেরে নি?

ঘরে ফিরে দেখি মতিনউদ্দিন সাহেব দোতলার বারান্দায় বসে সিগারেট টানছেন। জুতো-টুতো খুলে পা তুলে বসেছেন। আমাকে দেখে হাসিমুখে বললেন, 'সিগারেট খাবার জন্যে আসলাম। মুরুব্বিদের সামনে তো আর খাওয়া যায় না। কী বলেন?'

'তা তো ঠিকই। চা খাবেন?'

'তা বেশ তো। চা খেলে তো ভালোই হয়। অসুবিধা তো কিছু দেখছি না।'

লোকটির মাথায় কি ছিট আছে? আমি আড়চোখে তাকালাম তাঁর দিকে। কেমন নিশ্চিন্তে পা তুলে বসে আছেন। কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই।

'শফিক ভাই, আমি বসে বসে এতক্ষণ আপনার কাকটার কথা ভাবছিলাম, যার নাম রেখেছিলেন কনিষ্ক।'

'কী ভাবছিলেন?'

'না, বলা ঠিক হবে না আপনাকে।'

আমি আচমকা বললাম, 'আমেরিকায় কী করতেন আপনি?'

'পড়াশোনা। পি-এইচ. ডি করেছি এগ্রনমিতে।'

আমি অবাক হয়েই তাকালাম। কে বলবে এই লোকটির একটি পি-এইচ. ডি ডিগ্রী আছে? কেমন নির্বোধ চোখ। ঢিলাঢালা ভাবভঙ্গি। মতিনউদ্দিন সাহেব বিকাল পর্যন্ত আমার বারান্দায় বসে রইলেন। সন্ধ্যার আগে আগে তাঁকে নিতে তাঁর বড়ো ভাই আসবেন গাড়ি নিয়ে। তিনি গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমার বিরক্তির সীমা রইল না। বিলু এক বার এসে বলল নিচে যেতে। তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, বারান্দায় বেশ বাতাস, তিনি বাতাস ছেড়ে নিচে যেতে চান না। বিলুকে এইটুকু বলতেই তাঁর কান-টান লাল হয়ে একাকার হল।

সন্ধ্যাবেলা কোনো গাড়ি এল না। শোনা গেল, ঝিকাতলা এলাকায় কী-একটা ঝামেলা হয়েছে। ঝিকাতলা থেকে ধানমণ্ডি পনের নম্বর পর্যন্ত প্রতিটি বাড়ি নাকি সার্চ করা হবে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে একটা জীপে মাইক লাগিয়ে বলা হল, এই অঞ্চলে পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত কার্ফু ঘোষণা করা হয়েছে। তার কিছুক্ষণ পরই কারেন্ট চলে গেল। কাদের হারিকেন জ্বালিয়ে আবার নিভিয়ে ফেলল। মিলিটারি সার্চের সময় অন্ধকার থাকাই নাকি ভালো। এতে তারা মনে করে, বাড়িতে লোকজন নেই। মতিনউদ্দিন সাহেব একেবারেই চুপ হয়ে গেলেন। বিলু যখন এসে বলল--খাবার দেওয়া হয়েছে, তিনি বললেন--তাঁর একেবারেই খিদে নেই।

গভীর রাত পর্যন্ত আমি এবং মতিনউদ্দিন সাহেব অন্ধকার বারান্দায় চুপচাপ বসে রইলাম, রাত একটায় বাসার সামনে দিয়ে একটি খোলা জীপ গেল। সেই জীপটিই আবার রাত দেড়টার দিকে ফিরে গেল।

আমি বললাম, 'ঘুমুবেন নাকি মতিন সাহেব? কাদের জায়গা করেছে।'

মতিন সাহেব শুকনো গলায় বললেন, 'না, ঘুম আসছে না।'

আমি বললাম 'ভয় লাগছে না?'

'জ্বি-না। বড্ড মশা।'

মতিন সাহেব সিগারেট ধরিয়ে হঠাৎ বললেন, 'এটা বাংলা কোন মাস?'

তাঁর কথার জবাব দেবার আগেই জলিল সাহেবের স্ত্রীর কান্না শোনা গেল।

'কে কাঁদে?'

'জলিল সাহেবের স্ত্রী। ওর স্বামীর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কী সর্বনাশ, বলেন কী আপনি!'

মতিন সাহেব এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন, যেন এ রকম ভয়াবহ কথা এর আগে শোনেন নি। সেই খোলা জীপটা এসে থামল বাসার গেটের কাছে। কাদের ফিসফিস করে বলল 'দোয়া ইউনুস পড়েন ছোড ভাই। ভয়ের কিছু নাই।'

দোয়া ইউনুস কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। কাদের মতিন সাহেবের শার্ট টেনে চাপা স্বরে বলল 'সিগারেট ফেলেন। আগুন দূর থাইক্যা দেখা যায়।'

গাড়িটি এইখানে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? না, চলতে শুরু করেছে। এই তো যাচ্ছে বড়ো রাস্তার দিকে। আমার দোয়া ইউনুস মনে পড়ল। লাইলাহা ইল্লা আন্তা সোবাহানকা ইনি কুন্তু মিনায যোয়ালেমিন।

৫

জলিল সাহেবের ভাই এখনো দেশে ফেরেন নি।

সমগ্র ঢাকা শহর চষে বেড়াচ্ছেন। কীভাবে–কীভাবে যেন এক জন কর্নেলের সঙ্গে দেখা করে দরখাস্ত দিয়ে এসছেন। দৈনিক পাকিস্তানে 'সন্ধান চাই'––এই শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এবং সন্ধানদাতাকে নগদ পাঁচ শ' টাকা পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেছেন।

পুরস্কার ঘোষণা কাজে দিয়েছে বলা যেতে পারে। কালো মতো লম্বা এক লোক এসে হাজির।। তার চোখে নিকেলের চশমা, নিচের পাটির একটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধান। জলিল সাহেবের ভাই লোকটিকে আমার কাছে এনে হাজির করলেন। লোকটির বক্তব্য, বিজ্ঞাপনের বর্ণনা মতো এক জন লোক মীরপুর বারো নম্বরে আটক আছে। তাকে ছাড়িয়ে আনা যাবে না, তবে এক হাজার টাকা দিলে সে দেখা করিয়ে দিতে পারে। আমে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বললাম, 'আপনি নিজে দেখেছেন?'

'জ্বি জনাব। নিজে না দেখলে বলি কেন? তবে আগের মতো নাই, অনেক রোগা হয়ে গেছেন।'

'আপনি দেখলেন কীভাবে? মীরপুর বারো নম্বরে আপনি কী করেন?'

'আমার চেনাজানা লোক আছে।'

'বাড়ি কোথায় আপনার?'

'বাড়ি দিয়ে আপনার দরকার কী? দেখা করিয়ে দিলেই তো হয়।'

'কখন দেখা করাবেন?'

'এখন বলতে পারব না। খোঁজখবর নিয়ে বলতে হবে।'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখন এক কাজ করেন না কেন, জলিল সাহেবকে দিয়ে এক লাইনের একটা লেখা লিখিয়ে আনেন, আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার টাকা দেয়া হবে।'

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে রেগে উঠল।

'আপনে আমার কথা বিশ্বাস করেন নাই। আপনার সাথে ভাই আমি নাই। আমার এক কথা, আমি দেখা করিয়ে দিব। কিন্তু টাকাটা আমাকে এখন দিতে হবে।'

'এখন দিতে হবে?'

'জ্বি জনাব। অর্ধেক এখন দেন, আর বাকি অর্ধেক দেখা হওয়ার দিন দেন। ব্যস, সাফ কথা।'

আমি ঠাণ্ডা গলায় কাদেরকে বললাম, 'এই লোকটাকে ঘাড় ধরে বের করে দে কাদের।'

জলিল সাহেবের ভাই দারুণ অবাক হয়ে বললেন, 'আরে না–না। এই সব কী বলছেন? আসেন তো ভাই আপনি আমার সাথে। চা–পানি খান। আসেন দেখি। অবিশ্বাস করার কী আছে? মাবুদে এলাহী, অবিশ্বাস করব কেন? আপনি কি আর

খামাখা মিথ্যা কথা বলবেন?'

সন্ধ্যাবেলা খবর পেলাম লোকটিকে পাঁচ শ' টাকা দেওয়া হয়েছে এবং একটি টিফিন কেরিয়ারে করে গোশত পারোটা দেওয়া হয়েছে পৌছে দেবার জন্যে। লোকটি বলে গেছে সে বৃহস্পতিবার বিকালে এসে জলিল সাহেবের ভাইকে মীরপুর বার নম্বরে নিয়ে যাবে। লোকটি যে আর আসবে না, সেই সম্পর্কে আমি ষোল আনা নিশ্চিত ছিলাম।

কিন্তু সে সত্যি সত্যি বৃহস্পতিবার বেলা দুটার সময় এসে হাজির। খালি টিফিন-কেরিয়ারটিও সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সে অবশ্যি দেখা করানর জন্যে জলিল সাহেবের ভাইকে মীরপুরে নিয়ে গেল না। তার জন্যে নাকি অন্য এক বিহারী ব্যক্তির (সুলায়মান খাঁ) সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া প্রয়োজন। সেই লোক রোববার আসবে। রোববারে অবশ্যি দেখা হবে। এই বারও লোকটি একটি কম্বল, একটি বালিশ এবং দু' শ' টাকা নিয়ে গেল।

জলিল সাহেবের ভাইয়ের ধৈর্য সীমাহীন। তিনি রোববার ভোরে গেলেন, মঙ্গলবার দুপুরে গেলেন এবং আবার বৃহস্পতিবার সকালে গিয়ে সন্ধ্যাবেলা গায়ে জ্বর নিয়ে ফিরে এলেন। আমি দেখতে গেলাম রাতে। বেশ জ্বর। ভদ্রলোক লেপ গায়ে দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে উঠে বসতে চেষ্টা করলেন, 'শুয়ে থাকেন, উঠতে হবে না। আজকেও দেখা হয় নি?'

'জ্বি-না। সামনের মাসের দুই তারিখ যাইতে বলে'

'যাবেন?'

'জ্বি-না। ওরা কোনো খোঁজ জানে না। শুধু পেরেশানী করে।'

'এতদিনে বুঝলেন?'

'বুঝেছি আগেই ভাই, কিন্তু কী করব--মিথ্যাটাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।'

'আরো খোঁজখবর করবেন?'

'জ্বি-না, আগামী মঙ্গলবার ইনশাল্লাহ্ দেশের বাড়ি রওনা হব।'

'ঠিক আছে, আপনি বিশ্রাম করেন। পরে কথা বলব।'

'না ভাই, একটু বসেন। এক কাপ চা খান। আমিনা, ও আমিনা।'

আমিনা সম্ভবত জলিল সাহেবের স্ত্রী। কঠিন পর্দা এঁদের। তিনি এলেন না। দরজার ওপাশে খটখট শব্দে জানান দিলেন। জলিল সাহেবের ভাই শান্ত স্বরে বললেন, 'আমিনা, রোজ কেয়ামতের দিন কোনো পর্দা থাকে না। মেয়ে-পুরুষ তখন সব সমান। এখন সময়টা কেয়ামতের মতো। এখন কোনো পর্দা-পুশিদা নাই। তুমি আস চা নিয়া।'

জলিল সাহেবের স্ত্রীকে দেখে আমি বড়োই অবাক হলাম। নিতান্ত বাচ্চা একটি মেয়ে। শ্যামলা ছিপছিপে গড়ন। খুব লম্বা ঘন কালো চুল। এই বয়সের মেয়েরা বেণী দুলিয়ে স্কুলে যায়। হাতভর্তি আচার নিয়ে বারান্দায় বসে চেটে চেটে

খায়। মেয়েটি নিজে থেকেই বলল, 'আপনার কি মনে হয়, তাঁকে মেরে ফেলেছে?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলাম না। মেয়েটি থেমে থেমে বলল, 'তাঁকে কেন মারবে বলেন? সে তো কিছুই করে নাই। সে তো মানুষকে একটা কড়া কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। সাত বৎসর বয়স থেকে কোনো নামাজ কাজা করে নাই। কেন আল্লাহ্ এমন করবেন?'

জলিল সাহেবের ভাই গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আল্লাহ্র কাজের কোনো সমালোচনা নাই আমিনা। গাফুরুর রাহিম যা জানেন, আমরা সেইটা জানি না।'

মঙ্গলবার দুপুরে জলিল সাহেবের ভাই সবাইকে নিয়ে চাঁদপুর চলে গেলেন। একটি ঠিকানা দিয়ে গেলেন কোনো খবর থাকলে জানাবার জন্যে। ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে থাকলেন। আমার কিছু একটা বলা উচিত। কোনো একটা আশার কথা। অর্থহীন কোনো সান্ত্বনার বাণী। কিছুই বলতে পারলাম না।

রাত্রে অনেক দিন পর কোনো কান্না শোনা গেল না। তাদের তালা-দেওয়া বাড়ির সামনে একটা কুকুর এসে শুয়ে থাকল। রাত দশটার দিকে দেখি সেই বাড়ির বারান্দায় বসে নেজাম সাহেব সিগারেট টানছেন। জলিল সাহেবের ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর বেশ খাতির হয়েছিল। প্রায়ই দেখতাম দু' জন একসঙ্গে বেরুচ্ছেন।

মতিনউদ্দিন সাহেব আজকাল খুব ঘনঘন আসেন। আজিজ সাহেবের ঘরে না গিয়ে সরাসরি উঠে আসেন দোতলায়। আমার খোঁজ করেন না, চিকন সুরে কাদেরকে ডাকেন, 'ও কাদের মিয়া। কাদের আছ নাকি?'

কাদের সাড়া দিলেই তিনি অসংকোচে বলেন, 'কাদের মিয়া, রাতে এখানে খাব।'

বড়োই আশ্চর্য লাগে আমার কাছে। এক দিন বিকালে এসে দেখি, ভদ্রলোক আমার বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে দিব্বি ঘুমাচ্ছেন। কাদের আমাকে ফিসফিস করে বলল, 'ইনার শইলডা খারাপ। গায়ে জ্বর।'

'কাদের, রাত্রে আমি ভাত খাব না। রুটি করবে।'

আমাকে বললেন, 'জ্বর গায়ে ভাত খাওয়াটা ঠিক হবে না। কী বলেন শফিক ভাই?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'আপনি কি এইখানেই থাকবেন নাকি?'

ভদ্রলোক আমার চেয়েও আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'জ্বরজ্বারি নিয়ে যাব কোথায়? কাজের জন্যে যে ছেলে রেখেছিলাম, সেটাও চলে গেছে। একা-একা থাকি কী করে?'

তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোক দু'টি প্রকাণ্ড কালো রঙের স্যুটকেস সাথে করে নিয়ে এসেছেন।

বিলু ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখে টেনে টেনে খুব হাসতে লাগল। আমার সামনেই নীলুকে বলল, 'আমি তোমাকে কত বার বলেছি, ভদ্রলোকের মাথা পুরোপুরি

খারাপ। তুমি তো বিশ্বাস কর না।'

নীলু খুবই রাগ করল। একেবারে কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। চোখ-মুখ লাল করে বলল, 'কী মনে করে ঘর-বাড়ি নিয়ে আপনি অন্যের বাড়িতে উঠে আসলেন?'

'একলা থাকতে পারি না নীলু। ভয় লাগে।'

'ভয় লাগে! আপনি কচি খোকা নাকি?'

নীলু সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল। আমি অবস্থা সামলাবার জন্যে বললাম, 'এই সময় একা-একা থাকাটা ভয়েরই কথা।'

নিচে থেকে নেজাম সাহেব হৈচৈ শুনে উঠে এসেছিলেন। তিনি মহা উৎসাহে বললেন, 'কোনো অসুবিধা নাই। আপনি ভাই আমার সঙ্গে থাকেন। ভূতের উপদ্রব এই বাড়িতে। একা-একা থাকতে আমারো ভয় লাগে।'

মতিনউদ্দিন সাহেব পরদিন কাদেরকে নিয়ে বাড়ি থেকে সব জিনিসপত্র নিয়ে এলেন। মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে বিরাট এক একতলা বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। কাদেরের ভাষায় ঐ বাড়িতে একা-একা জ্বীনও থাকতে পারে না। আশেপাশে কোনো বাড়িতে কোনো লোক নেই। এই ক'দিন ভদ্রলোক কী করে একা-একা ছিলেন তাই নাকি এক রহস্য।

কাদেরের কাছ থেকে আরো জানা গেল যে, মতিনউদ্দিন সাহেব এই দেশে থাকবেন না--আবার চলে যাবেন। ভিসার জন্যে দরখাস্ত করেছেন। নতুন ব্যবস্থায় আজিজ সাহেব মহা খুশি। তাঁর মতে এটি একটি উত্তম ব্যবস্থা। সব দিক থেকেই ভালো। নীলুর মনোভাব ঠিক বোঝা যায় না। তাকে মতিনউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে গল্পটল্প করতে দেখি না, তবে এক দিন দেখলাম জামগাছের নিচে দু' জনে কথা বলতে-বলতে হাঁটছে। আমাকে দেখতে পেয়ে নীলু চট করে আড়ালে সরে গেল। কী জন্যে কে জানে?

আজিজ সাহেব আজকাল আর আগের মতো আমাকে ডেকে পাঠান না। তাঁর ব্যস্ততা হঠাৎ করে খুব বেড়েছে। তিনি স্থির করেছেন ছাব্বিশে মার্চের পর থেকে কোথায় কী হচ্ছে সব লিখে রাখবেন। লেখার কাজটা করবে বিলু। তিনটি আলাদা খাতা করা হয়েছে। একটিতে লেখা হচ্ছে পাকিস্তান রেডিওর খবর, অন্যটিতে আকাশবাণী কলকাতার। তৃতীয়টি হচ্ছে স্বাধীন বাংলা, বি বি সি এবং ভয়েস অব আমেরিকার জন্যে।

জুন মাসে ঢাকার অবস্থা অনেক ভালো হয়ে গেল। কার্ফু সময়সীমা কমিয়ে রাত বারটা থেকে সকাল ছটা করা হল। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় যে-সব মিলিটারি চেকপোস্ট ছিল, সেখান থেকে মিলিটারি সরিয়ে পুলিশ বসান হল। ঢাকার সমস্ত পুলিশ মিলিটারির সঙ্গে যুদ্ধে মারা গেছে বলে যে-খবর পেয়েছিলাম সেটি বোধ হয় পুরোপুরি সত্যি নয়। চারদিকে প্রচুর পুলিশ দেখা যেতে লাগল।

সেন্ট্রাল শান্তি কমিটি থেকে বলা হল, সমগ্র দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এক জন ফরাসী সাংবাদিক পত্রিকায় বিবৃতি দিলেন 'দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার সার্বিক উন্নতি হয়েছে। তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা তাঁর চোখে পড়ে নি। জনগণের মধ্যে আস্থার ভাব পুরোপুরি ফিরে এসেছে।'

নীলক্ষেতের রাস্তা দিয়ে আসবার সময় দেখি মহসিন হলের অনেকগুলি জানালা খোলা। ছেলেরা দড়িতে শার্ট শুকতে দিয়েছে। সত্যি সত্যি হল খুলে দেয়া হয়েছে নাকি? হতেও পারে। পত্রিকায় দেখলাম আসন্ন রমজান উপলক্ষে রেশনে ঘি এবং সুজি দেওয়া হবে।

ঠিক এই সময় রফিকের ছোট ভাইটির বিয়ে হয়ে গেল। হঠাৎ করেই নাকি সব ঠিক হয়েছে। দুপুরবেলায় বিয়ে। আমাকে বরযাত্রী যেতে হল। রফিককে মনে হল বেশ সংকুচিত। তাকে বাদ দিয়ে ছোট ভাইয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, এই কারণেই কিনা কে জানে।

বিয়েবাড়িতে গিয়ে দেখি হুলস্থুল কারবার। গেটের সামনে ব্যাণ্ড পার্টি। ছোট-ছোট মেয়েরা পরীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড়ো ভালো লাগল দেখে। গেট-ধরনীরা হাজার টাকার কমে গেট ছাড়বে না। শুধু টাকা দিলেই হবে না। তিনটি ধাঁধা আছে, ভেতরে ঢুকতে হলে সেগুলিও ভাঙতে হবে। একটি ধাঁধা হচ্ছে, কাটলে কোন জিনিস বড়ো হয়। বরযাত্রী যারা ছিলাম, কারোর বুদ্ধিসুদ্ধি বোধহয় সে-রকম নয়। আমরা কেউই একটি ধাঁধারও উত্তর দিতে পারলাম না। বাচ্চা মেয়েগুলি খুব হাসাহাসি করতে লাগল। হাসাহাসি করলে কী হবে, সবগুলি বিচ্ছু--গেট খুলবে না। শেষ পর্যন্ত মেয়ের বাবা এসে ধমক দিলেন, 'গেট খোল। সব সময় ফাজলামি।'

বিয়ে পড়ান হয়ে গেল নিমেষের মধ্যেই। 'দেন মোহরান'--যা নিয়ে দু' পক্ষই ঘন্টাদুয়েক দড়ি টানাটানি করেন, তাও দেখি আগেই ঠিক-করা। শুধু কবুল বলে নাম সই। বিয়ে বলতে এইটুকুই।

খেতে গিয়েও দেখি এলাহী ব্যবস্থা। জনপ্রতি ফুল রোস্ট, কাবাব, রেজালা। আমার পাশে রোগামতো একটি লোক বসেছিলেন। সে আমার পেটে খোঁচা মেরে ফিসফিস করে বলল, 'ব্রিগেডিয়ার বখতিয়ার এসেছে, দেখেছেন?

'কোথায় ব্রিগেডিয়ার বখতিয়ার?'

'ঐ যে দেখছেন না, সানগ্লাস পরা। খাস পাঞ্জাব রেজিমেন্ট আর্মড কোরের লোক। বডি দেখেছেন?'

আমি দেখলাম, লম্বা করে রোগামতো একটি লোক। বেশ কিছু লোক ঘুরঘুর করছে তার সঙ্গে।

'কত বড়ো দালাল দেখেছেন? পাঞ্জাবীর সাথে পিতলা খাতির।'

খাওয়াদাওয়া শেষ হতেই রফিক আমাকে বউ দেখাতে নিয়ে গেল। মেয়েটি দেখে আমি স্তম্ভিত। যেন সত্যি সত্যি একটি জলপরী বসে আছে। এমন সুন্দর

মেয়েও পৃথিবীতে আছে।

৬

দুপুরবেলা হঠাৎ চারদিক অন্ধকার করে ঝড় এল।

জামগাছ থেকে শনশন শব্দ উঠতে লাগল, একতলার কলঘরের টিনের চাল উড়ে চলে গেল। ঝড় একটু কমতেই শুরু হল বর্ষণ। তুমুল বর্ষণ। দরজা–জানালা সব বন্ধ, তবু ফাঁক দিয়ে পানি এসে ঘর ভাসিয়ে দিল। কাদের মহা উৎসাহে ছোটাছুটি করছে। এক বার নিচে যাচ্ছে, আবার উপরে উঠে আসছে। তার ব্যস্ততা সীমাহীন ব্যস্ততা। আমি চা করতে বলেছিলাম, সে তার ধার দিয়েও যাচ্ছে না। এক বার এসে হাসিমুখে বলল, 'বিলু আফার ঘরের একটা জানালার কাম সাফ । উইড়া গেছে।'

উল্লসিত হওয়ার মতো কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু কাদেরের মনস্তত্ত্ব বোঝার সাধ্য আমার নেই। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'হাসি তামাশার কী আছে এর মধ্যে?'

ঠিক এই সময় একতলা থেকে নেজাম সাহেব ভীত স্বরে ডাকতে লাগলেন, 'শফিক ভাই শফিক ভাই।' আমার উত্তর দেবার আগেই কাদের মিয়া বিদ্যুৎগতিতে নিচে নেমে গেল। সেখান থেকে সেও চেঁচাতে লাগল, 'ও ছোড মিয়া, ও ছোড মিয়া।' আমি গিয়ে দেখি জলিল সাহেব। মাথার চুল কামান। গায়ে একটি গেঞ্জি এবং ফুল প্যান্ট।

আমাকে দেখে বললেন, 'ভালো আছেন শফিক ভাই?'

নেজাম সাহেব বললেন, 'হাতটার অবস্থা দেখেছেন?'

হাতের দিকে তাকিয়ে আমি শিউরে উঠলাম। তাঁর বাঁ হাতটি কনুইয়ের নিচ থেকে শুকিয়ে গেছে। আমি বললাম, 'আপনার বউ আর মেয়ে ভালো আছে। আপনার ভাই এসে তাদের নিয়ে গেছে চাঁদপুর।'

জলিল সাহেবের কোনো ভাবান্তর হল না। থেমে থেমে বললেন, 'খিদে লাগছে, ভাত খাব।'

ভাত খেয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন। সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল তাঁর প্রচণ্ড জ্বর। চোখ রক্তবর্ণ । মনে হল কাউকে চিনতে পারছেন না।

নেজাম সাহেব বললেন, 'জলিল ভাই আমাকে চিনতে পারছেন? আমি নেজাম।'

জলিল সাহেব উত্তর দেন না।

'কি, চিনতে পারছেন না?'

জলিল সাহেব বললেন, 'পানি দেন ভাইসাব, তিয়াস লাগে।'

কাদের দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার আনল। আর আমাদের সবাইকে স্তম্ভিত করে জলিল সাহেব রাত একটার সময় মারা গেলেন। মারা যাবার আগমুহূর্তে খুব সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতো কথাবার্তা বললেন। বউ কোথায়? মেয়েটি কেমন আছে জিজ্ঞেস করলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নেজাম সাহেব বললেন, 'হাতটা এ রকম হল কেন?'

জলিল সাহেব তার উত্তর দিলেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন?'

'মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। গুলিস্তানের কাছ থেকে।'

'কবে ছেড়েছে?'

'গত পরশু।'

'বলেন কী! এই দুই দিন তাহলে কোথায় ছিলেন?'

জলিল সাহেব তার উত্তর দিলেন না। এর কিছুক্ষণ পরই তাঁর মৃত্যু হল। আমি চলে এলাম উপরে। এসে দেখি মতিনউদ্দিন সাহেব ইজি চেয়ারে বসে হাউমাউ করে কাঁদছেন।

ঝড়-বৃষ্টি কেটে গিয়ে মধ্যরাতে আকাশ কাঁচের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রকাণ্ড একটি চাঁদ ঝকমক করতে লাগল সেখানে। সেই অসহ্য জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থেকে শুনলাম, অনেক দিন পর জলিল সাহেবের বউ কাঁদছে। সরু মেয়েলি গলায় গাঢ় বিষাদের কান্না।

'কে কাঁদছে?'

কাদের মিয়া বলল, 'বিলু আফা কানতাছে।'

বিলু নীলু দুই বোন সমস্ত রাত জলিল সাহেবের মাথার পাশে বসে রইল।

মৌলবী ইজাবুদ্দিন সাহেব, (এম.এ., এল-এল.বি) খবর পাঠিয়েছেন--আমি যেন অবশ্যি তাঁর সঙ্গে দেখা করি, বিশেষ প্রয়োজন। দু' বার গিয়ে তাঁকে পেলাম না। তিনি আজকাল ভীষণ ব্যস্ত। বাসায় টেলিফোন এসেছে। সন্ধ্যার পর দু' জন আনসার তাঁর বাড়ি পাহারা দেয়। আগে তাঁর বাড়ির বারান্দায় কোনো আলো ছিল না। এখন তিন দিকে এক শ' পাওয়ারের তিনটি বাতি জ্বলে।

কোনো মানুষকে দু' বার গিয়ে না পাওয়া গেলে তৃতীয় বার যাওয়ার উৎসাহ থাকে না। তাছাড়া আমি ভেবে দেখালাম, আমাকে তাঁর বিশেষ প্রয়োজন হওয়ার কোনোই কারণ নেই। আমি আর না যাওয়াই ঠিক করলাম। তৃতীয় দিন ইজাবুদ্দিন

সাহেব আমাকে নেওয়ার জন্যে গাড়ি পাঠালেন। গাড়িতে অসম্ভব রোগা এবং অসম্ভব লম্বা একটি লোক বসে ছিল। সে কড়া গলায় বলল, 'আপনাকে ডাকা হয়েছে, তবু আপনি আসেন নাই কেন?'

আমার সঙ্গে কেউ কড়া গলায় কথা বললে আমি সাধারণত কড়া গলায় জবাব দিই। কিন্তু দিনকাল ভালো নয়, কাজেই সহজ ভঙ্গিতে বললাম, 'আপনি কে?'

'তা দিয়ে আপনার দরকার কী?'

'আপনি কি ইজাবুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কাজ করেন? আপনাকে তো দেখি নি।'

'আপনি বেশি কথা বলেন। বেশি কথা বলা ঠিক না।'

'ঠিক না কেন বলেন তো?'

লোকটি কঠিন মুখে চুপ করে রইল।

ইজাবুদ্দিন সাহেব কিন্তু এমন ভাব করলেন, যেন আমি এক জন মহা সম্মানিত ব্যক্তি। গাড়ি থামামাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নরম স্বরে বললেন, 'আসতে কোনো তকলিফ হয় নাই তো?'

'না, কোনো তকলিফ হয় নি। ব্যাপারটা কী?'

'আরে না ভাই, কিছু না। কথাবার্তা বলার জন্যে ডাকলাম। আসেন, ভেতরে গিয়ে বসি।'

ভেতরে অনেক লোকজন বসে ছিল। এঁদের মধ্যে এক জনের মাথায় একটি ঝলমলে ঝুঁটিওয়ালা টুপি। লোকজন এখনো এই জাতীয় টুপি পরে, আমার জানা ছিল না। গাড়ির সেই শুকনো লোকটিকে দেখলাম আলাদা একটা টেবিলে। টেবিলে ফাইলপত্রও আছে। ইজাবুদ্দিন সাহেব বললেন, 'আপনার এইখানে এক জন লোক মারা গেছে শুনলাম। কীভাবে মারা গেল, কী সমাচার?'

আমি বেশ স্পষ্ট স্বরেই বললাম, 'মিলিটারিরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।'

'বলেন কী সাহেব!'

ইজাবুদ্দিন সাহেব এমন ভাব করলেন, যেন অকল্পনীয় একটি ঘটনা শুনলেন। সেই শুকনো লোকটি সরু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তুর্কি টুপি-পরা ভদ্রলোক বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। তিনি এক সময় গলার স্বর উঁচু করে বললেন, 'লোকটি কে?'

'আমার এক জন ভাড়াটে। পরহেজগার লোক। সাত বছর বয়স থেকে নামাজ কাজা করে নি।'

ইজাবুদ্দিন সাহেব থেমে থেমে বললেন, 'বড়োই আফসোসের কথা। সিপাইদের হাতে দু'-একটা এই রকম ঘটনা ঘটেছে। দশ জন মন্দের সাথে এক জন ভালোও শাস্তি পায়। দুনিয়ার নিয়মই এই। আমি ব্রিগেডিয়ার সাহেবকে নিজে বলব ব্যাপারটা। ভবিষ্যতে এই রকম যেন না হয়।'

আমি চুপ করে রইলাম। তুর্কি টুপি-পরা ভদ্রলোক বললেন, 'মৃত্যু স্বয়ং

আল্লাহ্‌পাকের হাতে। আল্লাহ্‌পাক যদি ঐ লোকের মৃত্যু মিলিটারির হাতে লিখে থাকেন, তা হলে হবেই। আপনি আমি কিছুই করতে পারব না। কি বলেন ইজাবুদ্দিন সাহেব?'

ইজাবুদ্দিন সাহেব কোনো উত্তর দিলেন না।

আমি বললাম, 'আপনি কি এইটার জন্যেই ডেকেছেন?'

'জ্বি না, আমি ডেকেছি অন্য ব্যাপারে। স্থানীয় কিছু গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে একটা শান্তিসভা হবে, যাতে মানুষের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়। সবারই এখন মিলেমিশে থাকা দরকার। আপনার বাবা ছিলেন এই অঞ্চলের এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। পাকিস্তান হাসেলের জন্যে তিনি যে কী করেছেন তা তো আপনি জানেন না, জানি আমি। জিন্নাহ্‌ সাহেবের সাথে তাঁর চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। তাঁর ছেলে হিসাবে আপনার শান্তিসভাতে থাকা দরকার।'

'আমি থাকব।'

'তা তো থাকবেনই। না থাকলে কি আর আমি ডাকতাম আপনাকে? মানুষ চিনি তো। আপনার দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল সেদিন। তিনি আবার ব্রিগেডিয়ার তোফাজ্জল সাহেবের বিশিষ্ট বন্ধু। ইংল্যাণ্ডে উনার সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার সাহেবের পরিচয়। জানি তো সব, হা-হা-হা।'

ইজাবুদ্দিন সাহেব আমাকে গাড়িতে করে ফেরত পাঠালেন। সেই শুকনো লোকটা এবারেও যাচ্ছে আমার সঙ্গে। তার ভাবভঙ্গি এখন আর আগের মতো নয়। খুব বিনীত অবস্থা। গাড়ি ছাড়ামাত্র বলল, 'কোনো রকম অসুবিধা হলে বলবেন আমাকে।'

'আপনাকে বলব কেন?'

'না, আমি মানে খোঁজখবর রাখি। অনেক রকম কানেকশন আছে, ইয়ে কি যেন বলে.........'

লোকটি থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

বাসায় এসে দেখি বড়ো আপা চিঠি পাঠিয়েছে, তাতে লেখা--'আগামী কাল দুপুরে আমরা নীলগঞ্জে চলে যাচ্ছি। তুমি অবশ্যই তোমার জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসবে। তোমার দুলাভাইয়ের ধারণা, অবস্থা খুব খারাপ।'

আমি অবস্থা খারাপের তেমন কোনো লক্ষণ দেখলাম না। সব কিছুই বেশ স্বাভাবিক। মুক্তিবাহিনীটাহিনী বলে কিছু নেই বলেই মনে হচ্ছে। বড়ো আপার ধারণা, মুক্তিবাহিনীর সমস্ত ব্যাপারটাই আকাশবাণী কলকাতার দেবদুলাল বাবুর কল্পনায়। বড়ো আপাকে ঠিক দোষও দেওয়া যায় না, কলকাতার খবরগুলির প্রায় বার আনাই মিথ্যা। তাদের খবর অনুসারে যেদিন মুক্তিবাহিনীর বোমায় মগবাজার বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন কেন্দ্র সম্পূর্ণ বিকল বলা হল, তার পরদিনই বড়ো আপার বাসায় যাবার সময় দেখি সব ঠিকঠাক আছে। আরেক দিন বলা হল--মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে

সম্মুখসমরের ফল হিসেবে ঢাকার রাজপথ আজ জনশূন্য। আমি দেখলাম দিব্যি লোকজন চলাচল করছে।

আমার জানামতে দু' জন লোককেই পাওয়া গেল, যাদের স্বাধীন বাংলা বেতার এবং কলকাতা বেতারের খবরের উপর পূর্ণ আস্থা। এক জন আমাদের আজিজ সাহেব, অন্য জন কাদের মিয়া। কাদের মিয়া আবার যা শোনে, তার তিন গুণ বলে। রাতে শোবার আগে সে ইদানীং নিচু গলায় বলছে, 'ছোড ভাই, মিলিটারির পাতলা পায়খানা শুরু হইছে।'

আমি এই জাতীয় আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ দেখাই না, কিন্তু কাদেরের কোনো উৎসাহর প্রয়োজন হয় না।

'বিবিসির খবর ছোড ভাই, চিটাগাং-এ পুরা ফাইট। ঢাকা শহরেও শুরু হইছে। খেইল জমতাছে ছোড ভাই।'

'কই, আমি তো কোনো খেইল দেখি না।'

'ছোড ভাই, এইসব তো দেখনের জিনিস না। ভিতরের ব্যাপার। ইসকুরু টাইট হইতাছে, ছোড ভাই।'

'টাইট দেওয়া হলে তো ভালোই।'

কাদেরের আগের ভাব এখন নেই। আগে সে বাড়িঘর ছেড়ে বড়ো আপার বাসায় গিয়ে ওঠার জন্যে ব্যস্ত ছিল, এখন সে-ব্যস্ততা নেই। তবে তার কাজ অনেক বেড়েছে। প্রতিদিনই এক বার মতিনউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে তার বৈঠক বসে। সেই বৈঠক রাত দশটা-এগারটা পর্যন্ত চলে। এক দিন দেখি--সে মতিনউদ্দিন সাহেবের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিচ্ছে। মতিনউদ্দিন সাহেব লাইটার এগিয়ে দিলেন। সকালবেলা নীলু যখন খবরের কাগজ পড়ে তার বাবাকে শোনায়, কাদের মিয়া সেখানেও হাজির থাকে। এবং পড়া শেষ হলে গম্ভীর হয়ে বলে, 'একটাও সত্যি খবর নাই।' এ ব্যাপারে আজিজ সাহেবও তার সঙ্গে পুরোপুরি একমত।

মগবাজারে বড়ো আপার বাসায় গিয়ে দেখি তাদের যাওয়া বাতিল হয়ে গেছে। বড়ো আপা মহাখুশি। কাপড়চোপড় স্যুটকেস থেকে নামান হচ্ছে। বেশ একটা খুশি খুশি ব্যস্ততা।

'তোমাদের যাওয়ার কী হল?'

'তোর দুলাভাইকে জিজ্ঞেস কর, আমি কিছু জানি না।'

দুলাভাই ঠিক পরিষ্কার করে কিছু বলেন না। তাঁর হাবভাবে মনে হল অবস্থা যতটা খারাপ মনে করেছিলেন, ততট. খারাপ নয়। এক দিনে অবস্থা হঠাৎ করে কীভাবে ভালো হয়ে গেল, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এক ফাঁকে বড়ো আপা বললেন--তাঁরা তাজমহল রোডের বিজলী মহল্লায় একটা চারতলা বাড়ি কিনবেন। পঁচানব্বই হাজার টাকা দিলেই পাওয়া যায়। যে-

অবাঙালীর বাড়ি, সে পাকিস্তান চলে যাবে--কাজেই জলের দরে সব কিছু বিক্রি করে দিচ্ছে। দেশের অবস্থা ভালো হলে ঐ লোককে জলের দরে সব কিছু বিক্রি করে চলে যেতে হচ্ছে কেন, তাও পরিষ্কার বোঝা গেল না।

দুলাভাই আমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিলেন। অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বললেন, 'এখানের এক জন ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা আছে। তোফাজ্জাল নাম। বেলুচ রেজিমেন্টের লোক। খুবই ভালো মানুষ।'

'আমি জানি, ইজাবুদ্দিন সাহেব বলেছেন।'

দুলাভাই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আর কী বলেছে ইজাবুদ্দিন?'

'নাহ্, আর কিছু বলে নি।'

দুলাভাই খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আমি এদের সঙ্গে মেলামেশা করি না। তোফাজ্জলকে বাসায় পর্যন্ত আসতে বলি না। আমাকে প্রায়ই টেলিফোন করে। কয়েক দিন আগে রাজশাহীর এক ঝুড়ি আম পাঠিয়েছে।'

আমি চুপ করে রইলাম। দুলাভাই ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'এদের সাথে বেশি মাখামাখি করা ঠিক না। শীলার বন্ধু লুনাকে তো চেন? ঐ যে খুব সুন্দর দেখতে?'

'হ্যাঁ চিনেছি।'

'ওদের বাড়িতে খুব যাতায়ত ছিল মিলিটারিদের। লুনার বাবা প্রায়ই পার্টিফার্টি দিতেন। এখন শুনলাম, এক মেজর নাকি লুনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। ক্লাস নাইনে পড়ে মেয়ে, চিন্তা করে দেখ অবস্থাটা।'

'বিয়ে হচ্ছে?'

দুলাভাই দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বললেন, 'না হয়ে উপায় আছে? তবে আমি লুনার বাবাকে বলেছি সবাইকে নিয়ে সরে পড়তে। লোকটা ঘাবড়ে গেছে।'

নীলুর সঙ্গে মতিনউদ্দিন সাহেবের বিয়ে সম্পর্কে যা শুনেছিলাম, তা বোধ হয় ঠিক নয়। বিলুকে এক দিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছে, 'দূর, কী যে বলেন! আপনিও কি মতিন ভাইয়ের মতো পাগলা নাকি?'

বিলুর কথা অবশ্যি ধর্তব্য নয়। সে কখন কী বলে, তার ঠিক নেই। কখন সে রেগে আছে আর কখন শরিফ মেজাজে আছে, তাও বোঝা মুশকিল। এক দিন জিজ্ঞেস করলাম, 'বিলু, মতিন সাহেব শুনলাম আমেরিকা ফিরে যাবেন, সত্যি নাকি?'

বিলু সঙ্গে সঙ্গে রেগে গেল। চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'যেতে চাইলে যাক, আমরা কি তাকে ধরে রেখেছি?'

'রাগ করছ কেন বিলু?' আমি বিব্রত হয়ে বললাম।

'রাগ করলাম কোথায়? রাগের কী দেখলেন? আমি কি আপনাকে বকেছি, না কিছু বলেছি?'

বিলু মেয়েটিকে আমার বড়োই দুর্বোধ্য মনে হয়। পনের-ষোল বছরের একটি মেয়ের মধ্যে এতটা দুর্বোধ্যতার কারণ আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

এক দিন দুপুরবেলা আমাকে এসে বলল, 'শফিক ভাই, "নীপা" শব্দের অর্থ জানা আছে আপনার?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'না তো? কী জন্যে?'

'জানবার জন্যে? "এসো নীপবনে এসো ছায়াবীথি তলে" এই গানটি শোনেন নি আপনি?'

'শুনেছি।'

'ঐ জায়গায় তো "নীপ" শব্দটি আছে--এর মানে কী? নীলু আপা জানতে চাচ্ছে?'

'জানি না আমি। চলন্তিকা দেখে বলতে হবে।'

'কখন বলবেন?'

'আমার কাছে চলন্তিকা নেই। খুঁজে দেখতে হবে, রফিকের হয়তো আছে। তার ছোট ভাই বইপত্রের পোকা।'

'বেশ, তাহলে আজকে সন্ধ্যার আগে বলবেন, খুব জরুরী।'

সন্ধ্যাবেলা নীপ শব্দের মানে জেনে ঘরে ফিরছি, গেটের কাছ দেখা নীলুর সঙ্গে। আমি বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললাম, 'নীপ শব্দের মানে হচ্ছে কদম্ব। নীপবন হচ্ছে কদম্ববন।'

নীলু মনে হল খুবই অবাক হল। আমি বললাম, 'বিলু বলছিল তুমি এর মানে জানতে চাও?'

নীলু ইতস্তত করে বলল, 'বিলু প্রায়ই আসে আপনার কাছে, তাই না?'

'তা আসে।'

'শফিক ভাই, ওকে আপনি প্রশ্রয় দেবেন না। বিলুর বয়স কম। এই বয়সে মেয়েরা অনেক মন-গড়া জিনিসকে সত্যি মনে করে।'

আমি অবাক হয়ে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম নীলুর দিকে। নীলু হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'জলিল সাহেবের স্ত্রীকে কি আপনি খবর পাঠিয়েছেন?'

'না। তার ভাইকে চিঠি দিয়েছি।'

'উত্তর এসেছে কোনো?'

'না।'

'আসলে আমাকে জানাবেন।'

৮

সকালে কাদেরকে সিগারেট আনতে পাঠিয়েছি, সে সিগারেট না নিয়ে ফিরে এল।

তার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

'ছোড ভাই, কাম সাফ! খেল খতম পয়সা হজম!!'

সে খবর এনেছে, জেনারেল টিক্কা খানকে মেরে ফেলা হয়েছে। এত বড়ো খবরের পর সিগারেটের মতো নগণ্য জিনিসের কথা তার মনে নেই। দু' দিন পরপর কাদের এই জাতীয় খবর নিয়ে আসে। এক বার খবর আনল বেলুচী এবং পাঞ্জাবী এই দুই দলের মধ্যে গণ্ডগোল লেগে ঢাকা কেন্টনমেন্টে দু' দলই শেষ। একদম পরিষ্কার।

আরেক বার দরবেশ বাচ্চু ভাইয়ের দোকান থেকে পাকা খবর আনল, মেজর জিয়া চিটাগং এবং কুমিল্লা দখল করে ঢাকার দিকে রওনা হয়েছে। দাউদকান্দিতে তুমুল 'ফাইট' হচ্ছে। রাত গভীর হলেই নাকি কামানের শব্দ শোনা যাবে।

বলাই বাহুল্য, টিক্কা খানের মৃত্যুসংবাদটিও বাচ্চু ভাইয়ের দোকান থেকেই এসেছে। আমি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে কাদেরকে দোকানে ফেরত পাঠালাম। সিগারেট ছাড়া আমি সকালের চা খেতে পারি না। কাদের ফিরল না। ঠিক দু' ঘন্টা অপেক্ষা করে নিচে নেমে দেখি আজিজ সাহেবের ঘরে মীটিং বসেছে। নেজাম সাহেব এবং মতিনউদ্দিন সাহেব দু' জনেই মুখ লম্বা করে বসে আছেন। আজিজ সাহেব পায়ের শব্দ শুনেই আমাকে ডাকলেন, 'শফিক, কী সর্বনাশ! আজকে বেরুবে না কোথায়ও। খবর শোন নি?'

'কী খবর?

'টিক্কা মারা গেছে।'

'কে খবর দিয়েছে? আমাদের কাদের মিয়া তো?'

'খবর দেওয়াদেওয়ির কিছু নেই শফিক! সবাই জানে। আমরা জানলাম সবার শেষে।'

আজিজ সাহেব 'আকাশবাণী' ধরে বসে আছেন। এরা খবর দিতে এত দেরি করছে কেন বুঝতে পারছি না। তারা শুধু বলেছে--'ঢাকা থেকে প্রচণ্ড গণ্ডগোলের খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া গেছে। বি বি সি দিনের বেলা পরিষ্কার ধরা যায় না, রাত না হওয়া পর্যন্ত সঠিক কী ঘটেছে,তা জানা যাবে না। নেজাম সাহেব বললেন, তিনি অফিসে যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিলেন, অবস্থা বেগতিক দেখে চলে এসেছেন। দোকানপাট যেগুলি খুলেছিল সে-সব বন্ধ করে লোকজন বাড়ি চলে গেছে। রাস্তাঘাটে রিকশার সংখ্যাও নগণ্য। মীরপুর রোডে চেকপোস্ট বসেছে। রিক্সা-গাড়ি সব কিছুই থামান হচ্ছে।

আজিজ সাহেব বললেন, 'কলিজা শুকিয়ে শুকনা কাঠ হয়ে গেছে শফিক। বাঙালী তো চিনে নাই। এখন চিনবে। ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখে নাই।'

আমাকে তারা কিছুতেই বের হতে দিল না। আজিজ সাহেব বললেন, 'আজকের দিনটা খুব সাবধানে থাকা দরকার। ওরা পাগলা কুত্তার মতো হয়ে আছে

তো, কী করে না-করে কিছুই ঠিক নাই।'

দুপুরের আগেই কী করে এত বড়ো একটা ঘটনা ঘটল, তা জানা গেল। জেনারেল টিক্কা খান ফাইলপত্র সই করছিলেন। এমন সময় তাঁর ইউনিটের এক জন বাঙালী অফিসার (সে-ই একমাত্র বাঙালী, যে এখনো টিকে আছে এবং পাক আর্মির কথামতো সমানে বাঙালী মারছে) জেনারেল টিক্কার ঘরে ঢুকল। তাদের মধ্যে ইংরেজিতে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল।

টিক্কা : কী ব্যাপার কর্নেল মইন? এত রাত্রে কোনো প্রয়োজন আছে?

মইন : জ্বি স্যার, আছে।

টিক্কা : বেশ, বলে ফেল। আমার হাতে সময় কম। আমি খুবই ব্যস্ত।

মইন : আপনার সময় কম, কথাটি স্যার সত্যি।

এক পর্যায়ে কর্নেল মইন (নামের ব্যাপারে খানিকটা সন্দেহ আছে। কেউ কেউ বলছে মেজর সাঈদ) রিভলবার বের করে পরপর তিনটে গুলী করলেন।

মতিনউদ্দিন সাহেবকে দেখে মনে হল তিনি কিছুটা দিশাহারা, যেন বুঝতে পারছেন না ঠিক কী হচ্ছে। আমাকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে নিচু স্বরে বললেন, 'টিক্কা সাহেবকে অন্যায়ভাবে মারাটা ঠিক হল না।'

আমার বদ্ধমূল ধারণা, মতিনউদ্দিন সাহেবের মাথায় ছিট আছে। এখন তিনি নেজাম সাহেবের সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ান। যেখানে তিনি আছেন, সেখানেই মতিন সাহেব আছেন। কাদেরের কাছে শুনলাম, নেজাম সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নাকি ভূত দেখেছেন। সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় বসে ছিলেন, সড়সড় শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখেন, জামগাছের ডালে কে যেন বসে আছে। কোনোদিকে কোনো বাতাস নেই, শুধু জামগাছের ডালটি নড়ছে। মতিন সাহেবকে দেখি সব সময় ঘরেই থাকেন; চাকরিবাকরি কিছুই করবেন না নাকি? জিজ্ঞেস করলেই হুঁ-হাঁ করেন, পরিষ্কার কিছু বলেন না।

টিক্কা খানের মৃত্যুপ্রসঙ্গে আমার যা-কিছু অবিশ্বাস ছিল, বিকালের দিকে তা ধুয়ে-মুছে গেল। বড়ো আপার বাসায় যাবার জন্যে বেরিয়েছি, দেখি সত্যি সত্যি খুব থমথমে অবস্থা। দোকানপাট বেশির ভাগই বন্ধ, লোকজন এখানে-ওখানে জটলা পাকাচ্ছে। ই পি আর হেড কোয়ার্টারের গেটের সামনে বালির বস্তা ফেলে দুর্গের মতো করা। বালির বস্তা আগেও ছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যুদ্ধের সাজসজ্জা। সায়েন্স ল্যাবরেটরির কাছে মেশিনগান বসান দু'টি কালো রঙের জীপ। সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে রিকশা নিয়ে চলে গেলাম মগবাজারে। রিকশাওয়ালাটি বৃদ্ধ। টানতে পারে না। পাক মটরস পর্যন্ত যেতেই তাকে তিন বার থামতে হল। যতক্ষণ থেমে থাকে, ততক্ষণ সে আমাকে খুশি রাখবার জন্যেই হয়তো গল্পগুজব করে। তার কাছ থেকেই জানলাম--জেনারেল টিক্কা একা মারা যায় নি। তার বউ এবং ছেলেটাও মারা গেছে।

'গুষ্টি নিকাশ হইছে স্যার। নিব্বংশ হইছে।'

আমি বললাম, 'খবর কোথায় পেলেন চাচা মিয়া?'

সে গম্ভীর হয়ে বলল, 'এই সব খবর কি স্যার গোপন থাকে? মুক্তিবাহিনীর লোক শহরে ঢুকছে। লাড়াচাড়া শুরু হইছে।'

'কী লাড়াচাড়া?

'যাত্রাবাড়িতে দুইটা ট্রাক উড়াইয়া দিছে। হেই রাস্তায় দুই দিন ধইরা লোক চলাচল বন্ধ।'

'যাত্রাবাড়ির দিকে গেছিলেন নাকি?'

'কী যে কন! উদিকে কেউ যায়?'

আমাকে দেখে বড়ো আপা বললেন, 'তুই আবার আসলি কী জন্যে? এই বৎসর আর জন্মদিনটিন কিচ্ছু করছি না।'

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। দুলাভাই বললেন, 'তুমিও আবার জন্মদিনটিন মনে রাখ নাকি, শফিক? আমার নিজেরও কিন্তু মনে নাই। হা-হা-হা। গিফটটিফট কিছু আছে সঙ্গে, না খালি হাতে এসেছ?'

তখন আমার মনে পড়ল, আজ জুলাইয়ের ৬ তারিখ--শীলার জন্মদিন। বড়ো একটা উৎসবের তারিখ।

'তোর জন্যে সকালেই গাড়ি পাঠাতাম। তোর দুলাভাই বলল অবস্থা থমথমে, তাই পাঠাই নি। তুই আবার জন্মদিনের জন্যে চলে আসলি? ঘর থেকে বার হওয়াই তো এখন ঠিক না।

আমি ইতস্তত করে বললাম, 'জন্মদিন ভেবে আসি নি। জন্মদিনটিন আমার মনে থাকে না।'

আপা তার স্বভাবমতো সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল। দুলাভাই ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন।

'দিলে তো তোমার আপাকে রাগিয়ে। জন্মদিন ভেবে আস নি, এটা বড়ো গলা করে বলার দরকার কী? তুমি দেখি ডিপ্লোমেসি কিছুই শিখলে না। হা-হা-হা।'

জন্মদিনের কোনো আয়োজন হয় নি, কথাটা ঠিক নয়। কিছুক্ষণ পরই দেখলাম শীলার বান্ধবীরা আসতে শুরু করেছে। এরা আশেপাশেই থাকে। এদেরকে বলা হয়েছে। লুনা মেয়েটি একটি গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরে এসেছে। তুলিতে আঁকা ছবির মতো লাগছে মেয়েটিকে। আমি আপাকে বললাম, 'এই মেয়েটির যে এক মেজরের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, হয়েছে?'

আপা সরু গলায় বলল, 'তোকে কে বলেছে?'

'দুলাভাইয়ের কাছে শুনলাম।'

'তোর দুলাভাইকে নিয়ে মুশকিল। পেটে কথা থাকে না। শুধু লোক-জানাজানি

করা, আর মানুষকে বিপদে ফেলা।'

আপা রাগে গজগজ করতে লাগল। আমি জানলে কী-রকম বিপদ হতে পারে, তা বুঝতে পারলাম না। আপার কথাবার্তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। যখন যা মনে আসে বলে। সব মেয়েরাই এ-রকম নাকি? আপা ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'জন্মদিন ভেবে আসিস নি, তো কী ভেবে এসেছিস? তোর তো দেখাই পাওয়া যায় না।'

টিক্কা খান মারা যাওয়ার পর দুলাভাইয়ের পরিকল্পনা কিছু বদলেছে কি না জানবার জন্যে আসলাম।'

'টিক্কা খান মারা গেছে, তোকে বলল কে?'

'মারা যায় নি?'

'টিক্কা খান কি মাছি যে থাবা দিয়ে মেরে ফেলবে?'

আপা কোনো এক বিচিত্র কারণে পাকিস্তানী মিলিটারি মারা পড়ছে--এই জাতীয় খবর সহ্য করতে পারে না। আমি আপার রাগী মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'দুলাভাইকে জিজ্ঞেস করলে সঠিক জানা যেত।'

'আমি যে বললাম, সেটা বিশ্বাস হল না?'

রাত্রে আমাকে থেকে যেতে হল। দুলাভাই আমাকে গাড়ি দিয়ে পৌঁছে দিতে রাজি হলেন না, আবার একা-একা ছাড়তেও চাইলেন না। বড়ো আপার বাসায় আমার রাত কাটাতে ভালো লাগে না। এখানে রাত কাটানর মানেই হচ্ছে সারা রাত বসার ঘরে বসে বড়ো আপা যে কী পরিমাণ অসুখী, সেই গল্প শোনা। দুলাভাই ঠিক দশটা ত্রিশ মিনিটে, 'তুমি তোমার দুঃখের কাহিনী এখন শুরু করতে পার' এই বলে দাঁত মাজতে যান এবং দশটা পঁয়ত্রিশে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েন। আপার দুঃখের কাহিনী অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় না। দুলাভাই ঘুমিয়ে পড়েছেন কি না, সেই সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ঘন্টাখানিক অপেক্ষা করে আকবরের মাকে চা আনতে বলে, তারপর গলার স্বর যথাসম্ভব নিচে নামিয়ে বলে, 'শফিক, জীবনটা আমার নষ্ট হয়ে গেছে। তুই তো বিশ্বাস করবি না। তোর দুলাভাই একটা অমানুষ।'

'কী যে তুমি বল আপা!'

'কী বলি মানে? তুই কি ভেতরের কিছু জানিস? তুই তো দেখিস বাইরেরটা।'

'বাদ দাও, আপা।'

'বাদ দেব কি? বাদ দেওয়ার কিছু কি আছে? তুই কি ভাবছিস আমি ছেড়ে দেব? নীপু যদি না ছাড়ে, আমিও ছাড়ব না।'

নীপু আমার মেজো বোন। গত পনের বছর ধরে সে আমেরিকার সিয়টলে থাকে। গত বৎসর খবর এসেছে, সে সেপারেশন নিয়ে আলাদা থাকে। আমি আপাকে বললাম, 'নীপুর সঙ্গে তুলনা করছ কেন?

'কেন তুলনা করব না? নীপু কি আমার চেয়ে বেশি জানে না নীপুর বুদ্ধি আমার চেয়ে বেশি? সে যদি সেপারেশন নিতে পারে--আমিও পারি। তুই কি ভাবছিস, আমি এমনি ছেড়ে দেব? ওর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব না?'

যেহেতু নীপু সেপারেশন নিয়েছে, কাজেই আপার ধারণা হয়েছে সেপারেশন নেবার মধ্যে বেশ খানিকটা বাহাদুরি আছে।

আজ রাত্রে বড়ো আপা তার দুঃখের কাহিনী শুরু করবার সুযোগ পেল না। ঘড়িতে এগারটা বাজল, তবু দুলাভাই ওঠবার নাম করলেন না।

আপা বলল, 'ঘুমাবে না?'

'নাহ্।'

'শরীর খারাপ?'

'নাহ্, শরীর ঠিক আছে।'

'শরীর ঠিক থাকলে ঘুমাতে যাচ্ছ না কেন? তোমার তো সব কিছ ঘড়ির কাঁটার মতো চলে।'

'এই নিয়েও তুমি একটা ঝগড়া শুরু করতে চাও?'

'আমি বুঝি সব কিছু নিয়ে ঝগড়া করি?'

'তা কর। আমি যদি এখন একটা হাঁচি দিই, এই নিয়েও তুমি একটা ঝগড়া শুরু করবে।'

'তুমি হাঁচি দিলেই ঝগড়া শুরু করব!'

'প্রথমে ঝগড়া, তারপর কান্নাকাটি, তারপর খাওয়া বন্ধ।'

বড়ো আপা মুখ কালো করে উঠে চলে গেল। দুলাভাই হোহো করে হেসে উঠলেন।

'কফি খাওয়া যাক। শফিক খাবে?'

'না, কফি ভালো লাগে না। চা হলে খেতে পারি।'

'আমি নিজে বানাচ্ছি, খেয়ে দেখ। খুব সাবধানে লিকার বের করব। সবাই পারে না, খেলেই বুঝবে।'

দুলাভাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই দক্ষিণ দিকে প্রচণ্ড একটা আওয়াজ হল। সমস্ত অঞ্চল অন্ধকার হয়ে পড়ল। দুলাভাই থেমে থেমে বললেন, 'খুব সম্ভব ট্রান্সমিশন স্টেশনটি শেষ করে দিয়েছে।'

শীলা ঘুম থেকে উঠে চিৎকার করতে লাগল। ঘন্টা বাজিয়ে কয়েকটা দমকলের গাড়ি ছুটে গেল। গুলীর আওয়াজ হল বেশ কয়েক বার। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কয়েকটি ভারি ট্রাক জাতীয় গাড়ি গেল।

আমরা সবাই শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইলাম। আমার জানা মতে সেটিই ছিল ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর প্রথম সফল আক্রমণ।

৯

দরবেশ বাচ্চু ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে।

বাচ্চু ভাই একা নয়, তার চায়ের দোকানে রাত ন'টার সময় যে ক'জন ছিল, সবাইকে। আমাদের কাদের মিয়া তাদের এক জন। এত রাত পর্যন্ত সে বাইরে থাকে না। রাত আটটায় বি বি সির খবর। এর আগেই সে আজিজ সাহেবের ঘরে উপস্থিত হয়। সেদিনই শুধু দেরি হল।

যে-ছেলেটি খবর দিতে এল সে দরবেশ বাচ্চু ভাইয়ের দোকানের বয়। দশ-এগার বছর বয়স। তাকেই শুধু ওরা ছেড়ে দিয়েছে। তার কাছে জানা গেল রাত ন'টার কিছু আগে দু'-তিন জন লোক এসেছে দোকানে। লোকগুলি বাঙালী। এদের মধ্যে এক জন বেঁটেমতো-মাথার চুল কোঁকড়ান। সে বলল, 'বাচ্চু ভাই এখানে কার নাম?'

বাচ্চু ভাই কাউন্টার থেকে উঠে এলেন।

'আমার নাম। কী দরকার?'

'একটু বাইরে আসেন।'

'ওরা বাচ্চু ভাইকে বাইরে নিয়ে একটা গাড়িতে তুলল। তারপর এসে বাকি সবাইকে বলল, 'জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে থানায় নিয়ে যাচ্ছি। ভয়ের কিচ্ছু নাই।'

আমি ছেলেটিকে বললাম, 'দোকানে তালা দিয়ে এসেছিস?'

'হ স্যার। ক্যাশ বাক্সের টেকাও আমার কাছে।'

'কত টাকা?'

'মোট তেত্রিশ টাকা বার আনা।'

'তুই আর এত রাত্রে যাবি কোথায়? থাক এখানে।'

'দরবেশ সাবের বাসাত একটা খবর দেওন দরকার।'

'সকালে দিবি, এখন আর যাবি কীভাবে? কার্ফু না?'

ছেলেটি মাথা চুলকাতে লাগল। বললাম, 'দরবেশ সাবের বাড়িতে আছে কে?'

'তাঁর পরিবার আছে। আর একটা পুলা আছে, নান্টু মিয়া নাম। খালি কান্দে।'

'তুই খাওয়াদাওয়া করেছিস?'

'জ্বি-না।'

'ভাত খা। এখন ঘর থেকে বার হওয়া ঠিক না।'

কাদের মিয়াকে ধরে নিয়ে গেছে, এই খবরে আমি বিশেষ বিচলিত বোধ করলাম না। সহজ স্বাভাবিকভাবেই চা বানালাম। রাতের জন্যে কাদের কিছু রান্না করে গেছে কিনা, তা দেখলাম হাঁড়ি-পাতিল উল্টে। ছেলেটার শোবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে কিছু গল্পগুজবও করলাম।

'বাড়ি কোথায়?'

'বিরামছরি, ময়মনসিং।'

'বাড়িতে আছে কে?'

'মা আছে, ভইন আছে, দুইটা ভাই আছে। চাইর জন খানেওয়ালা।'

'বোনের বিয়ে হয়েছে?'

'হইছিল, এখন পৃথ্যক।'

এক সময় বিলু এসে আমাকে নিচে ডেকে নিয়ে গেল। আজিজ সাহেবের জ্বর। তিনি কম্বল গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর সামনের চেয়ারে নেজাম সাহেব বসে আছেন। আমাকে দেখেই নেজাম সাহেব শুকনো গলায় বললেন, 'কাদের মিয়কে শুনলাম শুট করেছে।'

'ধরে নিয়ে গেছে। শুট করেছে কিনা জানি না।'

'কী সর্বনাশের কথা ভাই!' আজিজ সাহেব একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। থেমে থেমে বললেন, 'মনটা খুব খারাপ আজকে।'

আমি চুপ করে রইলাম। বিলু বলল, 'আপনার খাওয়া হয়েছে?'

'না।'

'আপনার জন্য ভাত বাড়ছি। আমি এখনো খাই নি। নীলু আপাও খায় নি।'

'না, আমি খাব না। কাদের রেঁধে গিয়েছে।'

'তবু খেতে হবে।'

নীলু বলল, 'ইনি খেতে চাচ্ছেন না, তবু জোর করছ কেন?'

'না, খেতেই হবে।'

আজিজ সাহেব বললেন, 'কাদেরের ব্যাপারে কী করবে?'

'করার তো তেমন কিছু নেই।'

'তা ঠিক।'

'সকালবেলা ইজাবুদ্দিন সাহেবের কাছে যাব।'

আর কোনো কথাবার্তা হল না। বিলু এসে বলল, 'আসুন ভাত দিয়েছি।'

আমি অস্বস্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। ভাত খেতে গিয়ে দেখি, নীলু খেতে আসে, নি। তার নাকি মাথা ধরেছে।

বিলু বলল, 'মাথা ধরছে না হাতি, আমার সঙ্গে রাগ। আপনাকে খেতে বলেছি তো, তাই তার রাগ উঠে গেছে। তার রাগ করবার কী?'

আমি চুপ করে রইলাম। বিলু বলল, 'সে অনেক কিছুই করে, যা আমার ভালো লাগে না। কিন্তু আমি কি রাগ করি?'

'রাগ কর না?'

'মাঝে মাঝে করি, কিন্তু কাউকে বুঝতে দিই না। আমার মুখ দেখে কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। এই যে কাদের বেচারা মারা গেল……'

'কাদের মারা গেছে বলছ কেন?'

'মিলিটারি ধরলে কি আর কেউ ফেরে? কেউ ফেরে না।'

উপরে এসে দেখি, ছেলেটি তখনো ঘুমায় নি। বারান্দায় বসে আছে।

'কি রে, ঘুমাস নি?'

'দরবেশ সাবের লাগি পেট পুড়ে।'

'পেট পুড়বার কিছু নাই। দেখবি সকালে ছেড়ে দেবে। মিলেটারির হাতে তো ধরা পড়ে নি। মিলিটারির হাতে ধরা পড়লে একটা চিন্তার কারণ ছিল।'

ছেলেটা গম্ভীর হয়ে বলল, 'না স্যার, দরবেশ সাবেরে আইজ রাইতেই গুল্লী করব।'

'দূর ব্যাটা, বলেছে কে তোকে?'

'আমার মনে অইতাছে স্যার। যেডা আমার মনে অয় হেইডা অয়।

বলে কী এই ছেলে! আমি সিগারেট ধরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম তার দিকে।

'দরবেশ সাবরে খাওন দিছে, না--দিছে--না শেষ খানাটা বালা হওয়ন দরকার। কী কন স্যার?'

'কী বলছিস এইসব?'

'দরবেশ সাব আর জিন্দা নাই, স্যার।'

আমি একটা কড়া ধমক লাগালাম। রাগী গলায় বললাম, 'দেখবি ভোরবেলা চলে এসেছে। দরবেশ মানুষ, তাকে খামাখা গুলী করবে কেন?

ইজাবুদ্দিন সাহেব আগের মতোই আমাকে খাতির-যত্ন করলেন। প্রায় দশ বার বললেন, 'আমার সাধ্যমতো খোঁজখবর করব। সন্ধ্যার মধ্যে ইনশাল্লাহ্ খবর বের করব।'

'ছাড়া পাবে তো?'

'যদি বেঁচে থাকে, তাহলে ইনশাল্লাহ্ ছাড়া পাবে।'

'বেঁচে না থাকার সম্ভাবনা আছে নাকি?'

'আছে শফিক সাহেব, সময় খারাপ। চারদিকে ঝামেলা, কারোর মাথাই ঠিক নাই।'

'কোনো খবর পেলে জানাবেন।'

'ইনশাল্লাহ্ জানাব। চিন্তা করবেন না। ফি আমানুল্লাহ্।'

'আমি সন্ধ্যার সময় এসে খোঁজ নেব।'

'কোনো দরকার নাই। কষ্ট করবেন কেন খামাখা?'

ইজাবুদ্দিন সাহেব আমাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'চীনা সৈন্যরা চলে আসছে, জানেন নাকি?'

'চীনা সৈন্য?'

'জ্বি, হাজারে হাজারে আসছে। যে-সব ফুটফাট শুনেন,সব দেখবেন খতম।'

'চীনা সৈন্য আসছে, এইসব বলল কে আপনাকে?'

'হা-হা-হা। খবরাখবর কিছু কিছু পাই। ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে খানা খেয়েছি গত সপ্তাহে। খুব হামদর্দি লোক।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'ইজাবুদ্দিন সাহেব।'

'জ্বি।'

'এই সব বিশ্বাস করবেন না। পাকিস্তানীদের অবস্থা খারাপ।'

'এইটা ভাইসাব আপনি কী বললেন?'

'ঠিকই বললাম। আপনি নিজেও সাবধানে থাকবেন।'

'মাবুদে এলাহী, আমি সাবধানে থাকব কেন? আমি কী করলাম?'

ইজাবুদ্দিন সাহেব কাজের লোক। বিকালবেলায় খবর আনলেন, কাদের মিয়া, পিতা বিরাম মিয়া, গ্রাম কুতুবপুর, থানা কেন্দুয়া--জীবিত আছে। দু'-এক দিনের মধ্যে ছাড়া পাবে। তবে দরবেশ বাচ্চু ভাই নামে কেউ ওদের কাস্টডিতে নেই। এই নামে কোনো লোককে আটক করা হয় নি।

দু' দিনের জায়গায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল, কাদের ফিরল না। আমি রোজই এক বার যাই ইজাবুদ্দিন সাহেবের কাছে। ভদ্রলোকের ধৈর্য সীমাহীন--একটুও বিরক্ত হন না। রোজই বলেন, 'বলছি তো ছাড়া পাবে। সবুর করেন। আল্লাহ্ দুই কিসিমের লোক পছন্দ করে, এক--যারা নেক কাজ করে, দুই--যারা সবুর করে। সবুরের মতো কিছু নাই।'

কাদেরের অনুপস্থিতিতে আমার খাওয়াদাওয়া হয় নিচতলায় নেজাম সাহেবদের ওখানে। ওদের একটি কাজের মেয়ে রান্না করে দিয়ে যেত। এখন আর আসছে না। এখন রান্না করছেন মতিনউদ্দিন সাহেব। চমৎকার রান্না। দৈনন্দিন খাবারের ব্যাপারটি যে এত সুখকর হতে পারে, তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। অবশ্য নেজাম সাহেব প্রতিটি খাবারের কিছু-না-কিছু ত্রুটি বের করেন।

'গরুর গোসতে কেউ টমেটো সস দেয়! করেছেন কী আপনি? খেতে ভালো হলেই তো হয় না। একটা নিয়ম-নীতি আছে। গোসতের সঙ্গে আলু ছাড়া আর কিছু দেওয়া যায় না।'

'কেন? দেওয়া যায় না কেন?'

'আরে ভাই যায় না, যায় না। কেন তা জানি না। টেস্টের চেয়ে দরকার ফুড ভ্যালু। বুঝলেন?'

নেজাম সাহেবের আরেকটি দিক হচ্ছে, নিতান্ত আজগুবী সব কুৎসা খুব বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে বলা। এগুলি হয় সাধারণত ভাত খাবার সময়। সেদিন যেমন জলিল সাহেবের প্রসঙ্গ তুললেন, 'জলিল সাহেবের স্ত্রীর ভাবভঙ্গি লক্ষ করেছেন?'

'কী ভাবভঙ্গি?'

'না, তেমন কিছু না।'

'তেমন কিছু না হলে লক্ষ করব কীভাবে?'

'জলিল সাহেবের ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা যেন কেমন কেমন।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'কেমন কেমন মানে?'

নেজাম সাহেব প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, 'জলিল সাহেবের ভাই বিয়ে-শাদি করেন নাই, জানেন তো?'

'না, জানি না। তাতে কী?'

নেজাম সাহেব আর কথা বললেন না। এক দিন চোখ ছোট করে বিলুর প্রসঙ্গ তুললেন, 'মেয়েটাকে দেখে কী মনে হয় আপনার, শফিক ভাই?'

'কী মনে হবে! কিছুই মনে হয় না।'

'তাই বুঝি?'

নেজাম সাহেব মাথা হেলিয়ে হে-হে করে হাসতে লাগলেন, যা শুনে গা রি রি করে। আমার অনুপস্থিতিতে এই লোকটি আমাকে নিয়ে কী বলে কে জানে?

চাঁদপুর থেকে জলিল সাহেবের ভাইয়ের একটি চিঠি এসেছে। তিনি গোটা গোটা হরফে লিখেছেন—

পরম শ্রদ্ধেয় বড়ো ভাই সাহেব,

সালাম পর সমাচার এই যে, আপনার পত্রখানি যথাসময়ে হস্তগত হইয়াছে। জলিল যে শেষ সময়ে আপনাদের মতো দরদী মানুষের সঙ্গে ছিল, ইহার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আমার হাজার শুকুর। সমগ্র জীবন আমি আল্লাহ্‌পাকের নিয়ামত স্বীকার করিয়াছি। গাফুরুর রাহিমের কোনো কাজের জন্য মন বেজার করি নাই। কিন্তু আজকে আমার মনটায় বড়োই কষ্ট। আপনি লিখিয়াছেন জলিলের মাথার কাছে দাঁড়ায়ে বোন নীলু ও বোন বিলু কাঁদতে ছিল। আল্লাহ্ তাদের বেহেস্ত নসিব করুক, হায়াত দরাজ করুক। জলিলের পরম সৌভাগ্য আপনাদের মতো মানুষের সহিত তাহার দেখা হইল। আপনি লিখিয়াছেন, তাহার মৃত্যুসংবাদ যেন এখন আর তাহার স্ত্রী ও কন্যার নিকট না দেই। আপনার কথাটি রাখিতে না পারার জন্য আমি বড়ই শরমিন্দা। হাদিসে জন্ম ও মৃত্যুসংবাদ গোপন না করার নির্দেশ আছে। আল্লাহ্‌পাক যাহাকে দুঃখ দেন, তাহাকে দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতাও দেন। গাফুরুর রাহিমের কাছে আপনার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ্‌পাক আপনার হায়াত দরাজ করুক, আমিন।

ইতি

আপনার স্নেহধন্য

আব্দুর রহমান

চিঠি পড়ে কেন জানি খুব মন খারাপ হয়ে গেল। আমি চিঠিটি হাতে নিয়ে আজিজ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। ঘরে ঢুকেই অপ্রস্তুত হয়ে দেখি বিলু মাথা নিচু করে কাঁদছে। আজিজ সাহেব এবং নীলু গম্ভীর হয়ে বসে আছে। আমাকে ঢুকতে দেখেই নীলু বিলু উঠে চলে গেল। আজিজ সাহেব এই প্রথম বারের মতো শব্দ শুনে আমাকে চিনতে পারলেন না, থেমে থেমে বললেন, 'কে, মতিনউদ্দিন?'

'জ্বি–না, আমি। আমি শফিক।'

'ও শফিক। বস। বস তুমি। মনটাতে খুব অশান্তি।'

আমি বেশ খানিকক্ষণ বসে রইলাম। আজিজ সাহেব কোনো কথা বললেন না। অন্য দিনের মতো বিলুকে ডেকে চায়ের ফরমাশ করলেন না। আমি যখন চলে আসবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি, তখন তিনি ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'আমি আমার মেয়ে দু'টিকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যাব।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কখন ঠিক করলেন?'

'অনেক দিন ধরেই চিন্তা করছিলাম। এখন মনস্থির করেছি। নেজাম সাহেবকে বলেছি আমাদের নিয়ে যেতে।'

'কবে নাগাদ যাবেন?'

'জানি না এখনো, নেজাম সাহেব অফিস থেকে ছুটি নেবেন, তারপর।'

আজিজ সাহেবেরা শুক্রবার দু'টার সময় সত্যি সত্যি চলে গেলেন।

যাবার আগে বিলু দেখা করতে এল আমার সঙ্গে। খুব হাসিখুশি ঝলমলে মুখ। এসেই জিজ্ঞেস করল, 'চট করে বলুন তো, সব প্রাণীর লেজ হয়, আর মানুষের হয় না কেন? চট করে বলুন।'

আমি চুপ করে রইলাম। বিলু হাসতে হাসতে বলল, 'কি, পারলেন না তো? না, আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই নেই।'

আমি বললাম, 'তোমাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে কে জানে?'

বিলু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আর দেখাটেখা হবে না। কিছু বলবার থাকলে বলে ফেলুন। কি, আছে কিছু বলবার?'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি, কিছু বলতে পরি না। নিচ থেকে নীলু তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকে, 'এত দেরি করছিস কেন, এই বিলু, এই?'

মতিনউদ্দিন সাহেব জিনিসপত্র নিয়ে উঠে আসেন দোতলায়। একা–একা নিচতলায় থাকতে ভয় লাগে তাঁর। তার উপর ক'দিন আগেই নাকি ভয়াবহ একটি স্বপ্ন দেখেছেন––একটি কালো রঙের জীপে করে তাঁকে যেন কারা নিয়ে যাচ্ছে। যারা নিয়ে যাচ্ছে, তাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে বোঝা যাচ্ছে লোকগুলি অসম্ভব বুড়ো। অনেক দূর গিয়ে জীপটি থামল। তিনি জীপ থেকে নামলেন। কিন্তু

বুড়ো লোকগুলি নামল না। যে–জায়গাটিতে তিনি নেমেছেন, সেটি পাহাড়ী জায়গা, খুব বাতাস বইছে। তিনি ভয় পেয়ে বললেন,'এই, তোমরা আমাকে কোথায় নামালে?'

বুড়ো লোকগুলি এই কথায় খুব মজা পেয়ে হোহো করে হাসতে লাগল। তিনি দেখলেন, জীপটি চলে যাচ্ছে। তিনি প্রাণপণে ডাকতে লাগলেন, 'এই––এই।'

১০

গত চার দিন ধরে মতিন সাহেব দোতলায় আমার সঙ্গে আছেন। এই চার দিন সারাক্ষণই তিনি আমার সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে আছেন। আমি বাজারে যাচ্ছি––তিনি সঙ্গে যাচ্ছেন। আমি ইজাবুদ্দিন সাহেবের কাছে কাদেরের খোঁজে যাচ্ছি, তিনি আছেন। আজকেও বেরুবার জন্যে কাপড় পরছি, দেখি তিনিও কাপড় পরছেন।

আমি থমথমে স্বরে বললাম, 'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।'

'আজ আমি একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন না।'

মতিনউদ্দিন সাহেব অত্যন্ত অবাক হলেন, 'সে কি, আমি একা–একা থাকব কীভাবে!'

'যে–ভাবেই থাকেন থাকবেন।'

তাঁকে রেখেই আমি বের হয়ে এলাম। এই লোকটি দিনে দিনে অসহ্য হয়ে উঠছে। এখন মনে হচ্ছে, সঙ্গে টাকাপয়সা নেই। আমার কাছে সেদিন একটি মিনোল্টা এস এল আর ক্যামেরা বিক্রি করতে চাইলেন। আমি বললাম, 'আপনার টাকাপয়সা নেই নাকি?'

'কিছু আছে। যা নিয়ে এসেছিলাম, খরচ হয়ে যাচ্ছে।'

'কাজটাজ কিছু দেখেন।'

'কী দেখব বলেন? ইউনিভার্সিটিতে কোনো পোস্ট এডভ্যার্টাইজ করছে না। মাষ্টারী ছাড়া আর কিছু তো করতেও পারব না আমি।'

'আত্মীয়স্বজন কে কে আছে আপনার?'

'আত্মীয়স্বজন কেউ নেই।'

'কেউ নেই মানে! এক জন বড়ো ভাই তো আছেন জানি। গাড়ি করে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার যার কথা ছিল।'

'ও রকিব ভাই, সে অনেক দূরসম্পর্কের আত্মীয়। তাছাড়া আমাকে সে পছন্দও করে না।,

'নীলুরাও তো শুনেছি আপনার আত্মীয়, ওদের সঙ্গে চলে গেলেন না কেন?'

মতিনউদ্দিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'ওরা আমাকে এখন আর পছন্দ করে না। বিলুর ধারণা আমার মাথা খারাপ। দেখেন তো অবস্থা! তবু আমি যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নীলু খুব রাগ করল।

মতিনউদ্দিন সাহেবকে একা ঘরে রেখেই আমি চলে এলাম। সারাক্ষণ কাউকে গাদাবোটের মতো টেনে বেড়ানর কোনো অর্থ হয় না। বাইরে বেরিয়ে আবার আমার খারাপ লাগতে লাগল। সঙ্গে নিয়ে এলেই হত। রাস্তার মোড় পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ালাম, ফিরে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসব? ঠিক তখনি কে যেন ডাকল,'ও ছোড ভাই, ও ছোড ভাই।'

চমকে তাকিয়ে দেখি, কাদের মিয়া। রিকশা করে আসছে। চোখ কোটরাগত, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে।

'এই কাদের, এই।'

'রিকশা ভাড়াডা দেন ছোড ভাই।'

'কখন ছাড়া পেলি?'

'এক ঘন্টার মতো হইব। বালা আছেন ছোড ভাই? আজিজ সাব আর নেজাম সাবে বালা?'

'তুই ভালো?'

'মতিনউদ্দিন সাবের শইলডা কেমন?

বলতে বলতে কাদের মিয়া হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। সেই রিকশায় করেই কাদেরকে ঘরে নিয়ে এলাম।

'ছোড ভাই, পেটে ভুখ লাগছে, চাইরডা ভাত খাওন দরকার।'

'তুই চুপচাপ বসে থাক। আমি ভাত বসাচ্ছি। শুয়ে থাকবি?'

'জ্বি-না।'

'ঘরে ঘি আছে। গরম গরম ভাত খাবি ঘি দিয়ে। রাত্রে মতিনউদ্দিন সাহেব রান্না করবে। খুব ভালো রাঁধে।'

কাদের বসে বসে ঝিমুতে লাগল। সে কোথায় ছিল, কেমন ছিল--আমি কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না।

'ছোড ভাই, নিচতলাটা দেখলাম খালি।'

'ওরা দেশের বাড়িতে চলে গেছে।'

'বালা করছে, খুব বালা কাম করছে।'

ভাত খেতে পারল না কাদের। খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ল।

'কিছুই তো মুখে দিলি না, এই কাদের।'

'শইলডা জুইত নাই ছোড ভাই।'

'শুয়ে থাক, আরাম করে শুয়ে থাক। ভয়ের কিছু নেই।'

সন্ধ্যার পর থেকে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। এবং যথারীতি কারেন্ট চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখি হারিকেন জ্বালিয়ে মতিনউদ্দিন সাহেব নেজাম সাহেবের ঘর থেকে বেরুচ্ছেন। এতক্ষণ সেখানেই বসে ছিলেন। আমার তাঁর কথা মনেই হয় নি। আমাকে দেখেই একগাল হেসে বললেন, 'ঝড়-বৃষ্টির রাতে মিলিটারি বের হবে না। আরাম করে ঘুমান যাবে। ঠিক না শফিক সাহেব?'

এই বলেই কাদেরের দিকে তাঁর চোখ পড়ল। ভীতস্বরে বললেন, 'মরে গেছে নাকি?'

'না, মরে নি।'

'আসছে কখন?'

'বিকালে।'

'আপনি আমাকে খবর দেন নি কেন? কেন আমাকে খবর দেন নি?'

মতিন সাহেব বড়োই রেগে গেলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

'আমাকে কেউ মানুষ বলে মনে করে না। যখন কাদেরকে ধরে নিয়ে গেছে, তখনো কেউ আমাকে বলে নি। আমি জেনেছি এক দিন পরে। কেন আপনারা আমার সঙ্গে এ-রকম করেন? আমি কী করেছি?'

হৈ-চৈ শুনে কাদের জেগে উঠল। মতিনউদ্দিন সাহেব হঠাৎ অত্যন্ত নরম স্বরে বললেন, 'তোমার জন্যে আমি খুব চিন্তা করেছি কাদের। হযরত শাহ্জালাল সাহেবের দরগাতে সিন্নি মানত করেছি।'

'আপনের শইলডা বালা?'

'আমার শরীর বেশি ভালো না কাদের। রাত্রে ঘুম হয় না। কিন্তু তোমার পায়ে কী হয়েছে? ভেঙে ফেলেছে নাকি?'

না, ভাঙে নাই।'

'বললেই হয়, ভাঙে নি? নিশ্চয়ই ভেঙেছে। পায়ে কোনো সেন্স আছে? চিমটি দিলে বুঝতে পার?'

'জ্বি, পারি।

মতিনউদ্দিন সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তুমি রাজাকারে ভর্তি হয়ে যাও কাদের মিয়া। তাহলে মিলিটারি তোমাকে কিছু করবে না। ভয়ডর থাকবে না, আরাম করে ঘুমাতে পারবে। যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবে। নব্বই টাকা বেতন পাবে, তার সঙ্গে খোরাকি। ভালো ব্যবস্থা। ভর্তি হয়ে যাও। কালকেই যাও।'

আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম মতিন সাহেবকে। লোকটির বয়স হঠাৎ করে যেন অনেক বেড়ে গেছে। অনিদ্রার জন্যে চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। মোটাসোটা থাকায় আগে যেমন সুখী-সুখী লাগত, এখন লাগে না। কেমন

উদভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি। সমস্ত চেহারাটাই কেমন যেন রুক্ষ।

মতিন সাহেব সেই রাত্রে আমাকে খুবই বিরক্ত করলেন। একটা চিঠি লিখছিলাম। তিনি পেছন থেকে বারবার সেই চিঠি পড়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি রাগী গলায় বললাম, 'কী করছেন এই সব!'

'দেখছি মিলিটারির বিরুদ্ধে কিছু লিখেছেন কিনা। চিঠি এখন সেন্সার হয়। আপনার লেখার জন্যে শেষে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

'আপনার ভয় নেই, মিলিটারির বিরুদ্ধে কিছু লিখছি না।'

'কী লিখেছেন, পড়ে শোনান।'

'আপনি ঘুমাতে চেষ্টা করেন মতিন সাহেব।'

'রাত্রে তো আমি ঘুমাই না। তার উপর আজকে আবার ইলেকট্রিসিটি নেই। মিলিটারির জন্যে খুব সুবিধা।'

'মতিন সাহেব।'

'জ্বি।'

'আপনি দয়া করে আপনার ঘরে যান তো।'

'কেন, আমি থাকলে কী হয়? আমি তো আর আপনাকে বিরক্ত করছি না। বসে আছি চুপচাপ।'

বহু কষ্টে রাগ থামালাম আমি। নেজাম সাহেব কবে যে ফিরবেন, আর কবে যে এই গ্রহের হাত থেকে বাঁচব কে জানে? মতিন সাহেব হঠাৎ উঠে জানালা বন্ধ করতে লাগলেন।

'জানালা খোলা থাকলে অনেক দূর থেকে আলো দেখা যায়। এত রাত পর্যন্ত আলো জ্বলা খুব সন্দেহজনক।'

'গরমে সিদ্ধ হয়ে মরব মতিন সাহেব।'

'গরম কোথায়, হারেকেনটা নিভিয়ে দেন। দেখবেন শীত-শীত লাগবে।'

১১

গলা ব্যথার জন্যে ওষুধ কিনতে গিয়েছি, দেখি ওষুধের দোকানে রফিকের ছোট ভাই। এ্যাসপিরিন কিনছে। আমাকে দেখে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমি অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিতে বললাম, 'এই যে, কী ব্যাপার?'

সে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। যেন আমাকে ঠিক চিনতে পারছে না। আমি হাসি-হাসি মুখে বললাম, 'তারপর, সব খবর ভালো তো? হানিমুন কোথায় করলে?'

সে তার উত্তর দিল না। এ্যাসপিরিনের দাম দিয়ে লম্বা মুখ করে বেরিয়ে গেল।

এই ছেলেটিকে আমি দু' চোখে দেখতে পারি না। তবু রাস্তায় দেখা হলে কথা বলি। সে-ই সবজান্তার ভঙ্গিতে দু' একটা জ্ঞানগর্ভ কথা বলেই গম্ভীর হয়ে থাকে। কিন্তু আজকে এ-রকম করল কেন? ছেলেটির সঙ্গে আমার মোটামুটি খাতির আছে। আমার নিজের ধারণা, আমি বোকা সেজে থাকি বলে ছেলেটা আমাকে খানিকটা পছন্দও করে। আমি ওষুধ কিনে বাড়ি না ফিরে চলে গেলাম রফিকের ওখানে। রফিক বাসায় ছিল না। তার ছোট ভাই বেরিয়ে এসে পাথরের মতো মুখ করে বলল, 'আমাদের টেলিফোন নষ্ট।'

'টেলিফোন করতে আসি নি, রফিকের সঙ্গে কথা ছিল।'

'দাদা তো সন্ধ্যার আগে আসবে না।'

রফিক এসে পড়ল মিনিট দশেকের মধ্যেই।

'কোনো কাজে এসেছিস?'

'না, দেখা করতে আসলাম। কাদের ছাড়া পেয়েছে, জানিস নাকি?'

'জানব না কেন, তুই-ই তো টেলিফোন করলি । আছে কেমন এখন?'

'ভালোই আছে। তোদের খবর কী?'

রফিক মুখ কালো করে বলল, 'তুই জানিস না কিছু?'

'না। কী জানব?'

'সারা ঢাকার লোক জানে, আর তুই জানিস না! আয় আমার সাথে, চায়ের দোকানটাতে গিয়ে বসি। সিগারেট আছে?'

চায়ের দোকানে রফিক খুব গম্ভীর হয়ে বসে রইল। আমি বললাম, 'বল কী হয়েছে?'

'আমার ছোট ভাই ফিরোজ, সে এখন আর তার বৌকে দেখতে পারে না। মেয়েটা থাকে বাপের বাড়ি। সে যায় না ওখানে। খুবই অশান্তি।'

'কারণটা কী?'

'কোনোই কারণ নেই। একটা গুজব উঠেছে বুঝলি--দু'-এক জন লোক বলাবলি করছে মেয়েটাকে নাকি এক বার মিলিটারিরা উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। দু' রাত নাকি রেখেছিল।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

'গুজব ছাড়া আর কিছুই না। এই সিগারেটের আগুন হাতে নিয়ে বলছি। কিন্তু ফিরোজের ধারণা, এইটা গুজব না। ঐটা তো আসলে একটা গরু, চিলে কান নিয়ে গেছে শুনলে চিলের পিছে দৌড়ায়।'

রফিক আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে নিচু গলায় বলল, 'ফিরোজকে দোষ দিয়ে কী হবে বল। আমার মায়েরও সেই রকম ধারণা। মা ঐদিন বলছিলেন-কোনো দোষ না থাকলে এই রকম একটা সুন্দরী মেয়েকে ফিরোজের কাছে বিয়ে দেয় কেন? ফিরোজের আছে কী?'

রফিক আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিল। আমি বললাম, 'আর চা নিস না। দুপুরবেলা গাদাখানিক চা খাওয়-ঠিক না।'

রফিক বলল, 'কাউকে বলিস না, তোকে একটা কথা বলছি--আমি ঠিক করেছি মুক্তিবাহিনীতে চলে যাব। আমার জীবনের কোনো দাম আছে নাকি? বেঁচে থাকলেই কি আর মরলেই কি। আমার আর সহ্য হচ্ছে না।'

'মুক্তিবাহিনীতে যাবি কীভাবে?'

'প্রথম মেঘালয়ে যাব। সেখানে গেলেই ব্যবস্থা হবে। সোর্স পাওয়া গেছে।'

'কবে যাবি?'

'দু'-এক দিনের মধ্যে যাব।'

'কাউকে বলেছিস বাড়িতে?'

'বাবাকে বলেছি।'

'চাচা কী বলেন?'

'কী বলেন, শুনে লাভ নেই। দে, আরেকটা সিগারেট দে।'

উঠে আসবার সময় রফিক ইতস্তত করে বলল, 'একটা কথা শফিক, আমার ভাইয়ের ব্যাপারটা একটু গোপন রাখিস। বড়ো লজ্জার ব্যাপার হয়েছে রে ভাই। সে আবার গত সোমবার নয়টা ফেনোবারবিটল খেয়েছে। চিন্তা করে দেখ!'

'কে খেয়েছে?'

'ফিরোজ, আর কে? কী লজ্জা ভেবে দেখ। স্টমাক ওয়াশটোয়াশ করাতে হয়েছে।'

ঘরে ফিরে দেখি বাচ্চু ভাই দরবেশের দোকানের সেই ছেলেটা (বাদশা মিয়া) এসে বসে আছে। কাদের বাচ্চু ভাই দরবেশের কোনো খবর পেয়েছে কিনা তাই জানতে এসেছে। কাদের গম্ভীর হয়ে বলছে, 'বাঁইচা আছে, এই খবর পাইছি।'

'কে কইছে?'

'ইজাবুদ্দিন সাব।'

'এইটা কেমুন কথা কাদের ভাই! ইজাবুদ্দিন সাব তো কইছে উল্টা কথা।'

'আমি কি তর সাথে মিছা কইছি?'

'না, তুমি মিছা কইবা ক্যান।'

'দরবেশ সাবের পরিবাররে কইছি চিন্তার কোনো কারণ নাই।'

'দেখা করনের কোনো উপায় হয় কাদের ভাই?

'দেখা করনের চিন্তা বাদ দে বাদশা। বাইচা আছে--এইটাই বড়ো কথা। কয় জন বাঁচে ক দেখি?'

'তা ঠিক।'

বাদশা মিয়া ছেলেটি খুব কাজের, সে একাই বাচ্চু ভাই দরবেশের দোকান চালু করে দিয়েছে। আগের মতো বিক্রি নেই, তবু বাজার খরচ উঠে যায়। বাচ্চু

ভাইয়ের পরিবারকে পথে বসতে হয় নি।

এক দিন গেলাম তার ওখানে চা খেতে। লোকজন নেই, খালিদোকান সাজিয়ে বাদশা মিয়া বসে আছে।

'কি রে, লোকজন তো কিছু নেই।'

'সকালের দিকে কিছু কিছু হয়।'

'চা তুই একাই বানাস, না অন্য কেউ আছে?

'জ্বি–না, আমি একলাই আছি, অন্য কেউ নাই।'

কিছুতেই তাকে চায়ের দাম দেওয়া গেল না। চোখ কপালে তুলে বলল, 'আপনার কাছ থাইক্যা দাম নেই ক্যামনে? কন কী স্যার!'

আমার প্রতি তার এই প্রগাঢ় ভক্তির কারণ কী, কে জানে?

বাড়িতে ফিরে এসে দেখি আজিজ সাহেবের কাছ থেকে লম্বা একটি চিঠি এসেছে। চিঠিটি লিখে দিয়েছে নীলু। দু'টি খবর জানা গেল সে–চিঠিতে। আজিজ সাহেব তাঁর মেয়েদের জন্যে বিয়ে ঠিক করেছেন। বিলুর বিয়ে হচ্ছে যে–ছেলেটির সঙ্গে সে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ফিফথ ইয়ারে পড়ে। দেখতে ভালো, বংশও ভালো। ছেলের বাবা স্কুলের হেডমাষ্টার। আজিজ সাহেব লিখেছেন––বর্তমান পরিস্থিতিতে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে ভালো। সমগ্র চিঠিতে নীলুর বিয়ে কোথায় হচ্ছে, কার সঙ্গে হচ্ছে, কিছুই লেখা নেই। নেজাম সাহেবের কথাও নেই। সেটিও বেশ রহস্যময়।

চিঠির সঙ্গে বিলুর একটি চিরকুটও আছে। আমি অসংখ্য বার পড়লাম সেটি।

'শফিক ভাই'

মতিন ভাইয়ের কাছে একটি চিঠি দিয়েছিলাম আপনাকে দেবার জন্যে। লিখেছিলাম এক মাসের মধ্যে অবশ্যি যেন তার জবাব দেন। আপনি দেন নি। এমন কেন আপনি?

বিলু।

মতিন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিলু কি যাবার আগে আপনাকে কোনো চিঠি দিয়েছিল?'

মতিন সাহেব অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনাকে দিতে বলেছিল। খুব নাকি জরুরী।'

'কোথায় সে–চিঠি?'

মতিন সাহেব চোখ কপালে তুলে বললেন, 'আমি কী করে বলব কোথায়?'

সে চিঠিটি আর কোথাও পাওয়া গেল না।

১২

মানুষ যে-কোনো অবস্থাতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। ফাঁসির আসামীও শুনেছি এক সময় মৃত্যুভয়ে অভ্যস্ত হয়ে যায়, নিয়মিত খাওয়াদাওয়া করে, তরকারিতে লবণ কম হলে মেটকে চৌদ্দপুরুষ তুলে গালি দেয়। সেই হিসেবে আমাদের দীর্ঘ ছ' মাসে মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হওয়া গেল না। তার মূল কারণ সম্ভবত অনিশ্চয়তা। রাস্তায় রিকশা নিয়ে বের হলে দু'টি সম্ভাবনা--মিলিটারিরা রিকশা থামাতে পারে, না-ও থামাতে পারে। থামলে ধরে নিয়ে যেতে পারে, না-ও ধরতে পারে। ধরে নিয়ে গেলে আবার ফিরে আসতে পারে, আবার না-ও ফিরে আসতে পারে। এই ধরনের অনিশ্চয়তায় বেঁচে থাকা যায় না।

যদি নিশ্চিতভাবে জানা যেত--এর বেশি আর কিছু হবে না, স্বাধীনতা-টাধিনতার কথা চিন্তা করে লাভ নেই, তাহলে হয়তো সময় এত দুঃসহ হত না। কিন্তু একটি আশার ব্যাপার আছে। এক দিন হয়তো আবার আগের মতো রাস্তায় ইচ্ছামতো হাঁটা যাবে। রাত বারোটায় চায়ের দোকানে বসে সিঙ্গেল চায়ের অর্ডার দেওয়া যাবে। স্বাধীনতা একেক জনের কাছে একেক রকম। এই মুহূর্তে আমার কাছে স্বাধীনতা মানে হচ্ছে, রাত এগারটায় রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে গম্ভীর হয়ে পানের পিক ফেলা। মতিনউদ্দিন সাহেবের কাছে স্বাধীনতার মানে খুব সম্ভব রাতের বেলায় জানালা খোলা রেখে (এবং বাতি জ্বালিয়ে রেখে) ঘুমানর অধিকার।

আজকাল আমি রাস্তায় দীর্ঘসময় হেঁটে বেড়াই। আগে কেউ আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করত না। এখন মাঝে-মাঝে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বাসা কোথায়? কোথায় যাচ্ছি? মুসলমান না হিন্দু (হিন্দু বলতে পারে না, বলে ইন্দু)? এক বার শুধু-শুধু দু ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখল। আমার ধারণা, নিছক ভয় দেখিয়ে মজা করবার জন্যেই। আমার সঙ্গে আরেকটি ছেলে ছিল। সে বাজার করে ফিরছে। বাজারের ব্যাগ থেকে ইলিশ মাছের লেজ বের হয়ে আছে। ছেলেটি কুলকুল করে ঘামতে শুরু করল. নেহায়েত বাচ্চা ছেলে। হয়তো কাজের ছেলেটা আসে নি, মা জোর করে পাঠিয়েছে। আমি বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক। এক্ষুণি ছেড়ে দেবে।' যে সেপাইটি আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে, সে এক বার এসে জিজ্ঞেস করল, 'কেয়া, ডর লাগতা?'

ছেলেটি কোনো কথা বলতে পারল না। আমি বললাম, 'ইলিশ মাছ কত দিয়ে কিনেছ?'

বেচারা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। প্রচণ্ড ঘামছে সে। আমি বললাম, 'এক্ষুণি ছাড়বে, ভয়ের কিছু নেই।'

'যদি না ছাড়ে?'

'কী যে বল! ছাড়বেই। তোমার নাম কী?'

লম্বামতো একটি মিলিটারি এগিয়ে এল এই সময়, এবং আমি কিছু বোঝবার আগেই প্রচণ্ড এক চড় মারল ছেলেটির গালে। আমি হাত বাড়িয়ে ছেলেটিকে টেনে তুললাম। তার ব্যাগ ছিটকে পড়েছে দূরে। সেখান থেকে আলুগুলি বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মিলিটারিটি আমাদের হাত নেড়ে চলে যেতে বলল। ছেলেটির গা কাঁপছিল, ঠিকমতো হাঁটতে পারছিল না। সে ফিসফিস করে বলল, 'আমাকে একটু বাসায় পৌঁছে দেবেন?' আমরা একটা রিকশা নিলাম। ছেলেটি রিকশায় উঠে ক্রমাগত চোখ মুছতে লাগল। আমার খুব ইচ্ছা হল বলি--আজ তুমি যে লজ্জা পেয়েছ, সে শুধু তোমার একার লজ্জা নয়--আমাদের সবার লজ্জা। কিন্তু কিছুই বললাম না। এই সব বড়ো বড়ো কথার আসলে তেমন কোনো অর্থ নেই।

আমি তাকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ছেলেটির মা এমন ভাব করতে লাগল, যেন আমি তাকে মিলিটারির হাত থেকে ছুটিয়ে এনেছি। আমার জন্যে হালুয়া এবং পরোটা তৈরি হল। হালুয়া খাবার সময় ভদ্রমহিলা একটা তালপাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগল। আমি বললাম, 'রোজার সময় দেখবেন এরা বেশি ঝামেলা করবে না। আর কয়েকটা দিন।'

আমাদের কাদের মিয়াও খবর আনল, প্রথম রোজার দিন সব আটক লোকদের ছেড়ে দেয়া হবে। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠকে বসবে। সব ঠিকঠাক। আমেরিকা নাকি শক্ত ধমক দিয়েছে ইয়াহিয়া খানকে। ইয়াহিয়া মিটমাটের জন্যে একটা পথ খুঁজছে।

'বুঝলেন ছোড ভাই, সাপ গিলার অবস্থা হইছে। না পারে গিলতে না পারে রাখতে।' কাদের পহেলা রমজানের জন্যে খুব উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তার উৎসাহের প্রধান কারণ, দরবেশ বাচ্চু ভাই ছাড়া পাবে।

দরবেশ বাচ্চু ভাই ছাড়া পেলেন না। রমজানের সময় অবস্থা অনেক বেশি খারাপ হল। আলবদর বাহিনী তৈরি হল। প্রথম বারের মতো অনুভব করলাম, কিছু কিছু যুদ্ধ সত্যি সত্যি হচ্ছে। নয়তো এতটা খারাপ অবস্থা হওয়ার কোনো কারণ নেই। ইজাবুদ্দিন সাহেবও অনেকখানি মিইয়ে গেলেন। বারান্দায় এখন আর তিনি এক শ' পাওয়ারের বাতি দু'টি জ্বালান না। ছয় রোজার দিন রাতে তারাবীর নামাজ শেষে ফেরবার পথে তিনি মারা পড়লেন। হাসিমুখে খবর আনল কাদের মিয়া। প্রচণ্ড ধমক লাগালাম কাদেরকে, 'এই লোকটার জন্য বেঁচে আছিস তুই কাদের। আর যেই হাসে হাসুক, তুই হাসিস না।'

কাদেরের হাসি বন্ধ হল না। চোখ ছোট-ছোট করে বলল, 'খেইল শুরু হইছে ছোড ভাই। বিসমিল্লাহ্‌ দিয়া শুরু।'

মতিনউদ্দিন সাহেব শুধু বললেন, 'মানুষ মারাটা ঠিক না। মানুষ মারাটা কোনো হাসির জিনিস না কাদের মিয়া। ইজাবুদ্দিন সাহেব মানুষের অনেক উপকার করেছেন।'

দুলাভাই খবর পাঠিয়েছেন এক্ষুণি যেতে হবে। দুলাভাইয়ের গাড়ির এই ড্রাইভারটি নতুন রাখা হয়েছে। লোকটি বিহারী। মিলিটারি গাড়ি থামালেই সে গলা বের করে একগাদা কথা হড়হড় করে বলে। ফলস্বরূপ গাড়ি থেকে নামতে হয় না।

দুলাভাইয়ের বাসায় গিয়ে দেখি, জিনিসপত্র গোছগাছ হচ্ছে। আপার মুখে আষাঢ়ের ঘনঘটা। দুলাভাই বললেন, 'ইণ্ডিয়া যুদ্ধে নামবে, বুঝলে নাকি শফিক? শহর ছাড়ার সময় হয়ে গেছে।'

'কখন ছাড়ছেন শহর?'

'আন্দাজ কর দেখি?'

'আজকেই যাচ্ছেন নাকি?'

'ঠিক। এক ঘন্টার মধ্যে। গাড়িতে করে যাব ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহে খবর দেয়া আছে।'

'হঠাৎ করে যাচ্ছেন দুলাভাই! আজকেই ঠিক করলেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'আজকে ঠিক করার পিছনে কোনো কারণ আছে?'

'আছে। সিরিয়াস কারণ আছে।'

'বলেন শুনি।'

'তার আগে বল, তুমি একটা কাজ করতে পারবে কিনা?'

'কী কাজ?'

'লুনাকে তো চেন, শীলার বান্ধবী--এক মেজর বিয়ে করতে চায় তাকে।'

'চিনি।'

'সেই মেয়েটিকে তোমার ওখানে নিয়ে রাখবে। শুধু আজকের রাতটা। কাল ভোরে মেয়ের এক চাচা এসে মেয়েকে নিয়ে যাবে। খবর দেওয়া হয়েছে, তাঁকে তোমার ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না দুলাভাই। মেয়েটা কোথায়?'

'এইখানেই আছে। শীলার ঘরে আছে।'

ব্যাপার মোটামুটি এই রকম, গত দশ দিন ধরে লুনা এই বাড়িতে আছে। মেয়ের বাবা-মা মেজর ভদ্রলোককে বলেছেন, মেয়ে চিটাগাং তার নানার বাড়িতে আছে। ঈদের পর আসবে। বিয়ের পাকা কথাবার্তা হবে তখন। মেজর সাহেব কিছুই বলেন নি। আজ সকালে কিছু লোকজন এসে মেয়ের বাবা-মাকে তুলে নিয়ে গেছে। দুলাভাইয়ের ধারণা, তাঁকে ধরতে আসবে আজকালের মধ্যে।

বড়ো আপা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মেয়েকে আমার এখানে রাখার কথা তো আমি বলি নি, তোর দুলাভাই গলা বাড়িয়ে বলেছে। এখন দেখ না ঝামেলা।'

'ঝামেলা তো সবারই আপা। তুমি ঝামেলায় পড়লে দেখবে সাহায্যের জন্যে লোক আসছে।'

'রাখ রাখ। লম্বা লম্বা কথা ভালো লাগে না। লম্বা কথা অনেক শুনেছি।'

বড়ো আপার ঢাকা ছাড়ার ইচ্ছা মোটেই নেই। তিনি আমার সামনেই এক বার দুলাভাইকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, সবচেয়ে ভালো হয় এই বাসা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথায়ও ওঠা।

'শফিকের ওখানে উঠতে দোষ কী? ঘর তো খালি পড়ে আছে।'

দুলাভাই অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ঢাকা শহরে এক ঘন্টার বেশি আমি থাকব না। ওরা আমাকে খুঁজছে।'

'তুমি তো শেখ মুজিব! তোমাকে না হলে ওদের ঘুম হচ্ছে না।'

দুলাভাই শান্ত স্বরে ড্রাইভারকে বললেন গাড়ি বের করতে। আমাকে বললেন, 'লুনাকে সবকিছু বলা হয়েছে, খুব শক্ত মেয়ে। একটুও ঘাবড়ায় নি।'

আমি বললাম, 'যদি ওর চাচা না আসে?'

'আসবেই। আর যদি না–আসে, তাহলে তুমি বুদ্ধি খাটিয়ে যা করবার করবে। মেয়ের এক দূরসম্পর্কের খালা আছে ঢাকায়। লুনার কাছে ঠিকানা আছে।'

'ওর বাবা–মার খবর ওকে বলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কান্নাকাটি করছে না?'

'আমাদের সামনে না। মেয়ে বড়ো শক্ত, মচকাবার মেয়ে না। আমি খুবই ইমপ্রেসড।'

দুলাভাই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'একটা টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছি, সেই টেলিফোন নাম্বারে ফোন করে বলবে যে আমি চলে গেছি।'

'কাকে বলব?'

'যে টেলিফোন রিসিভ করবে, তাকেই বলবে। বলবে মেসেজ রাখতে।'

'এইটি কি আপনার ব্রিগেডিয়ার বন্ধুর নাম্বার?'

'হ্যাঁ, তোমার ওর কাছে যাওয়ার দরকার নেই।'

১৩

লুনাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছি।

রাস্তায় নেমেই প্রচণ্ড ভয় লাগল। মনে হল রাস্তাঘাটগুলি যেন বড়ো নির্জন। যেন আজকেই ভয়ংকর একটা কিছু ঘটবে। শাহবাগের পাশে প্রকাণ্ড একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমার বুক কাঁপতে লাগল। মনে হল ওরা আজ অবশ্যই আমাদের গাড়ি থামাবে। ঠাণ্ডা স্বরে বলবে, 'তোমার সঙ্গের ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে আমরা নিয়ে যাব।' আমি বলব, 'জনাব, ও

একটি নিতান্ত বাচ্চা মেয়ে। ক্লাস নাইনে পড়ে।' ওরা দাঁত বের করে হাসবে। এবং হাসতে হাসতে বলবে, 'জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে বাচ্চা মেয়েরাই ভালো।'

আমি নিজেকে সাহস দেবার জন্যেই বললাম, 'লুনা, ভয়ের কিছু নেই। তুমি শান্তভাবে চুপচাপ বসে থাক।'

'চুপচাপই তো বসে আছি।'

'জানালা দিয়ে বারবার এদিক–ওদিক তাকাচ্ছ কেন? মাথাটা নিচু করে বস না।'

'আহ্, আপনি কেন এত ভয় পাচ্ছেন? মাথা নিচু করে বসব কেন শুধু শুধু?'

ড্রাইভার গাড়ি ছোটাচ্ছে ঝড়ের মতো। এত জোরে গাড়ি চালানর দরকারটা কী? শুধু শুধু মানুষের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করা। আমি বললাম, 'ড্রাইভার সাহেব, একটু আস্তে চালান।'

ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ফার্স্ট গিয়ারে নিয়ে এল, যা আরো সন্দেহজনক। যেই দেখবে, তারই মনে হবে বদ মতলব নিয়ে গাড়ির ভেতর কেউ বসে আছে, সম্ভবত একটি লুকান স্টেনগান আছে, সুবিধামতো টার্গেট পেলেই বের হয়ে আসবে।

বাড়ির সামনে এসেও আমার বুকের ধকধকানি কমে না। এত খাঁ–খাঁ করছে কেন চারদিক? আগে তো কখনো এ–রকম লাগে নি। আমি গলা উঁচিয়ে ডাকলাম, 'এই কাদের––কাদের।'

কাদেরের সাড়া পাওয়া গেল না। মতিনউদ্দিন সাহেব জানালা দিয়ে মাথা বের করে আবার কচ্ছপের মতো মাথা টেনে নিলেন। তার পরই ঝপাং করে জানালা বন্ধ করে ফেললেন। ভদ্রলোকের মাথা কি পুরোপুরিই খারাপ হয়ে গেছে?

'মতিন সাহেব, আপনি নিচে এসে স্যুটকেসটা নিয়ে যান দয়া করে।'

মতিন সাহেব নিচে নামলেন না। শব্দ শুনে বুঝলাম ভদ্রলোক অন্য জানালাগুলি বন্ধ করছেন।

লুনা বলল, 'আমি নিতে পারব।'

'তোমার নিতে হবে না। রাখ তুমি। মতিন সাহেব, ও মতিন সাহেব।'

কোনোই সাড়া নেই।

লুনা বলল, 'ঐ লোকটিরই কি মাথা খারাপ?'

'কে বলল তোমাকে?'

'শীলা। শীলা বলেছে।'

শীলা দেখলাম অনেক কিছুই বলেছে। এই বাড়িতে যে একটা তক্ষক আছে, তাও তার জানা। দোতলায় উঠেই বলল, 'এ বাড়িতে নাকি কুমিরের মতো বড়ো একটা তক্ষক আছে?'

'তা আছে।'

'কোথায়, দেখান তো।'

এই মেয়ে যে-অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় কেউ যে তক্ষকের খোঁজ করতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। আমি গম্ভীর মুখে লুনাকে বসিয়ে রেখে মতিন সাহেবের খোঁজ করতে গেলাম। তিনি কাদেরের ঘরে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

'দরজা খোলেন মতিন সাহেব।'

'ঐ মেয়েটা কে?'

'আমার ভাগ্নি। আপনি দরজা বন্ধ করে বসে আছেন কেন?'

মতিন সাহেব দরজা খুলে ফিসফিস করে বললেন, 'আপন ভাগ্নি?'

'তা দিয়ে দরকার কী আপনার?'

মতিন সাহেব দীর্ঘ সময় চুপচাপ থেকে বললেন, 'মেয়েটাকে আমি চিনি, শফিক সাহেব। আপনাকে আমি আগে বলি নি, এক দিন সন্ধ্যাবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা মিষ্টি গন্ধ। তাকিয়ে দেখি, মাথার কাছে একটি মেয়ে বসে আছে। মেয়েটার নাকের কাছে একটা তিল। এইটি সেই মেয়ে। দেখেই চিনেছি।'

আমি ভদ্রলোকের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই লোক তো বদ্ধ উন্মাদ।

মতিন সাহেব ফিসফিস করে বললেন, 'আপনার বিশ্বাস হয় না?'

'না। অন্ধকারের মধ্যে আপনি একটা মেয়ের নাকের তিল দেখবেন কী করে?'

'তাও তো ঠিক।'

'মেয়েটার নাকে কোনো তিল-টিল নেই, বিপদে পড়ে এসেছে, কাল সকালে চলে যাবে।'

'কী সর্বনাশ! রাত্রে থাকবে, আগে বলেন নি কেন?'

'আগে বললে কী করতেন?'

'না, মানে করার তো কিছু নেই।'

'যান, নিচে থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে আসেন। কাদের গেছে কোথায়?'

'জানি না। আমাকে কিছু বলে যায় নি।'

'কখন আসবে, তাও বলে নি?'

'নাহ্।'

লুনা অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ সহজ হয়ে গেল। কথাবার্তা বলতে শুরু করল। ভাবখানা এ-রকম, যেন এ-জাতীয় ব্যাপার প্রতিদিন ঘটছে। অপরিচিত জায়গায় অপরিচিত পুরুষদের মধ্যে রাত কাটানটা তেমন কিছু বড়ো ব্যাপার নয়। নিজের বাবা-মার কথা এক বারই শুধু বলল। তক্ষকরা কী খায়, সেই গল্প বলতে বলতে হঠাৎ বলে ফেলল, 'আপনার কি মনে হয়, আব্বা-আম্মা ছাড়া পেয়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে? আমার ঠিকানা তো তারা জানে না।'

প্রশ্নটি এত আচমকা এসেছে যে, আমার জবাব দিতে দেরি হল। আমি থেমে থেমে বললাম, 'খুবই সম্ভব। তবে তারা নিশ্চয়ই তোমার চাচার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আর তোমার চাচা তো আমার ঠিকানা জানেন।'

'তা ঠিক, এটি আমার মনেই হয় নি।'

তার মুখ দেখে মনে হল বড়ো একটি সমস্যার খুব সহজ সামাধান পাওয়া গেছে। এ নিয়ে আর চিন্তার কিছু নেই। আমি বললাম, 'তুমি হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম কর। কাদের এসে এই ঘর তোমার জন্যে ঠিকঠাক করবে। চা খাবে? খিদে লেগেছে? ঘরে অবশ্যি কিছু নেই। শুধু শুধু চা এক কাপ খাও।'

'কে বানাবে চা, আপনি?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'শীলা বলেছে আপনি কিছুই করতে পারেন না। চা পর্যন্ত বানাতে জানেন না। এই জান্যেই চাকরিটাকরি কিছুই করেন না। শুধু ঘরে বসে থাকেন।'

'আর কী বলেছে?'

'আর বলেছে আপনি কাক পোষেন। আপনি যে দিকেই যান, দশ-বারোটা কাক কা-কা করতে করতে আপনার পেছনে পেছনে যায়।'

লুনা খিলখিল করে হেসে উঠল। বহুদিন আমার এই অগোছাল নোংরা ঘরে এমন মন খুলে কেউ হেসে ওঠে নি। আমার মনে হল, সব যেন আগের মতো হয়ে গেছে। আর ভয়ে ভয়ে রাস্তায় বের হতে হবে না। রাতের বেলা জীপের শব্দ শুনে কাঠ হয়ে বিছানায় বসে থাকতে হবে না। লুনা বলল, 'আপনি আবার রাগ করলেন নাকি?'

কাদের এসে নিমেষের মধ্যে ঘরদোর গুছিয়ে ফেলল। চাল-ডালের টিন দু'টি কোথায় যেন সরিয়ে ফেলল। নতুন টেবিলক্লথ বের হল। বিছানার চাদর নিয়ে রমিজের দোকান থেকে ইস্ত্রি করিয়ে আনল। বইয়ের শেলফ গুছিয়ে, মতিন সাহেবকে নিয়ে ধরাধরি করে বড়ো ট্রাঙ্কটা সরান হল। এতে নাকি হাঁটা-চলার জায়গা বেশি হবে। এক ফাঁকে আমাকে এসে ফিসফিস করে বলে গেল, 'মেয়েছেলে না থাকলে ঘরের কোনো 'সুন্দর্য' নাই। এই কথাটা ছোড ভাই খুব খাঁটি। লাখ কথার এক কথা।'

লুনার থাকার ব্যবস্থা হল আমার ঘরে। আমি গেলাম কাদেরের ঘরে। মতিন সাহেব বললেন, তিনি বারান্দায় বসে থাকবেন। ঘরে একটি মহিলা আছে, সবাই ঘুমিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না। তাঁর যখন এমনিতেই ঘুম হয় না, কাজেই অসুবিধা কিছু নেই। আমি লুনাকে বেশ কয়েক বার বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই, একটা রাত দেখতে-দেখতে কেটে যাবে। আর যদি ভয়টয় লাগে, ডাকবে। আমার খুব সজাগ ঘুম।'

'না, আমার ভয় লাগছে না।'

কাদের বলল, 'চিন্তার কিছু নাই আফা। কোনো বেচাল দেখলেই আমার কাছে খবর আসব। লোক আছে আমার আফা, আগের দিন আর নাই।'

কাদের যে এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠেছে, বেচাল দেখলেই তার কাছে খবর চলে আসবে--তা জানা ছিল না। সে কয়েক দিন আগে ঘোষণা করেছে--'এইভাবে থাকা ঠিক না। কিছু করা বিশেষ প্রয়োজন।'

মতিন সাহেবের কাছে শুনলাম কাদের নাকি কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, তারা তাকে নিয়ে যাবে। কখন নেবে, কি, তা গোপন। হঠাৎ এক দিন হয়তো চলে যেতে হবে। এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে তার কোনো কথা হয় নি। সরাসরি আমার সঙ্গে কথা বলার বোধহয় তার ইচ্ছাও নেই।

লুনা রাত দশটা বাজতেই ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল। আমি শুতে গেলাম রাত বারটার দিকে। শোয়ামাত্রই আমার ঘুম আসে না। দীর্ঘ সময় জেগে থাকতে হয়। এপাশ-ওপাশ করতে হয়। দু'-তিন বার বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে পানি দিতে হয়। বিচিত্র কারণে আজ শোওয়ামাত্রই ঘুম এল। গাঢ় ঘুম। ঘুম ভাঙল অনেক রাতে। দেখি অন্ধকারে উবু হয়ে বসে কাদের বিড়ি টানছে। আমাকে দেখে হাতের আড়ালে বিড়ি লুকিয়ে ফেলে নিচু গলায় বলল, 'মেয়েডা খুব কানতেছে ছোড ভাই। মনটার মইদ্যে বড় কষ্ট লাগতাছে।'

প্রথম কিছুক্ষণ কিছুই শুনতে পেলাম না। তারপর অস্পষ্ট ফোঁপানির আওয়াজ শুনলাম। মেয়েটি নিশ্চয়ই বালিশে মুখ গুঁজে কান্নার শব্দ ঢাকার চেষ্টা করছে। আমি উঠে দরজার কাছে যেতেই কান্না অনেক স্পষ্ট হল। মাঝে-মাঝে আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে--'আম্মি আম্মি।' আমি কিছুই বললাম না। কিছু কিছু ব্যক্তিগত দুঃখ আছে, যা স্পর্শ করার অধিকার কারোরই নেই। মতিন সাহেব অনেকটা দূরে ইজিচেয়ারে মূর্তির মতো বসে ছিলেন, আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে ধরা গলায় বললেন, 'মেয়েটা খুব কাঁদছে। কী করা যায় বলেন তো?'

'কিছুই করার নেই।'

'তা ঠিক, কিছুই করার নেই। বড়ো কষ্ট লাগছে, আমিও কাঁদছিলাম।'

বলতে-বলতে মতিন সাহেব চোখ মুছলেন। দু' জন চুপচাপ বারান্দায় বসে রইলাম। একসময় কাদেরও এসে যোগ দিল। শেষ রাতের দিকে বৃষ্টি পড়তে লাগল। জামগাছের পাতায় সড়সড় শব্দ উঠল। লুনা ফোঁপাতে ফোঁপাতে ডাকল, 'আম্মি আম্মি।' পরদিন লুনার চাচা লুনাকে নিতে এলেন না।

সন্ধ্যার পর মডার্ন ফার্মেসী থেকে টেলিফোন করতে চেষ্টা করলাম। অপারেটর বলল, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ নষ্ট। কখন ঠিক হবে তা জানে না। আমি বাসায় ফিরে দেখি লুনা মুখ কালো করে বসে আছে।

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই কোনো কাজে আটকা পড়েছেন। কাল নিশ্চয়ই আসবেন।'

লুনা কোনো কথাটথা বলল না।

'কালকে আমি তোমার খালার বাসা খুঁজে বের করব। চা খেয়েই চলে যাব। তোমার কাছে ঠিকানা আছে না?'

'জ্বি—আছে।'

'আমি খুব ভোরেই যাব। যদি এর মধ্যে তোমার চাচা চলে আসেন, তাহলে তুমি তাঁর সঙ্গে চলে যাবে। অবশ্যই যাবে। আমার জন্যে অপেক্ষা করবে না।'

লুনা শান্ত স্বরে বলল, 'না। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।'

'আমার ফিরতে কত দেরি হবে, কে জানে। হয়তো আটকা পড়ে যাব রাস্তায়। তুমি অপেক্ষা করবে না। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায় ততই ভালো।'

রাত্রে ভাত খাওয়ার জন্যে ডাকতে গিয়ে দেখি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

'আমি ভাত খাব না।'

'তোমার কি শরীর খারাপ লুনা?'

'জ্বি—না।'

'জ্বর না তো? চোখ—মুখ কেমন যেন ফোলা—ফোলা লাগছে।'

'জ্বরটর না। কিছু খেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।'

'দুধ খাবে? ঘরে কলা আছে।'

'জ্বি—না। আমি কিছুই খাব না।'

আমি ফিরে আসছি, হঠাৎ লুনা খুব শান্ত স্বরে বলল, 'আমার মনে হয় কেউ আমাকে নিতে আসবেন না।'

শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি টিকটিকি ডাকল। লুনা বলল, 'দেখলেন তো, টিকটিকি বলছে "ঠিক ঠিক"। তার মানে কেউ আসবে না।'

১৪

ঠিকানা নিয়ে যে—বাড়িতে উপস্থিত হলাম সেটি তালাবন্ধ। গেটে 'টু লেট' ঝুলছে। বাড়িওয়ালা আশেপাশেই ছিলেন, আমাকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, 'বাড়ি ভাড়া করবেন? খুব সস্তায় পাবেন। সারভেন্টের জন্য আলাদা বাথরুম আছে এখানে। গত বছর দেওয়াল ডিসটেম্পার করলাম।'

বাড়িভাড়ার জন্যে আসি নি, খোরশেদ আলি সাহেবের খোঁজ করছি——শুনে ভদ্রলোক খুব হতাশ হলেন।

'এরা থাকে না এখানে——জুন মাসে বাড়ি ছেড়ে গেছে। অঞ্চলটা নাকি নিরপাদ না। বলেন দেখি কোন অঞ্চলটা নিরাপদ? আমি তো এখানেই আছি, আমার কিছু হয়েছে? বলেন দেখি?'

'খোরশেদ আলি সাহেবরা এখন থাকেন কোথায় জানেন?'

'ঠিকানা আছে। গিয়ে দেখবেন, সেইখানেও নেই। নিরাপদ জায়গা যারা খোঁজে তারা এক জায়গায় থাকে না। ঘোরাঘুরি করে।'

ভদ্রলোক ঠিকানা বের করতে এক ঘন্টা লাগালেন। শেষ পর্যন্ত ঠিকানা যেটা পাওয়া গেল, সেটায় বাড়ির নম্বর দেওয়া নেই। লেখা আছে মসজিদের সামনের হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মসজিদের সামনেই বাড়ি, তাই মনে করেছে খুব নিরাপদ। বুদ্ধি নেই, লোক তো গাছে হয় না, মায়ের পেটেই হয়।'

বহু ঝামেলা করে মসজিদের সামনের হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি খুঁজে বের করলাম। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের কথাই ঠিক। খোরশেদ আলি সাহেব এখানেও নেই। কোথায় গেছেন, তাও কেউ জানে না। বাসায় ফেরার পথে মনে হল, লুনার চাচা ভদ্রলোক হয়তো আমার ঠিকানাই হারিয়ে ফেলেছেন। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে সবচেয়ে জরুরী কাগজটা হারিয়ে ফেলা। ঠিকানা হারিয়ে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বড়ো আপার বাসায় খোঁজাখুঁজি করছেন। অবশ্যি এ-যুক্তি তেমন জোরাল নয়। বড়ো আপার বাসায় দারোয়ান শমসের মিয়া আমার ঠিকানা খুব ভালো করে জানে। তবে এটা অসম্ভব নয় যে, শমসের মিয়াকে বিদায় দিয়ে নতুন লোক রাখা হয়েছে। খুব সম্ভব বিহারী কেউ। গাড়ির ড্রাইভার যেমন বিহারী রাখা হয়েছে সে-রকম। এ-যুক্তি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য মনে হওয়ায় আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে বড়ো আপার বাসায় দুপুর দু'টার দিকে উপস্থিত হলাম। না, শমশের মিয়াই আছে এবং কেউ এ-বাড়িতে আসে নি। আসবার মধ্যে পিয়ন এসেছে।

'খাওয়ার কিছু আছে শমসের মিয়া?'

'ঘর তো তালা দেওয়া, ছোট ভাই। চাবি মেমসাবের কাছে।'

'তোমার কাছে কিছু নাই?'

'মুড়ি আছে।'

'দাও দেখি। তেল মরিচ দিয়ে মেখে। চিঠিপত্র কী আছে দেখি।'

'চিঠি এসেছে অনুর কাছ থেকে। বড়ো আপার কাছে লেখা দীর্ঘ চিঠি (অনু আমাকে কখনো চিঠি লেখে না, নববর্ষের সময় কার্ড পাঠায়)। বড়ো আপার কাছে লেখা চিঠি আমার পড়তে কোনো দোষ নেই, এই চিন্তা করে চিঠি খুলে ফেললাম, চিঠি পড়ে বড়োই কষ্ট লাগল। এই যে, এত বড়ো একটা দুঃসময় যাচ্ছে আমাদের, সেই সম্পর্কে শুধু একটি লাইন লেখা, 'দেশের খবর শুনে খুব চিন্তা লাগছে, সাবধানে থাকবি।' তার পরপরই তিন পৃষ্ঠা জুড়ে মন্টানা যাওয়ার পথে কী ঝামেলা হয়েছিল সেটা লেখা : "আইডাহো ছাড়ার পাঁচ ঘন্টা পর গাড়ির ট্রান্সমিশন গেল বন্ধ হয়ে। হাইওয়েতে দু' ঘন্টা বসে থাকতে হল। শেষ পর্যন্ত হাইওয়ে পেট্রল পুলিশ এসে রাত তিনটায় একটা অতি বাজে হোটেলে নিয়ে তুলল। পেটে প্রচণ্ড খিদে।

ভেণ্ডিং মেশিনে আপেল আর মিল্ক চকোলেট ছাড়া কিছু নেই। বাধ্য হয়ে আপেল আর চকোলেট খেয়ে ঘুমাতে যেতে হল সবাইকে। আর ঘুম কি আসে? এয়ারকুলারটা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ।"

শমসের মিয়া এক গামলা মুড়ি নিয়ে এল। কাঁচামরিচ যে ক'টা ঘরে ছিল, সবই বোধ হয় দিয়ে দিয়েছে। ঝালের চোটে চোখে পানি আসার যোগাড়। শমশের মিয়া গলা নিচু করে বলল, 'জায়গায়-জায়গায় নাকি যুদ্ধ শুরু হইছে, কথাডা সত্যি ছোট ভাই?'

'সত্যি।'

'দেশ স্বাধীন হইলে গরিবদুঃখীর কোনো চিন্তা থাকত না, কী কন ছোট ভাই?'

'না থাকারই কথা।'

'খাওয়া-খাদ্য থাকব বেশুমার।'

'তা থাকবে।'

'খারাপের পরে বালা দিন আয়, এইটা বিধির বিধান।'

'খুবই খাঁটি কথা, শমসের মিয়া।'

'চিন্তা করলে মনটার মইদ্যে শান্তি হয়।'

বাড়ি ফিরে শুনি লুনার চাচা আজকেও আসেন নি। লুনার জ্বরও বেড়েছে। কাদের এক জন ডাক্তার নিয়ে এসেছিল। ওষুধপত্র দিয়েছে আর বলেছে রক্ত পরীক্ষা করতে।

লুনা আমাকে দেখে বলল, 'কাউকে পান নি?'

'কাল ঠিক পাব। সকালেই গুলিস্তান থেকে বাস নিয়ে চলে যাব নারায়ণগঞ্জ।'

'আপনি যে সারা দিন ঘোরাঘুরি করেন, আপনার ভয় লাগে না?'

'নাহ্, আমার অচল পা দেখেই মিলিটারিরা মনে করে, একে নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না।'

লুনা গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনি ভাবছেন আপনার কথা শুনে আমি হাসব? আমাকে যতটা ছোট আপনি ভাবছেন, তত ছোট আমি না। আমি অনেক কিছু বুঝি।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। লুনা শান্ত স্বরে বলল, 'এই যে আমার কাল রাত থেকে জ্বর, আপনি কি আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখেছেন--কতটা জ্বর? আপনি কি মনে করেন, আমি জানি না কেন আপনি এ-রকম করছেন? আমি ঠিকই জানি।'

'কি জান?'

লুনা থেমে থেমে বলল, 'গায়ে হাত দিলেই আমি অন্য কিছু ভাবব, বলেন, ভাবছেন না? আমি সব বুঝতে পারি। আমি যদি কালো, কুৎসিত একটা মেয়ে

হতাম--আপনি ঠিকই আমার গায়ে হাত দিয়ে জ্বর দেখতেন। দেখেন টিকটিকি টিকটিক করছে, তার মানে সত্যি।'

আমি লুনার কপালে হাত দিয়ে দেখি বেশ জ্বর গায়ে। স্বাভাবিক সুরে বললাম, 'লুনা তুমি শুয়ে থাক, আমি ভাত খেয়ে আসছি। আর তুমি যা বলেছ সেটা ঠিক। খুবই ঠিক।'

রান্নাঘরে ঢুকতেই মতিনউদ্দিন সাহেব বললেন, 'খতমে জালালীটা শুরু করা দরকার। লুনার চাচা আসছে না। এদিকে আবার জ্বরজ্বারি। এক লাখ পঁচিশ হাজার বার 'দোয়া ইউনুস' পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। খুব শক্ত খতম এটা।'

ভাত খেতে বসে শুনলাম দূরে কোথায় যেন গোলাগুলী হচ্ছে। থেমে থেমে বন্দুকের আওয়াজ। মতিন সাহেব মাখা ভাত রেখে উঠে পড়লেন। তাকিয়ে দেখি তাঁর পা ঠকঠক করে কাঁপছে। কাদের বলল, 'ভয়ের কিছু নাই। নিশ্চিন্ত মনে ভাত খান।'

'আমার খিদে নেই। বমি বমি লাগছে।'

খানিকক্ষণ পর ভারি ভরি দু'টি ট্রাক গেল। মতিন সাহেব ভীত স্বরে বললেন, 'সব বাতিটাতি নিভিয়ে ফেলা দরকার।'

তিনি দিশাহারার মতো জানালা বন্ধ করতে ছুটলেন। কাদের বলল, 'লক্ষণ খারাপ ছোড ভাই।'

রাত দশটায় হঠাৎ বাদশা মিয়া এসে হাজির। সে খুব একটা খারাপ খবর নিয়ে এসেছে। বিহারীরা দল বেঁধে লুটপাট শুরু করেছে। মানুষও মারছে। শুরু হয়েছে তাজমহল রোড, নূরজাহান রোড অঞ্চল থেকে। খবর সত্যি হলে খুবই চিন্তার ব্যাপার। কাদেরের মুখ শুকিয়ে গেল।

আমি বললাম, 'কোত্থেকে খবর পেয়েছিস?'

'ঠিক খবর স্যার। এক চুল মিথ্যা না।'

লুনার ঘরে গিয়ে দেখি সে জেগে আছে। আমাকে দেখেই বলল, 'ঐ ছেলেটি কী বলছে?'

'না, কিছু না।'

'বলেন আমাকে, কী বলছে?'

'বিহারীরা নাকি লুটপাট করা শুরু করেছে।'

'কোন জায়গায়?'

'শুরু হয়েছে মোহাম্মদপুরে।

'মোহাম্মদপুর কত দূর এখান থেকে?'

'দূর আছে।'

'আপনি ঠিক করে বলেন। কেন আমাকে লুকাচ্ছেন?

'বেশি দূর না।'

বাদশা মিয়া থাকল না। কার্ফু হবে দশটা থেকে। তার আগেই দরবেশ বাচ্চু ভাইয়ের ঘরে পৌছান দরকার। সেখানে পুরুষমানুষ কেউ নেই। বাচ্চু ভাইয়ের ছেলের বয়স মাত্র চার বছর।

আমরা বাতিটাতি নিভিয়ে সমস্ত রাত জেগে বসে রইলাম। মাঝরাতের দিকে সোবাহানবাগের দিক থেকে খুব হৈ-চৈ ও চিৎকার শোনা গেল। এর কিছুক্ষণ পর একনাগাড়ে দীর্ঘ সময় গুলীর শব্দ হতে লাগল। আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম।

'কাদের, কী করা যায়?'

'আল্লাহ্‌র নাম নেন ছোড ভাই। আল্লাহ্ হাফেজ।'

লুনা কিছুতেই বিছানায় শুয়ে থাকতে রাজি হল না। অন্ধকার বারান্দায় আমাদের সঙ্গে সারা রাত বসে রইল। ভোর রাতে মাইকে করে বলা হল এই অঞ্চলে বিকাল তিনটা পর্যন্ত কার্ফু বলবৎ থাকবে।

দিনটি মেঘলা। দুপুর থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। আমি নিচতলায় আজিজ সাহেবের ঘরের সামনে চুপচাপ বসে রইলাম। আজিজ সাহেব বা নেজাম সাহেব কারোর কোনো খোঁজখবর নেই। নেজাম সাহেবের নামে একটি রেজিস্ট্রি চিঠি অনেক দিন থেকে পড়ে আছে। লোকটি কোথায় আছে কে জানে?

'ছোড ভাই, আপনের চা।'

কাদের শুধু চা নয়, একটি পিরিচে দুটি বিস্কিটও নিয়ে এসেছে।

'কী ব্যাপার, চা কেন?'

'ছোড ভাই, এই শেষ কাপ চা বানাইলাম।'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম।

'আর দেখা হয় কি না-হয়।'

'ব্যাপার কী!'

'আমি রফিক ভাইয়ের সাথে মেঘালয় যাইতেছি ছোড ভাই।'

'কবে?'

'আইজই যাওনের কথা। কার্ফু তুললেই রওনা দেওনের কথা।'

'আগে বলিস নি কেন?'

কাদের চুপ করে রইল। এক সময় মৃদু স্বরে বলল, 'কার্ফু ভাঙলেই আমি লুনা আফার জন্যে ডাক্তারের ব্যবস্থা কইরা রফিক ভাইয়ের বাসায় যাইয়াম। এখন ডাক্তার পাইলে হয়।'

তাকিয়ে দেখি, কাদের শার্টের হাতায় চোখ মুছছে।

বেলা সাড়ে-তিনটায় কাদের সত্যি চলে গেল। মতিনউদ্দিন সাহেব কিছুই জানেন না বলে মনে হল। আমাকে বললেন, 'কাদেরের কাণ্ড দেখেছেন, তিন ঘন্টার জন্যে কার্ফু রিলাক্স করেছে--এর মধ্যেই তাকে বেরুতে হবে। কথা বললে তো শোনে না। শেষে একার জন্যে সবাই মারা পড়ব।'

মতিনউদ্দিন সাহেব গম্ভীর হয়ে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। তাঁর দৃষ্টি কেমন যেন উদভ্রান্ত। আমি বললাম, 'আপনার কি শরীর ঠিক আছে?'

'জ্বি, ঠিক আছে।'

'দেখছেন কেমন ঢালা বর্ষণ শুরু হয়েছে?'

'জ্বি দেখলাম।'

'লুনা কি ঘুমাচ্ছে?'

মতিন সাহেব হঠাৎ বললেন, 'মেয়েটার কাছে গিয়ে বসেন। ওর শরীর খুব খারাপ।' সহজ স্বাভাবিক ভালোমানুষের মতো কথাবার্তা।

লুনা জেগে ছিল। জ্বরের আঁচে তার ফর্সা গাল লালচে হয়ে আছে। চোখ দুটিও ঈষৎ রক্তবর্ণ।

'খুব বেশি খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'কাদের এক্ষুণি ডাক্তার পাঠাবে।'

'আপনি একটু বসবেন আমার কাছে?'

আমি তার মাথার কাছে গিয়ে বসলাম। লুনা ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। আমার দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে বলল, 'একদিন সব আবার আগের মতো হবে, ঠিক না?'

'নিশ্চয়ই হবে, খুব বেশি দেরিও নেই।'

'সেই সময় আপানাকে আমাদের বাসায় কয়েক দিন এসে থাকতে হবে। মতিন সাহেবকে আর কাদেরকেও।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভালোই হবে।'

'তখন কিন্তু হেন-তেন অজুহাত দিতে পারবেন না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'আপনার থাকার ইচ্ছা নেই, হাসছেন মনে মনে।'

'আরে না।'

'আর যখন সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আমি প্রায়ই আপনার এখানে বেড়াতে আসব।'

'তা তো আসবেই।'

'তখন আমার সঙ্গে অনেক কথা বলতে হবে। তখন যদি আপনি মনে করেন যে বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে আমি কী কথা বলব তাহলে খুব রাগ করব।'

'না, রাগ করতে দেব না।'

'আমি কিন্তু মোটেই বাচ্চা মেয়ে না। আমি অনেক কিছু জানি। ওকি, আপনি হাসছেন কেন?'

'কই, হাসছি কোথায়?'

'মনে মনে হাসছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি। যান, আপনার সঙ্গে কথা বলব না আমি।'

লুনা ঝিম মেরে গেল। দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বলল না। আমি চুপচাপ কাছে বসে রইলাম। কাদের কি ডাক্তারকে বলতে ভুলে গিয়েছে? ভোলবার কথা তো নয়।

লুনা সমস্ত দিন কিছুই খায় নি। আমি এক গ্লাস দুধ এনে দিলাম, সে তা স্পর্শও করল না। এক সময় গাঢ় রক্তবর্ণ চোখ মেলে বলল, 'কাদের এবং মতিন সাহেব এদের একটু ডেকে জিজ্ঞেস করুন তো ওরা আমাদের বাসায় থাকবে কি-না।'

'নিশ্চয়ই থাকবে।'

'তবু আপনি জিজ্ঞেস করুন।'

মতিন সাহেবকে ডেকে আনলাম। লুনা জড়িত স্বরে বলল, 'আপনি কি থাকবেন আমাদের বাসায় কিছু দিন? থাকতে হবে। না বললে শুনব না।'

মতিন সাহেব মুখ কালো করে বললেন, 'জ্বর মনে হয় খুব বেশি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, অনেক বেশি। কাদের ডাক্তার পাঠাবে।'

'কখন পাঠাবে?'

'কার্ফু ভাঙার আগেই পাঠাবে।'

লুনা বলল, 'কোনো ডাক্তার আসবে না। কেউ আসবে না আমার জন্যে।'

ডাক্তার সত্যি সত্যি এল না। সন্ধ্যার আগে আগে বাদশা মিয়া এসে উপস্থিত। জানা গেল কাদের দু' জন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, তাদের এক জন বলেছেন পরদিন সকালবেলায় আসবেন। অন্য জন বলেছেন হাসপাতালে নিয়ে যেতে।

সন্ধ্যা ছ'টা থেকে আবার কার্ফু। লুনা আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে। মাঝেমাঝে বেশ সহজভাবে কথা বলে পরক্ষণেই নিজের মনে বিড়বিড় করে। এক বার খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, 'ঠিক করে বলুন তো, আমার চেয়েও সুন্দরী কোনো মেয়ে দেখেছেন? আমাকে খুশি করবার জন্যে বললে হবে না। আমি ঠিক বুঝে ফেলব।'

আমি চুপ করে রইলাম। লুনার মুখে আচ্ছন্ন ভাব।

'চুপ করে থাকলে হবে না, বলতে হবে।'

'তোমার চেয়ে কোনো সুন্দরী মেয়ে আমি দেখি নি, লুনা।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।

'আমার গা ছুঁয়ে বলুন।'

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লুনার অবস্থা খুব খারাপ হল। মনে হল লোকজন ঠিক চিনতে পারছে না। মতিন সাহেব ঘরে ঢুকতেই বলল, 'আপনি আমার আম্মিকে

একটু ডেকে দেবেন?'

মতিন সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'ডেকে দিন না। বেশিক্ষণ কথা বলব না, সত্যি বলছি।'

মতিন সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'শফিক ভাই, আমি ডাক্তারের খোঁজে যাব। আপনি ওর কাছে বসে থাকুন। হাসপাতালে নিতে হবে।'

মতিন সাহেবের ভাবভঙ্গি অত্যন্ত স্বাভাবিক। সহজ সাধারণ মানুষের মতো কাপড় পরলেন। বাদশা অবাক হয়ে বলল, 'কার্ফুর মইধ্যে যাইবেন?'

'হ্যাঁ।'

আমি বললাম, 'সত্যি সত্যি বেরুচ্ছেন মতিন সাহেব?'

'হ্যাঁ। কাদের মুক্তিবাহিনীতে গেছে শুনেছেন?'

'শুনেছি।'

'বাদশা বলল--খুব নাকি কাঁদছিল। কাঁদার তো কিছু নেই, কী বলেন?'

মতিনউদ্দিন সাহেব জুতো পায়ে দিতে-দিতে বললেন,'দেখবেন, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমি বসে রইলাম মেয়েটির পাশে। জানালা দিয়ে দেখছি, শান্ত ভঙ্গিতে পা ফেলে মতিনউদ্দিন সাহেব এগোচ্ছেন। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় তাঁর দীর্ঘ ছায়া পড়েছে।

এক দিন এই দুঃস্বপ্ন নিশ্চয়ই কাটবে। এই অপূর্ব রূপবতী মেয়েটি গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরে হয়তো সত্যি সত্যি বেড়াতে আসবে এ বাড়িতে। বিলু নীলুরা ফিরে আসবে একতলায়। অকারণেই বিলু দোতলায় উঠে এসে চোখ ঘুরিয়ে বলবে, 'আচ্ছা বলুন দেখি, দুই এবং তিন যোগ করলে কখন সাত হয়?' কনিষ্কও ফিরে এসে গর্বিত ভঙ্গিতে রেলিং-এ বসে ডাকবে "কা-কা"। কাদের মিয়া বিরক্ত ভঙ্গিতে বলবে--"কী অলক্ষণ। যা-যা, ভাগ"। গভীর রাত্রে মুষলধারে বর্ষণ হবে। সেই বর্ষণ অগ্রাহ্য করে পাড়ার বখাটে ছেলেরা সেকেণ্ড শো সিনেমা দেখে শিস দিতে-দিতে বাড়ি ফিরবে। বৃষ্টির ছাটে আমার তোষক ভিজে যাবে, তবু আমি আলস্য করে উঠব না।

আমি বসেই রইলাম। বসেই রইলাম। লুনা ফিসফিস করে তার মাকে এক বার ডাকল। হঠাৎ লক্ষ করলাম, মতিন সাহেব ঠিকই বলেছেন। মেয়েটির নাকের ডগায় ছোট একটি লাল রঙের তিল। বহু দূরে একসঙ্গে অনেকগুলি কুকুর ডাকতে লাগল। আমার ঘরের প্রাচীন তক্ষকটি বুক সেলফের কাছে থেকে মাথা ঘুরিয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।